অমৃতলাল বসুর
জীবনী ও সাহিত্য

অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য

ডঃ অরুণকুমার মিত্র

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩

বিদ্যোৎসাহী পিতা ও সর্বংসহা মাতার

পুণ্যস্মৃতিতে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. ফিল্. উপাধিপ্রাপ্ত গবেষণাগ্রন্থ

ভূমিকা

ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজের ইতিহাস, কোন কোন ইংরেজের চারিত্র্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের অভিভূত না করিয়া আমাদের জ্ঞানস্পৃহা ও বাহিরের বিষয়ে কৌতুহল জাগাইয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে উস্‌কাইয়া দিয়াছিল। সেই পথে বাঙালী মনীষার নবজাগৃতি ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ এমন অনেকগুলি মানুষ তৈয়ারি হইয়াছিলেন যাঁহারা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাধর যাঁহারা যে কোন কালে জন্মাইলে দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিতেন। বাকি যাঁহারা তাঁহারা কালের পুরুষ ছিলেন। অর্থাৎ বিশিষ্ট কাল ও পরিবেশটিতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ কার্য দ্বারা দেশকে আগাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহারা আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ, তবে অ-সাধারণকর্মা। অমৃতলাল বসু ছিলেন মহৎকর্মা সাধারণ মানুষ।

যাঁহারা মহাপুরুষ অর্থাৎ মহৎপ্রতিভাধর ধর্ম ও চিন্তানেতা তাঁহাদের জীবনী এক ধরণের, আর যাঁহারা মহৎকর্মা গৃহস্থ মানুষ, তাঁহাদের জীবনী অন্য ধরণের। মহাপুরুষের জীবনীতে তাঁহার মহাপুরুষত্বটুকুই বিচার্য; তাঁহার জীবনে ভালোমন্দবিজড়িত সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্রত্ব যতখানিই থাক না কেন, তাহা জীবনীতে পরিত্যাজ্য। কেননা মহাপুরুষের জীবনী, আমাদের দেশে, ধর্মগুরু এমন কি অবতারের জীবনকথার ছাঁচে ঢালাই হয়। সে জীবনী একাধারে সাহিত্য ও ধর্মকথা। সাধারণ মানুষের জীবনী ইতিহাসের অন্তর্গত। অতএব তাহাতে মানুষটির সম্পূর্ণ চিত্র আকাঙ্ক্ষিত। দোষগুণ লইয়া মানুষ (এবং মহামানুষও)। সাধারণ মানুষের দোষগুলি মুছিয়া দিয়া শুধু গুণগুলি ধরিয়া দিলে আমরা মানুষটিকে পাইব না, ইতিহাস হইবে না। একথা অত্যন্ত সাধারণ, তবুও বলিলাম এই কারণে যে, বাংলা সাহিত্যে অধিকাংশ জীবনীই চরিতামৃত কিংবা লীলাকাহিনী।

ডক্টর শ্রীমান্ অরুণ মিত্র এই গ্রন্থে অমৃতলালের যে জীবনী দিয়াছেন তাহা ইতিহাস, সুতরাং বাংলা জীবনীসাহিত্যে একটু নূতনতর। আমার বিশ্বাস সাধারণ পাঠকেরও ভালো লাগিবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের

এক অ-সাধারণকর্মা ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিয়া প্রতিভার বলে বাংলা নাট্য ও কথাসাহিত্যে এবং রঙ্গমঞ্চে বিচিত্রকীর্তি দেখাইয়াছিলেন। আরও বড় কথা সেই সঙ্গে তিনি নাগরিক বিদগ্ধতার এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। সু-লেখক সু-অভিনেতা সু-শিক্ষিত সুরসিক সদালাপী অমৃতলালের সমকক্ষ তাঁহার সময়েও খুব কমই ছিল। এমন চৌকস ব্যক্তির জীবনকথা যতটুকু পাই ততটুকুই উপাদেয়। অরুণবাবুর বইটি পড়িলে পাঠকের তৃষ্ণা বাড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে করি। অরুণবাবু জল ঢালিয়া দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন নাই, একথা স্বীকার করিতে হইবে।

প্রস্তুত বইটির দ্বিতীয় অংশ অমৃতলালের সাহিত্যের আলোচনা। এ অংশটি রসিক পাঠকের, গবেষকের ও পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই কাজে লাগিবে। বইটির তৃতীয় অংশ—পরিশিষ্ট—কম মূল্যবান্ নয়। অমৃতলাল দিনলিপি লিখিতেন ইহা সাধারণ পাঠকের জানা ছিল না। অরুণবাবু সেই অজ্ঞাতপূর্ব দিনলিপির একটু অংশ পাইয়া পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাসের পক্ষে ইহার মূল্য যথেষ্ট। ছবিগুলিও বইটিকে মূল্যবান্ করিয়াছে।

'অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য' পড়িয়া যদি বাঙালী পাঠক অমৃতলালের রচনাবলী পড়িতে উৎসাহবোধ করেন তবে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীসুকুমার সেন

লেখকের কথা

অমৃতলাল বসুর (১৮৫৩-১৯২৯) পূর্ণাঙ্গ জীবনীসংকলন ও তাঁহার সমগ্র সাহিত্যের পর্যালোচনা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে অমৃতলালের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং রঙ্গালয়ের সংস্কার ও উন্নতির একনিষ্ঠ পোষক। রঙ্গালয়ের দক্ষ অধ্যক্ষ ও যোগ্য নাট্যশিক্ষকরূপেও তাঁহার কৃতিত্ব সামান্য ছিল না। তিনি যে কেবল নট ও নাট্যকার ছিলেন এমন নহে; কবি ও গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক, বাগ্মী ও সামাজিক এবং শিক্ষানুরাগী ও দেশপ্রেমী-রূপেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত। তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভায় ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বে সমাজের সকল স্তরের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি অনেকেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু অদ্যাবধি অমৃতলালের কোন জীবনীগ্রন্থ রচিত বা তাঁহার সমগ্র সাহিত্য পর্যালোচিত হয় নাই। একালের বাঙালী পাঠকের নিকট তিনি বিশেষ করিয়া প্রহসন-রচয়িতারূপেই পরিচিত। মনে হয়, তাঁহার 'রসরাজ' পরিচয়টিতে অন্য সকল গুণ ঢাকা পড়িয়াছে।

অমৃতলালের জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরে যদি তাঁহার জীবনী সংকলিত হইত, তাহা হইলে এমন অনেক মূল্যবান উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারিত যাহার চিহ্নমাত্র এখন লুপ্ত। আর সেই সূত্রে তাঁহার সমকালীন বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের ও অভিনয়জগতের অনেক অজ্ঞাত তথ্য লিপিবদ্ধ থাকিত। এ বিষয়ে তাঁহার দিনলিপির বিলুপ্ত পৃষ্ঠাগুলি এবং তাঁহার গ্রন্থাগারের পুস্তক ও সংগৃহীত অন্যান্য কাগজপত্রাদি আরও অনেক অভ্রান্ত উপাদান দিতে পারিত। কিন্তু সেই সব অমূল্য উপকরণের কিছু সংগ্রহ করিয়াও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যায় নাই। অমৃতলালের শেষজীবনে 'অমৃত-চক্রে'র চেষ্টায় যাহা কিছু সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল, পরে সেগুলির আর উদ্দেশ ছিল না। মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণের এবং অর্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ, বিনোদিনী, তারাসুন্দরী প্রভৃতি নটনটীদিগের এক বা একাধিক ক্ষুদ্র-বৃহৎ জীবনীগ্রন্থ আমরা লাভ করিয়াছি, কিন্তু অমৃতলালের কোন স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ জীবনীগ্রন্থ

এখনও আমরা পাই নাই। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ জীবনীকোষ 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থেও অমৃতলালের জীবনী নাই, যদিও অন্য অনেকেরই জীবনীর প্রসঙ্গে অমৃতলালের কথা অনিবার্যভাবে উত্থাপিত হইয়াছে।

অমৃতলালের জীবৎকালে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত 'বিশ্বকোষে' এবং 'জন্মভূমি' পত্রিকার একটি সংখ্যায়। ইহা ব্যতীত 'পুরাতন প্রসঙ্গে' কথিত ও 'পুরাতন পঞ্জিকা'য় লিখিত তাঁহার স্মৃতিকথা হইতেও জীবনীর কিছু কিছু মূল্যবান উপাদান মিলিয়াছে। অমৃত-লালের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে সংকলিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত-গ্রন্থেও ('সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'—৬৭) তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ আছে।

তথ্যাদির বিলুপ্তি ও উপকরণের অলভ্যতার জন্য অমৃতলালের বিস্তৃত জীবনী সংকলিত হয় নাই। যখন এই কার্যে ব্রতী হই, তখন জীবনীর উপাদান আরও বিনষ্ট—প্রাচীনরাও অনেকেই গত। এই সকল অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যথাসাধ্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া অমৃতলালের যে-জীবনী সংকলন করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সমকালীন মানুষের নিকট তাঁহার স্থান কোথায় ছিল, তাহাও প্রসঙ্গমতো তথ্যাদির দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছি। তাঁহাকে লিখিত পত্রাবলী হইতেও (যাহা এতদিন প্রকাশিত হয় নাই) তাহা স্পষ্ট হইবে। সম্ভ্রান্ত সমাজের ভিন্নরুচির মানুষকে একজন 'থিয়েটারের লোক' কতটা আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহাও এই সকল পত্র হইতে জানা যাইবে। বিভিন্ন গ্রন্থে এবং সংবাদ ও সাময়িক পত্রে অমৃতলাল-সম্পর্কিত যে সকল মতামত ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাও অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়া ব্যক্তি ও স্রষ্টা অমৃতলালকে সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

অমৃতলালের নাটক-প্রহসনের আলোচনাকালে অভিনয়ের ইতিহাস দিয়াছি এবং সংবাদপত্রাদির মতামত উদ্ধার করিয়াছি। ইহাতে তাঁহার নাটক-প্রহসনের অভিনয় দেখিতে রঙ্গালয়ে কিরূপ দর্শক-সমাগম হইত, অভিনয় দেখিয়া দর্শকরা কতটা আনন্দলাভ করিতেন বা এইগুলির অভিনয়ে রঙ্গালয়ে কিরূপ অর্থাগম হইত, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

সমকালীন সমাজের বিশিষ্ট পুরুষদের বিদ্রূপ করিবার দুঃসাহসে অ্যারিস্টো-ফেনিসের সহিত তাঁহার তুলনা চলে। অ্যারিস্টোফেনিস যেমন আক্রমণ করিয়া-

ছিলেন শক্তিধর ক্লেওনকে, বিদ্রূপে বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন বন্ধু সক্রেটিসকে, শান্ত কৌতুকের খোঁচা দিয়াছিলেন নাট্যকার ইউরিপিডিসকে—অমৃতলালও তেমনই রঙ্গে-ব্যঙ্গে-আঘাতে জর্জরিত করিয়াছিলেন সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সমাজপতি ও ধর্মব্যবসায়ীদের। অ্যারিস্টোফেনিস না পড়িলে যেমন এথেন্সবাসীদের স্বভাব-ধর্ম জানা যাইবে না, অমৃতলালের প্রহসনগুলি অপঠিত থাকিলে তেমনই তাঁহার কালের বাঙালীর অন্তঃপ্রকৃতির যথার্থ পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত থাকিবে।

অমৃতলালের নাটক-প্রহসনের অনেক স্থলে বিদেশী কাহিনীর ছায়া ও বিদেশী চরিত্রের ছাপ আছে। কোন্ নাট্যকারের রচনাতেই বা না আছে? যে মলিয়েরের প্রভাব বাংলা প্রহসন-সাহিত্যে সর্বাধিক, বিদেশী প্রভাব সর্বতোভাবে গ্রহণ ও স্বীকরণ করিবার কাজে তিনিও ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। অনেক সময়ে তাঁহার একই প্রহসনের বিভিন্ন দৃশ্যে ইতালীয় ও স্প্যানিশ কমেডি, টেরেন্সের নাটক, সার্ভেন্টিসের উপন্যাস, বোকাচ্চো-র কাহিনী রঙ্গের নির্ঝর অজস্র ধারায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। অমৃতলালের কৃপণ হলধরকে দেখিয়াই আমাদের মনে মলিয়েরের হারপার্গঁর কথা জাগে। অথচ কৃপণ-চরিত্রসৃষ্টিতে মৌলিকতা মলিয়েরও দাবী করিতে পারেন না; প্লটাসের *Aulularia* প্রহসনের কৃপণ ইউক্লিওর ছাঁচেই তাঁহার হারপার্গঁ গড়া—'Euclio Parisianized'। আবার প্লটাসের কৌতুক-কল্পনার উৎস সন্ধান করিলে দেখিব, রোম্যান্ দর্শকদের আনন্দ দিতে তিনিও গ্রীক নিউ কমেডি হইতে—বিশেষ করিয়া মেনাণ্ডার হইতে—ইচ্ছামতো কাহিনী, চরিত্র এবং সংলাপ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সেইরূপ টেরেন্সের নাটকগুলিতেও মেনাণ্ডারেরই শুধু নহে, ডিফিলাস ও অ্যাপোলোডোরাসের প্রভাবও বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই প্রভাবের দৃষ্টান্ত সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ হইতেও যথেষ্ট দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু অপ্রাসঙ্গিকবোধে সে আলোচনায় বিরত রহিলাম। অমৃতলালের নাটক-প্রহসনে বিদেশী প্রভাব যাহা আছে তাহা কৃতিত্বপূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যতায় আপন সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

অনেক সময়ে আকস্মিক সাদৃশ্যকেও প্রভাব বলিয়া মনে হইতে পারে। 'রাজা-বাহাদুর' প্রহসনের শেষ দৃশ্যের রঙ্গকল্পনা প্লটাসের *Asinaria* প্রহসনের অনুরূপ। মনসা ঠাকুরাণী যেভাবে স্বামী গাণিক্যধনকে পাঁচী বাইজীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে, আর্টেমোনাও তেমনই তাহার স্বামী 'বুড়ো শালিক' ডিমিনেটাস্‌কে 'বাইজী' ফিলেনিয়ামের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।

এখন, এই সাদৃশ্য আকস্মিক না প্লটাসের প্রভাবজাত, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন,—বিশেষ করিয়া এইরূপ ঘটনা যখন যে কোন সমাজে যে কোন কালেই ঘটিতে পারে।

অমৃতলালের রচনায় বিদেশী প্রভাবের কথা চিন্তা করিবার সময়ে এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিদেশী সাহিত্যপাঠের বহু পূর্বে, যখন বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অপঠিত বলিতে কিছু ছিল না, তখন সেই বালক বয়সেই হাসির ছলে শোধন করিবার মনোভঙ্গী তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন মধুসূদন ও দীনবন্ধুর আদর্শে।

অমৃতলালের বিভিন্ন প্রহসনে সমকালীন সমাজের ক্রিয়াকলাপ নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সে দিক দিয়া, ব্যঙ্গশিল্পীর স্বভাবসুলভ আতিশয্য সত্ত্বেও, তাঁহার প্রহসনগুলি সামাজিক ইতিহাসের উদ্দেশ্য অনেকখানি সিদ্ধ করিতেছে। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন, তাঁহার বিদ্রূপ ও রসিকতা একালের পক্ষে অর্থহীন ও অবান্তর। কিন্তু ইহা অদূরদর্শীর দৃষ্টিভঙ্গী। সাহিত্যের শেষ বিচার এত সহজে করিলে গোগোল, ইবসেন, বারনার্ড শ প্রভৃতির গ্রন্থের সহিত বহু 'মাস্টারপীস্'ই পরিত্যক্ত হইবে। এমন কি বারনার্ড শ-র পরে যিনি ছিলেন ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান 'writer of protest', সেই ইভ্‌লিন ওয়া'ও আজ পুরাতন বলিয়া বাতিল হইয়া যাইবেন। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের ইংলণ্ডের যে-কেতাদোরস্ত সমাজকে তিনি সুতীব্র আঘাতে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন তাঁহার *Decline and Fall* উপন্যাসে বা যে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের নির্বোধ অন্তঃসারশূন্যতাকে সমুচ্চ ধিক্কারে কম্পিত করিয়াছিলেন তাঁহার *Vile Bodies*-এ, সে সমাজ ও সমাজের সে 'ব্রাইট্ ইয়ং থিংস্' এখন আর সে চেহারায় নাই। কিন্তু যতদিন পাঠক তাঁহার সৃষ্ট ও আক্রান্ত চরিত্রের মধ্যে নিজেদের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি আবিষ্কার করিতে পারিবেন ততদিন তাঁহার গ্রন্থের মূল্য কমিবে না। অমৃতলাল সম্পর্কেও সেই কথা। তাঁহার ব্যঙ্গের আঘাত ও রসিকতার রস নিজের যুগেই আবদ্ধ নাই—তাহা এ যুগের শঠতা, ভণ্ডামি ও পরিণামবুদ্ধিহীন নির্বোধ ক্রিয়াকলাপকেও স্পর্শ করিতেছে। বাঙালীর স্বভাবের যে সকল দোষত্রুটি তিনি আঘাত করিয়া শোধন করিতে চাহিয়াছিলেন সেগুলি হইতে অনেকাংশে আমরা এখনও মুক্ত হইতে পারি নাই। তাঁহার অনেক বক্তব্য এখন ভবিষ্যদ্‌বাণীরই ন্যায় মনে হয়।

রঙ্গালয়ের সদাব্যস্ত অধ্যক্ষ, নট, নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালক হইয়াও

সাহিত্যের সর্ববিভাগেই তিনি তাঁহার কুশলী লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নাটক, প্রহসন ও নাট্যরূপগুলি ব্যতীত পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল কেবলমাত্র তাঁহার দুইটি কাব্যগ্রন্থ—'অমৃত-মদিরা' ও 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা', এবং একটি কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-নক্শার সংকলন —'কৌতুক-যৌতুক'। বাকি সকল রচনাই (বাংলা ও ইংরেজী) সংবাদ ও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। কিছু কিছু এখন অলভ্য। এই রচনাগুলিকে বিষয়ানুসারে শ্রেণীসজ্জিত করিয়া কালানুক্রমিকভাবে পর্যালোচনা করিয়াছি। দৈনিক বসুমতীতে 'প্রজানীতি' নামে অমৃতলালের যে গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধমালা বাহির হইয়াছিল তাহার উল্লেখ কোনও গ্রন্থে দেখি নাই। এই হিতগর্ভ প্রবন্ধও গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

'হরিশ্চন্দ্র' নাটকটির প্রণেতা অমৃতলাল নহেন এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছি। 'সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতলালের রচনাবলীর যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে 'চঞ্চলা' ও 'অবলা বল' (আসলে 'অবলাবালা') নামে দুইটি উপন্যাস (দুইটিই ডিটেকটিভ্ উপন্যাস) এবং 'স্বপ্নলব্ধা' নামে একটি স্মৃতিচিত্র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এগুলি যে অপর কোন অমৃতলাল বসুর রচনা সে আলোচনাও যথাস্থানে করিয়াছি।

অমৃতলালের দিনলিপির যে কয়টি জীর্ণপত্র মিলিয়াছে সেগুলি ১৮৯৫ হইতে ১৮৯৭-এর মধ্যে লেখা। এইগুলি হইতে তাঁহার অন্তর্লোকের স্পষ্ট পরিচয় ও সেকালের নাট্যজগতের কিছু অজ্ঞাত তথ্য ও মতামত পাইতেছি। এই দিনলিপিগুলি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৯৪ সনে স্টার-সম্প্রদায় ময়মনসিংহে অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ অমৃতলালের এই সময়কার একটি অভিনয়-নির্দেশপত্র ও ১৯২৫ সনে তাঁহার লেখা স্টার থিয়েটার-সংক্রান্ত ব্যক্তিগত চুক্তির (১৮৮৯) কয়েকটি প্রসঙ্গ-সংবলিত খসড়া সংগ্রহ করিয়াছি। এই দুইটি এবং কাশীধাম হইতে জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষেত্রভূষণকে লেখা তাঁহার একটি অপ্রকাশিত পত্র পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র হয় নাই। তথাপি নানা বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রহিয়া গেল। যাহা এতদিন হয় নাই আমি কেবল সেই প্রাথমিক কাজই সম্পন্ন করিয়াছি—অমৃতলালের জীবনী ও সাহিত্যের সামগ্রিক রূপটুকু ধরিয়া দিয়া। দেশবাসী তাঁহাকে 'রসরাজ' আখ্যা দিয়াছিলেন প্রহসনেরই

রসাস্বাদ করিয়া; আর এ পর্যন্ত যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে তাহাও তাঁহার নাটক ও প্রহসন লইয়া। কিন্তু তাঁহার ভাষার প্রকৃতি ও হাস্যরসের প্রকার লইয়া বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা এখনও বাকি। সে কাজ করিতে গেলে তাঁহার গল্প-উপন্যাসের সহিত অন্যবিধ রচনাকেও আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে আনিতে হইবে। একমাত্র তখনই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যে, নাট্যকাররূপে তিনি শুধু 'আয়রনি', 'প্যারডি', 'সারকাজ্‌ম' ও 'বার্লেস্ক্‌' লইয়া 'স্যাটায়ার'-এর আসর জমান নাই—বর্ণনামূলক গদ্যেও তাঁহার বুদ্ধিদীপ্ত হাস্য বিকীর্ণ হইয়াছে 'এপিগ্রাম'-এর সুনিপুণ প্রয়োগে, 'এগ্‌জাজারিজ্‌ম'-এর অভাবিত বিন্যাসে, 'ক্যারিকেচারিজ্‌ম'-এর দ্বারা উপহাস্য ব্যক্তিকে আরও হাস্যাস্পদ করিবার দক্ষতায়। এই সকল হাস্যরসোজ্জ্বল আত্মনিষ্ঠ রচনার ও তাঁহার গভীর চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধাদির মধ্য দিয়া শুধু লেখক নহে, মানুষটিরও ব্যক্তিরূপ সকলের নিকট স্পষ্টতর হইবে। তাঁহার এই শ্রেণীর রচনাবলী লইয়া ভবিষ্যতে আরও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণাকার্যের জন্য আমাকে 'ডক্টর অব 'ফিলজফি' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। আমার পূজনীয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের উপদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল (১৯৫৮-৬৩) গবেষণায় রত ছিলাম। ১৯৬৩-র নভেম্বরে 'থিসিস' দাখিল করি এবং ১৯৬৪-র জুন মাসে উপাধি প্রাপ্ত হই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের ভূতপূর্ব সম্পাদক অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও সাহিত্যিক বনফুল ছিলেন অপর দুই পরীক্ষক। তাঁহাদের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করিয়া আমি অনুগৃহীত হইয়াছি। ডঃ সেন তাঁহার অতিশয় কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমার প্রতি স্নেহবশত এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার চরণে আমার কৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করি।

এই দুরূহ গবেষণাকর্মে যিনি আমাকে নিত্য উৎসাহ দিয়াছেন, আমার চিন্তার নানা অপূর্ণতা দূর করিয়াছেন, সাহিত্য, নাটক ও অভিনয়ের আলোচনায় গবেষণাক্লান্ত মুহূর্তগুলি আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছেন, গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য বহু তথ্য ও অপ্রকাশিত পত্রাবলী ব্যবহার করিতে দিয়াছেন—রসরাজের জ্যেষ্ঠ পৌত্র শিক্ষককল্প সেই প্রীতিভূষণ বসুকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। তাঁহার অনুজত্রয়—শ্রীযুক্ত নীতিভূষণ বসু, বলেন বসু ও ৺'ম্যাকাই' বসুর সহৃদয় ব্যবহারের কথাও স্মরণ করি।

বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে সাহিত্যপ্রাণ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোন জিজ্ঞাসায় 'রেডি রেফারেন্সে'র কাজ করিয়াছেন। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় লণ্ডনে থাকিয়াও চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে বাংলা দেশের কোন প্রকাশক এই গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহী হন! ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য অনেক বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়াছেন। দিনলিপির আলোকচিত্রটি ডঃ সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের গৃহীত। ইঁহাদের সকলের সৌহার্দ্যের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি। শ্রীমতী প্রতিভা মিত্রের সহযোগিতার কথাও এক মুখে বলিবার নহে। কলিকাতা, যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এই গ্রন্থের জন্য নিয়ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

নাভানা-র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়ের নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনিই একমাত্র প্রকাশক যিনি এই 'অ-লাভজনক' গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সম্মত হইয়াছেন—আর তাহাও বিনা সুপারিশে এবং উপযুক্ত সৌষ্ঠবের সহিত। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বে আমি পাণ্ডুলিপিসহ কলিকাতার প্রায় সব 'বড় বড়' প্রকাশকের নিকট গিয়া বৃথাই 'আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে, সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে।' গ্রন্থমুদ্রণকালে মুদ্রিত অংশের স্থলে স্থলে পরিবর্তন করিয়া প্রেসের কাজে 'অজস্র সহস্রবিধ' বিঘ্নসৃষ্টি করিয়াছি। গোপালবাবু যে সামান্যতম ইঙ্গিতেও আমার স্বাধীনতা কখনও খর্ব করেন নাই সেকথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি। সেই সঙ্গে কুণ্ঠাহীন সহযোগিতার জন্য নাভানা প্রেসের সুযোগ্য কর্মিবৃন্দকেও ধন্যবাদ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা গ্রন্থপ্রকাশের অর্ধেক ব্যয়ভারবহনে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাকে পত্র লেখেন (১৩. ১. ৬৫)। কিন্তু গোপালবাবু গ্রন্থপ্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজে লওয়ায় সে অর্থানুকূল্য গ্রহণের আবশ্যক হয় নাই।

গ্রন্থখানিতে অশেষ শ্রমে সংগৃহীত উপাদানসমূহ বহুলভাবে ব্যবহার করিয়া ব্যক্তি ও স্রষ্টা অমৃতলালের সামগ্রিক পরিচয় উদ্ঘাটনের যে চেষ্টা করিয়াছি তাহা জিজ্ঞাসু ও রসপিপাসুর কাজে লাগিলে কৃতার্থ হইব।

অরুণকুমার মিত্র

সূচীপত্র

চিত্র ও প্রতিলিপি সূচী

চিত্র :

প্রতিলিপি :

'বঙ্গে আজি যাহা ধার্য,
সমগ্র ভারত-গ্রাহ্য,
হবে কল্য প্রতিপাল্য, বলেছে গোখলে।
দেশ ব'লে কাঁদাকাঁদি,
কাজ দল বাঁধাবাঁধি,
কাঁদে প'ড়ে হা বাংলা কি ঠকান্ ঠক্‌লে ॥'

'Satire has always shone among the rest,
And is the boldest way, if not the best,
To tell men freely of their foulest faults ;
To laugh at their vain deeds and vainer thoughts.'

—Dryden
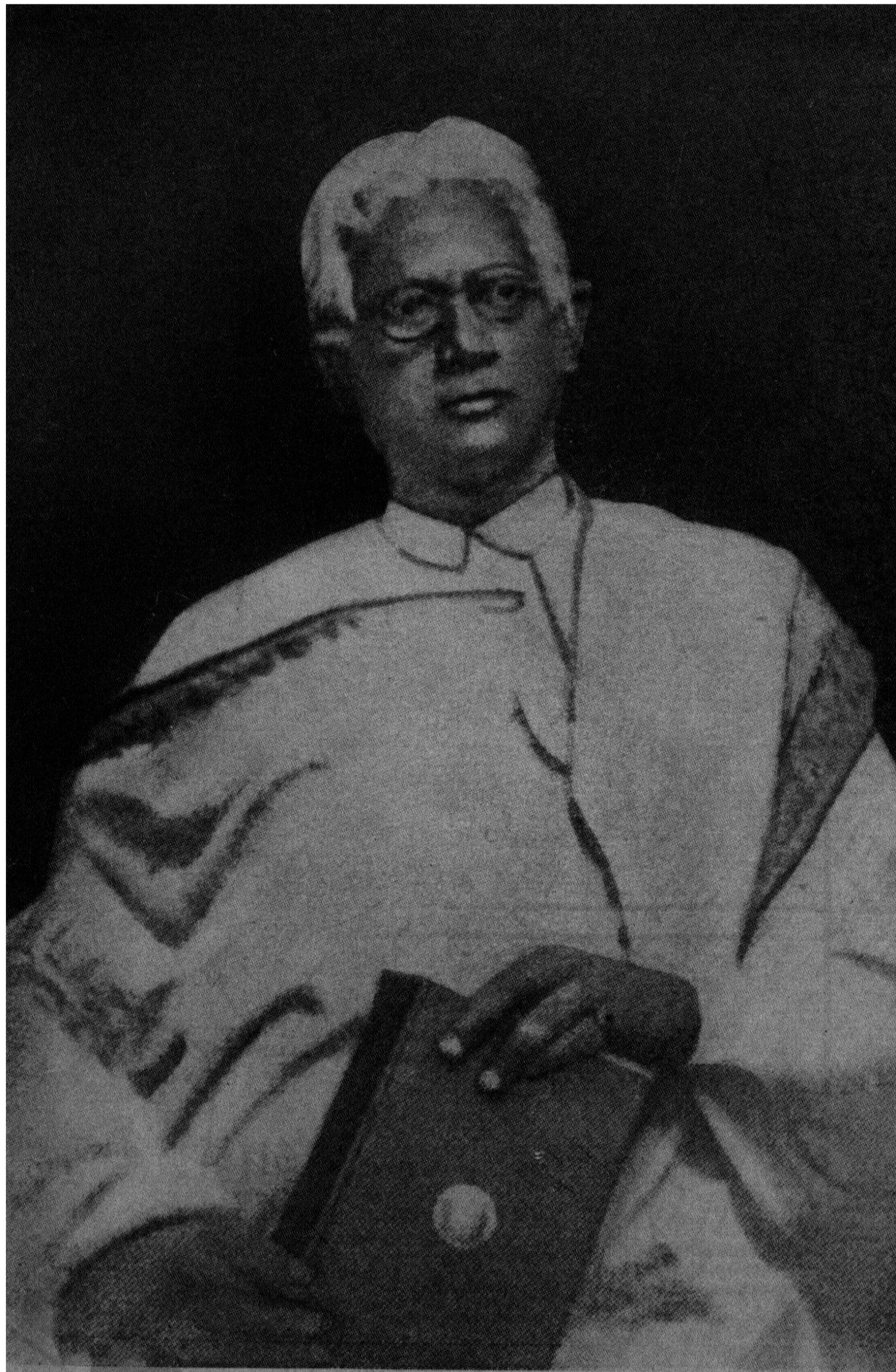
অমৃতলাল বসু (১৯০৩)

জী ব নী

'তুমি দেখিয়াছ মম প্রাণের ভিতর।
কোথায় মহৎ আমি কোথায় ইতর॥'

১২৬০ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখ রামনবমীর দিন রবিবার বেলা দশটায় ৮৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে অমৃতলাল বসু জন্মগ্রহণ করেন।

'এই শ্যামবাজারে আমার মামার বাড়ী, যে বাড়ীতে আমি ভূমিষ্ঠ হই…'।[১]

তাঁহার পিতার নাম ছিল কৈলাসচন্দ্র, মাতার নাম ভুবনমোহিনী। তাঁহার জন্মের সময়ে পিতামহ কালীকৃষ্ণ ও পিতামহী পার্বতী জীবিত ছিলেন। মাতামহ পূর্বেই গত হইয়াছিলেন, জীবিত ছিলেন মাতামহী ও মাতুল। মাতুলের নাম ছিল সাতকড়ি মিত্র। এই মিত্র-বংশ গয়ার সুপ্রসিদ্ধ মিত্র-বংশের শাখা।[২] অমৃতলালের পিতা ও খুল্লতাত হরিশ্চন্দ্র বসুর মতো সাতকড়িও এক সময়ে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর শিক্ষক ছিলেন—

'My father and my uncle…both served as teachers there along with my maternal uncle'[৩]

অমৃতলাল নিজে তাঁহার মাতুলালয় সম্পর্কে লিখিলেও তাঁহার জীবদ্দশায় 'জন্মভূমি' পত্রিকায় যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ইহার কোন আভাস নাই।[৪]

'পুরাতন প্রসঙ্গ'-আলোচনাকালে অমৃতলাল নিজেই তাঁহার জন্ম-সন ও তারিখের উল্লেখ করেন। তদনুযায়ী ১২৬০ এর ৬ই বৈশাখ হয় ১৮৫৩ এর ১৭ এপ্রিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সংবাদপত্রে তাঁহার যে জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হয় তাহাতে অনেকেই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দকেই তাঁহার জন্ম-সন ধরিয়াছেন।[৫]

---

১ 'চরকা'-অমৃতলাল বসু : মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩২৯।

২ 'ভারত' ১৭ই ভাদ্র ১৩৩৪ (স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ সম্পাদিত): কিরণচন্দ্র দত্তের 'বাগবাজার' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩ ১।৩।১৯২৯ তারিখে প্রকাশিত 'The Oriental Seminary: Centenary Volume' পৃ ২৫ দ্রষ্টব্য।

৪ 'জন্মভূমি' বৈশাখ ১৩০৩ সংখ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষার লেখক'এও অমৃতলালের 'জন্মস্থান—কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলা' বলা হইয়াছে।

৫ ৩।৭।১৯২৯ তারিখের 'The Englishman' লেখেন "Born in 1852. …" এবং ঐ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা লেখেন "Amritalal Bose was born……in 1852". ভ্রাতাদের মধ্যে অমৃতলাল জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার নাম—ললিতমোহন ও যোগেন্দ্রনাথ।

ইঁহাদের আদিবাস ছিল যশোহর জেলার পাঁজিয়া গ্রামে।* অমৃতলালের উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ কমলনয়ন বসু পাঁজিয়া হইতে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ধলচিতায় আগমন করেন। ধলচিতা হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রথম বসবাস আরম্ভ করেন অমৃতলালের প্রপিতামহ গঙ্গানারায়ণ বসু। অমৃতলালের একটি প্রবন্ধ হইতে (তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) এ বিষয়ে কিছু তথ্য মেলে—

'আমি নিজে বসু-বংশজ, পূর্বপুরুষের বাস বসিরহাটের অতি সান্নিধ্যে ধলচিতা গ্রামে। আমার প্রপিতামহ গঙ্গানারায়ণ বসু মহাশয় প্রথমে তথা হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন··· ।'[৬]

২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার সদর বসিরহাট সহর হইতে ধলচিতার দূরত্ব এক ক্রোশ। ইছামতীর পূর্বখাতের পরপারেই ধলচিতা অবস্থিত। এখনও সেইস্থানে তাঁহাদের প্রাচীন ভিটা বিদ্যমান, এখনও তথায় তাঁহাদের জ্ঞাতি বসু-বংশ বসবাস করিতেছেন।[৭]

১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২২শে ফাল্গুন বসিরহাট বাণী সম্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশনের সভাপতিরূপে অমৃতলাল তাঁহার অভিভাষণে বসিরহাট না বলিয়া 'বসুর হাট' বলিয়াছিলেন।**

গঙ্গানারায়ণের কলিকাতার বাটী ছিল শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীর সম্মুখে। এই বাটীকেই অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় 'পুরাতন বাটী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

'শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীর সম্মুখে আমাদের কলিকাতার পুরাতন বাটী ছিল, তখন গ্রে স্ট্রীট রাস্তা ছিল না।'[৮]

গঙ্গানারায়ণের সম্মান ও সম্পদ দুই-ই ছিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র কালীকৃষ্ণ অমিতব্যয়ী এবং হয়তো বা কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলও ছিলেন। জুয়ার নেশা ছিল তাঁহার

* ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১লা আগস্ট অমৃতলাল যে বংশতালিকা প্রকাশ করেন তাহাতে 'সাং পাঁজিয়া'র উল্লেখ আছে।

৬ 'বসিরহাট, ধান্যকুড়িয়া'—'পঞ্চপুষ্প' আশ্বিন ১৩৩৬।

৭ 'মাসিক বসুমতী' শ্রাবণ ১৩৩৬ : 'দাদামশাই'— সন্তোষকুমার বসু

** 'বসুরহাট-চক্রবাসী সুধীসমাজ'— পল্লী-বাণী' : চৈত্র ১৩২৭।
'বসিরহাট' কথাটি 'বসুর হাট' হইতে আসাই সম্ভব, যশোহর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'বসুর' উচ্চারিত হয় 'বসির' বলিয়া। যেমন বসুর বাড়ি— বসির বাড়ি।

৮ 'পুরাতন প্রসঙ্গ— দ্বিতীয় পর্য্যায়,' পৃ ৬৫।

অত্যধিক এবং ইহাতেই তিনি একরূপ সর্বস্বান্ত হন। পৈত্রিক বাটীটি খোয়াইয়া তিনি শোভাবাজার বাজারের নিকটবর্তী ১৪৯নং শ্যামবাজার স্ট্রীটে অবস্থান করিতে থাকেন। বাটীটি ক্ষুদ্র হইলেও কালীকৃষ্ণের নিজের ছিল। পরবর্তীকালে তাঁহার দুই পুত্র কৈলাসচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র বাটীর সংস্কারসাধন ও আয়তনবর্ধন করেন। অমৃতলালের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের শেষাবস্থা এই বাটীতেই অতিক্রান্ত হয়।[৯] পিতামহের অতিরিক্ত স্নেহে অমৃতলালের শৈশবকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

কালীকৃষ্ণ মনেপ্রাণে একজন 'সেকেলে' বাঙালী ছিলেন। শৈশবের কথা স্মরণ করিতে গিয়া এই 'অসভ্য ঠাকুরদাদা' সম্পর্কে অমৃতলাল একস্থানে লিখিয়াছেন—

"আমার স্মরণ হয়, যখন আমার সাত আট বৎসর বয়স, একদিন হঠাৎ আমার পিতামহের সম্মুখে এক ক্রীড়াসঙ্গীর সহিত কলহ করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, 'আমি যদি আর তোর সঙ্গে কথা কই ত' আমার গোরক্তের ব্রহ্মরক্তের দিব্যি', অসভ্য ঠাকুরদাদা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, দুই কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন, তিনি সবে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছিলেন, আবার স্নান করিবার জন্য সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে আর্দ্রবস্ত্রে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাসী রহিলেন, বাড়ির মেয়েরা আমাকে যথোচিত ভৎ´সনা করিলেন, মা চুলের মুঠি ধরিয়া পিঠে গোটাকতক খুব জোরে চাপড় দিলেন। কিন্তু এ সবের কিছুই প্রয়োজন ছিল না। কেন না, তাহার পূর্বে দাদার মুখপানে চাহিয়াই আমি লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে যেন মরিয়া গিয়াছিলাম।"[১০]

পিতামহের অপরিসীম স্নেহের কথা অমৃতলাল কোনদিনই বিস্মৃত হন নাই। সুদীর্ঘ কাল পরে (১৩১০ সালের ৬ই বৈশাখ) আপন জন্মতিথি উপলক্ষে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন (অপ্রকাশিত) তাহার একস্থলে পৌত্রের প্রতি পিতামহের স্নেহের আভাস আছে।[১১] কৃতজ্ঞ অমৃতলাল তাঁহার প্রৌঢ়

৯ 'পঞ্চপুষ্প'— আষাঢ় ১৩৩৬ : পৃ ৪০৮।

১০ 'কৌতুক-যৌতুক' পৃ ১৭৩ : 'গো-গোলযোগ'

১১ 'শ্যামবাজারেতে জন্ম মাতুল-আবাসে। দাদার কুটীর দীন শ'বাজার পাশে।
হারায়ে পৈত্রিক হর্ম্য ধন জন নাম। এইস্থানে অল্পদিন পেয়েছেন ধাম।
এ বাড়ী ও বাড়ী ওঠে আনন্দের রোল। শুনেছি মাসেক কাল বাজিয়াছে ঢোল।
পৌত্র পেয়ে পিতামহ অর্থশোক ভুলে। দেছেন চুলিয়ে দান গাত্রবস্ত্র খুলে।'

বয়সের কাব্য 'অমৃত-মদিরা'র 'পুষ্পাঞ্জলি' স্বর্গীয় পিতামহের উদ্দেশেই নিবেদন করেন—

'স্মরি কালীকৃষ্ণ নাম, পিতামহ স্নেহধাম,
আমার সাধের 'দাদা' আদরে পাগল।
তুমি গেছ অমরায়, 'পুষ্পাঞ্জলি' যথা যায়,
ভালবেসে ঢেলে দিই দিশি ফুলদল॥'[১২]

কোন কোন সংবাদপত্র ভ্রমক্রমে এই বসুপরিবারকে শালকিয়ার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১৩] অমৃতলালের স্মৃতিকথায় শালকিয়ার কোন উল্লেখ নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পারিবারিক কারণে অমৃতলাল এবং তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা, ললিতমোহন ও যোগেন্দ্রনাথ, ১৪৯নং শ্যামবাজার স্ট্রীটের পৈত্রিক নিবাসের নিজ নিজ অংশ তাঁহাদের খুল্লতাত হরিশ্চন্দ্রকে বিক্রয় করেন। বিক্রয়-লব্ধ অর্থে অমৃতলাল শালকিয়ায় একখানি বাটী ক্রয় করেন। বাড়িটি ছিল কামিনী স্কুলের গলিতে। এখানে থাকাকালীন তিনি একটি সুন্দর নার্সারী তৈয়ারী করেন— নাম 'অমৃত নার্সারী'। গাছ-গাছড়ার সখ তাঁহার চিরকাল ছিল। স্টার থিয়েটারের সুন্দর কুঞ্জ এবং শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের বাগান তাহার প্রমাণ। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন— 'অমৃতবাবু যে শৌখীন ছিলেন, স্টারের বাগান দেখে তা বোঝা যেত··· ।'[১৪]

শেষ বয়সে তিনি গিধনীতে একটি বাগানবাড়ি ক্রয় করেন। নানা স্থান হইতে গাছ-গাছড়া আনাইয়া তিনি তাঁহার এই 'কালী-কানন'কে[১৫] একটি সুন্দর বিশ্রামকুঞ্জে পরিণত করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ* ১৯২১ খৃষ্টাব্দে গিধনীর ঠিকানায় তাঁহাকে যে পত্রটি (অপ্রকাশিত) লেখেন তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

---

১২ 'অঞ্জলি' : 'অমৃত-মদিরা'— পৃ ৪ ।

১৩ ৩/৭/১৯২৯ তারিখের "The Englishman" লেখেন "Born......in a respectable Kayastha family at Salkia." অমৃত বাজার পত্রিকাও লেখেন "Amrita Lal Bose was born in a respectable Kayastha family at Salkia......"

১৪ 'দেশ', ১৮ আষাঢ় ১৩৬৭— 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' ।

১৫ পত্নীর নাম ছিল কালীকুমারী, সম্ভবতঃ তাঁহারই নামে কানন ।

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল) শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সন্ন্যাসী শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ (১৮৯৯— ১৯২২)

"শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা

R. K. Math
Mylapur
Madras 6. 11. 21.

প্রিয় ভূণীবাবু,[১৬]

আপনার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। Bangalore হইতে প্রেরিত গাছগুলি বেশ সতেজ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। Navel Orange এখানে পাওয়া যায় না—উহা Bangalore-এই একমাত্র পাওয়া যায়। ওলের মুখীর কথা যাহা আপনি লিখিয়াছেন—উহা এ সময় পাওয়া যায় না—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসেই মিলিয়া থাকে। আজকাল এখানে বর্ষাকাল, বৃষ্টি অবিশ্রান্ত হইতেছে—মাত্র এই দুই দিন ধরণ করিয়াছে। Inspired Talk একখানি ভি, পি-তে শীঘ্রই পাঠাইবার জন্য বলিয়াছি, আগামী সোমবার পাঠান হইবে। উপস্থিত শরীর আমার এক প্রকার ভাল আছে। অন্যান্য সকল সংবাদ কুশল। আপনি কুশলে আছেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। আমার আশীর্বাদ—ভালবাসা জানিবেন।

ইতি-

Affly. Yours,
Brahmanand"

শালকিয়ার বাড়িতে অমৃতলাল দীর্ঘকাল বসবাস করিতে পারেন নাই। একটি কন্যা জলমগ্ন হওয়ায়[১৭] এখানকার বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসেন এবং ভীম ঘোষ লেন, শ্যামপুকুর লেন, শিকদার বাগান ষ্ট্রীট, রামচন্দ্র মৈত্র লেন, শ্যাম স্কোয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বাড়ি ভাড়া লইয়া অবস্থান করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে শালকিয়ার বাড়িটি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়।*

---

১৬ অমৃতলালের ডাকনাম।

১৭ 'পঞ্চপুষ্প' আষাঢ়, ১৩৩৬

* ২।১২।১৯২৫ তারিখে "Star Theatre" এই শিরোনামে অমৃতলাল কয়েকটি প্রসঙ্গ তাঁহার দিনলিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে যখন অমৃতলাল স্টারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হন তখনকার কয়েকটি সর্তের উল্লেখ এখানে দেখি। শালকিয়ার বাড়ি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় থাকিবার জন্য তাঁহাকে ৪০৲ ভাতা দেওয়া হইত। উক্ত দিনলিপির একস্থলে অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

অমৃতলালের পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু সুশিক্ষিত ছিলেন এবং সেই কারণেই কলিকাতার বিদ্বৎসমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল বা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ওই স্কুলেই প্রথমে সহকারী শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পিতার সম্পর্কে অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

"যখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী—গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল—হিন্দু কলেজের প্রতিযোগী ছিল, যে সময়ে ৺কৃষ্ণদাস পাল, ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, ডবলিউ, সি, বনার্জি, চন্দ্রনাথ বসু, জাস্‌টিস্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেইসময়ে গ্রন্থকারের পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় উহার একজন প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত। ইনি অদ্বিতীয় শেক্‌সপীয়র পাঠক ক্যাপ্‌টেন ডি, এল, রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্রগণের অন্যতম। 'ওরিয়েণ্টালে'র কৃতবিদ্য ছাত্রেরা মহাসমারোহে শেক্‌সপীয়রের নাটক অভিনয় করিতেন; তখন সে অভিনয়ের ইনি একজন প্রধান উদ্‌যোগী ও পরিচালক ছিলেন। তা ছাড়া ইনি স্বয়ং একবার হ্যামলেটে প্রেতাত্মার অংশ অভিনয়ও করেন, গ্রন্থকারের এইটুকু জানা আছে। শেক্‌সপীয়র আবৃত্তি করিয়া ইনি যে প্রাণোন্মাদকর অমিয়াময় মধুর ঝঙ্কার তুলিতেন, তাহা শুনিয়া শুনিয়া শৈশবকাল হইতেই গ্রন্থকারের হৃদয়ে সেই জগৎ-কবির প্রতি পবিত্র প্রীতি-অনুরাগ অঙ্কুরিত হইতে থাকে।"[১৮]

"4.G.C.G. [গিরিশচন্দ্র ঘোষ] went away, A.L.B. [অমৃতলাল বসু] was manager and though the partners saved G. C's salary both as manager and playwright, A.L.B. did not receive any extra allowance except later on for a very few years Rs. 40/— a month as house-rent, he as manager was required to pay rent and live in Calcutta—near the theatre, while he had his house to live in at Salkia."

১৮ 'অমৃত-মদিরা' পৃ ২১৭-১৮। অন্যত্র লিখিয়াছেন— "I have heard Babu Kali krishna Tagore, Sir Gooroodas Banerjee, Rai Bahadur Kristo Das Pal, Mr. W.C.Bonnerjee, Babu Nabin Chandra De and Babu

এই সকল কৃতী ছাত্রের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু একাধিক স্থলে তাঁহার শিক্ষক কৈলাসচন্দ্রের নাম সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কৈলাসচন্দ্র একজন দক্ষ ও নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার সুশৃংখল নিয়মাধীনে স্কুল সুষ্ঠুভাবেই চলিত। "পৃথিবীর সুখ দুঃখ" নামক গ্রন্থে (১৩১৫) বাল্যস্মৃতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—

"আর একটি কথা মনে হইলে বড়ই বিমল আনন্দ অনুভব করি। Branch Oriental Seminaryতে পড়ি। বয়স ১৪ বৎসর। আমাদের শ্রেণীতে একটি নূতন মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। Main ইস্কুলের হেড মাষ্টার স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় অর্থাৎ ষ্টার থিয়েটরের অমৃতলালের পিতা শিক্ষকটিকে আনিয়াছিলেন। তাঁহার সব ভাল, কিন্তু বয়স বড় কম। তাঁহার অপেক্ষা বয়সে বড় এমন অনেক দুর্দ্দান্ত ছেলে আমাদের শ্রেণীতে পড়িত।...শিক্ষকটির নাম মনে নাই— বোধ হয় সারদা। তিনি পড়াইতে আসিলেই বিদ্রোহী বালকগুলি গোল করিয়া তাঁহাকে পড়াইতে দিত না। তিনি এনট্রান্স পাশ করিয়াছিলেন।...তাঁহার জন্য আমার বড় দুঃখ হইল। আমি অনেককে বুঝাইলাম। কিন্তু কিছুই হইল না। তিনি কৈলাসবাবুকে জানাইলেন। কৈলাসবাবু আমাদের ক্লাসে আসিলেন। কে বিরুদ্ধাচরণ করে, আমাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখিলাম আমার উপর বড় বড় কটাক্ষ পড়িতে লাগিল। আমি কিন্তু নির্ভয়ে তাহাদের নাম বলিয়া দিলাম। কৈলাসবাবু গোঁফের বামপ্রান্ত কামড়াইতে কামড়াইতে চলিয়া গেলেন। একমনে চিন্তা করিবার সময় ঐরূপ করা তাঁহার রীতি ছিল। দণ্ডের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, জানিনা। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে গরীব শিক্ষকটিকে আর কেহ বিরক্ত করিল না। বুঝিলাম, একটি অতি সুশিক্ষিত কর্তব্যপরায়ণ অন্নহীনের অন্ন বজায় রহিল।"[১১]

কৈলাসচন্দ্র যে ঠিক কত বৎসর প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাহা জানা যায় নাই। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে সেকালের পুরাতন কাগজপত্র এখন আর কিছু নাই। চন্দ্রনাথ বসুর আত্মজীবনী হইতে জানা যায় যে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ

Chandra Nath Bose mention with respectful affection the name of Kailas Chandra Bose as their teacher."
(The Oriental Seminary : Centenary Volume, p.25)

১১ পৃ ৫৯—৬১

তিনি 'এন্ট্রান্স ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্ব্বে'[২০] কৈলাসচন্দ্র প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ে W. C. Bonnerjee ছিলেন তাঁহার সহপাঠী।[২১] চন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"এন্ট্রান্স ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্ব্বে শাখা স্কুল হইতে মূল স্কুলে গিয়াছিলাম। মূল স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় ('বিবাহ-বিভ্রাট' প্রণেতা আমার স্নেহাস্পদ অমৃতলালের পিতা) আমাকে এত ভালবাসিতে লাগিলেন যে, আমার ক্লাসের কয়েকটি ছেলে আমাকে তাড়াইবার জন্য প্রতিদিন টেবিল চাপড়াইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিয়া গান গাহিত। আমি চুপ করিয়া শুনিতাম — একটি কথাও কহিতাম না, কৈলাসবাবুকেও কিছু বলিতাম না।"[২২]

'হিন্দু পেট্রিয়ট্' সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল কৈলাসচন্দ্রকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহা অমৃতলাল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বিবৃত করিয়াছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন বরোদার রেসিডেন্টকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগে গাইকোয়াড় মলহার রাওয়ের বিচার চলিতে ছিল তখন 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'সাধারণী', 'বামাবোধিনী' প্রভৃতি দেশীয় সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলিতে মলহার রাওয়ের পক্ষে তীব্র আন্দোলন চলে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দেশীয় হইয়াও বিদেশীয়ের ন্যায় আচরণ করেন সরকার-পক্ষকে সমর্থন করিয়া। অমৃতলাল তাঁহার প্রথম নাট্যরচনা (১৮৭৫) 'হীরকচূর্ণ' নাটকে কৃষ্ণদাস পালকে অত্যন্ত তীব্র ও স্পষ্ট ভাষায় আক্রমণ করেন।[২৩] নাটকটি প্রকাশের পর অমৃতলাল কুণ্ঠিতভাবে কৃষ্ণদাস পালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি কৈলাসচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন— 'আমিও যে তাঁর ছেলের মত, আমি যে তাঁর ছাত্র। তুমি ত আমার গুরুভাই হলে!'[২৪]

কৈলাসচন্দ্রের আর এক কৃতী ছাত্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১২ সালে অমৃতলালকে একটি পত্র লেখেন। এই অপ্রকাশিত পত্রেও শিক্ষক সম্পর্কে ছাত্রের শ্রদ্ধান্বিত মনোভাবটি স্পষ্ট—

২০ চন্দ্রনাথ বসু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৬০ এর ডিসেম্বর মাসে ।

২১ 'উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী'— কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৮৫

২২ 'বঙ্গভাষার লেখক'— হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃ ৬৮৪ ।

২৩ তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য।

২৪ 'পুরাতন প্রসঙ্গ— দ্বিতীয় পর্য্যায়' পৃ ৬৮

"শ্রীহরিঃ শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা,
৯ই ফাল্গুন, ১৩১২

কল্যাণবরেষু,

অদ্য আমার "A few thoughts on education" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক একখানি ডাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। পুস্তকখানি পাঠাইতে একটু বিলম্ব হইয়াছে তজ্জন্য দুঃখিত আছি। আপনার অনেকগুলি পুস্তক আমাকে সাদরে প্রদান করিয়াছেন, এবং আপনার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই বিদ্যালয়ে ও তাঁহার সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মাধীনে আমি কিছুদিন শিক্ষিত হইয়াছিলাম। এই দুই কারণে আমার শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকখানি আপনাকে বহুপূর্ব্বে উপহার দেওয়া আমার কর্ত্তব্য ছিল। তাহা হয় নাই তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়"

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর কৃতী ছাত্ররূপে কৈলাসচন্দ্র পঠদ্দশায় যে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন তদ্বারা তিনি সদ্যোজাত অমৃতলালের মুখ দেখেন। এই 'হিরণ্যমণ্ডিত আশীর্বাদের' কথা অনেকবারই অমৃতলাল স্মরণ করিয়াছেন।[২৫] তাঁহার আবৃত্তি-প্রবণতাও ইংরেজীতে সুপণ্ডিত শেক্সপীয়র-অনুরাগী কৈলাসচন্দ্রের নিকট হইতে লব্ধ।[২৬] ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া ম্যাকেঞ্জী লায়াল কোম্পানীর এজেন্সী গ্রহণ করেন।

প্রবল শিক্ষানুরাগ ছিল বলিয়া কৈলাসচন্দ্র কম্বুলিয়াটোলার বিশ্বম্ভর মৈত্রের আর্থিক সহায়তায় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই পরবর্তীকালের শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল। অমৃতলালের শৈশব শিক্ষার সূচনা এখানে ; এখানেই সতীর্থ অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও ধর্মদাস সুরের সহিত সৌহার্দ্য।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের দশহরার দিন সন্ধ্যার পরে টাইফয়েড রোগে ৩৬।৩৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হয়। অমৃতলালের জননী ভুবনমোহিনীর

---

২৫ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (২য় পর্য্যায়, পৃ ৬৬); Oriental Seminary : Centenary Volume-এও এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

২৬ 'পুরাতন পঞ্জিকা'— মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৩১।

বয়স তখনও ছাব্বিশ পূর্ণ হয় নাই।[২৭] অমৃতলাল তখন ১২ বৎসরের বালক মাত্র। ইহার পর তিনি খুল্লতাত হরিশচন্দ্রের নিকট সস্নেহে লালিত হন। শৈশবে একবার যখন তিনি সংকটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, হরিশ্চন্দ্রের যত্নেই তিনি রক্ষা পান। একথা তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন—

'শুনেছি শৈশবে কাকা যতনে তোমার।
সঙ্কট পীড়ায় প্রাণ পাই একবার॥'[২৮]

৩

'অমৃতলালের শৈশব-শিক্ষা শুরু হয় পিতৃপ্রতিষ্ঠিত কম্বুলিয়াটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে (বর্তমানে 'শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল')।'[২৯] এই বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা খুব সুন্দর ছিল। অমৃতলাল এখানে সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন রিপন কলেজের রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যের পিতা রামগোপাল ভট্টাচার্যের নিকট। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের 'পঞ্চম বর্ষীয় বিজ্ঞাপনী' হইতে জানা যায় যে তিনি তাঁহার শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। সেই কারণে 'শ্রীযুক্ত বাবু অনুপচাঁদ মিত্র-প্রদত্ত এক রজতনির্মিত পদক' তাঁহাকে দেওয়া হয়।

১৮৬০এর ১৮ই ডিসেম্বর তৎকালীন ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুলস একখানি পত্রে বিদ্যালয়-সম্পাদকের নিকট অমৃতলালের বিশেষ সুখ্যাতি করেন।[৩০]

২৭ 'অমৃত-মদিরা'র 'বালবিধবা' কবিতায় এই ঘটনা মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত আছে। শত বর্ষ পূর্বে অসুস্থ হিন্দু বিধবাকে কিরূপ নির্মম সমাজবিধান মানিতে হইত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে অমৃতলাল তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন। ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হয় ১৯০৬ সনে।

২৮ 'নূতন জীবন': 'অমৃত-মদিরা', পৃ ২৬৯

২৯ সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (৬৭) পৃ ৩৫

৩০ "Dear Sir,

......The lad named Umurto Lall Bose is far ahead of his classmates and deserves especial commendation. 18th December, 1860.

I am Dear Sir,
Yours faithfully,
Gopal Chunder Goopto
Offg. Deputy Inspector of Schools"

এই পরীক্ষায় তিনি মোট ৩৫০ নম্বরের মধ্যে ৩১৭ নম্বর পাইয়াছিলেন।[৩১]

শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ে তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন এবং তাহার পর হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন। সেখানে দুই বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার অধ্যয়নকাল। হিন্দু স্কুলে অধ্যয়নের স্মৃতিকথা অমৃতলাল বসন্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায়কে বিবৃত করিয়াছিলেন (৬ ফেব্রুয়ারী ১৯২০)। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

'নাট্যাচার্য্য রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, অমৃত বাবু যখন হিন্দু স্কুলে পড়েন, তখন জ্যোতিবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন। সেটা ইংরাজী ১৮৬৫ সাল।'[৩২]

হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি 'দিনকতক' ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পড়েন। 'পুরাতন পঞ্জিকা'র একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—

'আমি শৈশবে দিনকতক ওরিয়েণ্টালে গিয়েছিলুম, তারপর পিতৃহীন হয়ে ১৮৬৬ থেকে ৬৮ পর্য্যন্ত ঐখানে পড়ি…'[৩৩]

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল যখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর থার্ড ক্লাসে ভরতি হন, স্কুলের তখন অত্যন্ত দুরবস্থা :

'In 1866 when I took my admission in the Oriental Seminary, its popularity was sadly waning...'[৩৪]

স্কুলের খরচ চালাইতে না পারিয়া গৌরমোহন আঢ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ এবং গৌরমোহনের পুত্র ভৈরব আঢ্য স্কুলটি শিবু শীল নামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিবার উপক্রম করেন।

---

৩১ "Dictation from any book, ৫০ এর মধ্যে ৪৮
Reading from any book " ৪৯
Nitibodh " ৪৮
Wopocromonica " ৫০
Bhoogol Sootro " ৫০
Bengal History " ৫০
Arithmetic " ২২
মোট ৩৫০ এর মধ্যে ৩১৭"

৩২ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' পৃ ১৪২

৩৩ মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৩১

৩৪ O.S Centenary Volume p-25

এই সংবাদে :

'রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে, আমরা যেন জলে গেলুম,··· আমাদের থার্ড ক্লাসটা ছিল বৃন্দাবন বসাকের গলির ধারে উপরের ঘরে, ঝড়াঝড় চাদর দিয়ে সব বেঞ্চি টেবল বেঁধে গলির রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া গেল,··· আমাদের মাষ্টার পেনী সাহেব আর অক্ষয় বসু বি, এ, এসে আমাদের থামাতে চেষ্টা করলেন। আমরা বললাম, স্কুল আমরা কখনই বেচতে দেব না, বাড়ীতে কাঁদাকাটা করে ডবল মাইনে দেব, তবু স্কুল বেচতে দেব না। শিবুবাবু সরে পড়লেন··· ।···তার পরদিন স্কুলে গিয়ে ক্লাসে বসেছি, এমন সময় ভৈরববাবু এসে ক্লাসে ঢুকলেন,··· খুব স্নেহের স্বরে বললেন, তোমাদেরই কথা রাখব, স্কুল বেচব না, এস ভাল করে পড়াই'।[৩৫]

শিক্ষায়তনের প্রতি এই যে আন্তরিক অকৃত্রিম অনুরাগ বালক বয়সেই অমৃতলালের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল, ইহাই তাঁহাকে আমৃত্যু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছিল।

'পুরাতন পঞ্জিকা'য় অমৃতলাল লিখিয়াছেন যে, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী হইতে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা দেন।[৩৬] 'পুরাতন প্রসঙ্গে'ও তিনি বলিয়াছেন—

'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। আমার পরীক্ষা দিবার কথা ছিল ১৮৬৬ সালে, কিন্তু তখন আমার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র, সুতরাং দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে আমি পরীক্ষা দিতে পাইলাম।'[৩৭]

কিন্তু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় অমৃতলালের নাম নাই। অথচ মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বেও অমৃতলাল পুনরায় লেখেন,

'We pupils worked right hard on our lessons and in 1868 the pass-list showed a very creditable result'[৩৮]

অমৃতলালের নাম পাওয়া গিয়াছে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ

৩৫ 'পুরাতন পঞ্জিকা' : মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৩১

৩৬ 'স্কুল বেশ চলতে লাগল, ১৮৬৮ সালে আমরাও স্কুলের বিদ্যা শেষ করে বেরিয়ে পড়লুম' : মাসিক বসুমতী, ঐ

৩৭ পৃ ৬৯

৩৮ O. S. Centenary Volume.

ছাত্রদের তালিকায়। সেখানে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর নাম নাই, নাম রহিয়াছে জেনারেল্ অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের![৩৯] অমৃতলাল নিজে কখনও জেনারেল অ্যাসেমব্লিজের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই একটি প্রবন্ধে জেনারেল এ্যাসেমব্লিজের কথা লেখা হয়।[৪০]

স্কুলের নাম এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার সাল সম্পর্কে অমৃতলালের এরূপ 'ভুল' বিস্ময় উদ্রেক করে। মেডিকেল কলেজের পুরাতন কাগজপত্র হইতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত, কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অতদিনের পুরাতন ফাইল সেখানে আর নাই— সবই কাল-কবলিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

৪

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বেই অমৃতলাল প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের প্রায় সমস্তই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। পিতৃকণ্ঠের শেক্সপীয়র আবৃত্তি অতি শৈশবেই তাঁহাকে শুধু এই 'জগৎকবির' প্রতি অনুরক্ত করে নাই— ইংরেজী সাহিত্যেরও প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধাশীল রাখিয়াছিল।

কবিতা রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত হয়। কবিতা রচনায় তাঁহার হাতেখড়ি দিয়াছিলেন শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ের পণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তখনও তাঁহার বয়স বার বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কেননা কৈলাসচন্দ্র তখন জীবিত ছিলেন। 'বাবা তখন স্কুলের সেক্রেটারী।...আমরা বিদ্যালয়ে নানা ছন্দে কবিতা রচনা করিতে অভ্যাস করিলাম।'[৪১]

এই সময়ে অমৃতলালের এক দূর সম্পর্কীয় কাকা তাঁহাকে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ইঁহার নাম প্যারীমোহন বসু।[৪২] প্যারীকাকার নিকট হইতে অমৃতলাল একটু একটু ল্যাটিন গ্রীক শিখিয়া লইয়াছিলেন। প্যারীমোহন

৩৯ দ্রষ্টব্য The Calcutta Gazette : 5.1.1870.

৪০ 'অমৃতময় অমৃতলাল'—মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬।

৪১ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'—দ্বি. প. পৃ ৮৩

৪২ ইনি 'স্যাদাড়ু' গিরিশ ঘোষের ভগ্নীকে বিবাহ করেন।

মধুসূদনের কবিতার 'প্যারডি' করিতেন এবং সেই সব শ্লেষ-রচনা 'ভাস্কর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। ক্রমে অমৃতলালও এই ধরণের শ্লেষ-রচনায় কাকার 'সাকরেদ' হইয়া উঠিলেন। শেষে প্যারীকাকার কবিতার পাদপূরণ করিয়া দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া নিজে কৃতার্থ হইতেন। প্যারীকাকার অভয় পাইয়া তিনি তাঁহার প্রথম স্বাধীন কবিতা রচনা করিলেন তের বৎসর বয়সে (১৮৬৬)। আট চরণের এই কবিতাটির 'আদ্যক্ষরগুলি জুড়িলে' কবির নাম পাওয়া যায়। এই কবিতা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—

'প্যারীকাকার নিকটে অভয় পাইয়া ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আমার প্রথম চিত্রকাব্য রচিত হয়। আমার সেই প্রথম রচনাটি মোটেই রসাত্মক নহে, কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ শব্দ মাত্র। আদ্যক্ষরগুলি একত্র জুড়িলে আমার নামটী বানান করা হয়।···

শ্রীশ্রীহরিপদে যেবা করয়ে স্মরণ।
অবনী ভিতরে সেই আদরের ধন॥
মৃত্যুভয় নাহি থাকে সদা আনন্দিত।
তপ জপ করে সদা মনের সহিত॥
লালসা নাহিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন।
লভিতে লালসা মাত্র ঈশ্বর-চরণ॥
বন্দি' ঈশ্বর-চরণ খোঁজে মোক্ষ পথ।
সুজন স্বজন তার শত্রু হয় হত॥'[৪৩]

এই কবিতাটি কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু উপলক্ষে তিনি একটি কবিতা রচনা করিলেন। কবিতাটির ছন্দ মধুসূদনের 'রেখ মা দাসেরে মনে'র অনুরূপ।

'প্যারীকাকার তাহা এত ভাল লাগিল যে তিনি তাহা 'ভাস্করে' প্রকাশিত করিয়া দিলেন। এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অক্ষরে দেখি। কবিতাটি আমার নিজেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। কিন্তু শ্লেষ-রচনার দিকেই আমার প্রবণতা বেশী রহিয়া গেল।'[৪৪]

কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই প্যারীমোহনের মৃত্যু হয়। অমৃতলালের

৪৩ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'—দ্বি. প. পৃ ৮৩-৮৪
৪৪ ঐ ঐ পৃ ৮৪

বয়স তখন তের-চৌদ্দ। এই বয়সেই তিনি 'ঘটনাচক্রে' একখানি 'প্রহসন নাটক' লিখিয়া ফেলিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম প্রহসন। পাড়ার সখের যাত্রার দলের পীড়াপীড়িতেই ইহার জন্ম—

"আমি তখন সবেমাত্র পড়িয়াছি 'একেই কি বলে সভ্যতা?' তাহারই অনুকরণে আমি একখানা Farce রচনা করিলাম, নামটা বড় ছোটখাট হইল না—'একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা?' এই রচনাটি এখন একেবারে লুপ্ত। রচনায় যে বিশেষ কিছু কৃতিত্ব ছিল তাহা নহে, তবে এইটুকু বলিতে পারি— আমি অনুকরণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু চুরি করি নাই।"[৪৫]

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মধুসূদনের রচনা বালক অমৃতলাল সাগ্রহে পড়িতেন। বালক বয়সে ভাল লাগিত না বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের রচনা বর্জন করিয়াছিলেন। বালক অমৃতলাল ও বালক রবীন্দ্রনাথের মনোধর্মের এই পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মতো। বাইশ বৎসর বয়সে লেখা অমৃতলালের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'হীরকচূর্ণে'র নামপত্রেও দেখিতে পাই 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য হইতে উদ্ধৃতি।[৪৬] রাবণের মনোভাবের সহিত ভাগ্য-বিড়ম্বিত বরোদারাজ মল্‌হার রাওয়ের মনোভাবের যে সাদৃশ্য বাইশ বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা সঙ্গতিহীন নহে। ইহা ব্যতীত মধুসূদনের নিকট বাংলা সাহিত্যের ঋণের কথা তিনি বক্তৃতায়, প্রবন্ধে একাধিকবার স্মরণ করিয়াছেন।[৪৭]

রসসাহিত্য রচনায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রভাব তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। 'বিবিধ' নামে যে হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইত, সেই দুর্লভ সরস 'Cmoic titbits' এর রসপ্রাচুর্যে কিশোর অমৃতলাল মুগ্ধ হইতেন।

৪৫ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'—দ্বি. প. পৃ ৮৫-৮৬

৪৬ 'কুসুম দাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী,
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;'

৪৭ ১৩৩০ সালে কাঁঠালপাড়ায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণ; ১৩৩১ এর মাঘ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে তাঁহার প্রবন্ধ 'সারস্বত ব্রতকথা—মধুসূদন', এবং ১৩৩২ এর ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে তাঁহার 'মধু-মঙ্গল' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শৈশবকাল হইতেই অমৃতলাল ছিলেন সর্বভুক পাঠক। 'সৎসাহিত্য' তো ই, বটতলার উপন্যাস-নাটকও বাদ যাইত না। তাঁহার নিজের কথায়—

'মদনমোহন, তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল ত সব ছেলেই পড়িত। বটতলার বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা বেণীমাধব দের পুত্র লালবিহারী আমার সহপাঠী ছিল। তাহাদের দোকানে যত উপন্যাস নাটক ছিল, এক একখানি করিয়া বোধ হয় সবগুলিই পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। নাটকের প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল।'[৪৮]

এই বটতলার সাহিত্য সম্পর্কে চিরকালই তাঁহার মনের মধ্যে একটা মমতা-পূর্ণ প্রীতির ভাব ছিল। বটতলাই যে একদিন বাংলা সাহিত্যকে কালের আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল একথা তিনি কোনদিনই বিস্মৃত হন নাই। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি লিখিয়াছিলেন—

'আশ্‌মানির রূপবর্ণনাচ্ছলে বটতলার সরস্বতীকে আহ্বান করে বঙ্কিমবাবু একটু বিদ্রূপ করার পর থেকে* অনেক সাহিত্য-ঘোড়সোয়ার বটতলার নামে নাক সিটকে থাকেন। বলি, ও ঠাকুর! কোথায় থাকত তোমার বাঙ্গালা বিদ্যা, বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা ধর্ম, বাঙ্গালা পুণ্য, বাঙ্গালা গদ্য-পদ্য, যদি না চৌদ্দ আনায় বিকুতো বটতলার বাঙ্গালা মহাভারত, বাঙ্গালা রামায়ণ।'[৪৯]

অমৃতলালের যখন ১৮ বৎসর বয়স (১৮৭১) তখন হইতেই তাঁহার ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস পড়ার নেশা জমিয়া ওঠে।[৫০] কুইন্স কলেজের গ্রন্থাগারিক রাজচন্দ্র সান্যাল গ্রন্থাগার হইতে তাঁহাকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার সুযোগ দিয়াছিলেন। অমৃতলাল বলিয়াছেন—

'ইংরাজি পড়ার নেশা আমার খুব জমিয়া উঠিল।...জীবনে যদি আমি

৪৮ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বি. প. পৃ ৭০

* 'আমি আশ্‌মানির রূপ বর্ণন করিব।...হে বটতলা বিদ্যাপ্রদীপ-তৈলপ্রদায়িনি! আমার বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাও।'—'দুর্গেশনন্দিনী': প্রথম খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

৪৯ 'পুরাতন পঞ্জিকা': মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩১

৫০ সে সময়ে তিনি কাশীতে হোমিওপ্যাথি শিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন।

কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকি, তজ্জন্য সান্যাল মহাশয়ের নিকটে আমি অনেক অংশে ঋণী।'[৫১]

অমৃতলালের সাহিত্যানুরাগ ও বৈদগ্ধ্য সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত নিম্নরূপ—

'অমৃতবাবু বিস্তর পড়েছিলেন, বিশেষত সাহিত্য আর নাটক। প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল···অমন বিদগ্ধ পুরুষ, নাগরিক বাংলা দেশে খুব কম জন্মেছেন।'[৫২]

তৎকালীন বাংলা দেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই অমৃতলালের পড়াশুনার খবর রাখিতেন এবং তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পত্রোত্তরে একবার তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

'26 Pataldanga Street,
Calcutta, December 23, 1911.

My dear Amrita Babu,

I have received many letters of congratulations but yours I value most as coming from a real lover of art, literature and history...

Thanking you again very heartily and wishing you honours which you so richly deserve,

I remain
Yours sincerely
Haraprasad Shastri.'[৫৩]

ধূর্জটিপ্রসাদ যে 'প্রকাণ্ড লাইব্রেরী'র উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের গ্রন্থ ছিল। শোনা যায়, স্যর আশুতোষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া একবার এক নীলাম হইতে তিনি প্রচুর গ্রন্থ ক্রয় করেন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অমৃতলালের এই 'প্রকাণ্ড' গ্রন্থাগারটি গঠিত হয়। অভিনয়ের কথা বাদ দিলে গাছ আর বই ছিল তাঁহার প্রধানতম 'নেশা'র বিষয়।

১৮৯৬-৯৮ সনে লেখা তাঁহার দিনপঞ্জীর কয়েকটি ছিন্নপত্র মিলিয়াছে। তিনি

৫১ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বি. প. পৃ ৮১

৫২ 'মনে এল' পৃ ১০৭

৫৩ পত্রটি অপ্রকাশিত।

কি ভাবে গ্রন্থ ক্রয় করিতেন তাহার কিছুটা আভাস সেখান হইতে পাওয়া যায়। যেমন,

(19.7.1896 : Sunday) 'I have made a very large [purchase]; ......many of the books are rare......it will cost a great deal to make a decent collection of old histories and kindred works.'

পরদিন (অর্থাৎ 20.7.1896) লিখিয়াছেন—

"......brought the books from the Exchange, the whole lot has cost Rs. 130/-/6 besides Buxis to clerks, cooly, carriage......"

কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি গ্রন্থ ক্রয় করিতেন তাহাদের কয়েকটি নাম পাওয়া যাইতেছে ১লা অক্টোবর, ১৮৯৮-এর 'ডায়েরী' হইতে। লিখিয়াছেন,

'......make payments of small sums to Cambray[৫৪] and he hawkers and Ramzan'.

এইভাবে গ্রন্থ ক্রয় করিয়া তাঁহার গ্রন্থাগার এতই বড় হইয়া উঠিল যে, তাহার তত্ত্বাবধান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। স্টারের অভিনেতা ও অমৃতলালের বিশেষ স্নেহভাজন মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মহেন্দ্র মাষ্টার) গ্রন্থাগারটি দেখাশুনা করিতেন।[৫৫] শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই অমূল্য গ্রন্থাগারটি তিনি রক্ষা

৫৪ এই ক্যাম্ব্রে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুরদাস করের সহিত [ইঁহার নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে স্বর্ণপদক আছে] অমৃতলালের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইনিই অমৃতলালকে প্রয়োজনমতো গ্রন্থ সরবরাহ করিতেন। ১৮৯৭ সনের ১৮ই মে, মঙ্গলবারে লেখা তাঁহার দিনলিপির একাংশে আছে: "Babu Thakurdas Kar came in the evening to inform that a lot of good books are coming out for me from England." 'খাস-দখল' নাটকে (প্রথম অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্যে) অমৃতলাল 'ক্যাম্ব্রে'র উল্লেখ করিয়াছেন।

৫৫ চোখের পীড়ায় শয্যাশায়ী অমৃতলাল 'অমৃত-মদিরা' কবিতায় লিখিয়াছিলেন, 'মহেন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের সমান।' দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়া 'নূতন জীবন' নামে যে কবিতাটি লেখেন তাহাতেও মহেন্দ্রের উল্লেখ আছে— 'এস হে মহেন্দ্র করি আঁখির পারণ।' [ইঁহার সম্পর্কে 'অমৃত-মদিরা' গ্রন্থের 'উদ্দেশ-বিবৃতি' অংশে লিখিত আছে— "ইঁহারাই ডায়মণ্ড হারবারের

করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে কুমার মন্মথ মিত্রকে অধিকাংশ গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া দেন। জীবনে তিনি অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন প্রচুর। কিন্তু সঞ্চয় করিবার মত বিষয়বুদ্ধি তাঁহার কোন কালেই ছিল না। দুর্ভাগ্যপ্রপীড়িত কবি হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে অমৃতলাল 'হেমচন্দ্রের মুক্তি' নামে যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নিজের অমিতব্যয়িতার আভাস দিয়া লিখিয়াছেন—

'বাঁচিলে কি কবিবর জুড়াল কি জ্বালা।
ছুটি কি দিলে গো শেষ ভব-নাট্যশালা॥
... ...
আমিও করেছি কালে অর্থ উপার্জন।
শুনেছি মাতাল কানে সুখ্যাতি গর্জন॥
কিন্তু হে তোমারি মত,
ব্যয় করি অবিরত,
বর্ষায় আশ্রয়তরে বাঁধিনি কুটীর।
ভিজেছি তোমারি মত ঢেলে আঁখিনীর॥'...[৫৬]

কিছু মূল্যবান গ্রন্থ তাঁহার অতি প্রিয় শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলে এখনও আছে।

অমৃতলালের এই সাহিত্যানুরাগ আমৃত্যু অব্যাহত ছিল।

৫

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ছাত্র থাকাকালীন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অমৃতলালের বিবাহ হয়। পাত্রী শালকিয়ার ভূম্যধিকারী জয়নারায়ণ ঘোষের পৌত্রী কালীকুমারী। বিবাহকালে অমৃতলালের বয়স পনের এবং কালীকুমারীর নয় বৎসর।

অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

'কলিকাতার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেদেরও তখন বিবাহটা হয়ে যেত সাধারণতঃ ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সের ভেতর। এই অন্যায় অপ্রেমিক

অন্তর্গত ঘাটেশ্বরের জমিদার। গ্রন্থকারের বহুযত্নসঙ্কলিত দুর্লভ গ্রন্থাবলীর তত্ত্বাবধানভার ইঁহার উপরে ন্যস্ত। নাট্যশালায় ইঁহার প্রচলিত নাম—'মাষ্টারমশাই'।"

৫৬ 'অমৃত-মদিরা' পৃ ১৩৮

কাজটা হয়ে যাবার কারণ, তখন ছেলে বিয়ে করত না, বাবা বিয়ে দিতেন। বাবা নিজের মেয়েটিকে পরের ঘরে দিয়ে অপরের একটি মেয়েকে বউ বলে নিজের সংসারের ভিতর এনে গড়ে তোলবার জন্য ঘরে নিতেন, প্রেমিক পুত্র প্রেয়সী ঘরে আনতেন না।'[৫৭]

পুত্রের বিবাহ কৈলাসচন্দ্র দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

'তখন ১৫ বৎসর মাত্র বয়স, এন্‌ট্রান্স পড়ি, ৩ বৎসর পূর্বে পিতৃবিয়োগ হয়েছে।'[৫৮]

অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় এই বিবাহের একটি উপভোগ্য চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহাদের বাল্যাবস্থায় বঙ্কিমের উপন্যাস অপেক্ষা দীনবন্ধুর নাটকের জন্য 'সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া' থাকিতেন। অমৃতলালও যুগরুচি অনুযায়ী দীনবন্ধুর অধিকাংশ নাটকই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এবং

"বিবাহের দিন 'লীলাবতী' আগাগোড়া পাঠ করিয়া ভাবিলাম,—
তাই ত, পত্নীটি আমার কি রকম হবেন! সারদাসুন্দরীর মত হলেই ভাল হয়, আমার ত ঝোঁক লীলাবতীর চেয়ে সারদাসুন্দরীর দিকে। নিশ্চয়ই সারদাসুন্দরীর মত হবে।"[৫৯]

'লীলাবতী' নাটকে একমাত্র 'সারদাসুন্দরী'কে পছন্দ হইবার কারণ অমৃতলাল অন্যত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"রাজলক্ষ্মীকে মোটেই পছন্দ হল না, কেন না আমাদের হেডমাস্টার আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন সভ্য ঈশ্বর নন্দী মহাশয় গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সেজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্মধর্ম' প্রথম ভাগের ব্যাখ্যা করছেন মনে হতে লাগল। ক্ষীরোদসুন্দরীটা যেন উপোসপোড়া ছিঁচকাঁদুনে রোগা মড়াটা। লীলাবতী বেশ সাজাগোজা কবিতা পড়া মেয়ে বটে, কিন্তু কেমন মনে হল যেন কলের পুতুল, একজিবিশনে পাঠাতে বেশ, কিন্তু ফার্স্ট ডিবিশনে চারটে পাশ করবার আগে তার সঙ্গে যে প্রণয় জমিয়ে তুলতে পারব, এমন মনে হল না, নিয়ে ঘরকন্নার কথা ত নয়ই। এইবার সারদা-সুন্দরী, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস, পূরোপুরি মনের মত, আদর্শ স্ত্রী, আমার

৫৭ 'পুরাতন পঞ্জিকা'—মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১

৫৮ ঐ . ঐ

৫৯ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বি. প. পৃঃ ৭১

চেয়ে কিছু বয়সে বড় বলে মনে হল বটে, তা ভাবলেম, ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে।"[৬০]

কিন্তু মুষড়াইয়া পড়িলেন শুভদৃষ্টির সময়ে। দেখিলেন—

'চক্ষু দুটি অনেকটা সারদাসুন্দরীর মত বটে, কিন্তু অঙ্গ থেকে যেন গায়ে হলুদের গন্ধের সঙ্গে একেবারে ঝিনুকের দুধের গন্ধ বেরুচ্ছে।......আমার বয়স পনেরো, কনের বয়স সবে নয়, এতেই আমি আমাকে যুবা আর তাকে খুকি মনে করতে লাগলুম। মনটা বড় মুষড়ে গেল।'[৬১]

এই স্মৃতিচিত্র রচনার দীর্ঘকাল পূর্বে একবার বক্তৃতা প্রসঙ্গে অমৃতলাল এই 'আকর্ণবিশ্রান্ত কাজলপরা চেলির পুঁটুলী'র উল্লেখ করেন।[৬২] 'অমৃত-মদিরা'র একটি সরস কবিতায় পত্নী 'কালী'র উল্লেখ আছে। জয়দেব-চণ্ডীদাস প্রদর্শিত পথে তিনিও 'সুশীতল পদতল' প্রার্থী—

'জয় জয় কালী, এই লও ডালি,
ঢালিলাম পায় নতশুভ্র শির।
অতি সুশীতল তব পদতল,
জীবনে আমার যমুনার তীর ॥'[৬৩]

বিবাহের ছাপ্পান্ন বৎসর পরে 'পুরাতন পঞ্জিকা' লিখিতে বসিয়া স্ত্রীর সম্পর্কে অনেক প্রসন্ন পরিহাস করিয়াছেন। 'পরিণয়বৃক্ষের কচি ফলটিকে' তিনি যে তখনও 'মালদহের আমসত্ত্বের আদরে ভাঁড়ারের অমূল্য সংস্থানরূপে' রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, একথা আনন্দেরই সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার দাম্পত্য জীবন সর্বথা মধুর ছিল না। 'রসসাগর অমৃতলালের জীবনের আভ্যন্তরিক যবনিকার অন্তরালে ছিল দুঃখসাগর।'[৬৪]

সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে একবার কথাপ্রসঙ্গে অমৃতলাল বলিয়াছিলেন—"পঞ্চোত্তর পঞ্চাশৎ বৎসর গৃহাশ্রমে ব্রতধারী হইয়া পতিত্বের সাধনায়

৬০ 'পুরাতন পঞ্জিকা'— মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১

৬১ 'পুরাতন পঞ্জিকা'— মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১। অমৃতলালের পুত্র ও কন্যাদের নাম—ক্ষেত্রভূষণ, কেতনভূষণ, শশিভূষণ, অসিভূষণ, মৃণালভূষণা ও বীণাভূষণা।

৬২ 'অমৃতবাবুর বক্তৃতা' : রঙ্গভূমি, মাঘ, ১৩০৭

৬৩ 'মন্ত্র'— 'অমৃত-মদিরা', পৃ ৮৮

৬৪ 'অমৃত-তর্পণ'—দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী : ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৭

বুঝিয়াছি যে কৃষ্ণনামের ফল কৃষ্ণনাম—'তথাপি মম সর্বস্বং গৃহিনী রক্তলোচনা'।"[৬৫]

অনুরূপা দেবী তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন—

"তাঁর স্ত্রীকে দিদিমা না বলিয়া আমরা বৌদিদি বলিতাম। আমাদের ছোটরা তাঁকে বলিত লেডী বোস।

গত বৎসর (১৩৩৫) তিনি আমার মার* কাছে কাশীতে আসিয়া মাস দুই ছিলেন। নিজের দুই মেয়েই গত হওয়ায়** তাঁর উপর স্নেহটা প্রচুররূপেই পড়িয়াছিল। স্বামীর উপর রাগ অভিমান হইলেই বলেন, 'আমি আমার মেয়ের কাছে চলে যাব।' সেবার জিদ করিয়াই চলিয়া আসেন। ফিরিতে ইচ্ছা ছিলনা।"[৬৬]

অমৃতলালের মনে এজন্য আক্ষেপ ও ক্ষোভ কম ছিল না। স্ত্রীর নিকট একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

'আমার জন্ম রামনবমীর দিনে, তাই হয়ত রামের মতই আমিও আমার সীতাদেবীর মনে দুঃখ দিয়ে আসচি।'[৬৭]

৬

এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতলাল ডাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি তাঁহার স্বভাবগত অনুরাগ ছিল। লিখিয়াছেন—

'ছেলেবেলা থেকেই আমি ডাক্তারির ভাণ করিয়া খেলা করিতাম, কলাগাছ কাটিয়া amputation এর সখ মিটাইতাম, বেলের আটা পচিয়া পোকা হইলে জোঁক বসানর অভিনয় করিতাম, বেলের আটা সেবন করাইয়া বাস্তবিকই কোন কোন রোগীকে আরাম করিতাম।'[৬৮]

---

৬৫ ১৩৩০ সালে কাঁঠালপাড়া সাহিত্য-সম্মেলনে তাঁহার ভাষণ দ্রষ্টব্য।

* অমৃতলালের প্রথম জীবনের নাট্যসঙ্গী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

** জ্যেষ্ঠা মৃণালভূষণার মৃত্যু হয় ১৩২১ সালে। কনিষ্ঠা বীণাভূষণা পূর্বেই গত হন (১৩১৮)।

৬৬ 'অমৃতলাল বসু': মাসিক বসুমতী: ভাদ্র ১৩৩৬

৬৭ ঐ

৬৮ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বি. প. পৃ ৭১-৭২

শৈশবের এই অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা তিনি একটি গল্পে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছেন। ১৩২৯ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত 'পতিত ডাক্তার' নামক গল্পটিতে অমৃতলাল পতিত ডাক্তারের মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করিয়া লিখিয়াছিলেন—

'পতিত ছেলেবেলায় ডাক্তারী ডাক্তারী খেলা করিত, টিফিনের পয়সায় কচুরি জিলিপি না খাইয়া বেনের দোকান হইতে সোডা, এ্যাসিড্ কিনিয়া আনিয়া সে আলাদা আলাদা বাটিতে গুলিত এবং ভাই বোন্ ও খেলুড়ীদের সামনে ঐ তুইটা জল মিশাইয়া চোঁ চোঁ শব্দে ফুটাইয়া তাহাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিত। জলপানির পয়সা জমাইয়া সে তার্পিন কিনিত, পিপারমেণ্ট কিনিত, টিন্‌চার আইডিন্ কিনিত এবং অবস্থানুসারে ক্রীড়াসঙ্গীদিগের উপর ঐ সকল ঔষধের ব্যবস্থা চালাইত। পাড়ার এক নাপিত ডাক্তারের নিকট সে একখানি ভাঙ্গা বেল্‌কার চাহিয়া লইয়া তাহার দ্বারা ভাইবোনের পাকা পাঁচড়া উস্‌কাইয়া দিয়া অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করিত। একবার সে একটা পাকা বেল কাটাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল, বেল পচিয়া তাহাতে যে পোকা ধরিল, তাহাই তাহার খেলাঘরের জোঁক হইল।

পতিত মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিত ডাক্তারকে।··· ডাক্তার আসিলে তাঁহার উঠা-বসা, দাঁড়ানো, নাড়ী টেপা, জিভ্ দেখা, শিঙ্গে বসানো, প্রিস্‌ক্রপসন্ লেখা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ক্রিয়া অতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিত।'*

তাঁহাদের শৈশবে বিজ্ঞানচর্চার বা হাতের কাজ শিখিবার আগ্রহ সাধারণের মধ্যে একরূপ ছিলই না। তথাপি অমৃতলাল খেলাচ্ছলে বা প্রয়োজনে হাতের কাজ করিতে ভালবাসিতেন। 'বিশ্বকর্মাপূজা' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

'ইদানীং বিজ্ঞানের কথা, ভদ্দরলোকের ছেলেদের হাতের কাজ শেখবার কথা, স্কুল-কলেজে, সভাসমিতিতে, বেড়াবার বাগানে, হাওয়া খাবার পার্কে, ক্লাবে বৈঠকে চলছে। আমাদের বাল্যাবস্থায় ও সব কথার উচ্চবাচ্যই ছিল না, তবু আমরা নিজ প্রয়োজনসাধন জন্য, অথবা খেলায় ধুলায় যত হাতের কাজ করিতাম, এখনকার বালক বা কিশোরদিগকে তাহার কিছুই করিতে দেখি না।'**

* 'কৌতুক-যৌতুক' পৃ ১৯-২০

** 'কৌতুক-যৌতুক' পৃ ১৩৪

মেডিক্যাল কলেজে রাধাগোবিন্দ কর (R. G. Kar) ছিলেন তাঁহার সহাধ্যায়ী*। দুই বৎসর পরে শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি মেডিক্যাল কলেজ পরিত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ হোমিওপ্যাথির আকর্ষণে।

অ্যালোপ্যাথরা হোমিওপ্যাথদের সম্পর্কে যে উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করিতেন অমৃতলাল তাহা কোনদিনই সমর্থন করেন নাই। একবার লিখিয়াছিলেন 'এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের মধ্যে জনকয়েকের দুইটি···ব্রহ্মাস্ত্র আছে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমাত্রকেই বলিয়া থাকেন, ও এনাটমী জানে না, প্যাথলজি জানে না'।[৬৯]

'মোটের উপর দুই বৎসর কলেজে অধ্যয়ন করিলাম।'[৭০]
অ্যালোপ্যাথির ঝোঁক কাটিয়া তখন হোমিওপ্যাথির নেশা ধরিয়াছে। সে সময়কার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ লোকনাথ মৈত্র তখন কাশীতে। ইনি চিকিৎসার দ্বারা জজ আইরণসাইডের স্ত্রীর প্রাণরক্ষা করায় তিনি কাশীতে ভারতের প্রথম হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল নির্মাণে লোকনাথ মৈত্রকে সহায়তা করেন। অমৃতলাল ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাশীতে গিয়া তিনি লোকনাথ মৈত্রের বাড়ীতে রহিলেন। কলিকাতায় লোকনাথ মৈত্রের বাড়ী শ্যামবাজারে তাঁহাদের বাড়ীর নিকটেই ছিল। লোকনাথ মৈত্র ছিলেন তাঁহার পিতৃবন্ধু। সেই কারণে শৈশব হইতেই তিনি লোকনাথ মৈত্রকে বিশেষ জানিতেন। লোকনাথ মৈত্র এবং তাঁহার হোমিওপ্যাথির সহিত অমৃতলালের বাল্যজীবনের একটি ঘটনা জড়িত হইয়া আছে। এগার বৎসর বয়সের সময় গাছ হইতে পড়িয়া তাঁহার একটি হাত ভাঙে। সেই সময় লোকনাথ মৈত্র তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া 'দেখিলেন যে হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।'

* ইঁহাদের গৃহে বসিয়াই অমৃতলাল তাঁহার প্রথম নাটকটি রচনা করেন :

'লিখেছি 'হীরকচূর্ণ' পূর্ণপাত্র করে।
বয়স বাইশ যবে বসি 'কর' ঘরে।'

৬৯ 'সারস্বত ব্রতকথা' : মাসিক বসুমতী মাঘ, ১৩৩১।

৭০ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বি. প: পৃ ১২। অনেকে মনে করেন অমৃতলাল তিন বৎসর মেডিক্যাল কলেজে পড়েন। তাঁহার মৃত্যুর পরদিন (৩।৭।১৯২৯) ইংলিশম্যান ও অমৃতবাজার পত্রিকা তিন বৎসর বলিয়াই উল্লেখ করেন। মাসিক বসুমতীতে (শ্রাবণ ১৩৩৬) প্রকাশিত 'অমৃতময় অমৃতলাল' প্রবন্ধে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অধ্যয়নকাল তিন বৎসর বলিয়া নির্দেশ করেন।

'তৎক্ষণাৎ আমার বাবার অনুমতি লইয়া তিনি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেরিনিকে লইয়া আসেন। আমার ভাঙ্গা হাত লইয়া বোধ হয় কলিকাতায় হোমিওপ্যাথির প্রথম surgical case হয়।...ব্যাণ্ডেজ খোলা দেখিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ডাক্তার রাজেন দত্ত আসিয়াছিলেন।'[৭১]

বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রনাথ দত্তের এই কৌতূহলের কারণ আছে। রাজেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন প্রথম বাঙালী হোমিওপ্যাথ। বিদ্যাসাগর ইঁহার নিকট হইতে হোমিওপ্যাথির উপকারিতা জানিয়া হোমিওপ্যাথির চর্চা ও প্রচারে এক সময় মন দেন।[৭২] এইজন্যই 'হোমিওপ্যাথির প্রথম surgical case' দেখিতে উভয়ে আসেন।

লোকনাথ মৈত্রকে তিনি পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। লোকনাথের মৃত্যুর পর তিনি 'লোকনাথ মৈত্র'[৭৩] নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। তাহার আরম্ভ এইরূপ—

'কোথা তাত লোকনাথ দেবপদে প্রণিপাত,
কত কথা ওঠে মনে তোমার স্মরণে।
তব স্নেহ ভালবাসা, কত সুখ কত আশা
পেয়েছি পায়ের পাশে কিশোর জীবনে॥'

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে অমৃতলাল স্বাধীনভাবে ডাক্তারি শুরু করিলেন। লোকনাথ মৈত্রের পত্র লইয়া তিনি কাশী হইতে বাঁকিপুরে গেলেন। বাঁকিপুরের উকীল গুরুপ্রসাদ সেন তখন ডেঙ্গু জ্বরে পীড়িত। তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়া দুইদিনে অমৃতলালের চারিটি টাকা রোজগার হইল। বাঁকিপুরে তিনি কবি বলদেব পালিতের বাসায় ছিলেন এবং ডাক্তার বসন্ত দত্ত তাঁহার মুরুব্বি হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে বসন্তবাবুর সহিত থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তার বসন্ত দত্ত সম্পর্কে অমৃতলাল বলিয়াছেন—

'তিনি আমাকে হাতে ধরিয়া কার্য্যে ব্রতী করিয়া দিলেন, যাহাতে আমার উন্নতি হয় কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।'[৭৪]

৭১ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি. প. পৃ ৭৩
৭২ 'বিদ্যাসাগর'— চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৫০১
৭৩ 'অমৃত-মদিরা' পৃ ৭৯
৭৪ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি. প. পৃ ৭৮

কাশীতে এবং বাঁকিপুরে থাকাকালীন অমৃতলাল বিদ্যাসাগর, কবি নবীনচন্দ্র সেন ও কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসেন। পিতাকে কাশীতে রাখিতে গিয়া বিদ্যাসাগর লোকনাথ মৈত্রের অতিথি হন। ভোর রাত্রে নৌকাযোগে নদী পার করিয়া (তখন সেতু নির্মিত হয় নাই) বিদ্যাসাগরকে রাজঘাট ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবার ভার অমৃতলালের উপর পড়িল। যদি ভোর রাত্রে জাগিতে না পারেন, সেইজন্য এক কৌশল করিলেন—

"…বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিয়া বসিলাম—গল্প বলিতে হইবে। তিনি বলিলেন— 'গল্প শুনবি? কি রকম গল্প বলব, দু মিনিটের মত, না আধঘণ্টার মত?' ছোট বড় বিচিত্র রূপকথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নিশাযাপন করিলাম।…শেষ রাত্রে রেল ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিলাম। জীবনের শেষ পর্যন্ত সে রাত্রি ভুলিব না।"[৭৫]

এই সময়ে কাশীতেই কবি নবীনচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তখন নবীনচন্দ্রের কোন গ্রন্থই মুদ্রিত হয় নাই— ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া বান্ধবসমাজে কবিযশঃ অর্জন করিয়াছেন মাত্র। অমৃতলাল ও নবীনচন্দ্র 'বুড়ুয়া-মঙ্গল'[৭৬] দেখিবার জন্য নৌকায় গিয়া উঠিলেন। নবীনচন্দ্র বুড়ুয়ামঙ্গল 'পদ্যে বর্ণনা' করিবার জন্য লোকনাথ মৈত্রের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন। সুতরাং "কালী কলম কাগজ ও একটি বোতল মদ লইয়া নবীন ও আমি নৌকায় উঠিলাম। বিশ্বনাথের চরণতলে আমি মদ খাইতে শিখিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পরে নবীনকে বলিলাম,— 'লিখবে ত লেখ, নইলে মদ দোব না'। নবীন এক নিঃশ্বাসে বুড়ুয়া-মঙ্গল লিখিয়া ফেলিল।"[৭৭]

অমৃতলাল বলিয়াছেন, 'বিশ্বনাথের চরণতলে' মদ খাইতে শেখেন। সেই প্রথম যৌবনের মদ্যপানের স্মৃতি তাঁহার 'অমৃত-মদিরা'য় ছায়াসম্পাত করিয়াছে—

৭৫ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি. প. পৃ ৭৫। বাস্তবিকই ভোলেন নাই; বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর শোকাভিভূত অমৃতলাল 'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন' নামে একটি শোকনাট্য রচনা করেন। এটি স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় ২২ আগষ্ট ১৮৯১ সনে।

৭৬ 'বুড়ুয়ামঙ্গল'— কাশীতে হোলির পরের মঙ্গলবার গঙ্গাবক্ষে যে নাচগান ও যাত্রা হইত তাহার নাম।

৭৭ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বি. প পৃ ৭৬

'প্রথম যৌবনে প্রেম করি তব সঙ্গে।
কাটায়েছি কতদিন কত রসরঙ্গে ॥
তুমি দেখিয়াছ মম প্রাণের ভিতর।
কোথায় মহৎ আমি কোথায় ইতর ॥'[৭৮]

অতি অল্প বয়সে মদ্যপানে অভ্যস্ত হইলেও তিনি কদাচ প্রকাশ্যে মদ্যপান করিতেন। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী নাট্যরসিক সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—

'সুরাদেবীর প্রসাদে অমৃতলালের অরুচি ছিল না। একাধিকবার তাঁর কাছে গিয়ে বুঝেছি, তিনি মদ্যপান করেছেন, কিন্তু কখনও তাঁকে মত্ত অবস্থায় দেখিনি। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের মত আমাদের চোখের সামনে বসে কোনদিন তিনি সুরার প্রসাদ গ্রহণ করেন নি।'[৭৯]

নবীনচন্দ্র তাঁহার 'আমার জীবন' গ্রন্থের 'নবীন কবি—অবকাশরঞ্জিনী' এই অধ্যায়ে কাশীর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এইভাবে—

"ভবুয়া হইতে একবার কাশীর বুড়ামঙ্গলের মেলা দেখিতে যাই।··· কলিকাতার বর্ত্তমান রঙ্গভূমির রসিক চূড়ামণি এবং প্রহসনের খনি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর সঙ্গে সেইবার কাশীতে লোকনাথবাবুর বাড়ীতে সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের এক বয়স, একই প্রকৃতি, একই প্রাণের গতি। প্রথম পরিচয়েই উভয়ের হৃদয় সলিলে সলিলের মত মিলিয়া মিশিয়া গেল। তাহার পর যদিও এ জীবনে উভয়ের অল্পই সাক্ষাৎ হইয়াছে, তথাপি অমৃতের বন্ধুতা, আমার এ জীবন-সন্ধ্যায়ও 'অমৃত ও মদিরা'। আমরা একটা দল বাঁধিয়া বুড়ামঙ্গলের মেলা দেখিতে সন্ধ্যার পর গঙ্গার তীরে আসিলাম।··· গৃহে ফিরিবার সময়ে অমৃত প্রমুখ বন্ধুগণ 'বুড়ামঙ্গল' সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিতে আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিলেন। প্রাতে আমি আমার শিবিরে ফিরিলাম।···রাত্রির সেই দৃশ্য নয়নে ভাসিতেছিল। বন্ধুদের অনুরোধও কর্ণে বাজিতেছিল। তখন এক টুকরা কাগজ লইয়া, রাত্রি জাগরণের অনিবার্য্য ফল, হাই তুলিতে তুলিতে 'বুড়ামঙ্গল' কবিতাটি লিখিলাম···।"[৮০]

৭৮ 'অমৃত-মদিরা' পৃ ২৩৪

৭৯ 'যাঁদের দেখেছি' পৃ ৪২

৮০ পরিষৎ সংস্করণ পৃ ৩২৩-২৪

অমৃতলাল বলিয়াছেন যে, নবীনচন্দ্র সেই রাত্রেই নৌকায় বসিয়া 'এক নিঃশ্বাসে' কবিতাটি লেখেন। আর নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, পরদিন 'হাই তুলিতে তুলিতে' কবিতাটি লেখেন। যাই হোক, কাশীর এই স্মৃতি অমৃতলাল কোনদিনই ভুলেন নাই। তাঁহার একটি কবিতায় তাহা অক্ষয় হইয়া আছে; কবিতাটি তিনি লিখিয়াছিলেন নবীনচন্দ্রেরই এক পত্রের উত্তরে। নবীনচন্দ্র তখন ছিলেন চট্টগ্রামের কমিশনার গ্রীন্ সাহেবের পার্সোন্যাল এসিষ্টেণ্ট—

"কতদিন সেই দিন হয় কি স্মরণ।
কাশীতে নিশিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ॥
বুড়ুয়ামঙ্গল মেলা মহাধুমধাম।
বসন্ত-বাহারে সাজে বারাণসী ধাম॥
জলেতে দোকানপাট জলেতে বাগান।
দুলে দুলে চলে জলে শত জলযান॥
তীরে দীপ নীরে দীপ দীপ তরী 'পরে।
লক্ষ দীপ দেখে চক্ষু সলিল ভিতরে॥
তরণী তরুণীরূপে উজল বিমল।
যামিনী কামিনী-দীপে আমোদে বিহ্বল॥
নাচে রম্ভা মেনকার অনুজা সকল।
তরঙ্গে উছলে জলে লাবণ্য তরল॥
কি স্বরলহর তোলে ভাসায়ে গগন।
অঙ্গ টলে তরী টলে সঙ্গে টলে মন॥
আমি ধরে' বসিলাম তোমারে নৌকায়।
হইবে বর্ণিতে মেলা কম-কবিতায়॥
নন্দনে রচিলে বসি' মকরকেতন।
হত কি হ'তনা গীত তোমার মতন॥
বন্ধু বিনে সে সময় কে জানিত আর।
নবীন-হৃদয়খানি অমৃত-আধার॥"[৮১]

৮১ 'নবীনচন্দ্র সেন'— অমৃত-মদিরা পৃ ৭১। 'নবীন-হৃদয়খানি অমৃত-আধার'— শ্লেষ-অলংকার প্রয়োগের সার্থক নিদর্শন। নবীনচন্দ্রের স্বভাবের সুন্দর বিশ্লেষণ আছে অমৃতলালের 'যুবক-জীবন' উপন্যাসে (দ্রঃ ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

তখনকার যুবকদের আদর্শ পুরুষ কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে ফিরিয়া বাঁকিপুরে অবস্থানকালে অমৃতলালের বাসায় ছয় সাত দিন ছিলেন। একটি প্রকাণ্ড সভায় তিনি বক্তৃতা করিলেন এবং অমৃতলাল নিকটে বসিয়া সমস্তটা লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

'অনেক বাগ্মীর বক্তৃতায় এ জীবনে মুগ্ধ হইয়াছি, কেশববাবুর এই বক্তৃতা grand, divine, inspired— আর কাহারও সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে প্রস্তুত নই।'[৮২]

কেশবচন্দ্রও অমৃতলালকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদিন অমৃতলাল কবি বলদেব পালিতের বাসায় গিয়াছিলেন, চাকরকে বলিয়া যান যে সে রাত্রে আর ফিরিবেন না। কেশবচন্দ্র ও ডাক্তার বসন্ত দত্ত সন্ধ্যার পর গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনেন।

"কেশববাবু বলিলেন, 'আজ ফুর্ত্তি করে এত খাবার কিনে এনে চাকরের কাছে শুনি যে তুমি আজ আর বাসায় ফিরবে না। আমরা ভাবলুম তাও কি হয়? এ খাবার খাবে কে?' এখনও যখনই আমার মনে হয় যে আমাকে ছাড়া কেশববাবুর জীবনের একটি দিনের আনন্দ অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তখনই আমি নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করি।"[৮৩]

হোমিওপ্যাথি চর্চার অবকাশে তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। এখানে অবস্থানকালে কম্বুলিয়াটোলা স্কুলে অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করিতেন। অমৃত-সুহৃদ অর্দ্ধেন্দুশেখর ও ধর্মদাস সুর* তখন ওই স্কুলের শিক্ষক। সেই সময় একবার অমৃতলালকে কলিকাতায় দেখিয়া অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি উল্লসিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' অভিনয়ের জন্য মহলা দিবার আয়োজন করিলেন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির উদ্যোগে চুঁচূড়ায় মল্লিকবাড়িতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩০এ মার্চ তারিখে 'লীলাবতী' অভিনীত হয়। অমৃতলাল প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনয় দেখিয়া আসেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার পরবর্তীকালে স্মৃতিকথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন—

৮২ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বি. প. পৃ ৭৮-৭৯

৮৩ ঐ ঐ পৃ ৮০

* 'সাধারণী' পত্রিকায় ইঁহার নামটিকে বিকৃত করিয়া লেখা হইত 'পাপদাস অসুর'।

'বাগবাজারের নীলদর্পণের দল অর্থাৎ অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তাঁহারাও নিমন্ত্রিত শ্রোতা।'[৮৪]

অমৃতলালের নাট্যানুরাগ এইবার স্পষ্ট হইল এবং "নাট্যানুরাগবশত প্রায়ই তিনি ধর্মদাসবাবুর 'সিন' আঁকা দেখিতে আসিতেন।"[৮৫]

স্থির হইল অমৃতলাল যোগজীবনের ভূমিকা লইবেন, কারণ অর্ধেন্দুশেখরের সেইরূপ অভিপ্রায়। অভিনেতৃ-সঙ্ঘ নাম লইলেন 'শ্যামবাজার নাট্যসঙ্ঘ'। তালিম দেওয়া শেষ হইলে লোকনাথ মৈত্র সহসা কাশী হইতে আসিয়া বন্ধুদের কাকুতি মিনতি উপেক্ষা করিয়া অমৃতলালকে কাশীতে লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার আর 'ষ্টেজে দাঁড়ান' হইল না।

১৮৭২ এর ১১ই মে (৩০এ বৈশাখ ১২৭৯) 'লীলাবতী' অভিনীত হয়।[৮৬] যোগজীবনের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেন তাঁহার নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য।

কাশীতে ফিরিয়া অমৃতলাল পুনরায় ডাক্তারিতে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাসের সহিত অমৃতলালের পরিচয় হয় (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে উপেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন, অমৃতলাল হন ম্যানেজার)। কাশী হইতে কিছুদিন পরে অমৃতলাল বাঁকিপুর যান ডাক্তারির জন্য। সেখান হইতে ১৮৭২ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতার বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে ফিরিলেন। ডাক্তারি করা এবার শেষ হইল। আর কোনদিন বাঁকিপুর যান নাই।

৭

কলিকাতায় ফিরিয়া অমৃতলাল অর্ধেন্দুশেখরের নিকট শুনিলেন যে, অর্ধেন্দু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় গিরিশচন্দ্রের সহিত মনোমালিন্য হইয়া গিয়াছে। গিরিশচন্দ্র ভাল বাড়ী

৮৪ 'বঙ্গভাষার লেখক'— হরিমোহন মুখোপাধ্যায়— পৃ ৫৫৪। 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইয়াছিল আরও আটমাস পরে ১৮৭২ এর ৭ই ডিসেম্বর।

৮৫ 'সাধারণ বঙ্গনাট্যশালায় জন্মবৃত্তান্ত' : অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়— 'সচিত্র শিশির', বড়দিন ১৯২৪

৮৬ 'সাধারণ বঙ্গনাট্যশালায় জন্মবৃত্তান্ত' প্রবন্ধে অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ভ্রমক্রমে তারিখটি '১২৭৮ সালের আষাঢ়' বলিয়া উল্লেখ করেন ('সচিত্র শিশির' বড়দিন ১৯২৪)। রাধামাধব কর (যিনি 'লীলাবতী'তে ক্ষীরোদবাসিনী) বলেন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাস (পুরাতন প্রসঙ্গ— দ্বি. প.

(রঙ্গালয়) না করিয়া টিকিট বিক্রয়ের পক্ষপাতী নহেন। ধর্মদাস রিহার্স্যাল দেখাইবার জন্য অমৃতলালকে সরাসরি বাগবাজারে ভুবন নিয়োগীর বাড়ীর দ্বিতলের কক্ষে লইয়া গেলেন। ভুবন নিয়োগীর বাড়ীতে 'নীলদর্পণে'র মহলা দেখিয়া অভিনয়কলার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই প্রসঙ্গে ধর্মদাস সুর তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে লিখিয়াছেন—

'এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু বেনারস্ হইতে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। এখানে যদি থাকেন, আমাদের সহিত অভিনয় করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। তিনি রিহার্স্যালে যাইতেন ও আমার বাটীতে আসিয়া সিন আঁকা দেখিতেন।··· আমি সেই সময়ে কম্বুলিয়াটোলার Preparatory স্কুলে* মাষ্টারি করিতাম ও স্কুলের হিসাবের বহি রাখিতাম। স্কুলে পড়াইতে গেলে সিন আঁকা হয় না···'[৮৭]

অতএব তাঁহার ছুটির ব্যবস্থা অমৃতলাল করিলেন এইভাবে—

'গতিক দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম,— দেখ এক কাজ করা যাক্, তোমার বদলে আমি স্কুলে পড়াব, মাসকাবারে তোমার পুরো মাইনে তোমার হাতে দোব···'[৮৮]

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ('লীলাবতী'র নদেরচাঁদ) তাঁহার স্মৃতিকথায় এই রিহার্স্যালের উল্লেখ করিয়াছেন—

'রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপর প্রকাণ্ড হলে তাঁহাদের rehearsal হইত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জগদ্ধাত্রী পূজার সময় নগেনবাবুর বাড়ীতে তাঁহাদের dress rehearsal। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বোস আসিয়া এই দলে যোগদান করেন।'[৮৯]

পৃ ১৭৬), আবার অর্ধেন্দুশেখর বলিয়াছেন— 'অনেকদিন রিহার্স্যালের পর ১৮৭১ (১২৭৮) সালের বর্ষাকালে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হয়' ('রঙ্গভূমি' ৬ই মাঘ ১৩০৭)।

* বর্তমানে শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল।

৮৭ 'নাট্যমন্দির'— শ্রাবণ ১৩১৭

৮৮ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বি. প. পৃ ১০৪

৮৯ ঐ ঐ পৃ ১৭৮। অমৃতলাল বলিয়াছেন— 'রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরে সেই বাড়ীটি এখন আর নাই, তাহার সোপানাবলী কলবাহিনী ভাগীরথীর জলে ধৌত হইয়া যাইত। দ্বিতলের প্রকাণ্ড হলে আমরা নীলদর্পণের রিহার্স্যাল চালাইতাম।' (পুরাতন প্রসঙ্গ— দ্বি. প. পৃ ৯৭)

বহুদিন পরে এই পুরাতন স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া অমৃতলাল তাঁহার 'অমৃত-মদিরা' কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

'গড়ুক কৌশলী শিল্পী নব নাট্যশালা।
সৌদামিনী লক্ষ দীপে করুক তা আলা॥
র‍্যাফেল-লাঞ্ছিত-তুলি লিখে দিক পট।
লীলায় ভুলাক লোকে দিব্য নটী নট॥
তথাপি নগেন মতি বেল ধর্ম্মদাস।
অর্দ্ধেন্দু মহেন্দ্র ক্ষেতু সে গোপাল দাস॥
শিবু যদু অবিনাশ কিরণের সাথে।
জীবন্ত জাগিয়ে রবে ইতিহাস পাতে॥
ভুবন-ভবন ছিল গ্রেট ন্যাশনাল।
গঙ্গা 'পরি হর্ম্যে তার হ'ত রিহার্স্যাল॥
ইংরাজ-বাণিজ্য-খড়্গে হ'ল বলিদান।
কলিকাতা মধ্যে সেই অতুলনস্থান॥'[২০]

'নীলদর্পণে' অমৃতলালকে দেওয়া হইয়াছিল সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে,

'রাধামাধব বাবু নীলদর্পণ নাটকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ায় অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রভৃতি অমৃতবাবুকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা-গ্রহণে বিশেষ অনুরোধ করেন।'[২১]

আবার নগেন্দ্রনাথ বসু-সংকলিত 'বিশ্বকোষে'র বিবরণ অন্যরূপ—

'অমৃতবাবুর পূর্বে যদুনাথ ভট্টাচার্য সৈরিন্ধ্রীর অংশ লইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘচ্ছন্দ পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বধূ সাজিলে মানাইত না। অমৃতবাবু সেই অংশ লইলেন।'[২২]

অমৃতলালের স্মৃতিকথায় রাধামাধব কর বা যদুনাথ ভট্টাচার্যের কোন উল্লেখ নাই। 'পুরাতন প্রসঙ্গে' তিনি বলিয়াছেন,

২০ 'অমৃত মদিরা' পৃ ২৪৩

২১ 'সচিত্র শিশির' বড়দিন সংখ্যা, ১৯২৪

২২ 'বিশ্বকোষ' ১৬শ ভাগ, পৃ ১৯২। 'নীলদর্পণে' যদুনাথ ভট্টাচার্য একজন রায়তের ভূমিকা লন।

'আমার পার্ট লইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সকলে মিলিয়া চাপাচাপি করিয়া ধরিল ; বলিল, তুমি সৈরিন্ধ্রীর পার্টটা নাও।'[১৩]

আরও অনেকদিন পরে (মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্বে) অমৃতলাল 'পিছন ফিরিয়া' অতীতকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার 'Looking Backward' নামক জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

"If I had not returned home to Calcutta from Bankipur on a certain November morning in 1872, if I did not on that very day, while walking past the Shambazar Preparatory School (now the A. V.), enter, without the least premeditation, within its old walls, and find there to my surprise friend Dharmadas occupying a tutorial chair, and delighted at seeing me, if Sur did not run up to his Headmaster for permission to leave early, and on obtaining which, had he not carried me to the beautiful hall over Russick Neogi's Ghat at Baghbazar, I do not know what path fate would have found for me to trudge on through life.

May be I would have developed into a belladonna-loving homoeopath with a moderate practice, may be uncle would have persuaded me to enter into business under him and see his brother's son seated on a pile of rupees as he used to say with regret in later years.

But the star that was ruling over my destiny at the time was not in a subjunctive but in an indicative mood and the prelude to the play of my life was acted exactly according to the text written in the first paragraph of this paper, and I became a stage player which I think I still am. An old stage-horse that has been in harness for over half a century cannot completely cast off his buskins even in a 'Pinjrapole'......I found there at the 'Baitak-khana' old Ardhendu—once my classmate and subsequently a life-long friend. Ardhendu hailed me as an old chum and looked at me, I think, with the eye of a recruiting sergeant.

।১৭

I was then running for the last station of my teens; on my smooth cheeks was the bloom I gathered at Bankipur and on my upper lip was only a microscopic mark of colourless downs. The wily sergeant seemed satisfied with his scrutiny for he exclaimed out—

'Eureka, I have found my Sairindhri! Dear Bhuni has come back home and it is all right.'......

I! I take to the stage and that in a theatre where door-money will be charged! and preposterous still to appear in a female part, made up in Sari, Churi and long hair! I who already imagined myself a full-fledged doctor, only waiting for a pair of respectable moustache to launch into regular practice!

'Tut! Drop dilutions all day and weep over your stage husband's body at night and that only once in a week. It is all right; here is your part.'

To be a doctor was my dream even during childhood. As a boy I used to play at doctoring; the pleasure of relieving the pains of suffering humanity was an enjoyment with me in anticipation or practice in the first years of my youth; and to bid adieu to all these before I scored my first count of twenty? No, to the healing art I would dedicate my life.

In devout humiliation I bowed my head to the Will of God and to Him I prayed for inspiration to enable me to 'minister to a mind diseased'."[১৪]

অনেকে মনে করেন অর্ধেন্দুশেখরই তাঁহাকে সৈরিন্ধ্রীর 'মড়াকান্না' শিখাইতেন।[১৫] কিন্তু অমৃতলাল বলিয়াছেন যে, কান্না তিনি একাই অভ্যাস করিতেন, অর্ধেন্দু বা আর কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন না—

'...আমি আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কালিদাস সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকটে কান্না শিখিতে গেলাম। তাঁর সেকেলে ধরণের কান্না; সুরটাই মেয়েলি, কিন্তু আমার মনে হইল যেন emotion-এর অভাব। আমার ঠিক উহা

১৪ "Looking Backward"—The Servant: 7. 3. 1925.

১৫ "It is said, Ardhendu taught him to weep at a deserted house in the evening..." The Indian Stage, Vol. II by H. N. Dasgupta p. 180.

ভাল লাগিল না। আমি একাই চেষ্টা করিয়া দেখিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ ঐ পোড়ো বাড়ীতে [তাঁহাদের নিজ বাড়ীর পার্শ্বে] দ্বিপ্রহরে আমি মড়াকান্না অভ্যাস করিতাম, অর্দ্ধেন্দু বা অন্য কেহ আমার দোসর ছিলেন না।'[২৬]

অভিনয়-বিদ্যাকে অমৃতলাল প্রাণের প্রেরণায় গ্রহণ করিয়াছিলেন,—সখ মিটাইবার উদ্দেশ্যে নয়। করতলগত ভাল চাকরী এবং সেই সঙ্গে নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ তিনি এই সময়ে হেলায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কাশীতে অবস্থান-কালে বাগবাজারের অভয়চন্দ্র মল্লিকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অভয়চন্দ্র তখন ছিলেন Land Acquisition Deputy Collector। অমৃতলালকে তিনি কলিকাতায় নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া ডেপুটি করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অমৃতলাল বলিয়াছেন—

'আমি কিন্তু তখন ভুবন নিয়োগীর বাড়ীতে নূতন থিয়েটরে আখড়াই দিতে যাইতাম। ভুবন নিয়োগীর বাড়ী যাইতে হইলে অভয়বাবুর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া গেলেই শীঘ্র যাওয়া যায়; কিন্তু পাছে তিনি আমাকে ধরিয়া ডেপুটি করিয়া দেন, এই ভয়ে একটা পাশের সরু গলি দিয়া লুকাইয়া থিয়েটর করিতে যাইতাম।'[২৭]

অনেক অসুবিধা ও বাধাবিপত্তি তাঁহাদের পথরোধ করিতে চাহিলেও তাঁহারা কোন ধনী ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগেই বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় গড়িয়া ওঠে। 'আখড়াই দেওয়া' শেষ হইলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার জোড়াসাঁকোর নিমাইচরণ সান্যালদের প্রকাণ্ড ঘড়িওয়ালা বাড়ীর বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র উদ্বোধন হইল। মাসিক ভাড়া চল্লিশ টাকা। অর্থের অভাবে কত কষ্টেই যে তাঁহারা এই উদ্বোধন সম্ভব করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস অমৃতলাল লিখিয়াছেন এইভাবে—

"গেছে দিন পাই-হীন ছিনু ক'টি ভাই।
পুষিতে বিরাট্‌পুত্র ঘরে দুধ নাই॥

২৬ 'রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা'— অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় পৃ ৯২

২৭ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— বি. প. পৃ ৭৮

একটি কাঠের কপি এক আনা মূল্য।
অভাবে ভেবেছি তারে সুবর্ণের তুল্য॥
সাণ্ডেল দালানে * উচ্চ পড়-পড় কড়ি।
ঝুল-ঢাকা ছিল তাতে ঝাড়-ঝোলা দড়ি॥
আমি আর ধর্ম্মদাস নিশীথ-আঁধারে।
বাঁশ বেয়ে উঠিয়াছি চুরি করিবারে॥
সেকালে ছিল না বেশী কুলি কি চাকর।
যারা ছিল কাজে যেতে একা পেত ডর॥
তাই দেখিয়াছে লোক লালদীঘি-ধারে।
প্ল্যাকার্ড ম'য়েতে উঠে' 'ভুনিবাবু'[৯৮] মারে॥
এখন হুকুমে কার্য হয় সমাধান।
বেহারা বাঁধিতে পারে অপেরার গান॥"[৯৯]

পরবর্ত্তী কালে (যখন তিনি স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ) অমৃতলাল একটি 'অভিনয়-বিজ্ঞাপনপত্রে' (হ্যাণ্ডবিল্) তাঁহাদের প্রথম উদ্যোগের দুঃসাহসিক প্রয়াসের কথা একবার এইভাবে লেখেন—

"এই সকল নাটকের ['নীলদর্পণ', 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রভৃতির] অভিনয় যদি না দেখিবেন তবে কেন নাট্যকলার সৃষ্টি হইয়াছিল ? কেন অনির্দ্দিষ্ট তট-আশায় ঝটিকা-আন্দোলিত সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়া আমরা নটবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম ? এত লোকের অন্ন হইতেছে আর আমাদের কি একটা চাপকানপরা চাকরী জুটিত না। কেনই বা বিলাসীর লোভ-লুব্ধ অঙ্ককে বঞ্চিত করিয়া কুলটাকন্যাকে অভিনয়কলা শিক্ষা দিয়াছিলাম ? কেনই বা এই অপরাধে ঘরে পরে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিয়া আসিলাম ? আর কেনই বা, হায়, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া মাথা বিক্রয় করিয়া নগরের শোভা-বর্দ্ধনকারী এই নাট্যশালা* বিনা রাজসাহায্যে বিনা সাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছি !"[১০০]

* জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীর পূজার দালানে।

৯৮ অমৃতলালের ডাকনাম।

৯৯ 'অমৃত-মদিরা' পৃ ২৪২-৪৩

* স্টার থিয়েটার

১০০ 'পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা'—'রূপ ও রঙ্গ' ১ম সংখ্যা, ১৮ই আশ্বিন ১৩৩১

'পুরাতন প্রসঙ্গে'ও বলিয়াছেন—

'বাস্তবিকই আমরা ধনী ও অভিজাত সমাজের নিকটে অর্থভিক্ষা করি নাই। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন; যদি ভাল লাগে, দুটি ভাল কথা বলিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন; যেখানে ভাল লাগিল না, সেখানে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন; ইহার অধিক আমরা কিছু আশা করিতাম না।'[১০১]

শুধু তাহাই নহে, ন্যাশনাল থিয়েটারের সূচনায় তাঁহারা কেহ মাহিনা লইতেন না:

"আমরা পেশাদারই ছিলাম না। ভাল থিয়েটর নির্মাণ করিতে হইবে। তজ্জন্য টাকা আবশ্যক, আমাদের সকলেরই ঝোঁক ছিল যে স্টেজের উন্নতি করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতে হইবে। এই কারণে থিয়েটরের জন্য যখন আমরা প্ল্যাকার্ড ছাপাইতাম, প্রতি রাত্রির প্ল্যাকার্ডের শিরোদেশে লেখা থাকিত— 'For the benefit of the stage' (থিয়েটরের উন্নতির জন্য)। এই কয়টি কথা আমিই মতলব করিয়া প্রথম প্ল্যাকার্ডের উপর বসাইয়া দিয়াছিলাম। গিরিশবাবুর কাছে একজন ন্যাশন্যাল থিয়েটরকে পেশাদারী থিয়েটর বলায় তিনি বলিয়াছিলেন,—

'ভুনেটা বাঁচিয়ে দিয়েছে রে,— পেশাদারী নয়'।"[১০২]

সেই প্রথম অভিনয়ের যুগে অভিনেতাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অতি মধুর। 'সপ্তমীর রাত' নামক একটি স্মৃতিকথামূলক রচনায় অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

"সেকালে অ্যাক্টারে অ্যাক্টারে যে সম্বন্ধ ছিল, তাকে বন্ধুত্ব বললেও চলে না, আত্মীয় কুটুম্বিতা বললেও চলে না। তারা মা বাপ, ভাই বোন, সোমত্ত বউয়ের অসুখ হলে তাঁদের ঘরে একটা উঁকি মেরে মাত্র অপরাধী হয়ে, অ্যাক্টারদের কারুর যদি কিছু অসুখ হত, তার তদ্বিরে গিয়ে দিনরাত পড়ে থাকতো; কারুর বাড়ীতে কিছু নতুন খাবার জিনিষ তৈরী হলে লুকিয়ে এনে দুচার জনে মিলে বেঁটে খেতো। অভিনয়-কার্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ ছিল, কিন্তু আর একজনের অভিনয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখলে প্রম্পটারের কাছ থেকে বই কেড়ে নিয়ে নিজে পার্ট বলে দিতো, আবার

১০১ 'দ্বিতীয় পর্যায়' পৃ ১১৭

১০২ ঐ পৃ ১২০। 'ভুনী' অমৃতলালের ডাকনাম।

কারুর সঙ্গে ঝগড়া হলে দাঁতে দাঁত দিয়ে বলতো— 'তোর চোখ দুটো উপড়ে নোবো'।"[১০৩]

বাঁকিপুর হইতে ফিরিবার পর তাঁহাকে দেখিয়া অর্ধেন্দুশেখর যে উল্লসিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভিতর নাট্যপ্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার কারণ কম্বুলিয়াটোলা স্কুলের ছাত্রাবস্থা হইতেই সহপাঠী অর্ধেন্দুর সহিত অমৃতলাল অনেক অভিনয় করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অমৃতলাল বলিয়াছেন—

'সে আমার সহপাঠী, নাট্যগুরু। ছেলেবেলায় আমাদের আড্ডা ছিল, তাতে হয়ত অর্ধেন্দু সাজত পূর্বদেশীয় কবিরাজ, আমরা নানাদেশের রুগী— এই রকম।'[১০৪]

গিরিশচন্দ্রও অমৃতলালের এই শিক্ষানবিশীর কথা লিখিয়া গিয়াছেন— 'সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি··· সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও তিনি [অর্ধেন্দুশেখর] শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি সমপাঠিসহযোগে ইংরেজ ভিক্ষুক, রাস্তাবন্দি ইনস্পেক্টর, উড়ে, কুলি, হাঁসপাতালের রোগী সাজিয়া সকলের প্রীতি উৎপাদন করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকেও তাঁহার ন্যায় অনুকরণ করিতে শিক্ষাদান করিতেন।'[১০৫]

অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর পর অমৃতলাল একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটির নাম 'বাল্যসখা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' (মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ৩রা আশ্বিন ১৩১৫ অর্ধেন্দু-স্মৃতিসভায় পঠিত)। এই কবিতাতেও অর্ধেন্দুর নিকট অভিনয়ে 'হাতেখড়ি'র কথা অমৃতলাল স্বীকার করিয়াছেন:

'··· রঙ্গের সুধার সিন্ধু, রঙ্গাকাশ-পূর্ণ-ইন্দু,
অর্ধেন্দুশেখর সখা বঙ্গ-নটরায়॥
বাল্যবন্ধু বিদ্যালয়ে, কৈশোরে শিক্ষক হয়ে,
একসঙ্গে অধ্যাপনা আজো মনে হয়।

১০৩ 'নাচঘর' ২৬এ আশ্বিন ১৩৩৫

১০৪ ১৩৩৫ সালের ১লা আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে অর্ধেন্দু-স্মৃতিসভায় অমৃতলালের বক্তৃতা: 'নাচঘর' ৫ই আশ্বিন ১৩৩৫

১০৫ 'পরলোকগত অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের নটজীবন' পৃ ২। অন্যত্র লিখিয়াছেন— 'অর্ধেন্দু-শেখর মাষ্টার··· তাঁহার দীক্ষার পরিচয় ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।' ('বঙ্গীয় নাট্যশালার নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী'— পৃ ৭)

মোর হাতে হাতেখড়ি গোড়ায় দিয়াছ গড়ি,
তাই আজি নট নামে মোর পরিচয় ॥
বৈঠকে কি নাট্যমঞ্চে, কত রাত গেছে বঞ্চে,
মুস্তফি ! তোমার সাথে কৌতুক-কলায়।
কথায় কথায় বসে, ভিজায়ে হাসির রসে
রচেছি রহস্য কত কৈশোর খেলায় ॥'

অভিনয় করিতে ভাল লাগিলেও অভিনয় দেখিবার সুযোগ এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্বে অমৃতলালের বিশেষ হয় নাই। ঝামাপুকুরে তাঁহার পিসীমার বাড়ীতে বার দুই শকুন্তলার অভিনয় দেখিয়াছিলেন মাত্র। বাড়ীর শাসনও ছিল বেশ কড়া—

'আমি অনেক নাটক পড়িয়াছিলাম, কিন্তু কখনও থিয়েটর দেখিতে যাই নাই ; সন্ধ্যার পরে বাড়ীর বাহিরে বেশীক্ষণ থাকা আমাদের নিষেধ ছিল।'[১০৬]

রঙ্গমঞ্চে অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় তিনি যে কবে প্রথম দেখেন সে বিষয়ে স্পষ্টতঃ কিছু জানা যায় না। তবে রঙ্গব্যঙ্গ সৃষ্টি করিয়া সামাজিক, চারিত্রিক বা ধর্মীয় অসঙ্গতিকে খোঁচা দিবার প্রথম পাঠ যে তিনি অর্দ্ধেন্দুর কাছেই লইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর জোড়াসাঁকোর কয়লাহাটায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বুঝলে কিনা'র জবাব স্বরূপ* ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কিছু কিছু বুঝি' অভিনীত হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর এই প্রহসনেই প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। অমৃতলালের আগ্রহ দেখিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর থিয়েটারের 'টিকিট' আনিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু বাড়ীর কঠোর শাসনভয়-ভীত অমৃতলাল বলিয়াছিলেন,

১০৬ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'—দ্বি. প. পৃ ৮৯

* অমৃতলাল বলিয়াছেন—"আমি এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই প্রাইভেট থিয়েটর সম্বন্ধে আলোচনা ছেলেমহলে খুব হইত। কোথায় কোন নাটক অভিনীত হইল, কে কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, নাটকে কলিকাতা সমাজের কোন্ ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই সমস্ত বিষয় লইয়া ছেলেরা জল্পনা-কল্পনা করিত।... 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' রচনার পর হইতে নাটক বা উপন্যাস সাহিত্যে কে কার জবাব দিল ইহাই সকলে জানিতে চেষ্টা করিত।" ['পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি. প. পৃ ৮৯]

'না ভাই, আমার যাওয়া হবে না, রাত্তিরে বাইরে থাকা আমার নিষেধ, আর এ বছরে আমি এন্‌ট্রান্স একজামিন দোব।'[১০৭]

এই উক্তি অনুযায়ী অনুমান করা যায় যে, অমৃতলাল অর্ধেন্দুর সেই অভিনয় দেখেন নাই। কিন্তু অনেক দিন পরে অর্ধেন্দুশেখরের স্মৃতি-সভায় বলেন—

"জোড়াসাঁকোতে 'কিছু কিছু বুঝি' অভিনয় দেখতে গিয়ে অর্ধেন্দুকে দেখি। সে বললে, 'আমি প্লে করব,' অবাক হয়ে গেলুম, বেশ অভিনয় করলে।"[১০৮]

যাই হোক, অমৃতলাল অর্ধেন্দুশেখরকে নাট্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং অর্ধেন্দুর বিশেষ অনুরোধেই তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হন। অর্ধেন্দুই তাঁহাকে Caricature-এর দিকে মনোযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাল্যকালে এক 'জিমন্যাষ্টিক' এর আখড়ায় অর্ধেন্দুশেখরের সহিত অমৃতলাল নানাপ্রকার রঙ্গানুকৃতি করিতেন।

শৈশবকাল হইতেই অমৃতলাল জিমন্যাষ্টিকের ভক্ত ছিলেন। শোভাবাজার রাজবাড়ীতে জিমন্যাষ্টিক দেখিয়া 'ন্যাশনাল পেপারে'র সম্পাদক (ইনি 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিন' নামেও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন) নবগোপাল মিত্র চোর-বাগানে এক স্কুলবাড়ীর উঠানে জিমন্যাষ্টিকের স্কুল খুলিলেন।[১০৯] প্রথম হইতেই অমৃতলাল সেই স্কুলের শিক্ষার্থী হন। সেকালের এই ব্যায়ামচর্চার উল্লেখ করিয়া অমৃতলাল লিখিয়াছিলেন—

"তখনকার ছোকরারা ল্যাঙট পরে মাটি মেখে পালোয়ানী কুস্তী কর্ত্তে বড় প্রস্তুত নয়, তাই যুবকদের ব্যায়ামচর্চার জন্য নবগোপালের উদ্যোগে জিমন্যাষ্টিক বন্দোবস্ত হ'ল, আর মিলনের বর্ণপরিচয়-শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ 'জাতীয় মেলা বা চৈত্র মেলা' বলে একটি বার্ষিক প্রদর্শনী খোলা হয়।...ঐ মেলাতে...আমাদের ন্যায় যুবকেরা জিমন্যাষ্টিক ও এ্যাক্রোব্যাটিক কৌশল দেখাতো..."[১১০]

১০৭ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', দ্বি. প. পৃ ৯০

১০৮ 'নাচঘর' ৫ই আশ্বিন ১৩৩৫

১০৯ "To Baboo Nabo Gopal Mitter is due the credit of introducing athletic sports among the natives."— The Indian Daily News: 14. 2. 1881

১১০ 'সেকালের কথা'— ভারতী চৈত্র ১৩৩২

'পুরাতন প্রসঙ্গ' বর্ণনাকালেও অমৃতলাল বলিয়াছিলেন—'আমরা নবগোপাল বাবুর চেলা হইলাম।' (পৃ ৮৮)

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন যে, এই জাতীয় মেলার নাম ছিল 'হিন্দুমেলা' কারণ 'ন্যাশনাল' কথাটা তখনও চালু হয় নাই—

"[নবগোপাল মিত্রই] চাঁদা তুলে 'হিন্দুমেলা' শুরু করেন। তখনও ন্যাশনাল কথাটার চল হয় নি।…গুপ্তবৃন্দাবনের বাগানে হিন্দুমেলা হোত। …পূর্বকালে পাথুরেঘাটার ঠাকুর বংশেরই একজন কেউ ছিলেন বাগানের মালিক।"[১১১]

চোরবাগানে নবগোপাল মিত্রের স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অমৃতলাল ও তাঁহার সঙ্গীরা কম্বুলিয়াটোলার নটবর চৌধুরীর বাড়ীতে একটা আখড়া করেন। এখানে অর্ধেন্দুশেখর মাঝে মাঝে আসিতেন এবং হাস্যপরিহাসের তুফান উঠিত।

'একদিন তিনি সাজিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন; আমরা সব রোগী সাজিলাম— ফিরিঙ্গি, উড়ে, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি; caricatureএর চূড়ান্ত করা হইত। ক্রমশঃ এই রকমেই যেন অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেল।'[১১২]

এই যে 'ক্যারিকেচার'এ 'অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেল', ইহাই পরবর্তীকালে তাঁহাকে প্রহসন রচনায় যতটা উৎসাহী করিয়াছে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় ততটা নহে। তাঁহার প্রহসন সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন—

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রহসন রচয়িতারূপে বাংলা সাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু মহাশয় পরে সেই স্থান অধিকার করেন। অমৃতলালের রঙ্গকৌতুক এবং ব্যঙ্গশ্লেষ হিন্দু পুনরুত্থানের আন্দোলনের মুখেই ফুটিতে আরম্ভ করে।'[১১৩]

৮

প্রহসন রচনার ব্যাপারেই গিরিশচন্দ্রের সহিত এই সময় তাঁহার প্রথম পরিচয়। অমৃতলাল তখন এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছেন। সেই সময় গিরিশচন্দ্র সখের যাত্রা-

১১১ 'ঘরোয়া' পৃ ৮৬-৮৭

১১২ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি. প পৃ ৯৩

১১৩ 'নাট্যকলায় ও রঙ্গালয়ে নবযুগ' : নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ ২৫১

দলের জন্য পালা লিখিয়া দিতেন, গান বাঁধিয়া দিতেন। অমৃতলাল স্থির করিলেন যে তাঁহাদের ব্যায়ামের আখড়ার জন্য গিরিশচন্দ্রকে দিয়া একখানি 'ফার্স' লিখাইতে হইবে। এক রবিবারে তিনি একাকী গিয়া গিরিশচন্দ্রের সহিত দেখা করিলেন। গিরিশচন্দ্র নিজে না লিখিয়া অমৃতলালকেই 'ফার্স' লিখিয়া আনিতে বলিলেন। গিরিশচন্দ্রের কথামতো অমৃতলাল একটি 'ফার্স' লিখিয়া আনিলে গিরিশচন্দ্র সেই রচনাটির বিশেষ প্রশংসা করেন ('পুরাতন প্রসঙ্গ')। ইহার চারি বৎসর পরে (১৫ জানুয়ারী ১৮৭৩) অমৃতলালের 'স্টেজে লেখার প্রথম হাতেখড়ি' 'মডেল স্কুল' নামক নক্সা ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় 'নব বিদ্যালয়' নামে।

এই ঘটনার পূর্বে গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। কারণ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রামপ্রসাদ মিত্রের* বাড়ীতে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র চতুর্থ অভিনয় হয়। 'নিমে দত্ত'র ভূমিকা গ্রহণ করেন গিরিশচন্দ্র। অর্ধেন্দুশেখর এই ভূমিকাটি দেখিবার জন্য অমৃতলালকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু অমৃতলাল তখন ধারণাই করিতে পারেন নাই যে, তিনি ব্যতীত আর কেহ শেক্‌সপীয়র আবৃত্তি করিয়া সু-অভিনয় করিতে পারিবেন! আর এই অভিমানেই তিনি গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখিতে যান নাই। পরবর্তীকালে এই মনোভাবকে তিনি 'মূঢ় আত্মাভিমান' বলিয়াছিলেন; ইহার অত্যল্পকাল পরে গিরিশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার পূর্ব সংস্কার দূর হয়।[১১৪]

নিমে দত্তর ভূমিকায় পরবর্তীকালে অমৃতলালও কয়েকবার নামিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজেই মনে করিতেন যে, গিরিশচন্দ্রের ভূমিকার তুলনায় তাঁহার ভূমিকা বেমানান হইয়াছে—

'পরবর্তীকালে আমিও নিমাই দত্ত সাজিয়াছি, বিশেষ অখ্যাতিও হয়

* অমৃতলালের স্মৃতিকথায় রামচন্দ্র মিত্র বলিয়া উল্লিখিত।

১১৪ গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩১৯ সালের ১১ই ভাদ্র কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে 'নটসমন্বয়ে অভিনয়' আরম্ভ করিবার পূর্বে অমৃতলালরচিত 'স্মৃতির সম্মান' কবিতাটি পঠিত হয়। তাহাতে 'নিমে দত্ত'র ভূমিকার উল্লেখ করিয়া অমৃতলাল গিরিশকে বঙ্গের প্রথম নটগুরু বলিয়া সসম্মান স্বীকৃতি দিয়াছিলেন—

'মদে মত্ত পদ টলে নিমে দত্ত রঙ্গ স্থলে
প্রথমে দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তায়।'

নাই, তবুও আমার নিজের মনে কেবলই খটকা লাগিত যে, আমায় ঠিক মানাইতেছে না।'[১১৫]

অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি ন্যাশনাল থিয়েটারের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার সহিত গিরিশচন্দ্রের মতভেদ হওয়ায় তিনি দূরে সরিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বাদ দিয়াই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল। শুধু সখ মিটাইবার জন্য তাঁহারা অভিনয় করেন নাই। এ বিষয়ে ১৮৭২-এর ১৯এ নভেম্বর তারিখে 'সুলভ সমাচারে' তাঁহাদের 'কলিকাতা ন্যাশনেল থিয়েট্রিকেল সোসাইটি'র বিজ্ঞাপনে তাঁহারা স্পষ্টতঃই জানাইয়াছিলেন যে, 'রঙ্গভূমির ও বঙ্গভাষার অঙ্গপুষ্টির নিমিত্ত রঙ্গভূমে আবির্ভূত হইতে ইচ্ছুক ও যত্নবান হইয়াছি।'

গিরিশচন্দ্র তখন টিকিট বিক্রয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু টিকিট বিক্রয় করিয়া সর্বসাধারণকে থিয়েটার দেখিবার সুযোগ করিয়া দেওয়ায় অনেকেই অমৃতলাল প্রভৃতির 'মঙ্গল প্রার্থনা' করিয়াছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মন্তব্য নিম্নরূপ—

> 'নাটকের অভিনয় কলিকাতা সহরে বা মফস্বলেও নূতন নহে। কিন্তু এ সেরূপ অভিনয় নহে। খোসপোষাকী বাবুদিগের বৈঠকী সখের অভিনয় নহে। সে সকলের স্থায়িত্ব অনেক অব্যবস্থিত চিত্তের প্রসাদের উপর নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজবদ্ধ হইয়া এই অভিনয়কর্ম সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা টিকিট বিক্রয় করিতেছেন ও সেই অর্থে অভিনয়-সমাজের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিবেন মানস করিয়াছেন। আমরা একান্ত মনে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।'[১১৬]

'নীলদর্পণে' কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অমৃতলালের স্মৃতিকথা 'পুরাতন প্রসঙ্গ', দ্বিতীয় পর্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। 'সৈরিন্ধ্রী'র ভূমিকা লইয়া প্রথম মঞ্চাবতরণের দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার কথা অমৃতলাল এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

'যথাসময়ে তৃতীয় দৃশ্যের সীন উঠিল, আমি সৈরিন্ধ্রীর বেশে স্টেজের উপরে

১১৫ 'পত্রিকা ও নাট্যশালা'— অমৃতলাল বসু : 'সচিত্র শিশির' বড়দিন সংখ্যা ১৯২৪

১১৬ অমৃতবাজার পত্রিকা— ১২ই ডিসেম্বর ১৮৭২

উপবিষ্ট। চাহিয়া দেখি, আমার গুরুস্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক সম্মুখে বসিয়া আছেন। মুহূর্তের জন্য আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল; আমি যেন তখন সমাজচ্যুত, ধর্মচ্যুত হইয়া আমার ব্যর্থজীবনের সমস্ত লজ্জার ভার শিরে বহন করিয়া আমার গুরুজনদিগের সম্মুখে নারীবেশে উপবিষ্ট হইয়াছি; যেন মনে হইল, টিকিট বেচিয়া পাবলিক স্টেজে অভিনয় করিয়া আমি আমার সমাজকে, স্বদেশকে, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবকে আজ যে লজ্জা দিতেছি তাহার একমাত্র শাস্তি বহিষ্করণ। আমার তখনকার মনের ভাব আজ আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। তখন সমাজ ছিল, সমাজবন্ধন ছিল, সমাজদ্রোহিতার শাস্তি ছিল। মুহূর্তের জন্য আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, পরক্ষণেই ভাবিলাম, এ যা হবার তা ত হল, এখন যদি ভাল করিয়া প্লে না করিতে পারি, তা হইলে গঞ্জনা লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। কায়মনোবাক্যে নীলদর্পণের সৈরিন্ধ্রী হইলাম। বাহবা ধ্বনির তালে তালে 'সীন' পরিবর্তিত হইয়া গেল।'[১১৭]

তৎকালীন সকল সংবাদপত্রেই 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সৈরিন্ধ্রী'র ভূমিকা সম্পর্কে মতভেদের অন্ত ছিল না।

অমৃতবাজার পত্রিকা (১২. ১২. ১৮৭২) লিখিয়াছিলেন, 'সৈরিন্ধ্রী তত ভাল হয় নাই। কিন্তু তাহার রোদনস্বর অপূর্ব বলিতে হইবে।' 'এডুকেশন গেজেটে' 'অনুগত কশ্চিৎ দর্শক' (১৩. ১২. ১৮৭২) লিখিলেন, 'পঞ্চম অঙ্কে সৈরিন্ধ্রীর বিলাপলহরী এত স্বাভাবিক ও ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে তচ্ছ্রবণে এমত শ্রোতা ছিল না, যে, একবিন্দু অশ্রুপাত করেন নাই। সৈরিন্ধ্রীর বাক্যাদি ঠিক স্ত্রীলোকের ন্যায় বোধ হয়।' এই 'অনুগত দর্শক'টি অভিনেতৃবর্গকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তোরাপ, গোলোকচন্দ্র ও সৈরিন্ধ্রীকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন।[১১৮]

আবার 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে (১৯. ১২. ১৮৭২) "A Father" লিখিত যে পত্রটি প্রকাশিত হয় তাহার মতে "Syrindry, the heroine, was not up to mark ; her weeping tone was unnatural." ওই সংবাদপত্রেই

১১৭ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বি. প. পৃ ১০৫-৬

১১৮ তোরাপের ভূমিকা লইয়াছিলেন মতিলাল সুর। অমৃতলাল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলিয়াছেন— 'মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না।' গোলোকচন্দ্রের ভূমিকা ছিল অর্ধেন্দুশেখরের।

(২৭. ১২. ১৮৭২) "A Spectator"— লিখিত পত্রের ভাষা ও মন্তব্য আরও তীব্র : "Syrindri, it seemed, belonged to some extinct race of mortals, whose weeping tone some antiquary might recognise ; and it was a curious sight to see her drawling with the upper lip curved, and the head-beating time."

অমৃতলাল অনুমান করিয়াছিলেন যে ওই পত্র গিরিশচন্দ্রের লেখা।[১১৯]

ন্যাশনাল থিয়েটারের দলের সহিত গিরিশচন্দ্রের মতের মিল না হওয়ায় গিরিশচন্দ্র নিশ্চয়ই মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন এবং এই দলের প্রত্যেককে ব্যঙ্গ করিয়া একটি বিদ্রূপপূর্ণ গান— 'লুপ্তবেণী বইছে তেরোধার···' রচনা করেন। অমৃতলাল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' এই গানটি উদ্ধৃত করিয়া গিরিশচন্দ্র-উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচয় দিয়া গানটির ব্যাখ্যা করেন। গানটিতে সৈরিন্ধ্রীর অশ্রুবর্ষণকে কটাক্ষ এবং টিকিট বিক্রয়কে শ্লেষ করিয়া গানটির শেষাংশে গিরিশচন্দ্র লেখেন—

'······অমৃত বরষে,
বুঝিবা দিনের গৌরব যায় খসে,
স্থানমাহাত্ম্যে হাড়িশুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার ॥'

এই গানটির কথা অমৃতলাল আর একবার স্মরণ করিয়াছিলেন। ১৩৩৪ সালের ২৫এ বৈশাখ ভুবনমোহন নিয়োগীর মৃত্যু হইলে তিনি লিখিয়াছিলেন—

'···আমাদের ব্রজরাজ যখন প্রথম প্রথম দিনকতক জটিলা-লীলা-রস অনুভব করবার জন্য আমাদের নামে কলঙ্কের গান বেঁধেছিলেন··· তখন আমরা এই ঘাটের বৈঠকখানায় বসেই হাসতে হাসতে কবির অপূর্ব রচনা সুর ক'রে নিজেরা গেয়েই কলঙ্কের কালিমাটুকু জ্যোছনায় উজ্জ্বল ক'রে দিয়েছিলেম !'*

৯

'নীলদর্পণ' অভিনীত হইবার পর অমৃতলাল অভিনয়কার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন—

১১৯ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বিতীয় পর্যায় পৃ ১০৮-১০৯। গিরিশচন্দ্রের (?) পত্রের তারিখ দেখিয়া মনে হয় তিনি নীলদর্পণের দ্বিতীয় অভিনয় দেখিয়া (২১. ১২. ১৮৭২) এই পত্র লেখেন।

* 'ভুবনমোহন নিয়োগী'— মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

'ক্রমে ক্রমে আমাদের সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। একে একে দীনবন্ধু মিত্রের সমস্ত নাটক অভিনয় করিলাম। এক এক সপ্তাহে এক এক নূতন বই প্লে করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।'[১২০]

১৮৭৩ এর ৪ঠা জানুয়ারী অভিনীত হইল 'নবীন তপস্বিনী'। অমৃতলালের ছিল বিজয়ের ভূমিকা। অমৃতলালের অভিনয়ের প্রসঙ্গে 'ন্যাশনাল পেপার' লিখিয়াছিলেন—

"Bejoy with the love for Kamini.........charmed the audience."

'নবীন তপস্বিনী'র পর তাঁহারা দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' (১১. ১. ১৮৭৩) ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৫. ১. ১৮৭৩) প্রহসনের অভিনয় করেন। তারপর রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (২২. ১. ১৮৭৩) ও 'নবনাটক' (২৫. ১. ১৮৭৩) অভিনীত হয়। 'নবনাটকে' অমৃতলাল সুবোধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকার মতো বিজয় ও সুবোধের ভূমিকাও অমৃতলাল অর্ধেন্দুশেখরের নিকট শিক্ষা করেন। 'অমৃত-মদিরা' গ্রন্থের পরিশিষ্টে আছে—

'নীলদর্পণের সৈরিন্ধ্রী, নবীন তপস্বিনীর বিজয় ও নবনাটকের সুবোধ প্রভৃতি প্রথম নাট্যজীবনের কয়েকটি ভূমিকা গ্রন্থকার ইঁহারই [অর্ধেন্দুশেখরেরই] নিকট শিক্ষা করেন।'[১২১]

৮ই ফেব্রুয়ারী অভিনীত হয় শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেয়া'। অমৃতলাল রঞ্জনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁহার অভিনয় সম্পর্কে 'ন্যাশনাল পেপার' মন্তব্য করেন :

"The love scenes between Ranjan and Sarala were tolerably represented. Ranjan was very hasty and rather flippant".[১২২]

১৫ই ফেব্রুয়ারী 'ভারতমাতা' অভিনীত হয়। অমৃতলাল দীর্ঘকাল পরে

---

১২০ পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বি. প পৃ. ১০৯। নীলদর্পণ অভিনীত হইবার পরের সপ্তাহে 'জামাই বারিক' (১৪ই ডিসেম্বর), ২১এ ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ' এবং ২৮এ ডিসেম্বর 'সধবার একাদশী' সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

১২১ পৃ ২৭৬

১২২ ন্যাশনাল পেপার : ১২.২.১৮৭৩। সরলার ভূমিকায় অভিনয় করেন ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (নীলদর্পণের সরলতা)।

রচিত 'নবজীবন' নাটিকার নিবেদনে লিখিয়াছিলেন—'ভারতমাতার অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চে জননী জন্মভূমির প্রথম পূজা।'

একবার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে 'ভারতমাতা' সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—

'তখন হেমবাবুর 'ভারত-সঙ্গীত' নূতন হয়েছে··· এই সময়ে আমরা ন্যাশানাল থিয়েটারে ভারতমাতা বলে একটা ছোটখাটো দৃশ্যকাব্য দিলেম। এই ভারতমাতার অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে আরম্ভ হয়েছিল, সাধারণে বিষয়টা বড় appreciate করলে।'[১২৩]

এই ক্ষুদ্র নাটিকায় অমৃতলাল ভারতসন্তানের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল প্রভৃতির নিকট হইতে দূরে ছিলেন। এইবার তিনি আসিয়া যোগ দিলেন ন্যাশনাল থিয়েটারে।

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে গিরিশচন্দ্র ভীমসিংহের ভূমিকা লইবেন স্থির হইল। কিন্তু থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে তিনি নিষেধ করিলেন। এ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন—

'আমি আমার নাম Amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় করিতে অসম্মত হই। অর্থলোভী ব্যক্তিরা আমার যোগদানে তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না, এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি করিলেন।'[১২৪]

গিরিশচন্দ্র 'অর্থলোভী' বলিয়া কাহাদের বুঝাইয়াছেন তাহা বলা দুরূহ। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বে কেহ 'অর্থলোভী' ছিলেন এমন মনে হয় না। প্রত্যেকেই রঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্য প্রভূত স্বার্থত্যাগ করিতেছিলেন। অমৃতলাল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে এই সময়ে তাঁহারা কেহ মাহিনা লইতেন না। তাঁহারা কেহ পেশাদার ছিলেন না। গিরিশচন্দ্রও যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তথাপি 'অর্থলোভী' এই স্থায়ী দুর্নাম তিনি কেন যে তাঁহার প্রথম জীবনের নাট্যসঙ্গীদের দিয়া গেলেন তাহা বলা শক্ত। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয়ে গান গাহিবার জন্য মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ নাট্যশালায় ইনিই প্রথম ও একমাত্র বেতনভোগী ছিলেন।

১২৩ দ্রষ্টব্য 'অমৃতবাবুর বক্তৃতা': রঙ্গভূমি: মাঘ. ১৩০৭। এই ভারতমাতাকে স্মরণ করিয়াই অমৃতলাল 'নবজীবন' (১৯০২) 'রূপক' রচনা করেন।

১২৪ 'নট-চূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর' পৃ ২৩

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের কথাই রহিল। ২২ এ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ 'কৃষ্ণকুমারী'-অভিনয়ে তিনি "distinguished amateur" এই পরিচয়ে ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। এই অভিনয়ের সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি অমৃতলাল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিজে পুনরায় স্ত্রী ভূমিকায় (মদনিকা) অবতীর্ণ হন।[১২৫] প্রথম অভিনয়-রজনীতে মধুসূদন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (কৃষ্ণকুমারী) বলিয়াছেন যে, 'অভিনয়ান্তে ভিতরে আসিয়া তিনি··· নগেন, অর্ধেন্দু ও ভূনিবাবুরও (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর) খুব সুখ্যাতি করিলেন।'[১২৬]

নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ অভিনেতৃবর্গকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং উৎসাহ দিতেন। এমন কি, অমৃতলাল বলিয়াছেন,

> 'আমি যখন মদনিকার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলাম, তিনি গ্রীণরুমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; আমি প্রত্যাবৃত্ত হইলেই তিনি অবলীলাক্রমে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আমার পায়ের মোজা খুলিয়া দিলেন; আমার সলজ্জ প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না।'[১২৭]

জোড়াসাঁকো সান্যালবাড়ীর প্রাঙ্গণে ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় হয় ১৮৭৩ এর ৮ই মার্চ। এই রাত্রে মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং রামনারায়ণের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' অভিনীত হয়। এই সঙ্গে হাস্য-কৌতুক প্রভৃতি কতকগুলি বিচিত্র বিষয়ও দেখান হয়। অমৃতলালের 'ষ্টেজে লেখার হাতেখড়ি' 'মডেল স্কুল'ও অভিনীত হইয়াছিল এই রাত্রে।

থিয়েটার বন্ধ হইবার গৌণ কারণ বর্ষার সমাগম। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> 'বর্ষা আগমনে জোড়াসাঁকোর সান্যালবাড়ীর প্রাঙ্গণে অভিনয় করা অসম্ভব হওয়ায় ন্যাশানাল থিয়েটার বন্ধ হয়।'[১২৮]

ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গ দর্শকদের নিকট সেই কারণ দেখাইয়াই অভিনয় বন্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ ৮ই মার্চ অভিনয়-শেষে

১২৫ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার "The Indian Stage" (Vol II) গ্রন্থে ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন 'মদনিকা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন আশুতোষ বসু (পৃ ১৯৭ দ্রঃ)।

১২৬ 'শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নটজীবন'— অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ('রূপ ও রঙ্গ' ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩১)

১২৭ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বি. প. পৃ ১১৭

১২৮ 'বঙ্গীয় নাট্যশালার নটচুড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পৃ ২৩

যবনিকা পতনের পূর্বে 'জ্যাঠা' বেহারী (বিহারীলাল বসু) নারীবেশে গিরিশচন্দ্র-রচিত যে বিদায়গীতি গাহিয়াছিলেন তাহাতে 'মিনতি' ছিল এই বলিয়া যে,

'নির্মাইয়ে নাট্যালয়,
আরম্ভিব অভিনয়,
পুনঃ যেন দেখা হয়
এ মিনতি পায় ॥'*

থিয়েটার বন্ধ হওয়ার প্রকৃত কারণ, টাকাকড়ি খরচপত্র লইয়া মতভেদ ও মনোমালিন্য। অমৃতলাল বলিয়াছেন—

'যখন টাকা হিসাবে আমাদের দলের মধ্যে কেহই স্বার্থপর ছিলেন না, তখন টাকা লইয়া গোলযোগ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাই হইল। থিয়েটারে আমাদের অভিভাবকস্থানীয়গণ সকলকে সন্তোষজনকরূপে টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না।'[১২৯]

ফলে দুইটি দলের সৃষ্টি হইল। একদলে অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং অন্যদলে গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি ছিলেন।

তথাপি ন্যাশনাল থিয়েটারের সেই শেষ অভিনয়-রজনীর বেদনার্ত স্মৃতি অমৃতলাল দীর্ঘকাল মনের মধ্যে বহন করিয়াছিলেন। 'জ্যাঠা বেহারী'র গানের একাংশে ছিল—

'এ সভা রসিক মিলিত
হেরিয়ে অধিনীচিত
আধ পুলকিত
আধ হুতাশে শুকায় ·'

১৩২৩ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ সেই পুরাতন গানটি স্মরণ করিয়া অমৃতলাল বলিয়াছিলেন—

'১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধুযামিনীর সেই করুণ বিদায়গীতি আজিও থাকিয়া থাকিয়া আমার হৃদয়নিকুঞ্জে গুঞ্জরিত হইয়া উঠে। আমার সেই উদ্দাম যৌবনের বসন্তোৎসবে সেই 'আধ পুলকিত আধ হুতাশে শুকায়'

* গানটি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি. পর্যায়ে সম্পূর্ণ উল্লিখিত আছে।

১২৯ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বি. প. পৃ ১২১

হৃদয়—আজ আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? তারপরে কত বসন্ত আসিল ও গেল; কত হাসি-কান্নার ভিতর দিয়া আমার জীবন-নাট্য লীলায়িত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সেই রাত্রির সেই বেদনা আজিও বিস্মৃত হই নাই।'[১৩০]

১০

ন্যাশনাল থিয়েটার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেলে গিরিশচন্দ্র এবং তাঁহার দল (ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর প্রভৃতি) স্টেজ এবং সিন আটকাইলেন ও নিজেদের দলটিকে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে রেজিষ্ট্রী করিয়া লইলেন। অন্য দল (অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলবাবু, ক্ষেত্রবাবু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি) তখন নাম লইলেন 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' এবং লিণ্ডসে স্ট্রীটে 'অপেরা হাউস' ভাড়া লইয়া ১৮৭৩ সনের ৫ই এপ্রিল অভিনয় করিলেন। এই রাত্রে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের সহিতঅ মৃতলালের 'মডেল স্কুল'ও অভিনীত হয়। কিন্তু 'অপেরা হাউসে' তাঁহাদের নাট্যলীলা অল্পদিনের মধ্যেই সাঙ্গ হইয়া গেল।[১৩১] ২৬শে এপ্রিল হাওড়া রেলওয়ে থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' অভিনয় করিলেন। তারপর ঢাকা যাইবার প্রস্তাব হইল এবং মে মাসের মাঝামাঝি অমৃতলাল দলের সহিত কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল। দর্শক ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অভয় দাস, ডাক্তার কেদারনাথ ঘোষ, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রাম্পীনি, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওয়েদারল প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। অমৃতলাল বলিয়াছেন, 'একবারেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম।'

একজন দর্শক এই অভিনয় দেখিয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় লিখিয়াছিলেন, 'আমরা সমস্ত ঢাকাবাসী অভিনয় সন্দর্শন করিয়া যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি লিখিয়া শেষ করিতে পারি না।'[১৩২]

"আমি একটি ছোটখাট ফার্স রচনা করিয়া পরদিন সন্ধ্যার পর মুদ্রিত 'বেঙ্গল টাইম্‌স' কাগজে পেন্ট্‌লান, কোট, টাই প্রভৃতি রচনা করিয়া তদ্দ্বারা আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া স্টেজের উপর দাঁড়াইয়া প্রাণ খুলিয়া কেম্প সাহেবকে বিদ্রূপ করিলাম।"[১৩৩]

ঢাকায় মাসখানেক অবস্থানের পর তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিলেন। কিছুদিন পরে দীঘাপতিয়া হইতে নিমন্ত্রণ আসিল। ন্যাশনাল ও হিন্দু ন্যাশনাল উভয় দলের কয়েকজন অভিনয় করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। অমৃতলাল যান নাই। এ বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন—'··· দীঘাপতিয়ার রাজকুমারের (এখন রাজা প্রমদানাথ রায়) অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ন্যাশনাল থিয়েটরের নিমন্ত্রণ হয়। তখন দুই দল-এর অধিকাংশ লোকই একত্র হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি গেলাম না।'

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় দীঘাপতিয়ায় এই অভিনয় দেখিয়াছিলেন। তাঁহার একটি প্রবন্ধে[১৩৪] এ-সম্পর্কে তিনি কিছু আলোচনাও করিয়াছিলেন। অমৃতলালের মৃত্যুর পর ৪ঠা জুলাই ১৯২৯ তিনি রাজসাহীর ঘোড়ামারা হইতে একটি সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি দীঘাপতিয়ায় 'রসরাজের অভিনয় দর্শন' করেন বলিয়া লিখিয়াছেন। পত্রটির* এক অংশ এই—

'পরলোকগত দীঘাপতিয়ার রাজা মাননীয় প্রমদানাথের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ন্যাশনাল থিয়েটার রাজসাহীতে আনীত হইয়াছিল। তখন স্ত্রীলোকের ভূমিকায় স্ত্রীলোক অভিনয় করিত না।[১৩৫] সেই সময়ে রসরাজের অভিনয় দর্শন করি।'

ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্বের স্মৃতি! অক্ষয়কুমারের ভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক।

অতঃপর অর্ধেন্দুশেখর এই দলটিকে লইয়া রামপুর বোয়ালিয়া ও বহরমপুরে অভিনয় করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া এই সম্মিলিত দল ১৬ই জুলাই ১৮৭৩ 'অপেরা হাউসে' কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় করেন।

এই সময়ে বিডন স্ট্রীটে নবনির্মিত 'বেঙ্গল থিয়েটারে' চলিতেছিল 'মোহন্তের

১৩৩ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বি. প. পৃ ১৩০

১৩৪ 'অর্ধেন্দুশেখর'— সচিত্র শিশির : ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

* পত্রটি অপ্রকাশিত।

১৩৫ অভিনেত্রী লওয়া হয় প্রায় এক বৎসর পরে। অমৃতলাল লিখিয়াছেন, '৭৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি আমরা স্ত্রীলোক অভিনেত্রী নিতে বাধ্য হলাম।' ('ভুবনমোহন নিয়োগী'— মাসিক বসুমতী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪)

এই কি কাজ!' মধুসূদনের পরামর্শে 'বেঙ্গল'ই সর্বপ্রথম অভিনেত্রী লইয়া অভিনয়ের সূত্রপাত করিল। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'উভয়-সঙ্কট' অভিনয় করিয়া 'বেঙ্গল' তত জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারিল না। ৬ই সেপ্টেম্বর অভিনীত হইল 'মোহন্তের এই কি কাজ'। এই অভিনয় দেখিতে বেঙ্গল থিয়েটার দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অমৃতলাল তাঁহাদের সেই সময়কার অভিজ্ঞতার কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

'১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ চলছে, আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি, এমন সময় আগষ্ট মাসে বিডন ষ্ট্রীটে বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হ'ল।··· বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় চলছে, কিন্তু জমছে না, শেষে বাবা তারকনাথ মুখ তুলে চাইলেন,··· কে একজন বাঙ্গালী (কৃশ্চান বোধ হয়) 'মোহান্তের এই কি কাজ' বলে নাটক লিখলেন, সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সারা বেঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল, আমি আর নগেন উপরি-উপরি দু'রাত্রি টিকিট কিনতে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। মাইকেলের পরামর্শে নারী এ্যাক্‌ট্রেস নিয়েও যে বেঙ্গল থিয়েটার খালি বেঞ্চির সামনে প্লে কচ্ছিল, মোহান্ত মাহাত্ম্য কীর্তনে সেই বেঙ্গলের দরজা থেকে রাত্রির পর রাত্রি শত শত লোক ফিরে যেতে লাগল।* আমরা দম ফেটে মারা যেতে লাগলুম, টাকার ঝন্‌ঝনানি শুনে নয়, সত্য বলছি— টাকা তখন ডোণ্ট কেয়ার; খালি, বাড়ী নেই—ষ্টেজ নেই, এ্যাক্‌ট করতে পারছি না বলে, হাততালির শব্দে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করতে পারছি না বলে।'[১৩৬]

সাত দিনের মধ্যেই (অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩) অমৃতলাল, নগেন্দ্রনাথ, ক্ষেত্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি হিন্দু ন্যাশনালের দল চুঁচুড়ায় গিয়া 'মোহান্তের এই

* অমৃতলালের নাটকে, প্রহসনে, প্রবন্ধে, কবিতায় সর্বত্রই সমসাময়িক ঘটনার ছায়াপাত হইত। 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৮৭৫) প্রহসনের প্রথম দৃশ্যে বেঙ্গল থিয়েটারের 'মোহান্তের এই কি কাজ' অভিনয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই :

'নারাণ। যা হোক একটা হুজুক করে অনেকে অনেক পয়সা রোজকার কল্লে, বিশেষ বটতলার বইওয়ালারা আর থিয়েটারওয়ালারা।

কাঙ্গালী। হাঁ ঠিক ঠিক, আমি একবার চার আনায় এক টিকিস করে ব্যাংগোলে মোহান্ত নাটক দেখে এসেছি।'

১৩৬ 'ভুবনমোহন নিয়োগী' মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

কি কাজ!' অভিনয় করিয়া আসিলেন। এই অভিনয়ে অমৃতলাল—এলোকেশীর পিতা, নগেন্দ্রনাথ— নবীন এবং ক্ষেত্রমোহন— এলোকেশী হইয়াছিলেন।

১১

এই সময়ে ভুবনমোহন নিয়োগী রঙ্গালয় নির্মাণের জন্য অর্থ দিতে স্বীকৃত হইলেন। 'আর আমাদের দেখে কে। তোমার জয় জয়কার হোক ভুবন, বলে আমরা লেগে গেলুম।' তখন গিরিশচন্দ্র বা অর্দ্ধেন্দুশেখর এই দলে ছিলেন না। দল একরূপ ছিন্নভিন্ন। অমৃতলাল ও ধর্মদাস সুর অভাবনীয় পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। 'গিলেণ্ডার কোম্পানী'র নিকট হইতে তিন হাজার টাকার 'সেগুনের চকোর'* কেনা হইল। ধর্মদাস সুর চৌরঙ্গীর 'লুইস থিয়েটারে'র অনুকরণে বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের জমিতে একটি কাষ্ঠনির্মিত রঙ্গালয় প্রস্তুত করিলেন। এ সম্পর্কে ধর্মদাস তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—

> 'এই বাটী নির্মাণ করিবার জন্য আমি ইংরাজ বা ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য লই নাই; তবে ড্রপ সিন ও আর দু চারিখানি সিন মিঃ গ্যারিককে দিয়া আঁকান হয়।'[১৩৭]

এই ডেভিড গ্যারিক ছিলেন আর্ট স্কুলের প্রিন্‌সিপ্যাল। পরে তিনি স্বাধীনভাবে চিত্রকর ও ফটোগ্রাফারের কার্য করেন। অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

> 'তিনি ৮০৲ টাকা করে প্রত্যেকখানির মজুরী নিয়ে চারখানি ফ্লাট সিন আমাদের এঁকে দেন; কাঠ, কাপড়, রং সব আমাদের, একখানি গৃহাভ্যন্তর, একখানি রাজসভা, একখানি উদ্যান, একখানি পর্বত ও বন। কাশীর গঙ্গাতীরস্থ দৃশ্য নিয়ে আইরিশ ড্রপ কাপড়ের উপর তিনি একখানি ড্রপসিন এঁকে দেন, এর জন্য তাঁকে মজুরী দিতে হয় সাড়ে ছ'শ টাকার কিছু উপর।'[১৩৮]

'হিন্দু ন্যাশনাল' নাম পরিত্যাগ করিয়া এইবার তাঁহারা রঙ্গালয়ের নাম

* ১৩৩৪ সালে অমৃতলাল লিখিয়াছেন, 'আজ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ, এখনও সেই কাঠের গঠন বিনা ক্ষয়ে ষ্টারের বর্ত্তমান বাটীতে ব্যবহৃত হয়ে মজুত হয়ে আছে।' ('ভুবনমোহন নিয়োগী')

১৩৭ 'নাট্যমন্দির' ভাদ্র ১৩১৭

১৩৮ 'ভুবনমোহন নিয়োগী'— মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

দিলেন 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। সমস্যা দেখা দিল নাটক লইয়া ; অভিনয়ের উপযোগী নাটক না পাওয়ায় তাঁহারা নিজেরাই 'মায়াকাননে'র ধরণে 'কাম্য-কানন' নামে একটি নাটিকা লিখিয়া ফেলিলেন। অমৃতলাল বলিয়াছেন—

'আমি ও দেবেন্দ্র নামক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— আমরা কয়জন মিলিয়া 'কাম্যকানন' নামে একটা নাটকই বলুন আর Fairy Talesই বলুন, রচনা করিয়া ফেলিলাম।'[১৩৯]

১৮৭৩ এর ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে 'কাম্যকানন' অভিনয়ের দ্বারা গ্রেট ন্যাশনালের উদ্বোধন হইল। এত অল্প সময়ের মধ্যে রঙ্গালয় নির্মাণ করিয়া (২৯এ সেপ্টেম্বর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়) রঙ্গালয়ের উদ্বোধন তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য সাধনই হইয়াছিল। অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

'নগেনের ছিল তখন একটা আফিসে চাকরী, দল এক রকম ছিন্ন-ভিন্ন, আমি আর ধর্মদাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, শেষাশেষি মশাল জ্বালিয়ে কাজ করে, কি খাটনটা খেটেই যে ঐ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খুলতে পেরেছিলুম, তা এখনও মনে হলে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই।'[১৪০]

সেই রাত্রে দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ রঙ্গভূমে অমৃতলাল 'কাম্যকাননে'র নায়ক-রূপে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু পাঁচটি মাত্র দৃশ্য অভিনীত হইতে না হইতেই উত্তর দিকের প্রবেশদ্বারে আগুন লাগে। দর্শকমণ্ডলী মহাকোলাহল আরম্ভ করে। আগুনলাগার কারণ সম্পর্কে অমৃতলাল লিখিয়াছেন— 'গ্যাসফিটারের অসাবধানতায় প্রথম রাত্রিতেই বাটীর সম্মুখের দেওয়ালে আগুনলাগার সূত্রপাত হয়, দুর্গার ইচ্ছায় সব রক্ষা পায়। কিন্তু দর্শকের আতঙ্ক ও বাজে ভদ্রলোকের অনধিকার প্রবেশে এত গোলমাল হয় যে, অভিনয় আর সে রাত্রিতে শেষ হয় নাই।'[১৪১]

১৩৯ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'— দ্বি. প. পৃ ১৩৪

১৪০ 'ভুবনমোহন নিয়োগী'— মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

১৪১ 'ভুবনমোহন নিয়োগী'— মাসিক বসুমতী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪। 'ভারত সংস্কারক' নামক সাপ্তাহিক পত্রও ১৮৭৪, ২রা জানুয়ারী লেখেন— 'একটী বিষয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য ও দুঃখিত হইলাম যে যখন নাট্যশালায় অগ্নি লাগিল, ভদ্রবেশধারী কতকগুলি লোক মহানন্দে করতালি ও কোলাহলপূর্বক আপনাদিগের নীচতার পরিচয় দিতে লাগিলেন।'

অর্ধেন্দুশেখর ও নাট্যকার মনোমোহন বসু তখন রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রাণপণ প্রয়াসেও দর্শকদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। অমৃতলাল তখন মঞ্চের উপর। তিনি সেই অবস্থায় নায়কের বেশেই দর্শকদের সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে বলিলেন,

'আজ আমাদের বড় সাধে আগুন লাগিয়াছে; আমাদের দুঃখের গভীরতা আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে একটু চেষ্টা করিবেন কি? কত খরচপত্র, সাধ্য-সাধনা করিয়া আমরা এই ষ্টেজ গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, কত আনন্দে ও উৎসাহে এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, আপনাদিগকে তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব?...আপনারা সকলেই নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনাদের নিকটে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, একদিন আপনারা বিনা পয়সায় আমাদের অভিনয় দেখিতে পাইবেন।'[১৪২]

দর্শকবৃন্দ 'সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।' যেখানে অর্ধেন্দুশেখরের মতো 'নটচূড়ামণি'ও বক্তৃতা দিয়া দর্শকদের 'সন্তুষ্ট' করিতে পারেন নাই, সেখানে কতখানি ব্যক্তিত্ব থাকিলে তবে এ কার্য সম্পন্ন করা যায় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরবর্তী জীবনে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষরূপে অমৃতলালকে অনেক সময়েই এইরূপ বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইত। তাঁহার বাগ্‌ভঙ্গী ছিল অননুকরণীয় এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন সহৃদয় প্রসন্নতা ছিল যে, সকল বিপদই তিনি অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতেন।

একটি ঘটনার উল্লেখ করি, অমৃতলাল তখন স্টারের অধ্যক্ষ। বিজয়ার পর স্টারে যে-রাত্রে প্রথম অভিনয় হইত, অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে অমৃতলাল মঞ্চে দাঁড়াইয়া দর্শকবৃন্দকে বিজয়ার নমস্কার ও প্রীতি সম্ভাষণ জানাইতেন। এই প্রথাই চলিত হইয়া গিয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের বিজয়ার পর প্রথম অভিনয় রাত্রির ঘটনাটি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন বেশ সরসভাবে—

'অমৃতলাল বিজয়ার সম্ভাষণ জানিয়ে নেপথ্যান্তরালে প্রস্থান করেছেন... কনসার্ট বাজছে... তিনতলার জেনানা মহলে উঠলো তুমুল হট্টগোল। এক বিপুল-কলেবরা প্রৌঢ়া গার্জেনের সঙ্গে এক দঙ্গল মহিলা এবং ছেলেমেয়ে

১৪২ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'—দ্বি. প. পৃ ১৩৫-৩৬। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৮ই মার্চ (১৮৭৪) তারিখে তাঁহারা 'নবীন তপস্বিনী' অভিনয় করিয়া বিনামূল্যে দর্শকদের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন।

এসেছেন— তাঁরা জায়গা পান না! প্রৌঢ়া প্রচণ্ড হুঙ্কারে নাট্যশালা প্রকম্পিত করে তুললেন।... অমৃতলালকে এসে দাঁড়াতে হলো মঞ্চের উপর। এসে তিনি করজোড়ে দাঁড়িয়ে জেনানা মহলের দিকে চাইলেন... বেশ জোর গলায় তিনি বললেন— মা লক্ষ্মীরা একটু চুপ করুন। কেউ অভিনয় শুনতে পাচ্ছে না।... জায়গা না থাকে যদি তো চলে আসুন... আপনার টিকিটের দাম ফিরিয়ে দিচ্ছি। না জেনে অপরাধ করেছি— সেজন্য ক্ষমা চাইছি।... অমৃতলালের এ কথায় প্রৌঢ়া বেশ উচ্চকণ্ঠেই বললেন— থাক্ থাক্, বুড়ো মাপ চেয়েছে তো... যেমন করে হোক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই থিয়েটার দেখা যাক।

এমন গোলমালে মেজাজ ঠাণ্ডা এবং সেই সঙ্গে দর্শকদের মান রেখে ব্যবস্থা... ক'জন তা পারেন।"[১৪৩]

গ্রেট ন্যাশনালে সেই অভাবিত দুর্ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ১৮৭৪ এর ১লা জানুয়ারী 'ফ্যান্সী ফেয়ার' উপলক্ষে অমৃতলাল প্রভৃতি গ্রেট ন্যাশনালের দল বেলভেডিয়ারে সখের বাজারে 'নীলদর্পণ' অভিনয় করিয়াছিলেন। তারপর রঙ্গালয়ের সংস্কার সাধন করিয়া তাঁহারা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অনেকগুলি নাটকের অভিনয় করেন। ২১ এ ফেব্রুয়ারী 'মৃণালিনী' অভিনীত হয়। অমৃতলাল দিগ্বিজয়ের ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হন। এই সময় হইতেই রঙ্গালয়ের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। ১২৮০ সালের ৫ই মাঘ 'প্রণয় পরীক্ষা' নাটকের অভিনয় দেখিয়া 'কশ্চিৎ দর্শক' এই থিয়েটার সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন—

"ন্যাশানেল থিয়েটর ছাড়িয়া, কয়েকজন অভিনেতা* কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটে 'গ্রেট ন্যাশানেল থিয়েটর' নামে একটি স্বতন্ত্র নাট্যমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। এখনও উহা সর্বাঙ্গসুন্দর না হউক, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙ্গালা নাটক অভিনয় যেখানে যত হইয়াছে, এরূপ সুপ্রশস্ত ও সুরম্য রঙ্গস্থল আর কুত্রাপি দেখা যায় নাই। রঙ্গভূমির পারিপাট্য ও ঔৎকর্ষসাধন জন্য ইহারা যেমন অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তেমনি শ্রোতৃবর্গের যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাহাতেও যত্নের ত্রুটি করেন নাই।"[১৪৪]

---

১৪৩ 'সচিত্র শিশির'— বৈশাখ ১৩৬৪

* 'কয়েকজন' বলিবার কারণ গিরিশচন্দ্র বা অর্দ্ধেন্দুশেখর তখন দলে ছিলেন না।

১৪৪ 'সাধারণী'— ২৭ মাঘ ১২৮০ (পৃ ১৯০)

পরবর্তীকালে যে-অমৃতলালের সুদক্ষ পরিচালনায় স্টার থিয়েটার আদর্শ রঙ্গালয়ে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয় গ্রেট ন্যাশনাল পরিচালনায়।

তখন বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রীরা স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করিতেছে, একদিন রামবাগানের প্রখ্যাত মনীষী উমেশচন্দ্র দত্ত অমৃতলাল প্রভৃতিকে অভিনেত্রী গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন—

"অমৃত বসু বলেন, 'রামবাগানের উমেশ দত্ত একদিন স্পষ্টই বলিলেন, তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় না করিলে রঙ্গালয় জমাইতে পারিবে না'।"[১৪৫]

কিন্তু রঙ্গালয় 'জমান' নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িলেও তৎকালে অভিনেত্রী-প্রবর্তন অত্যন্ত দুঃসাধ্য কার্য ছিল। একসময় 'স্টেটসম্যান' পত্রের প্রতিনিধি অমৃতলালের সহিত সাক্ষাৎকারের পর এই প্রসঙ্গে যথার্থই লিখিয়াছিলেন,

'It was in the year 1873, when the Bengal Theatre was opened, that actresses were first engaged. There was a great outcry raised when females first appeared on the stage, and in deference to this Mr. Bose's party stuck to their original determination to only employ males'.[১৪৫ক]

এই সময় গ্রেট ন্যাশনাল দল একবার বহরমপুরে অভিনয় করিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারাও শেষ পর্যন্ত অভিনেত্রী লইতে বাধ্য হইলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে গ্রেট ন্যাশনালে অভিনেত্রীরা অভিনয় করিতে লাগিলেন।[১৪৬]

এই ব্যবস্থা 'ভারত সংস্কারক' পত্রের মনঃপূত হয় নাই— 'বেঙ্গল থিয়েটরের ন্যায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। সকল সভ্যসমাজেই নাট্যোল্লিখিত স্ত্রীগণের অভিনয় এক্ষণে স্ত্রীজাতি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। আমরা সেই সভ্যসমাজের অনুরোধেই এ প্রকার অভিনয়কে উত্তম বলিতে পারি না।'[১৪৬ক]

১৪৫ 'গিরিশচন্দ্র'— কুমুদবন্ধু সেন— পৃ ১০৬

১৪৫ক "The Bengali Stage— Its past, present and future— Interview with Bengali Irving"— The Statesman : 25. 5. 1913.

১৪৬ সর্বপ্রথম এই পাঁচজন অভিনেত্রী গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয় করেন : কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, রাজুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী ('গিরিশচন্দ্র'— অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ১৮২)

১৪৬ক 'ভারত সংস্কারক'— ২রা অক্টোবর ১৮৭৪

রক্ষণশীল বাঙালীসমাজ অভিনেত্রী-প্রবর্তনে ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রতিবাদের ঝড় বহিল। 'থিয়েটর ও কুচরিত্র নারী' এই শিরোনামে 'সুলভ সমাচার' উপদেশ দিলেন—

'পাঠকদিগের প্রতি আমাদের এই নিবেদন তাঁহারা যেন যে সমস্ত থিয়েটরে স্ত্রী অভিনেতা আছে সেখানে না গমন করেন, গেলে পরে ভাল মন লইয়া ফিরিয়া আসা তাঁহাদিগের পক্ষে কঠিন হইবে।'[১৪৬খ]

'সাধারণী' আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন কয়েক বৎসর পরে—

'কুক্ষণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গের রঙ্গভূমিতে বারাঙ্গনা প্রবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন ; অধঃপতিত বঙ্গসমাজে অতি সন্তর্পণে ইজ্জত রাখিতে হয়— এ সমাজে দুঃশীলা মহিলাগণের সহিত একত্র হইয়া অভিনয়কার্য সম্পাদন করা অসাধ্য। এই বিড়ম্বনায় গিরীশ, কেদার, অর্ধেন্দু, মতি, নগেন্দ্র, যোগেন্দ্র সকলে মাটী হইয়া গেলেন।'[১৪৬গ]

কেহ কেহ আবার ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া অভিনেতৃকুলকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন—

'নির্বাহ করিয়া মাররে লক্ষ্মণ
চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও তাহারে॥

দীর্ঘকাল হইল বঙ্গদেশে নাট্যশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু আজি আমরা জানিতে চাই একালমধ্যে বঙ্গভূমি উহা দ্বারা কি উন্নতি লাভ করিল? সমাজ-সংস্কারের ও দেশের হিতসাধনের ছলনায় নীচকুলসম্ভবা, নিকৃষ্ট পশুপ্রকৃতি বারবণিতার সহযোগে বঙ্গের রঙ্গভূমিকে কলুষিত আমোদ-প্রমোদ ও ঘোরতর অসভ্যতা প্রকাশের স্থান করিয়া, অনন্ত কুহকজাল বিস্তারে যাহারা দরিদ্র বঙ্গের নিকট হইতে প্রতি সপ্তাহে রাশি রাশি অর্থশোষণ করিতেছে, আজি আমরা সেই নীচমনা যুবকদিগের নিকট জানিতে চাই তাহারা হতভাগ্য বঙ্গদেশের জন্য কি করিয়াছে?'[১৪৭]

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে কেন যে তাঁহারা অভিনেত্রী লইতে বাধ্য হইলেন তাহার কারণ অমৃতলাল একস্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

১৪৬খ 'সুলভ সমাচার'—১০ কার্তিক ১২৮২

১৪৬গ 'সাধারণী'— ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬

১৪৭ বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত 'বঙ্গীয় নাট্যসমাজ' (১২৯০) পৃ ১

'...যাঁরা এতদিন মেয়ে সেজে খুব সুখ্যাতি নিয়ে আসছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই বয়স বেড়ে উঠল, সাজলে মানায় না, সাজতেও আর তাঁরা চান না; বাইরের ছোকরা দেখতেও ভাল, অভিনয়ও মন্দ করেনা, এমন কয়েকজন যোগাড় করা গেছল বটে, কিন্তু দায়িত্ববোধ বলে জিনিষটার কোন ভাবই প্রায় তাদের মধ্যে দেখা যেত না...'[১৪৮]

সেপ্টেম্বর মাসে অভিনেত্রী লইয়া 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকের অভিনয় করিয়া তাঁহারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটক অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই নাটক সম্পর্কে কথা বলিবার জন্য অমৃতলাল জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই সময়ে তরুণ অমৃতলালের উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে অপূর্ব প্রতিভার আলোক দেখিয়াছিলেন—

'পুরুবিক্রম প্রকাশিত হওয়ার পর, একদিন Great National Theatre-এর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা এই নাটকখানির অভিনয় করিবার জন্য, আমার অনুমতি লইতে আসিয়াছিলেন। তখন তরুণ অমৃতলাল সামান্য একজন অভিনেতা মাত্র, কিন্তু তখনই তাঁহার উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে আমি এক অপূর্ব প্রতিভার আলোক দেখিতে পাইয়াছিলাম।'[১৪৯]

এ সম্পর্কে অমৃতলালের স্মৃতি নিম্নরূপ—

'...যেই সংবাদ পেলাম যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'পুরুবিক্রম' নাম দিয়ে একখানি নাটক লিখেছেন, অমনি নগেনেতে আমাতে ছুটে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে সবিনয়ে অভিনয়ের অনুমতি এনেছি।... তখন অভিনয়স্বত্ব কপিরাইট আইনের ভিতরে আসেনি, কিন্তু তখনকার আমাদের মত দুষ্ট নটরাও শিষ্টতা বর্জন করত না।'[১৫০]

৩রা অক্টোবর (১৮৭৪) 'পুরুবিক্রম' অভিনীত হয়। ১৪ই ও ২১এ নভেম্বর 'আনন্দ-কানন বা মদনের দিগ্বিজয়' অভিনীত হয়। অমৃতলাল

১৪৮ 'ভুবনমোহন নিয়োগী'— মাসিক বসুমতী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪। অমৃতলালের 'তিল-তর্পণ' নাটকেও ইহাদের উল্লেখ আছে: 'গুঁপো রাণী বার করতে অডিয়েন্সের সামনে লজ্জা হয় না?'

১৪৯ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'— পৃ ১৪২

১৫০ 'ভুবনমোহন নিয়োগী'— মাসিক বসুমতী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় দেখেন। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' তিনি গ্রেট ন্যাশনালের 'স্টেজ সংক্রান্ত' ব্যক্তিদের 'মহারহস্যময় মুখের ভাব'-এর উল্লেখ করিয়াছেন (দ্রঃ চতুর্থ পত্র)।

নারায়ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ২রা ডিসেম্বর অমৃতলালের সাহায্যরজনী উপলক্ষে হরলাল রায়ের 'শত্রু-সংহার' নাটকের অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ২৬এ নভেম্বরের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও শেষ পর্যন্ত অভিনয় হয় নাই।[১৫১] পুনরায় আত্মকলহে দল ভাঙিল। থিয়েটারের ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগীর মনোমালিন্য হয় এবং

'নগেনবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন বর্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান।'[১৫২]

এই দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অমৃতলাল চুঁচুড়ায় গিয়া কয়েকটি নাটকের অভিনয় করেন। এইবার দলের নাম হইল 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী'। ২৪ ও ২৬এ ডিসেম্বর 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনয়ের পর তাঁহারা ২৮এ ডিসেম্বর বৃটিশ চন্দননগরের উমাচরণ সিংহের বাড়ীতে 'জামাই বারিক' নাটকের এবং ১৮৭৫ এর ৯ই জানুয়ারী 'লুইস থিয়েটার রয়্যালে' 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র অভিনয় করেন। তারপর হাওড়া রেলওয়ে স্টেজে ১৬ই জানুয়ারী 'সতী কি কলঙ্কিনী' এবং ৩০এ জানুয়ারী 'আনন্দ কানন' ও 'ভারতে যবন' নাটকের অভিনয় করেন। ইহার পর তাঁহারা বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত মিলিত হন। অমৃতলাল লিখিয়াছেন:

'এক সময়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতে গ্রন্থকার ও তাঁহার সঙ্গে আর কতকগুলি সুদক্ষ অভিনেতা আসিয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন।'[১৫৩]

ইঁহাদের প্রথম সম্মিলিত অভিনয় হয় ৬ই ফেব্রুয়ারী, 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকের অভিনয়ে। ফেব্রুয়ারী মাসের ৪, ৫, ৬ এই তিন তারিখেই তাঁহারা 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, এই অভিনয় হইবে "With the united strength of both the Great National Opera and Bengal Theatre Companies"।

বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত অমৃতলাল সংশ্লিষ্ট রহিলেন আগস্ট মাস পর্যন্ত।

১৫১ 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১৬৪

১৫২ 'গিরিশচন্দ্র'— অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় পৃ ১৮৩

১৫৩ 'অমৃত-মদিরা' পৃ ২৭৮

এই সময়ের মধ্যে বেঙ্গল ও অপেরা কোম্পানী মিলিয়া এই কয়টি নাটকের অভিনয় করিলেন : 'অপূর্ব কারাবাস' (২০.২.১৮৭৫), 'ভীমসিংহ' (২৭.২.১৮৭৫) এবং 'মেঘনাদ-বধ' (৬ ও ১৩.৩.১৮৭৫)। 'মেঘনাদ-বধে'র পর হইতে বেঙ্গল থিয়েটার আর কখনও 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী'র সহিত তাঁহাদের সম্মিলনের কথা বিজ্ঞাপিত করেন নাই। ২৫এ মার্চ 'দুর্গেশনন্দিনী' ও ২২এ মে 'গুইকোয়ার' নাটকের অভিনয়-বিজ্ঞাপনে তাঁহারা 'বিশেষ রজনী' ('Special Night') এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। তারপর প্রায় তিনমাস বেঙ্গলে অভিনয় বন্ধ রহিল।

আগস্ট মাসে পুরাতন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতে ধর্মদাস সুরের দল আসিয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন। তাঁহারা নাম লইলেন 'নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশন্যাল) থিয়েটার'। এই পরিবর্তনের ফলে মহেন্দ্রলাল বসু হইলেন পুরাতন গ্রেট ন্যাশনালের অধ্যক্ষ। তাঁহারাও নূতন নাম লইলেন— 'দি ইণ্ডিয়ান (লেট গ্রেট) ন্যাশনাল থিয়েটার'। ১৪ই আগস্ট দুই থিয়েটারেই উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকের অভিনয় হয়। বেঙ্গলে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালে 'শরৎ-সরোজিনী'। 'শরৎ-সরোজিনী'র পর যখন 'নীলদর্পণে'র মহলা হইতেছিল তখন অমৃতলাল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালে যোগ দিলেন। ২১ এ আগস্ট অভিনয় হইল— অমৃতলাল অবতীর্ণ হইলেন বিন্দুমাধবের ভূমিকায়। ইহার পর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালে একে একে 'অপূর্ব সতী' (২৩.৮) 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'ভারতসঙ্গীত' (২৮.৮) এবং 'ডাক্তারবাবু' (৪.৯) অভিনীত হইল। কিন্তু থিয়েটার ভালভাবে চলিল না। ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা নাটক না করিয়া 'রংতামাসা ও নৃত্য' উপস্থিত করিলেন। অধ্যক্ষ মহেন্দ্রলাল বসু দর্শক-আকর্ষণের জন্য চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দিলেন—

"Saturday, the 11th September, 1875

Burlesque!

This is the first attempt to produce a Burlesque on the Native Stage in India.

The above to conclude with a short Pantomime

when

Apsaras, Demons, Horse, Asses, Bull &c &c

Will appear on the Stage.

... ...

The whole stage will be full of Fairies" [১৫৩ক]

কিন্তু বিজ্ঞাপনের এই জৌলুষ সত্ত্বেও আশানুরূপ দর্শক-সমাগম হইল না। এইভাবে ১৮ই সেপ্টেম্বর 'পুরুবিক্রম' অভিনীত হইল এবং ২৫এ সেপ্টেম্বর অভিনীত হইল 'কনকপদ্ম'। 'কনকপদ্মে' অমৃতলাল দুষ্মন্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। তারপর কিছুদিনের মত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল বন্ধ হইয়া গেল। ৬ই নভেম্বর 'ইংলিশম্যানে' "Grand Opening Night" ঘোষণা করিয়া তাঁহারা প্রায় দেড় মাস পরে হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহার' অভিনয় করিলেন।

আগস্ট হইতে নভেম্বর, এই চারি মাস থিয়েটার চালাইয়া ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালের লেসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এমন কি থিয়েটারের ভাড়া পর্যন্ত দিতে অসমর্থ হন। ভুবনমোহন নিয়োগী বাধ্য হইয়া এইবার থিয়েটার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন।[১৫৪]

১২

থিয়েটারের নাম পুনরায় গ্রেট ন্যাশনাল হইল। এইবার গ্রেট ন্যাশনালের ডাইরেক্টর হইলেন উপেন্দ্রনাথ দাস এবং অমৃতলাল হইলেন থিয়েটারের ম্যানেজার। উপেন্দ্রনাথেব সহিত অমৃতলালের পূর্বপরিচয় ছিল। কাশীতে হোমিওপ্যাথি চর্চার সময়েই তাঁহার সহিত অমৃতলালের পরিচয়। উপেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অমৃতলাল বলিয়াছেন—'নানা কারণে তিনি তখন তাঁহার পিতা শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া লোকনাথবাবুর বাসায় আসিলেন।'[১৫৫]

১৫৩ক The Indian Daily News : 11. 9. 1875. এই জাতীয় অভিনয় এবং অভিনয়-বিজ্ঞাপনের প্রতি অমৃতলালের চরম কটাক্ষ দেখা যায় 'তিল-তর্পণ' (১৮৮১) নাটকে :

'Zoological show on the stage.
Singing, Dancing, Jumping
Throughout
... ...
To conclude with nothing.'

১৫৪ 'গিরিশচন্দ্র'— অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় পৃ ১৮৫

১৫৫ 'পুরাতন প্রসঙ্গ,' দ্বিতীয় পর্যায় পৃ ৮০

থিয়েটার পরিচালনভার লইয়াই ইঁহারা ১৮৭৫ এর ৭ই ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের 'চতুর্থ বর্ষীয়' উৎসব করিলেন। এ বিষয়ে 'সাধারণী'র 'সংবাদ' এই—

'গত ৭ই ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরের চতুর্থ বর্ষীয় সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ...নাটকের উপকারিতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা হয়। তৎপরে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামে প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয়টী নাকি বড় সুন্দর হইয়াছিল। সর্বশেষে 'গাও ভারতেরই জয়, গাও ভারতেরই জয়' এই সঙ্গীতটী সুমধুর স্বরে গাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অস্থির কলিকাতার বালকগণ নাকি অনবরত রঙ্গভূমিমধ্যে ঢিল ছুড়িয়াছিল।'[১৫৬]

তখন অমৃতলালের বাইশ বৎসর বয়স। রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াই তিনি নাটক রচনায় মন দিলেন। এই সময়ে বরোদার রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া বরোদারাজ মল্‌হার রাও সিংহাসনচ্যুত ও নির্বাসিত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যখন মল্‌হার রাওয়ের বিচার চলিতেছিল তখন হইতেই দেশে তুমুল আন্দোলন হয়। 'অমৃতবাজার', 'সাধারণী' প্রভৃতি জাতীয় পত্রিকায় স্বদেশী মনোভাব তীব্রভাষায় ধ্বনিত হইতেছিল। অমৃতলাল সমসাময়িক পত্রপত্রিকা হইতে নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এবং কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করিয়া 'হীরকচূর্ণ নাটক' (১.৬.১৮৭৫) রচনা করিলেন। এই নাটকে মল্‌হার রাওকে সমর্থন করিয়া তিনি তাঁহার স্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ প্রথম সংস্করণে এই কারণে তিনি নাটকটিতে নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া লিখিয়াছিলেন : "BY AN ACTOR"। নামপত্রে হেমচন্দ্রের কবিতার দুই পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া অমৃতলাল ইংরেজশাসনের সেই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে যেন তাঁহার তৎকালীন ভীত মনোভাবটিকেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।*

নাটকটি তিনি একরূপ মুখে মুখেই রচনা করেন। এই সময়ে তাঁহার 'গণেশকর্ম' করিয়াছিলেন রাধামাধব কর, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ও রাধাগোবিন্দ

১৫৬ 'সাধারণী'— ২৭এ অগ্রহায়ণ ১২৮২

* 'ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার।'

কর (পরবর্তীকালে ডাঃ আর. জি. কর)।[১৫৭] এইরূপ মুখে মুখে নাটক রচনা করিবার অভ্যাস গিরিশচন্দ্রেরও ছিল একথা অমৃতলাল বলিয়াছিলেন 'গিরিশচন্দ্র'-প্রণেতা অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে।[১৫৮] গিরিশচন্দ্রের এই ধরণের অনেক রচনার লিপিকর অমৃতলালকেও হইতে হইয়াছিল।*

১৮৭৫ এর ২৫এ ডিসেম্বর 'হীরকচূর্ণ' অভিনীত হয়। অমৃতলাল অবতীর্ণ হন অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ স্কোবলের ভূমিকায়। মল্‌হার রাওয়ের ভূমিকাটি ছিল তাঁহার বাল্যসখা অর্ধেন্দুশেখরের।

গ্রেট ন্যাশনালেই অমৃতলালের প্রথম প্রহসন 'চোরের উপর বাটপাড়ি' অভিনীত হয়। অমৃতলাল এই প্রহসনে কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

'হীরকচূর্ণ' অভিনীত হওয়ার পর অমৃতলালের অধ্যক্ষতায় গ্রেট ন্যাশনালে একে একে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (৩১এ ডিসেম্বর), 'শরৎ-সরোজিনী' (২রা জানুয়ারী), 'প্রকৃত বন্ধু' (৮ই জানুয়ারী), 'সরোজিনী' (১৫ই ও ২২এ জানুয়ারী) প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। অমৃতলাল 'সরোজিনী' নাটকে বিজয়ের ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হন।** ৫ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হইবার পর ১৯এ ফেব্রুয়ারী পুনরায় 'সরোজিনী' অভিনীত হয়। ইহার সহিত 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। এই প্রহসনের একটি ইতিহাস আছে। এই প্রহসনের জন্য অমৃতলাল প্রভৃতিকে রাজরোষে পড়িতে হইয়াছিল।

সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েল্‌স রূপে কলিকাতায় আগমন করিলে ১৮৭৬ এর জানুয়ারী মাসে হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুরে তাঁহার নিজের বাড়িতে যুবরাজকে আহ্বান করেন। মুখোপাধ্যায়-গৃহিনী ও অন্যান্য মহিলারা তাঁহাকে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি দিয়া বরণ করিলেন। এই

১৫৭ 'সাধু লেখে যোগী লেখে মুখে বলে কবি।'— 'অমৃত-মদিরা' : পৃ ২৩৭

১৫৮ 'গিরিশচন্দ্র' : অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ১০৬

* গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের উল্লেখ করিয়া অমৃতলাল একবার বলিয়াছিলেন— 'প্রথম যা লেখা হয়, তার অর্ধেকের বেশীটা আমারই হাতের নকল করা ছিল।' (অমৃতবাবুর বক্তৃতা : 'রঙ্গভূমি' মাঘ ১৩০৭)

** মন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন—'সরোজিনী'ও মহাসমারোহে ন্যাসানাল থিয়েটারে উপর্যুপরি অভিনীত হইল এবং দর্শকগণের নিকট প্রভূত প্রশংসা লাভ করিল। অমৃতলাল বিজয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয়চাতুর্যে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।' ('জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'— পৃ ৫২)

ঘটনায় কলিকাতার বাঙালী সমাজ অতিশয় ক্ষুব্ধ হন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাজীমাৎ' কবিতায় 'মুখুজ্যের পো'কে যথেষ্ট বিদ্রূপ করেন। অমৃতলাল প্রভৃতিও তাঁহাদের অসন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্য 'জগদানন্দ' নামটিকে বিকৃত করিয়া 'গজদানন্দ' প্রহসনটি রচনা করিয়া অভিনয় করেন।

২৩এ ফেব্রুয়ারী অমৃতলালের 'সাহায্য-রজনী' ঘোষণা করিয়া 'সতী কি কলঙ্কিনী'র সহিত 'গজদানন্দ' দ্বিতীয়বার অভিনীত হইল। একজন 'রাজভক্ত প্রজাকে' ব্যঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেয়। অমৃতলাল প্রভৃতি ইহাতেও না দমিয়া তিন দিন পরেই (২৬এ ফেব্রুয়ারী) প্রহসনটির নাম বদলাইয়া 'হনুমান-চরিত্র' নামে অভিনয় করেন। পুলিশ এই অভিনয়ও বন্ধ করিয়া দেয়। বারবার পুলিশের এইরূপ উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া তাঁহারা ১লা মার্চ 'Police of Pig and Sheep' নামে একটি প্রহসন রচনা করিয়া 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র সহিত অভিনয় করেন। তখন পুলিশ কমিশনার ছিলেন স্টুয়ার্ট হগ্ এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন 'ল্যাম্ব্' সাহেব। এই প্রহসনে 'হগ্' হইলেন 'পিগ' এবং 'ল্যাম্ব্' হইলেন 'শিপ'! সেই রাত্রে পুলিশ রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিল এবং তাহারা 'Police of Pig and Sheep'-এরও অভিনয় বন্ধ করিয়া দিল।

> "'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' অভিনয়ের সময় ইহার প্রতিশোধ লওয়া হইল। ম্যানেজার অমৃত বসু মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেটবেশে যখন সুরেন্দ্রের সহোদরা বিরাজমোহিনীকে প্রলোভিত করিবার অভিপ্রায়ে বলেন, 'সুন্দরি, হামার কাছে এস। ডর কি? হামি ত tiger না আছে, bear না আছে।' বলিতে বলিতে এও বলেন, 'হামি ত পিগ্ না আছে, সীপ না আছে।'" ১৫৯

পুলিশেরও পক্ষ হইতে ইহার প্রতিশোধ লইতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। ৪ঠা মার্চ যখন 'সতী কি কলঙ্কিনী'র অভিনয় চলিতেছিল তখন পুলিশ থিয়েটারে আসিয়া পূর্ব-অভিনীত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক 'অশ্লীল' এই অজুহাতে অধ্যক্ষ অমৃতলাল, পরিচালক উপেন্দ্রনাথ, স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন, এবং মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), রামতারণ সান্যাল,

১৫৯ 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (২য় খণ্ড)— হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত— পৃ ৮৪

শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দাস এবং সহকারী অধ্যক্ষ বঙ্কুবিহারী দাস—এই দশজনকে গ্রেপ্তার করে।[১৬০]

৬ই মার্চ ম্যাজিস্ট্রেট ডিকেন্সের এজলাসে উক্ত দশজন আসামীর বিচার আরম্ভ হয়। ৮ই মার্চ বিচারে অমৃতলাল ও উপেন্দ্রনাথের একমাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।[১৬১] অন্য সকলে মুক্তিলাভ করেন। এই বিচার সম্পর্কে 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকা ১০ই মার্চ মন্তব্য করেন—'যেরূপ বিচার হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, দোষ প্রমাণ হউক না হউক, দণ্ড দেওয়াই উদ্দেশ্য।'

সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে পরদিন (৯ই মার্চ) হাইকোর্টে আপীল হওয়ায় বিচারপতি ফিয়ার ও মার্ক্‌বি-র এজলাসে শুনানী হইল। 'সাধারণী' পত্রিকা হইতে এই এজলাসের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়—

'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের অশ্লীলতা অভিনয় করার মোকদ্দামার মোশন বিগত বৃহস্পতিবার জজ ফিয়র ও মার্কবির কাছে শুনানী হইয়াছিল। হাইকোর্ট লোকে লোকারণ্য। যুবক ও মধ্যবিত্তের ভাগই অধিক,… কিন্তু হলহলা হয় নাই। সকলে নিঃস্তব্ধে কান পাতিয়া কথাগুলি শুনিতে-ছিল। বলিদানের পূর্বে তান্ত্রিক ভবনেও সেরূপ তুষ্ণীম্ভাব কখনও বিরাজ করে না।'[১৬২]

২০এ মার্চ হাইকোর্টের বিচারে প্রমাণিত হইল যে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' অশ্লীল নয়। অমৃতলাল ও উপেন্দ্রনাথ মুক্তি পাইলেন। বিখ্যাত এটর্ণি গণেশচন্দ্র চন্দ্র আসামী পক্ষের মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন।

১৬০ 'রূপ ও রঙ্গ' ৮ই কার্তিক ১৩৩১

১৬১ 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১৭৭। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একবার এই দণ্ড 'বিনাশ্রম' ('রূপ ও রঙ্গ': ৮ই কার্তিক ১৩৩১), আর একবার 'সশ্রম' ('ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' ২য় খণ্ড পৃ ৮৬) বলিয়া উল্লেখ করেন। আবার 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকা (১০ই মার্চ, ১৮৭৬) এই দণ্ড 'সামান্য পরিশ্রমের সহিত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১৬২ 'সাধারণী': ৭ই চৈত্র ১২৮২

* অনেকদিন পরে (মে, ১৯০৭) কলিকাতা পুলিশ আর একবার অমৃতলালকে অভিনয় বন্ধের নোটিশ দেয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জের তখনও মেটে নাই। 'চন্দ্রশেখর' নাটকে ইংরাজ-নিন্দা রহিয়াছে ইহাই ছিল অভিযোগ। নাট্যকার এবং স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার রূপে অমৃতলালকে গিয়া পুলিশ কমিশনারকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে 'চন্দ্রশেখরে' ইংরাজ-নিন্দা নাই। (দ্রঃ 'পুরাতন পঞ্জিকা'—মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৩১)

'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের মোকর্দমার পর হইতে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের ধ্বংস আরম্ভ হইল। মামলা-মোকর্দমা, অমিতব্যয় প্রভৃতিতে ভুবনমোহন সর্বস্বান্ত হইতে বসিলেন। এইভাবেই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত থিয়েটার চলিল। মোকর্দমার সময় থিয়েটার বন্ধ ছিল না। ১২ই ও ১৮ই মার্চ যথাক্রমে 'সরোজিনী' ও 'আনন্দকানন' অভিনীত হইয়াছিল। রায় বাহির হওয়ার পর এপ্রিল মাসে (১লা ও ৮ই) দুইটি নাটক— 'পদ্মিনী' ও 'ভীমসিংহ' অভিনীত হইয়া নভেম্বর মাস পর্যন্ত থিয়েটার বন্ধ রহিল। তারপর 'সতী কি কলঙ্কিনী' (৪ঠা নভেম্বর), 'সরোজিনী' (১৮ই নভেম্বর), 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (২৫এ নভেম্বর) এবং 'পারিজাত-হরণ' (২রা ডিসেম্বর) অভিনীত হইয়াছিল।

এই সময় উপেন্দ্রনাথ দাস থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন।[১৬৩] অমৃতলালের ইচ্ছা ছিল তিনিও উপেন্দ্রনাথের সহিত বিলাত যাইবেন। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের নিষেধে শেষ পর্যন্ত প্রতিনিবৃত্ত হন।

রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষতা করিতে গিয়া অমৃতলালকে অধ্যক্ষরূপে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইত। ২৮এ জানুয়ারী ১৮৭৭ 'সাধারণী' পত্রিকা একটি ঘটনার উল্লেখ করেন—

'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার।

বিগত শনিবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'পারিজাত-হরণ বা দেবদুর্গতি' নাট্যাভিনয় হইয়া গিয়াছে। নাট্যাভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।··· কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্ত্রীলোকদিগের অভিনয়কালে অনেক লম্পট ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগকে নানাবিধ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগে দর্শকবৃন্দকে মহাব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।··· গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা খুব সতর্ক হইবেন, ভবিষ্যতে যেন, এরূপ নরাধমেরা থিয়েটারগৃহে প্রবেশ করিতে না পায়।'

১৬৩ বিলাত হইতে ফিরিয়া উপেন্দ্রনাথ আবার এক সময়ে থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। এ বিষয়ে অনেকদিন পরে 'অনুসন্ধান' (১৫ই মাঘ, ১২৯৫) লিখিয়াছিলেন—
"নিউ ন্যাশন্যাল থিয়েটার। বীণা রঙ্গমঞ্চে উক্ত কোম্পানীর দ্বারা আজকাল 'দাদা ও আমি', 'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইতেছে। বিলাত প্রত্যাগত খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উক্ত থিয়েটারটি পরিচালিত।"

থিয়েটার ভাল চলিতেছিল না; বিলাতযাত্রার স্বপ্নও ভাঙিয়া গেল! ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুলিশে চাকরী লইয়া অমৃতলাল পোর্ট ব্লেয়ার চলিয়া গেলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বহুদিন পরে একবার লেখেন—

'দীনের এই পঞ্চান্ন বৎসর ব্যাপী নাট্যজীবনের স্রোত একবার এক বৎসরের জন্য অন্যপথগামী হয়; সেটা যৌবনস্বপ্নের একটা রোমান্স। ৭৭ অব্দের এপ্রেল মাসে আমি পুলিসে একটা কর্ম নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ার যাই। ৭৮এর মার্চে ফিরে আসি।'[১৬৪]

পোর্ট ব্লেয়ার যাত্রার কারণ সম্পর্কে অমৃতলাল বিশেষ কিছুই বলেন নাই। শুধু 'যৌবন স্বপ্নের একটা রোমান্স' বলিয়া নীরব হইয়াছেন। 'কালাপানি' পার হইবার পিছনে ইহা অপেক্ষা গভীরতর সত্য নিহিত আছে বলিয়াই মনে হয়। তিনি উপেন্দ্রনাথ দাসের সহিত বিলাতযাত্রার বাসনা প্রকাশ করিলে আত্মীয়েরা তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। এই নিষেধের কারণ দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়। এক, থিয়েটার করার জন্য তাঁহাকে ঘরে-পরে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত।[১৬৫] হয়তো এই একই কারণে পিতৃব্য হরিশচন্দ্র বিলাতযাত্রার ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন নাই; দুই, তাঁহাদের পরিবার ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল (তাঁহার বিসূচিকা-রোগাক্রান্তা বিধবা মাকে একাদশীর দিন কেহ ঔষধ পর্যন্ত খাইতে দেয় নাই, এ ঘটনা অমৃতলাল 'বালবিধবা' কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন), সমুদ্রযাত্রায় হয়তো সেই কারণেই কাহারও সম্মতি ছিল না। মনঃক্ষুণ্ণ অমৃতলাল সম্ভবতঃ সকলকে আঘাত দিবার জন্যই 'কালাপানি' পার হইয়া স্বেচ্ছানির্বাসন লইয়াছিলেন পোর্ট ব্লেয়ারে। কেবলমাত্র চাকরীর প্রয়োজনেই তিনি এরূপ করেন নাই। কারণ তাহা হইলে তিনি তাঁহার হোমিও-প্যাথিতেই ফিরিয়া যাইতে পারিতেন বা কলিকাতায় কি ভারতবর্ষের ভিতরেই 'পুলিশের কর্ম' করিতে পারিতেন, আত্মীয়স্বজন ও অষ্টাদশী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সেই সুদূর পোর্ট ব্লেয়ারে যাইতেন না।

১৬৪ 'ভুবনমোহন নিয়োগী'— মাসিক বসুমতী : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

১৬৫ 'অমৃত-মদিরা' কবিতায় লিখিয়াছেন—

'নিজ পরিবার মাঝে বিরক্তি কারণ।
কুটুম্বসমাজে লজ্জা নিন্দার ভাজন।
দেশের দশের পাশে শ্লেষ ব্যঙ্গ হাসি।
সয়ে' গেছে বাল্যসখা তাচ্ছীল্য প্রকাশি।'

অমৃতলালের পোর্ট ব্লেয়ার-প্রবাস সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করিয়াছেন।

অমৃতলালের লেখা হইতে জানিতে পারি যে, তিনি পোর্ট ব্লেয়ারে এক বৎসর ছিলেন* এবং তাঁহার কর্ম ছিল পুলিশে।[১৬৬] 'ভুবনমোহন নিয়োগী' নিবন্ধের একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন— 'আমার ছয়মাস পূর্বে সেথায় যান আমার বন্ধু বিহারীলাল···।[১৬৭]

অমৃতলালের 'যৌবনস্বপ্নের রোমান্স' এক বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। সংসারের আসক্তি এবং থিয়েটারের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রবাসী চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পোর্ট ব্লেয়ার হইতে ফিরিয়া অমৃতলাল দেখিলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ঘন ঘন স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার বদলাইতেছে। থিয়েটারের লিজ হস্তান্তরের পর হস্তান্তর হইতেছে। ধর্মদাস সুর, অবিনাশচন্দ্র কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু, কেদারনাথ চৌধুরী প্রভৃতি কাহারও হাতেই থিয়েটার স্থায়ী হইল না।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে থিয়েটারের লিজ লইলেন গোপীচাঁদ শেঠী এবং ম্যানেজার হইলেন অবিনাশচন্দ্র কর। কিন্তু কোন অভিনয়েই অর্থাগম না হওয়ায় অবিনাশ কর কলিকাতা হইতে দল লইয়া ঢাকায় রওনা হইলেন। এই সময়কার ঘটনা অমৃতলাল একটি স্মৃতিকথামূলক রচনায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্মৃতিচিত্রটি, তাঁহার নিজের কথায়, 'সেকালের থিয়েট্রিক্যাল অ্যালবাম থেকে খুলে নেওয়া একখানি ম্লানপ্রায় চিত্রপট'—

> '১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ; আটাশ উনত্রিশ বৎসরের বেশী দলের কারুরই বয়স ছিল না। স্টার থিয়েটার তখনও হয় নি, পুরানো ন্যাশনাল নামটা টানা-টানিতে বজায় আছে। ···কলকাতার নাট্যশালার স্রোতেও তখন প্রায় সার-ভাঁটা।···

* কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ও 'ইংলিশম্যানে' তাঁহার যে জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে পোর্ট ব্লেয়ারে তাঁহার অবস্থান কাল ভ্রমক্রমে তিন বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

১৬৬ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই চাকরী ডাক্তারি মনে করিয়াছিলেন '......he went to Port Blair on medical service'. (৩. ৭. ১৯২৯)

১৬৭ অথচ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন— 'তিনি বেহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আন্দামান রওনা হন।'— 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (২য় খণ্ড) পৃ ৮৮

হাফ্ প্রাইসেও কলকাতার দর্শকের ভিড় কমে আসছে দেখে অবিনাশ অপেরার সঙ্গে সঙ্গে দু একখানা ছোটখাট নাটক-প্রহসন চালাবে, এই রকম একটা সম্প্রদায় বেছে ঢাকায় চলে গেল ; সেখানে পৌঁছে এমন একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা সে পায়, যাতে মহেন্দ্র বোস, অমৃত মিত্তির, বেলবাবু প্রভৃতি জনকতক ভালো ভালো অ্যাক্টার সঙ্গে করে আমায় ঢাকা যেতে টেলিগ্রাফ করে।

… ঢাকা বর্ধমান ঘুরে সম্প্রদায় উদয় হলেন এসে বাঁকিপুরে, উপলক্ষ দ্বারভাঙ্গার স্বর্গীয় রাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের অভিষেক।…

চার রাত্রির জন্যে এসে প্রায় মাস দেড়েক বাঁকিপুরে কাটানো গিয়েছে। বেথিয়ার রাজবাড়ীতে আমাদের পাঠানোর জন্যে দুর্গাগতি বাবু (পাটনা ডিভিশনের কমিশনারের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট) চিঠি লিখেছেন। সেখানে যেতে হলে পাঁচ ছ'দিন পথে হাতীর পিঠে দোলানি, এক্কার ওপর ঝাঁকানি, আর শাম্পানীর ভেতর শীতে কাঁপুনি ; এ আনন্দভোগের আশা ছেড়ে কি পূজো দেখতে বাড়ী ফেরা যায়!'[১৬৮]

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় অমৃতলালও একবার অধ্যক্ষ হন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন—

'শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও এই বিশৃঙ্খলার সময়েই একবার ম্যানেজার হইয়াছিলেন।'[১৬৯]

ক্রমে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অবস্থা এতই খারাপ হইয়া দাঁড়াইল যে, জমির ভাড়া ও মিউনিসিপ্যাল কর অনেক বাকি পড়িয়া গেল। স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী অভিযুক্ত হইলেন। থিয়েটার নীলাম করিয়া ২৫০০০৲ টাকায় প্রতাপ জহুরী নামক এক ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করা হইল।[১৭০]

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের এই পরিণতির অন্তরালে যে অলিখিত ইতিহাস আছে তাহার সন্ধান যাঁহারা রাখিতেন তাঁহারা কেহ তাহা প্রকাশ করেন নাই। অমৃতলাল ভুবনমোহনের মৃত্যুতে পুরাতন স্মৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহার ইঙ্গিতমাত্র দিয়াছেন—

১৬৮ 'সপ্তমীর রাত' : নাচঘর— ২৩এ আশ্বিন ১৩৩৫।

১৬৯ 'রূপ ও রঙ্গ' : ১৬ই শ্রাবণ ১৩৩২

১৭০ 'The Indian Stage'—H. N. Dasguputa, vol. III, page 18.

'কিন্তু আর এক মজাও দেখলাম, ভুবনমোহন নিয়োগী গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়েও নিজের থিয়েটারে নিজে ঢুকতে পায় না। যে সকল কৌশলে ভুবনের কাছ থেকে থিয়েটার লিজ নিয়ে তা হস্তান্তরের পর হস্তান্তর করে ভুবনকে ভূঁইকম্পে তুলিয়ে উল্টে ফেলে দেওয়া হয় শোনা গেল, তার বর্ণনায় আমি অনেক বিবেচনা করে ধামা চাপা দিলাম।'[১৭১]

থিয়েটারের অনিশ্চিত অবস্থার এইবার অবসান ঘটিল। ডক্টর স্কুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন—

'বাঙ্গালা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের এই অস্থিতাবস্থার অবসান ঘটিল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। তখন স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন প্রতাপচন্দ্র জহরী।'[১৭২]

প্রতাপ জহুরী থিয়েটার ক্রয় করিয়া গিরিশচন্দ্রকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। গিরিশের পুরাতন সঙ্গীবর্গের সহিত অমৃতলালও আসিয়া যোগ দিলেন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়াদি জনচিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হইয়াছিল। এ সম্পর্কে ১৮৮১ সনের ৮ই জানুয়ারী 'দি ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' লেখেন—

'National Theatre—We hear that the entertainments given at this theatre are very popular with the native community...'

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত অমৃতলাল প্রতাপ জহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'হামীর' নাটকে জাল মন্ত্রী (১.১.১৮৮১), গিরিশচন্দ্রের 'মোহিনী প্রতিমা'য় নীলকমল (১৬.৪.১৮৮১) 'আনন্দ রহো'তে মানসিংহ (২১.৫.১৮৮১), 'রাবণ-বধ'এ বিভীষণ (৩০.৭.১৮৮১) এবং 'সীতার বনবাসে' দুর্মুখের ভূমিকায় (১৭.৯.১৮৮১) অবতীর্ণ হন। তারপর অমৃতলালের তৃতীয় নাট্য-রচনা 'তিলতর্পণ' প্রহসন অভিনীত হয় (২১.৯.১৮৮১)। 'তিলতর্পণে' অমৃতলাল বাপ্পারাও-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

'তিলতর্পণ' প্রহসনে অভিনয়ের পর তিনি গিরিশচন্দ্রের 'লক্ষ্মণ-বর্জন'

১৭১ 'মাসিক বসুমতী' : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

১৭২ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' : দ্বিতীয় খণ্ড (৩য় সং), পৃ ২৪৯

নাটকে দুর্বাসার ভূমিকায় (৩১.১২.১৮৮১) অভিনয় করেন। পরবর্তী বৎসর ১৫ই এপ্রিল গিরিশের 'রামের বনবাস' নাটকে কঞ্চুকী ও ভরত, এই দুই ভূমিকায় এবং ২২এ জুলাই 'সীতাহরণ' নাটকে সুগ্রীবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ন্যাশনাল থিয়েটার পরিত্যাগ করেন এবং বেঙ্গল থিয়েটার লিজ লন। পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে গুরমুখ রায়ের স্টার থিয়েটারে যোগ দেন। কিন্তু তাহার পূর্বে তিনি কিভাবে বেঙ্গল থিয়েটার 'দখল' করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দিয়াছেন অভিনেত্রী বিনোদিনী :

'আমারই উদ্যমে বিডন ষ্ট্রীটে জমি লিজ লওয়া হইল, এবং থিয়েটার প্রস্তুতের জন্য গুর্মুখ রায় অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন।...একে একে সব নূতন পুরাতন একটার একট্রেস আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন। ...এই সময় এখনকার ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার অমৃতলাল বসু আসিলেন। ইহার আগে ইনি বেঙ্গল থিয়েটার লিজ লন, তখন বোধ হয় আমরা ৺প্রতাপবাবুর থিয়েটারে। সেই সময় কোন কারণবশতঃ জোড়ামন্দিরের পাশে ঐ সিমলাতে আমাদের একটি বাটী ভাড়া ছিল। সেই বাড়ীতে ভুনীবাবুও (অমৃতলাল) প্রায়ই যাইতেন ও কার্যানুরোধে কয়েকদিন বাসও করিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়দের সহিত বিবাদ থাকায় থিয়েটার হাউস দখল করিতে পারিতেছিলেন না। আমরাই দূর দেশ হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া দিয়া ভুনীবাবুকে দখল দেওয়াইয়া দিই। পরে যখন আমাদের নূতন থিয়েটার হইল, তখন ভুনীবাবু আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দেন।'[১৭৩]

বেঙ্গলে থাকাকালীন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ডিসেম্বর অমৃতলালের 'ডিসমিস' প্রহসনটি অভিনীত হয়। অমৃতলাল কৃষ্ণনাথ বাবুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার 'ব্রজলীলা' (নাট্যরাসক) বেঙ্গল থিয়েটারে সাফল্যের সহিত অভিনীত হইল। ইহার কিছু পরে বিডন স্ট্রীটের জমির উপর 'অকাতরে অর্থব্যয়' করিয়া গুরমুখ রায় নূতন থিয়েটারভবন নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন।* থিয়েটারের নাম হইল স্টার। গুরমুখ রায়ের

---

১৭৩ 'আমার কথা'— বিনোদিনী দাসী, পৃ ৬৯

* তখন থিয়েটারটি ছিল বিডন স্ট্রীটের ৬৮ সংখ্যক ভবনে। পরবর্তীকালে এই জমির উপর দিয়া চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ চলিয়া গিয়াছে। কীর্তি মিত্র নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন এই জমির মালিক।

স্বত্বাধিকারিত্বে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২১ এ জুলাই গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক লইয়া স্টারের উদ্বোধন হয়।* এই নাটকে অমৃতলাল দধীচির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু নূতন থিয়েটার উদ্বোধনের জন্য ব্যস্ত থাকায় তাঁহারা ঠিকমত মহলা দিবার সময় পান নাই। 'স্টেট্‌সম্যান' (24.7.1883) এ সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন—

'The performance of the play, Dakshya Yajna, was eminently satisfactory, especially so as the actors and actresses had not had time enough for a fair rehearsal.'

১১ই আগস্ট গিরিশচন্দ্রের 'ধ্রুব-চরিত্রে' এবং ১৫ই ডিসেম্বর 'নল-দময়ন্তী'তে অমৃতলাল বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলিতে বিদূষকের ভূমিকা বিশিষ্টতাপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রেই এই বিদূষক বা কঞ্চুকী জাতীয় চরিত্রগুলি মূল নাট্যকাহিনীর সহিত অসম্পৃক্ত থাকিয়া ঘটনাবলীকে সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। অমৃতলাল দুইটি নাটকেই বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করায় মনে হয় যে, এই ধরণের গভীর অথচ আপাতলঘু ভূমিকা-অভিনয়ে তাঁহার প্রবণতা এবং যোগ্যতা দুই-ই ছিল।

কিছুদিন পরে গুরমুখ রায় থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করেন। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন যে, তখন অমৃতলাল ও অন্যান্য কয়েকজন কিছু কিছু টাকা নিজেরা দিয়া ও কিছু টাকা ধার করিয়া গুরমুখ রায়ের নিকট হইতে স্টার থিয়েটার ক্রয় করিয়া লইলেন।[১৭৪] অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে থিয়েটার ক্রয় করা হয় গুরমুখ রায়ের মৃত্যুর পর—

'কিছুকাল থিয়েটার করিয়া গুরমুখ রায় ইহলোক ত্যাগ করিলে তাঁহার অভিভাবকগণ থিয়েটার বিক্রয় করিয়া ফেলিল। এই থিয়েটার কিনিলেন

* ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন— গিরিশচন্দ্র অনুগত কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী লইয়া নূতন স্টার থিয়েটারে যোগ দিলে সেই উপলক্ষে 'শ্রীমান্ দিগ্‌গজচন্দ্র বিদ্যানন্দী'র ছয় সর্গ 'নটেন্দ্রলীলা কাব্য' (১২৯১) লেখা হইয়াছিল।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, তৃ. স. পৃ ৩৯৪)

১৭৪ 'বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী' পৃ ৬৭। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লেখেন—
"A sum of Rs. 10,000/-was raised by mortgaging the house to Babu Haridhon Dutta with whom they were on terms of friendship..."
(The Indian Stage, Vol. III, p. 43)

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু, ৺দাসুচরণ নিয়োগী ও ৺অমৃতলাল মিত্র।'[১৭৫]

তাঁহাদের ঋণের অধিকাংশ 'নল-দময়ন্তী'র অভিনয় প্রদর্শনে পরিশোধ হয়।[১৭৬]

এই সময়ে অভিনয়প্রণালীতে নূতনত্বের অবতারণা করায় প্রাচীন অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অনেকেই স্টারে যোগ দেন নাই। পুরাতনদের মধ্যে এক অমৃতলাল ও বিনোদিনী স্টারে রহিয়া গেলেন। এ বিষয়ে অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'প্রবীণা ও নবীনা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এবং অভিনেত্রী বিনোদিনী ব্যতীত প্রাচীন দলের অধিকাংশ অভিনেতা বা অভিনেত্রী যোগ দেন নাই। অর্ধেন্দুবাবু তখন কলিকাতায় ছিলেন। ৺মহেন্দ্রলাল বসু, ৺মতিলাল সুর প্রভৃতি অভিনেতারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন।'[১৭৭]

এই সময়ে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের অনেকগুলি নাটকে অভিনয় করেন। ১৮৮৪র মার্চ মাসে 'কমলে কামিনী' নাটকে তিনি গুরু মহাশয় ও সভাসদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তারপর ১৬ই এপ্রিল তাঁহার 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে' প্রহসনের অভিনয় হয়। প্রথম রাত্রিতে চাটুয্যের ভূমিকায় অমৃতলাল অবতীর্ণ হন।[১৭৭ক] ইহার পর গিরিশচন্দ্রের 'শ্রীবৎস-চিন্তা'য় (৭.৬.১৮৮৪) তিনি বাতুলের ভূমিকায় এবং 'চৈতন্যলীলায়' (২.৮.১৮৮৪) প্রতিবেশীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। ২২এ নভেম্বর তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন 'বিবাহ-বিভ্রাট' অভিনীত হয়। অমৃতলাল বিলাত-ফেরৎ মিঃ সিংএর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে অভিনীত 'প্রভাস

১৭৫ 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'— অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃ ৪৪
ডঃ সুকুমার সেনও লিখিয়াছেন, '১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গুরমুখ রায়ের মৃত্যু হইলে অমৃতলাল বসু ও অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন থিয়েটারটি কিনিয়া লইলেন।'—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (৩য় সং) পৃ ২৪৯

১৭৬ 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (১ম খণ্ড)— হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ ৩৭

১৭৭ 'রঙ্গমঞ্চ' ভাদ্র ১৩১৭, পৃ ৭১। অর্ধেন্দু, মহেন্দ্র, মতিলাল প্রভৃতি পরে গোপাললাল শীলের এমারেল্ডে যোগ দেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'— ডঃ সুকুমার সেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ ২৫০)

১৭৭ক 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (১ম খণ্ড)— হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, পৃ ৩৭

যজ্ঞে' তিনি বসুদেবের এবং ১৯এ সেপ্টেম্বর অভিনীত 'বুদ্ধদেব-চরিতে' শিষ্য ও গণকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ডিসেম্বর 'বেল্লিক-বাজার প্রহসনে' অমৃতলাল ঢু'কড়ি সেনের ভূমিকায় এত সুন্দর অভিনয় করেন যে, এই অভিনয় দেখিয়া গোপাললাল শীল নামক সেকালের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি থিয়েটার করিতে উৎসাহিত হন। ২১এ জুন, ১৮৮৭ 'রূপ-সনাতনে' অমৃতলাল সুবুদ্ধির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।[১৭৭খ] ইতিমধ্যে গোপাললাল শীল স্টার থিয়েটার ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। স্টার সম্প্রদায় শেষবারের মতো (৩১.৭.১৮৮৭) 'বুদ্ধদেব চরিত' ও বেল্লিকবাজার' অভিনয় করিয়া সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

সেই রাত্রে দর্শকেরা সকলেই শোকে ম্রিয়মাণ ছিলেন। অমৃতলাল আসিয়া পাদপ্রদীপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদের মনোভাব দর্শকবৃন্দকে জানাইয়াছিলেন :

"Babu Amrita Lal gracefully acknowledged the patronage that had been accorded to the company during the last four years that they had catered for the public in that pavilion, craved pardons for their shortcomings, and concluded by expressing a hope that their patrons would continue their kindness towards them, should the company resume their performances elsewhere, as they shortly expected to do."[১৭৮]

অমৃতলালের যে অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি পরবর্তীকালে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই শক্তির পরিচয় এইভাবেই রঙ্গালয়ের সংকটমুহূর্তে অনেকবার প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়রজনীর সেই অগ্নিকাণ্ডের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে অমৃতলালের বক্তৃতার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেই বক্তৃতার মত এইবারকার বক্তৃতাও দর্শকবৃন্দ সসম্ভ্রম সহানুভূতিতে শ্রবণ করিয়াছিল :

১৭৭খ —"Here too Mr. Amrita Bose's Subuddhi was superb."—'The Indian Stage' by H.N.Dasgupta (Vol. III p.75)

১৭৮ 'The Indian Mirror' : Tuesday, August 2,1887.

"The sympathetic silence with which the affecting address was received unquestionably proved the popularity of the corps with the play-going public who had mustered strong on the occasion to bid the company a hearty au revoir."[১৭৯]

১৩

গোপাললাল শীল বিডন স্ট্রীটের থিয়েটার ভবন ক্রয় করিলেন বটে, কিন্তু 'স্টার' তাহার 'গুড উইল' দিল না। ফলে তাঁহাকে থিয়েটারের অন্য নাম দিতে হইল। নাম হইল 'এমারেল্ড্'। স্টারের অভিনেতৃসজ্ঘ সরিয়া দাঁড়াইলেন। গোপাললাল ন্যাশনাল থিয়েটারের দল লইয়া থিয়েটার খুলিলেন; পরিচালক ও অধ্যক্ষ হইলেন কেদারনাথ চৌধুরী।[১৮০] প্রায় এক মাস পরে গোপাললাল বিশহাজার টাকা বোনাস ও সাড়ে তিন শত টাকা বেতনে গিরিশচন্দ্রকে স্টার হইতে লইয়া আসিলেন এমারেল্ডের ম্যানেজার করিয়া। গিরিশচন্দ্র সহসা এমারেল্ডে যোগ দেওয়ায় স্টারের স্বত্বাধিকারীরা বেশ অসুবিধায় পড়েন। গিরিশচন্দ্র তখন অধ্যক্ষরূপে স্টারের সহিত চুক্তিবদ্ধ। স্টার-সম্প্রদায়ও তাঁহাকে ছাড়িতে সম্মত ছিলেন না। তিনি তাঁহার বোনাসের টাকা হইতে ষোল হাজার টাকা স্টার-সম্প্রদায়কে দিয়া নূতন রঙ্গালয় নির্মাণের উপদেশ দিলেন।

হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার নির্মিত হইল। অমৃতলাল এবারও অন্যতম স্বত্বাধিকারী রহিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি থিয়েটারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। ১৮৮৮ সনের ২৫এ মে গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটক লইয়া নবনির্মিত স্টারের উদ্বোধন হইল।* অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্র-রচিত একটি 'উদ্বোধনী' কবিতা পাঠ করেন।

১৭৯ 'The Indian Mirror' : Tuesday, August 2, 1887.

১৮০ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর এমারেল্ডের উদ্বোধন হইল। ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত এমারেল্ডের যে সব বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত তাহাতে 'ডিরেক্টর ও ম্যানেজার'রূপে কেদার চৌধুরীর নাম থাকিত। ১৮ই নভেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে সর্বপ্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম পরিচালক ও অধ্যক্ষরূপে বিজ্ঞাপিত হয়।

* নসীরামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অমৃতলাল স্বয়ং।

এই রাত্রির স্মৃতিকথা বিবৃত করিয়াছেন নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত :

'প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে আসিয়া এই আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন···

আমার মনে আছে এই দিন অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে স্বনামখ্যাত নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় ষ্টেজের উপর দর্শন দিলেন। একটি শাদা পাঞ্জাবী তাঁহার গায়ে ছিল। সহস্র সহস্র দর্শকের কৌতূহলোদ্দীপক লোচন তাঁহার উপর নিপতিত হইল। অমৃতবাবু একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন।'[১৮১]

অমৃতলাল এবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে তাঁহার যে অধ্যক্ষতার অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা কাজে লাগাইলেন। দিন দিন স্টারের সুনাম বর্ধিত হইতে লাগিল। ওদিকে এমারেল্ড থিয়েটারের 'ধ্বজাধারীগণ' ক্রমশঃ দুর্বিনীত ও অত্যন্ত অশিষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ১৮৮৮ সনের শেষে গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়কার 'অনুসন্ধান' পত্র হইতে জানা যায় এমারেল্ড থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ কিভাবে দর্শকদের নিগৃহীত করিয়াছিলেন।[১৮২] কিন্তু স্টার থিয়েটার সম্পর্কে 'অনুসন্ধান' লিখিয়াছিলেন—

'আজকাল থিয়েটারের বাজারে ষ্টার থিয়েটারের বড়ই নামডাক। কাগজে কলমে চারিদিকে সুখ্যাতির ছড়াছড়ি, আর সেইজন্যই, ষ্টার থিয়েটারে কোন কিছু অভিনয় হইবে শুনিলেই, লোক আর ধরে না— তিনি উনি সকলেই অভিনয় দেখিতে ছুটেন।'[১৮৩]

অভিনয় পরিচালনা ও নাট্যনির্দেশনায় দুর্লভ ক্ষমতা অমৃতলালের ছিল। গিরিশচন্দ্রও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই স্টারের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি নিজে মহলার ভার না লইয়া অমৃতলালকেই সে দায়িত্ব দিতেন।[১৮৪]

১৮১ 'অমরেন্দ্রনাথ'— উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

১৮২ 'অনুসন্ধান'— ১৫ই শ্রাবণ ১২৯৬

১৮৩ ঐ ১৫ই শ্রাবণ ১২৯৭

১৮৪ 'যাঁদের দেখেছি'— হেমেন্দ্রকুমার রায়, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৮

এমারেল্ড হইতে ফিরিবার পর ১৮৯১ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের নাম স্টারের ম্যানেজাররূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে অমৃতলালের নাম ম্যানেজাররূপে দেখা যায়।

অধ্যক্ষতা করিবার সময় প্রয়োজন বোধে অমৃতলালকে যেমন অভিনয় করিতে হইত তেমনই রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটক-প্রহসন রচনা করিতে হইত। দর্শকদের নিকট 'নাটকের গুণাগুণ' কিরূপে বিচার হইয়া থাকে তাহা তিনি ভালভাবেই জানিতেন।* একবার বলিয়াছিলেন—

'আপনাদের রুচির খোরাক যোগাবার জন্যে গিরিশবাবু, কুঞ্জবাবু, অতুলবাবু, আমি ইত্যাদি আমরা সব গ্রন্থকার হ'য়ে পড়লেম,— টপ্ টপ্ করে নূতন নূতন নাটক হ'তে লাগল। এখনকার যুগের নূতন ধরণের প্রহসনের জন্মও এই সময়ে। আপনাদের আব্দারের রুচির মত বই লিখতে গিয়ে থিয়েটারের ম্যানেজারেরা play-writer হয়ে পড়ল, আর বাহিরের লেখক আসবার পথ রইল না— আসে কিরূপে বলুন, আপনারা যেমন খোঁজেন তেমন দিতে না পারলে আপনারা দেখবেন কেন? প্রহসনের মধ্যে 'বিবাহ-বিভ্রাট' যেদিকে গিয়েছিল, 'বেল্লিকবাজার' সেদিকে গেল না। সুর ফিরে গেল; কাজেই এখন প্রহসন, পঞ্চরং আপনারা যেমনটা চান, তেমনটা করে করতে হয়।'[১৮৫]

স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়া তিনি সর্বপ্রথম নাট্যরূপ দিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২এ সেপ্টেম্বর 'সরলা' নামে নাটকটি স্টারে প্রথম অভিনীত হয়। তারপর অধ্যক্ষতা ও অভিনয়ের অবসরে একে একে তাঁহার এই সকল প্রহসন ও নাটক-নাটিকা রচিত ও অভিনীত হইতে লাগিল: তাজ্জব ব্যাপার (১৮৮৯), তরুবালা (১৮৯০), বিলাপ বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন (১৮৯১), রাজা বাহাদুর (১৮৯১), সম্মতি-সঙ্কট (১৮৯১), কালাপানি (১৮৯২), বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত (১৮৯৩), বাবু (১৮৯৪), একাকার (১৮৯৪), বৌ-মা (১৮৯৭), গ্রাম্য বিভ্রাট (১৮৯৭), হরিশ্চন্দ্র (১৮৯৯), সাবাস আটাশ (১৮৯৯), কৃপণের ধন (১৯০০), আদর্শ বন্ধু (১৯০০), যাদুকরী (১৯০১), বৈজয়ন্ত-বাস (১৯০১), অবতার (১৯০১), নবজীবন (১৯০২), বাহবা বাতিক (১৯০৪) এবং সাবাস

* ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত তাঁহার পত্র দ্রষ্টব্য। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র (৬৭) পত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৮৫ 'রঙ্গভূমি,' মাঘ ১৩০৭

বাঙ্গালী (১৯০৬)। এই সময়ের মধ্যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপন্যাসেরও নাট্যরূপ দিয়াছিলেন— চন্দ্রশেখর (১৮৯৪), রাজসিংহ (১৮৯৬) এবং বিষবৃক্ষ (১৯০১)। সাবাস বাঙ্গালী রচিত ও অভিনীত হইবার পর কয়েক বৎসর অমৃতলাল আর কোন নাটক রচনা করেন নাই। ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার সহকারীরূপে স্টারে যোগ দিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে অমৃতলাল রচনা করিলেন তাঁহার বিখ্যাত 'নাট্যলীলা' খাস-দখল (১৯১২)। মিনার্ভায় নাট্যাচার্যরূপে যোগদানের পর রচনা করিলেন নবযৌবন (১৯১৩)। দীর্ঘকাল পরে ব্যাপিকা-বিদায় (১৯২৬) ও বন্দে মাতনম্ (১৯২৬) রচনা করেন। তাঁহার শেষ নাটক যাজ্ঞসেনী (১৯২৮)।

মাঝে তাঁহার সাহিত্যসাধনা একবার ব্যাহত হয় সাময়িকভাবে দৃষ্টিহীন হইয়া। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত হন। এই অবস্থায় তাঁহার মন নিষ্ক্রিয় ছিল না। অন্ধাবস্থায় তিনি যে সকল কবিতা মুখে মুখে রচনা করিতেন, অনুরাগী সুহৃজ্জন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। 'অমৃত-মদিরা' কাব্যগ্রন্থের অন্তত ষাটটি কবিতা এইভাবে রচিত। তাঁহার চক্ষুরোগের সংবাদে দুঃখিত হইয়া রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে একটি পত্র লেখেন।* সুবিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ডাক্তার স্যাণ্ডার্স অস্ত্রোপচার করিয়া তাঁহাকে দৃষ্টি দান করেন। 'অমৃত-মদিরা'র শেষ কবিতা 'নূতন জীবন'এ কৃতজ্ঞ কবি তাই লিখিয়াছিলেন, 'ধন্য হে ছুরিকা তব স্যাণ্ডার্স সাহেব...'[১৮৬]

* 'Editor's Department.

'The Bengalee' Office,
70, Colootola Street,
Calcutta-6.9.1901

My dear Amrita Babu,

I have read the pieces which you so very kindly sent me. I am prepared to have a talk with you. I am very sorry for your eyes. I trust they will be all right......

Yours affly.,
Surender Nath Banerjee'.

(পত্রটি অপ্রকাশিত)

১৮৬ 'অমৃত-মদিরা' পৃ ২৬৭

১৯১৬ সনে তিনি পুনরায় চক্ষুরোগে আক্রান্ত হন। মেয়ো হাসপাতালে প্রায় আড়াই মাস অবস্থানের পর ডাক্তার মেনার্ড তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুতে 'অস্ত্র চিকিৎসা' করেন ('মানসী ও মর্মবাণী, পৌষ ১৩২৩)।

হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার হইবার পর রঙ্গালয় পরিচালনা ও নাটক রচনা করিয়াও অমৃতলাল অনেক ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনীত উল্লেখযোগ্য ভূমিকাগুলি এই— নসীরাম (নসীরাম), নীলকমল (সরলা), রমেশ (প্রফুল্ল), পূর্ণরাম ভাট (চণ্ড), বেহারী খুড়ো (তরুবালা), মহানন্দ (নরমেধ যজ্ঞ), মিঃ ফিস্ (রাজা বাহাদুর), তিনকড়ি (বাবু), বিশ্বাস, ফস্টর ও চন্দ্রশেখর (চন্দ্রশেখর), বিশ্বামিত্র (হরিশ্চন্দ্র), উড (নীলদর্পণ), শক্তসিংহ (রাণাপ্রতাপ), নিতাই (খাস-দখল), করুণাময় (বলিদান), বসন্তকুমার (নবযৌবন, মিনার্ভা থিয়েটারে), ধৃতরাষ্ট্র (ক্ষত্রবীর), অনঙ্গমোহন (অভিনেত্রীর রূপ) প্রভৃতি।

কোন্ ভূমিকায় অমৃতলাল কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। অমৃতলালের জীবদ্দশায় 'নাচঘর' পত্রিকায় একবার তাঁহার অভিনীত ভূমিকার একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। যে ভূমিকাগুলিতে অমৃতলাল তাঁহার 'শক্তির বিশেষ পরিচয়' দিয়াছেন সেগুলি তাঁহারা চিহ্নিত করেন।[১৮৭]

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছিলেন— 'অমৃতবাবুর নসীরামের ভূমিকায় অভিনয় অদ্যাপি আদর্শরূপে গৃহীত।'*

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রমেশের ভূমিকা সম্পর্কে লিখিয়াছেন— 'অর্ধেন্দুশেখরের চেয়ে অমৃতলালের রমেশ আমার অনেক ভাল— অনেকখানি life-like লেগেছিল— accomplished villainএর রূপ ফুটতো অমৃত-লালের অভিনয়ে এবং তিনি অদ্ভুত প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলতেন।'[১৮৮]

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সময়ে স্টারে অভিনীত 'প্রফুল্ল' নাটকে রমেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। তিনি লিখিয়াছেন—

"রমেশ! শুনে মনে আনন্দই হলো। 'প্রফুল্ল' যখন প্রথম অভিনয় হয়— সেই ১৮৮৯ সালে— এই ষ্টারেই হয়েছিল সেই অভিনয়— তাতে রমেশ

১৮৭ 'নাচঘর': ১৪ই আশ্বিন ১৩৩৩

* 'গিরিশচন্দ্র' পৃ ১৩৯

১৮৮ 'সচিত্র শিশির'—পৌষ-মাঘ, ১৩৩০

করেছিলেন নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। ওঁর পরে আরও বহু লোক 'রমেশ' করেছে, সে সব তেমন গা করিনি, মনে মনে ভাবছিলাম অমৃতলালেরই রমেশের কথা। ভাবতে ভাবতে একটু ভয়ও যে না হচ্ছিল এমন নয়।"[১৮৯]

শুধু অভিনয়নৈপুণ্যই নহে, চরিত্রোপযোগী রূপসজ্জা (make-up) গ্রহণেরও ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। মিনার্ভার রমেশ (অর্ধেন্দুশেখর) ও স্টারের রমেশের (অমৃতলাল) মধ্যে তুলনা করিয়া একজন লিখিয়াছিলেন—

"একটা পেটে-পাড়া কাঁচা চুলের বাবরী চুল এবং লম্বা গোঁফ পরায় অর্ধেন্দু বাবুর চেহারা যেন হাটখোলার মহাজনপটির বাঙ্গাল দালালের মত হইয়াছিল! কিন্তু অমৃতবাবু ষ্টারে যে সাজে 'রমেশ' সাজিয়াছিলেন, তাহা সাজের গুণে অতি সুদৃশ্য হইয়াছিল। তিনি অর্ধেন্দুবাবুর প্রায় সমবয়স্ক, অর্ধেন্দুবাবুর ন্যায় তাঁহারও সমস্ত চুল পাকিয়া গিয়াছে, মুখে বয়সোচিত শিরা ও রেখা দেখা দিয়াছে, গাল তুবড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু দিব্য সিঁথা কাটা, ইংরাজী ফ্যাসানে ঘাড়ছাঁটা একটি কোঁকড়া চুলের আবরণে, কার্তিকদাদার ফ্যাসানের একটি ছোট গোঁফে এবং অধরের নিম্নভাগে ছোট একটু দাড়িতে তাঁহাকে যেন ২৮।২৯ বৎসরের ছোকরা করিয়া তুলিয়াছিল!"[১৯০]

অমৃতলালের অধ্যক্ষতাগুণে স্টারের এরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে থিয়েটারে বহু অভিজাত বিদেশী দর্শকের উৎসুক আবির্ভাব ঘটিত। এই প্রসঙ্গে একটি পত্র উদ্ধৃত করি—

'22, Royd Street,
4th March, 1911

Dear Mr. Amrita Lall,

Ever so many thanks for so kindly arranging for my French friends to come to the theatre. They intend coming to-morrow Sunday. Might I beg of you to

১৮৯ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' : দেশ ৫ই কার্তিক ১৩৬৭

১৯০ 'বঙ্গীয় নাট্যশালা'— ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, পৃ ৫১-৫২। স্টার ও মিনার্ভায় একই রাত্রিতে এই অভিনয় হয়। অভিনয়ের তারিখ ২রা জুন ১৯০৭।

let me know what time would suit best for them to arrive ?

With best regards and many thanks,

Yours very sincerely,

Ernest Kedenburg.'*

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সুঅভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টারে আসিলেন অমৃতলালের সহকারী হইয়া।[১৯১]

অমরেন্দ্রনাথের স্থায় উৎসাহী যুবককে পাইয়া পঞ্চান্ন বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল আশ্বস্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিন মাস পরেই যখন মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীদ্বয় (মহেন্দ্রনাথ মিত্র ও মনোমোহন পাঁড়ে) 'ছয় হাজার টাকা বোনাস দিয়া অমরেন্দ্রনাথ ও কুসুমকুমারীকে স্টার হইতে ভাঙাইয়া তাঁহাদের থিয়েটারে লইয়া আসিলেন',[১৯২] তখন তিনি বেশ বিপন্ন বোধ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে অমৃতলাল চিরকালই দলভাঙানোকে ঘৃণা করিতেন এবং বোনাসের লোভে থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরিতেন না। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

'তিনি বরাবরই দলভাঙ্গানোর বিরুদ্ধে ছিলেন।'[১৯৩]

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অমরেন্দ্রনাথ পুনরায় স্টারে ফিরিয়া আসেন। অমৃতলাল এই যোগ্য সহকারীর উপর সব দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া একপ্রকার অবসর লইলেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

'ষ্টারে অমরেন্দ্রনাথ আসবার পর অমৃতলাল বসু প্রায় নেপথ্যগামী হয়ে রইলেন। তাঁর বই লেখা বন্ধ। কোনো নাটকের অভিনয়ে নামাও বন্ধ করে দিলেন। কর্মাধ্যক্ষতার ভার, বলতে গেলে, সবটুকুই নিলেন অমরেন্দ্রনাথ।'[১৯৪]

প্রায় তিন বৎসর অমরেন্দ্রনাথ স্টারের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিলেন। তাঁহার অশেষ গুণ সত্ত্বেও অসহিষ্ণুতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য স্টার কর্তৃপক্ষের

---

* পত্রটি অপ্রকাশিত।

১৯১ 'অমরেন্দ্রনাথ'— উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ পৃ ৭৮

১৯২ ঐ ঐ পৃ ৭৯

১৯৩ 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—পৃ ১৯০

১৯৪ 'বাংলা রঙ্গমঞ্চ'—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ঃ 'সচিত্র শিশির,' শ্রাবণ ১৩৫৮

সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটিল। স্টারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া তিনি অনাথনাথ দেবের সহায়তায় পুরাতন বেঙ্গল থিয়েটার ভাঙিয়া নূতন থিয়েটারের পত্তন করিলেন। এই থিয়েটারের নাম দেওয়া হইল 'গ্রেট ন্যাশনাল'। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়।

অমৃতলাল প্রভৃতি স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে আর থিয়েটার চালাইবেন না। উপযুক্ত ব্যক্তিকে থিয়েটারবাড়ীটি ভাড়া দিবেন। অমরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন এবং নানা সর্তে থিয়েটার ভাড়া লইয়া স্টারের লেসী হইলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর নবরূপে স্টারের উদ্বোধন হইল। অমৃতলাল পাদপ্রদীপের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,

'বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেবার কাজ নিয়ে যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সকলেই আজ পরলোকগত। থাকবার মধ্যে আছি আমি আর গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র রোগশয্যায়— আমিও আজ বার্ধক্যপীড়িত। আজ এ থিয়েটারের ভার দিতে হলে অমরেন্দ্রনাথ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখছি না।'[১৯৫]

নিজেকে 'বার্ধক্যপীড়িত' বলিয়া প্রচার করিলেও অমরেন্দ্রনাথ অমৃতলালকে ছাড়িলেন না। অভিনয় শিক্ষা দিবার জন্য, নূতন নাটক লিখিবার জন্য, বিশেষ করিয়া ধরিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ নাট্যজগতের মধ্যে অমৃতলালকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার প্রতিটি পত্রেই তিনি অমৃতলালকে সম্মানসূচক "My dear Sir" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। স্টার থিয়েটারের অনেকেই অমরেন্দ্রনাথের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট ছিলেন এবং অমরেন্দ্রনাথ বুঝিতেন এখানে তাঁহার শত্রুর সংখ্যা কম নহে। এই শত্রুপুরীর মধ্যে একমাত্র অমৃতলালকেই তিনি সহায়-সুহৃদরূপে জানিতেন। বেনারস ক্যান্টনমেন্ট হইতে লেখা তাঁহার একটি পত্র এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি। পত্রটি অপ্রকাশিত। কিছু অজ্ঞাত তথ্যের সহিত অমৃত-অমরেন্দ্রের সম্পর্কের আভাস এই পত্র হইতে মিলিবে:

'Wednesday night.

My dear Sir,

You must have received my telegram sent this morn. It

১৯৫ 'The Indian Stage'—H.N. Dasgupta, Vol. IV p. 166.

is needless to state that I count upon you as my only'—' during my absence. I am surrounded by enemies, who are praying day and night for my rapid ruin. If they succeed in taking advantage of your goodness these days, then, I am sure, I am doomed for good.'

অমরেন্দ্রনাথ নিজে নাট্যকার ছিলেন। তিনি মনে করিতেন অমৃতলালের নাট্যরসবোধ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অপেক্ষা বেশী ছিল। পত্রটির পরবর্তী অংশে তিনি লিখিয়াছেন—

'D. L. Roy's farce must be opened on the 17th Kartick next (Saturday). Otherwise we can't arrange any other performance which will pay, specially after Pujah. But I tell you confidentially that unless you give some touches in the book, there is little chance of the success of the same.'

পত্রটির শেষাংশে অমৃতলালের নিকট হইতে একটি একাঙ্ক 'পঞ্চরং' এর প্রত্যাশা। 'But kindly remember, I want from you at least a one-act pantomime. Otherwise my existence will tremble.'[১৯৬]

অমরেন্দ্রনাথ স্টারে যোগ দিবার পর অমৃতলাল অবকাশ পাইলেন একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার। দীর্ঘ দিন পরে তিনি নূতন নাটক 'খাস-দখল' রচনা করিলেন। নিজে অবতীর্ণ হইলেন তরুণ নিতাইয়ের ভূমিকায়। যেমন তাঁহার অভিনয়ের সুখ্যাতি, তেমনই নাটকের জনপ্রিয়তা!

"কথায় কথায় মুদ্রাদোষ—'ইজ্ দি' বলা সহরে বেশ আন্দোলন জাগিয়েছিল। 'খাসদখল' নাটকের অভিনয়ে স্টার থিয়েটার আবার ফিরে পেল তার হারানো গৌরব।"[১৯৭]

---

১৯৬ পত্রটিতে তারিখ নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের যে প্রহসনের উল্লেখ আছে তাহা 'আনন্দ-বিদায়।' অমরেন্দ্রনাথ স্টারের লেসী হন ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পূজার পরে (নভেম্বর মাসে) ; পরবর্তী বৎসর পূজার পর দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ-বিদায়'ই অভিনীত হয় এবং উহাই তাঁহার শেষ প্রহসন। অমরেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রহসনটি ১৭ই কার্তিক মঞ্চস্থ হয় নাই—হইয়াছিল অগ্রহায়ণের শেষে (১৬.১২.১৯১২), পত্রটি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের পূজার কিছু পূর্বে লিখিত বলিয়া মনে হয়।

১৯৭ 'বাংলা রঙ্গমঞ্চ' সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—'সচিত্র শিশির': ভাদ্র ১৩৩৮

'খাস-দখল' অভিনীত হয় ৩০এ মার্চ ১৯১২। কিছুদিন পূর্বে (৮ই ফেব্রুয়ারী) গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। ২৭এ আগস্ট (১১ই ভাদ্র ১৩১৯) গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিভাণ্ডারে সাহায্যকল্পে কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে এক বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন হয়। তাহাতে 'বলিদান' নাটকে অমৃতলাল করুণাময়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে অমৃতলাল-রচিত 'স্মৃতির সম্মান' নামক কবিতাটি অমরেন্দ্রনাথ পাঠ করেন।[১৯৮] অভিনয়ের পর বিভিন্ন নাটক হইতে নির্বাচিত নয়টি সঙ্গীত গীত হয়। তন্মধ্যে অমৃতলাল-রচিত সঙ্গীত কয়েকটি ছিল ('চন্দ্রশেখর', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'যাদুকরী', 'খাসদখল' প্রভৃতি হইতে)।

ইতিমধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যু হয় এবং মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভার ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি অমৃতলালকে "তাঁহার মিনার্ভার নাট্যাচার্য, নাট্যকার ও অভিনেতারূপে আনয়ন করেন। অমৃতবাবুর রচিত 'নবযৌবন' নামক নূতন নাটক মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হয়।"[১৯৯]

অমরেন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ কর্তৃত্বে স্টার তখন ভালই চলিতেছে। অমৃতলাল মিনার্ভার উন্নতিতে মন দিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২০এ ডিসেম্বর 'নবযৌবন' অভিনীত হয়। এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লেখেন—

"অমৃতলাল নেমেছিলেন তরুণ বসন্তকুমারের ভূমিকায় ···। ···'নবযৌবন' বেশ পশার করেছিল— নাচে, গানে, আখ্যানের বৈচিত্র্যে এবং অভিনয়ের গুণে মিনার্ভায় 'নবযৌবন' নবযৌবন এনে দিয়েছিল।"[২০০]

পরবর্তী বৎসর (১৯১৪) ডিসেম্বর মাসে তিনি স্টারে অভিনীত 'ক্ষত্রবীর' নাটকে ধৃতরাষ্ট্র এবং 'অভিনেত্রীর রূপ' নাটকে 'অনঙ্গমোহনের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মৃণালভূষণার মৃত্যু হয়। শোকাহত অমৃতলাল সংসারে বীতরাগ হইয়া সস্ত্রীক কাশীধামে যাত্রা করেন।

কাশীবাসী সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে তাঁহার শরীর ও মনের অসুস্থতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে লিখিয়াছিলেন—

১৯৮ 'নাট্যমন্দির' শ্রাবণ—ভাদ্র ১৩১৯

১৯৯ 'বংশ পরিচয়' (৪র্থ খণ্ড)—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সংকলিত : পৃ ৩৩৯

২০০ 'সচিত্র শিশির', আশ্বিন ১৩৫৮

'সে বোধ করি বারো বৎসর পূর্বের কথা,—তিনি কাশীতে এসে কয়েকমাস কাটান,—শরীর ও মন তেমন স্বচ্ছন্দ ছিল না।'[২০১]

অমরেন্দ্রনাথও এই সময়ে অসুস্থ হইয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে চুনিলাল দেব স্টার থিয়েটার পরিচালনা করিতেন। মনোমোহন পাঁড়ে অধিক বেতন দিয়া চুনিলাল দেবকে এই সময়ে তাঁহার মনোমোহন থিয়েটারে লইয়া আসেন। ফলে অসুস্থতা সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তৎপূর্বে তিনি অমৃতলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্টার থিয়েটারের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিবার জন্য অমৃতলালকে বিশেষ অনুরোধ করেন। অমরেন্দ্রনাথকে বিপন্ন দেখিয়া অমৃতলাল সম্মত হন। স্থির হয়, অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে পত্র লিখিলে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন।[২০২]

কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য যে তিনি অমৃতলালের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 'নাট্যমন্দির'-সম্পাদক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন—

"সেইদিনই অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহার মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। কারণ চুনিবাবুর প্রভাবে অমরেন্দ্রনাথের যে সকল 'হিতৈষী'র স্বার্থহানি হইতেছিল, তাঁহারা প্রত্যেকেই থিয়েটারের এক একটী 'ভূষণ্ডী'।...প্রাচীন নাট্যাচার্য, স্থির গম্ভীর অমৃতলালের কঠোর শাসনাধীনে স্বার্থসাধনের আশা নাই,—ইহা বোধ হয় তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাই রোগগ্রস্ত অমরেন্দ্র-নাথকে প্রলুব্ধ করিয়া আর কাহাকেও আনাইবার অবকাশ না দিয়া তাঁহাকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন।"[২০৩]

এই 'হিতৈষী'দের অমরেন্দ্রনাথ ভালরকমই চিনিতেন।[২০৪] কিন্তু ইহাদের চক্রান্তে তিনি একরূপ বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অভিনয় করিতে

২০১ 'অমৃতাবাদ'—মাসিক বসুমতী : ভাদ্র ১৩৩৬

২০২ 'অমরেন্দ্রনাথ' : উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পৃ ১১২-১৩

২০৩ ঐ —পৃ ১১৩

২০৪ পূর্বে উল্লিখিত অমরেন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য।

গিয়া তাঁহার রক্তবমন আরম্ভ হয় এবং ১৯১৬র ৬ই জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়।

অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে অমৃতলালকে কাশীবাসের সংকল্প ত্যাগ করিতে হয়। অনুরূপা দেবী লিখিয়াছেন—

"অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে কাশীবাস সংকল্প ছাড়িয়া কলিকাতায় ফিরিলেন, যাওয়ার পূর্বদিনে আমাদের সঙ্গে দেখা হইলে বলিলেন—'বিশ্বনাথ তাড়িয়ে দিলেন, দিদি! আবার ওই করতে চল্‌লুম'।"[২০৫]

কয়েকমাস স্টারের অভিনয় বন্ধ রহিল। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন—

'১৯১৬ সালে অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে বাংলা থিয়েটার হয়ে পড়েছিল প্রকৃতপক্ষে মুখপাত্রবিহীন।...অমৃতলাল বসু তখনো অবশ্য বেঁচে, কিন্তু... ঐ সময় সক্রিয়ভাবে কোন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্টও ছিলেন না।'[২০৬]

সেপ্টেম্বর মাস হইতে অমৃতলাল স্টারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেন। পুনরায় তাঁহাকে নাট্যাচার্য করিয়া স্টারে আনা হইল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে কয়েকটি নাটক অভিনীত হইবার পর 'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হয় (১৯১৭)। অমৃতলাল এবার 'চন্দ্রশেখরে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিছুদিন পরে স্টারের স্বত্বাধিকারীর পরিবর্তন হয় এবং অনঙ্গ হালদার নামক জনৈক ব্যক্তি থিয়েটারের লিজ লন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে গোপাললাল শীলের ভাগিনেয় গিরিমোহন মল্লিক থিয়েটারের লেসী হন। গিরিমোহন লিজ লইবার পর ৩রা আগস্ট শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' নাটক লইয়া স্টারের উদ্বোধন হয়। অমৃতলাল নামেন একটি অপ্রধান ভূমিকায়।

শরৎচন্দ্রের সহিত এই সময়েই অমৃতলালের সর্বপ্রথম পরিচয় হয়।[২০৭]

নভেম্বর মাসে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা হইতে স্টারের ম্যানেজার হইয়া চলিয়া আসেন। অমৃতলালও নাট্যজগৎ হইতে একরূপ বিদায় লইলেন। অভিনয় করাও ছাড়িয়া দিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বাল্যবন্ধু অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যু-তিথিতে শুধু একবার অভিনয় করিবেন স্থির হয়। এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহাকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি এই—

২০৫ 'মাসিক বসুমতী' : ভাদ্র ১৩৩৬

২০৬ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'—দেশ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

২০৭ 'সচিত্র শিশির' : পৌষ ১৩৩৮

"26, Pataldanga Street,
Calcutta, September 10, 1919.

কল্যাণবরেষু—

মহাশয় আপনি ৺অর্ধেন্দুবাবুর বাৎসরিক তিথিতে একবার থিয়েটারে নামিবেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আপনার 'খাস-দখল' অনেকবার পড়িয়াছি, কখনও অভিনয় দেখি নাই। আপনার নিজের বই, আপনি অভিনয় করিবেন, দেখিবার বড়ই সাধ হইয়াছে। আমার সাধে বোধ হয় আপনি বাদ সাধিবেন না।

শুভার্থী

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী"*

এই সময় হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রঙ্গালয়ের সহিত তাঁহার আর সংযোগ ছিল না—

'আচার্য অমৃতলাল জীবিত আছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্র বহুকাল পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছেন।'[২০৮]

এই সময়ে অভিনয়কলা ক্রমেই বিশেষত্বহীন হইয়া পড়িতেছিল দেখিয়া হেমেন্দ্রকুমার রায় মন্তব্য করেন—

'অমৃতলাল বৃদ্ধ হয়ে বিশ্রামে নিযুক্ত। ফলে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে আমাদের অভিনয়কলা ক্রমেই বিশেষত্বহীন ও আর্ট আখ্যা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়তে লাগল।'[২০৯]

ইতিমধ্যে মিনার্ভা থিয়েটার আগুনে পুড়িয়া যায়। ১৯২৫এর ৮ই আগস্ট নবনির্মিত মিনার্ভার দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এই উদ্বোধনকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য অমৃতলাল আমন্ত্রিত হন। এই প্রসঙ্গে 'নাচঘর' লিখিয়াছেন—

'নাট্যলোকের নটবৃদ্ধ পিতামহ আচার্য অমৃতলাল বসুর পৌরোহিত্যে নান্দী ও উদ্বোধনকার্য সুসম্পন্ন হবার পর নাটকাভিনয় সুরু হল।'[২১০]

কিছুদিন থিয়েটার চালাইবার পর মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধ অমৃতলালকে মিনার্ভায় লইয়া আসিলেন। এ সম্পর্কে 'সাপ্তাহিক নবযুগ' মন্তব্য করেন—

* পত্রটি অপ্রকাশিত

২০৮ 'সচিত্র শিশির': ২২এ কার্তিক ১৩৩১

২০৯ 'বিজলী': ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩০

২১০ 'নাচঘর': ২৯এ শ্রাবণ ১৩৩২

'অমৃতলাল রঙ্গালয়ের সম্পর্ক একরূপ তুলিয়াই দিয়াছিলেন, মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিয়া নাট্যসাহিত্যের ও নাট্যমঞ্চের যথেষ্ট উপকার করিলেন।'[২১১]

অমৃতলাল মিনার্ভায় যোগ দিবার পর মিনার্ভা-সম্প্রদায় তাঁহার একটি প্রহসন ও একটি পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের স্বত্ব সংগ্রহ করিলেন। সাপ্তাহিক 'নবযুগের' মতে—

"এ উদ্যোগ যে বিশেষরূপ প্রশংসনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। পৌরাণিক নাটকখানির নাম 'যাজ্ঞসেনী' আর প্রহসনখানির নাম 'ব্যাপিকা-বিদায়'। বহুদিন পরে অমৃতলালের নাটক ও প্রহসন যে বাঙ্গালী দর্শকেরা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য। 'খাসদখলে'র পর… কোন ভাল প্রহসন অভিনীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"*

'ব্যাপিকা-বিদায়' অভিনীত হয় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই।[২১২]

ইতিমধ্যে একটি নূতন থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। মিনার্ভার মহেন্দ্র মিত্রের পুত্র শিশিরকুমার মিত্র ও তাঁহার পিতৃব্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯২৬এর ২রা এপ্রিল অ্যালফ্রেড্ মঞ্চে 'মিত্র থিয়েটার' খুলিলেন। কয়েকটি নাটকাভিনয়ের পর ইঁহারা অমৃতলালকে নাট্যাচার্য ও নাট্যশিক্ষকরূপে মিত্র থিয়েটারে লইয়া আসেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অভিনয়ের আয়োজন চলে। অমৃতলাল কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন স্থির হয়। তাঁহার তখন ৭৪ বৎসর বয়স। এই উপলক্ষে মিত্র থিয়েটার একটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন।[২১৩]

২১১ 'নবযুগ' : ২৫এ আষাঢ়, ১৩৩৩

* 'নবযুগ' : ২২এ ফাল্গুন, ১৩৩২। অমৃতলাল এই সময়ে 'যাজ্ঞসেনী' রচনা শুরু করিলেও নাটকটি শেষ হয় দুই বৎসর পরে।

২১২ প্রহসনটি সম্পর্কে 'নাচঘর' মন্তব্য করেন—'…এত বৎসরের আলস্যের পরেও যে-কলমের লেখা থাকে এমনি তাজা ও চমৎকার, সে লেখনীকে বারবার তারিফ না করে উপায় নেই।'—'নাচঘর' : ৩১এ আষাঢ় ১৩৩৩।

২১৩ 'বিনামেঘে বজ্রনির্ঘোষ—শুনিয়া চমকাইবেন না, সত্যই

মিত্র থিয়েটারে

নাট্যাচার্য শ্রীঅমৃতলাল বসু

এইবার আপনারাই বলুন মিত্র থিয়েটার অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে কি না?'—'নাচঘর' : ১৭ই ভাদ্র ১৩৩৩।

শনিবার, ১৮ই ভাদ্র ১৩৩৩ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অভিনীত হয়। অমৃতলাল প্রয়োজনমতো নাট্যরূপের অনেক পরিবর্তন করেন। 'নাচঘর' এই অভিনয় দেখিয়া লিখিলেন—

"প্রথমেই দেখলুম, রঙ্গালয়ে পূর্ব-অভিনীত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সঙ্গে এ নাটকের তফাৎ আছে বিস্তর। প্রথম তিন অঙ্ক নাট্যাচার্য অমৃতলালের পাকা হাতের পরীক্ষিত কলমের গুণে একেবারে নতুন আকার লাভ করেছে। প্রায় অবিকৃত আছে শেষ দুই অঙ্ক। এ পরিবর্তন ভাল লাগল।··· নাট্যাচার্য অমৃতলাল সেজেছিলেন কৃষ্ণকান্ত। তাঁর এই প্রাচীন বয়সের অপটু দেহের অভিনয় আমি সমালোচকের চোখে দেখবার চেষ্টা করিনি এবং করা উচিত নয়। কাজেই তাঁর অভিনয় আমার মন্দ লাগে নি। মৃত্যুদৃশ্যে তাঁর অভিনয় সত্য সত্যই নিখুঁত হয়েছিল।"[২১৪]

থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইহাই তাঁহার শেষ অভিনয়। ১৩৩৪ সালের ১লা বৈশাখ স্টার থিয়েটারে যে নববর্ষোৎসব হয়, তাহাতে 'তরুবালা' নাটকের বিশেষ অভিনয়ে অনুরুদ্ধ হইয়া অমৃতলাল বেহারী খুড়োর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন—

"ষ্টারে ১লা বৈশাখের আয়োজনটা একটু বিশিষ্ট রকমের। বহুদিন পরে রসরাজ অমৃতলাল তাঁহার 'তরুবালা' নাটকে বেহারী খুড়োর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।"[২১৫]

এই অভিনয় দেখিয়া 'নাচঘর' মন্তব্য করেন—

"নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর সঙ্গে সঙ্গে ষ্টারে তাঁর তরুবালাকেও আমরা বহুকাল পরে আবার দেখতে পেয়ে খুশী হলুম। নাট্যাচার্য স্বয়ং 'বিহারী খুড়ো'রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।"[২১৬]

অমৃতলাল, মিত্র থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাকালীন, তাঁহারা স্থির করেন 'রত্নাবলী' নাটকটি মঞ্চস্থ করিবেন। অনেকদিন পূর্বে অমৃতলাল এই সংস্কৃত নাটকটির অনুবাদ করেন এবং 'নাট্যমন্দির' পত্রিকার প্রথম বর্ষ (১৩১৭-১৮), প্রথম সংখ্যা হইতেই ধারাবাহিক ভাবে নাটকটি (তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত) প্রকাশিত

২১৪ 'নাচঘর' : ৭ই আশ্বিন ১৩৩৩

২১৫ 'নবযুগ' : ৩রা বৈশাখ ১৩৩৪

২১৬ 'নাচঘর' : ৯ই বৈশাখ, ১৩৩৪

হয়। মিত্র থিয়েটারে নাটকটি অভিনীত হইবে জানিয়া 'নাচঘর' মন্তব্য করেন—

"শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু-অনূদিত 'রত্নাবলী' ওরফে 'সাগরিকা' নাটকখানির অভিনয়ের আয়োজন করে মিত্র থিয়েটার সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন।"[২১৭]

শেষ পর্যন্ত মিত্র থিয়েটারে নাটকটি অভিনীত হয় নাই। অমৃতলাল মিত্র থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার প্রাপ্য অর্থ না মিটাইয়া দেওয়ায় মিত্র সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইয়াছিল।[২১৮]

স্টার থিয়েটার অমৃতলালকে ফিরাইয়া আনিয়া 'সাগরিকা' অভিনয়ের উদ্যোগ করিল। ১৭ই বৈশাখের (১৩৩৪) 'নবযুগ' লিখিলেন—

'মধ্যে যখন মিত্র সম্প্রদায়ে অমৃতলাল বসু যোগদান করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা 'সাগরিকা'র প্লাকার্ড মারিয়াছিলেন— এক্ষণে অমৃতলাল ষ্টারে আসিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে ষ্টারের কর্তারাও 'সাগরিকা'র প্লাকার্ড মারিলেন। এখন দেখা যাউক কোথায় সত্যকার অভিনয় আরম্ভ হয়।'

প্লাকার্ড মারা হইলেও এক মাসেরও অধিককাল পরে সাগরিকা যে অভিনীত হয় নাই তাহা ২৭এ জ্যৈষ্ঠের 'নাচঘর' হইতে জানিতে পারি।

শেষ পর্যন্ত স্টারে 'সাগরিকা' অভিনীত হয় নাই। কেন হয় নাই তাহা অজ্ঞাত। তবে সৌরীন্দ্রমোহনের মতে—

'নাট্যমঞ্চে তার অভিনয় সহজ ছিল না। বহু নাচগান, জঁাকালো দৃশ্য-সজ্জাদি, এ সবের মীমাংসা কঠিন ছিল না— কিন্তু এমন পল্লবিতভাবে নাটকখানি লিখেছিলেন যে, তার অভিনয়ে সময় লাগবে প্রায় ছয় ঘণ্টা।'[২১৯]

স্টারে আসিবার পর অমৃতলাল 'যন্দে মাতনম্' নামে একটি প্রহসন লিখিয়া ছিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ প্রহসন। ১৯২৬এর ১০ই নভেম্বর ইহা স্টার মঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল।

ইহার পর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তাঁহার শেষ নাটক 'যাজ্ঞসেনী' মিনার্ভায় অভিনীত হয়।

২১৭ 'নাচঘর' : ৯ই পৌষ, ১৩৩৩

২১৮ 'নবযুগ' : ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪—'নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু মিত্র থিয়েটারের নামে ৬৫০৲ টাকার এক ডিক্রী করিয়াছেন।'

২১৯ 'বাংলা রঙ্গমঞ্চ' : সচিত্র শিশির : শ্রাবণ ১৩৩৮

বাংলা রঙ্গমঞ্চের উৎকর্ষের জন্য আত্মোৎসর্গ করিলেও অমৃতলাল যে শুধুমাত্র মঞ্চেই অভিনয় করিয়াছেন এমন নয়, একাধিক বার ছায়াচিত্রেও তিনি অভিনয় করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাডান কোম্পানী 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর নির্বাক চিত্ররূপ প্রস্তুত করেন। ইহাতে অমৃতলাল কৃষ্ণকান্তের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁহার ভাবাভিব্যক্তি এত সুন্দর হয় যে, চিত্রটি বিলাতে প্রেরিত হইলে সেখানকার দর্শকমণ্ডলী তাঁহার অভিনয়ের বিশেষ সুখ্যাতি করেন—

'This very picture proved the triumph of the Indian Fılm Industry. The unique facial expressions of Amritalal in this picture will not fail to put heart into those who despair the prospects of film acting in India. This picture was sent by the Madan Company to England .. and the acting of Amritalal was highly eulogised by the Englısh cinemagoers there. This pıcture is a sufficient proof that he was a great, perhaps the greatest Indian Film Actor'.[২২০]

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সাফল্য দেখিয়া ম্যাডান কোম্পানী ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র চিত্ররূপ দিতে আরম্ভ করেন। ৭৭ বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল 'বিবাহ-বিভ্রাটে' নামিলেন গোপীনাথের ভূমিকায়। মৃত্যুর তিন চার দিন পূর্বেও তিনি স্টুডিয়োয় গিয়া অভিনয় করিয়া আসিয়াছিলেন।[২২১]

শুধু ছায়াচিত্রে অভিনয় নয়, কোন্ ধরণের বিষয় ছায়াচিত্রের উপযোগী হইবে সে সম্পর্কেও তাঁহার স্পষ্ট ধারণা ছিল। এই কারণেই তৎকালীন অনেক চিত্রপরিচালক তাঁহার অভিমত লইতেন। খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (চিত্রজগতে ডি. জি. নামে সুপরিচিত) তাঁহাকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে একটি পত্র লেখেন; পত্রটিতে অমৃতলালের মতামতের উপর পত্রলেখকের সুগভীর আস্থা প্রকাশ পাইয়াছে। পত্রটি এই—

২২০ 'The Bengalee': 3.7.1929.

২২১ অমৃতবাজার পত্রিকা: ৩.৭.১৯২৯

'Lotus Film Company
Hyderabad (Deccan).

25th September, 1923.

শ্রীচরণেষু,

দু'তিন দিন হল আপনাকে একখানি চিঠি দিয়েছি আশা করি পেয়ে থাকবেন।

আমি এই 'শিবাজী'খানার পরই আর একখানি Historical subject ধরতে চাই, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না কোন্‌খানা ধরবো। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ সম্বন্ধে পরামর্শ দেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হব। আপনার উপর আমার স্নেহের দাবী আছে বলেই আপনাকে এত বিরক্ত করছি।

আপনার চিঠি পেলে অত্যন্ত সুখী হব। আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

ইতি

আপনার স্নেহের

ধীরেন।'*

১৭

অমৃতলালের ৫৬ বৎসরের নটজীবন অবিমিশ্র গৌরবে পূর্ণ। যদিও তিনি একজন বিশেষ দক্ষ অভিনেতা ছিলেন তথাপি রঙ্গালয়-পরিচালনা, নাট্য-নির্দেশনা এবং নাটক-প্রহসন রচনায় নিবিষ্ট থাকিতে হইত বলিয়া তিনি অনেক সময় প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারিতেন না। জীবনে তিনি বহু বিচিত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার প্রথম নাট্যজীবনের সূত্রপাত সৈরিন্ধ্রী, মদনিকা প্রভৃতি স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয়ে। তারপর তিনি 'নবীন তপস্বিনী', 'কাম্যকানন', 'সরোজিনী' প্রভৃতি নাটকের প্রধান পুরুষ-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সাহেব-চরিত্রাভিনয়েও তাঁহার কৃতিত্ব অসামান্য। 'হীরকচূর্ণে' মিঃ স্কোব্‌ল,

* পত্রটি অপ্রকাশিত। পত্রলেখক একজন ভাল মকাভিনেতাও ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মিত্র থিয়েটারে অভিনীত 'বিবাহ-বিভ্রাটে' ইনি মিঃ সিংএর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অমৃতলাল তখন উক্ত থিয়েটারের নাট্যাচার্য ও নাট্যশিক্ষক।

'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'তে ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রিবি, 'চন্দ্রশেখরে' লরেন্স ফস্টর, 'নীল-দর্পণে' (স্টারে অভিনীত) মিঃ উড্, 'রাজা বাহাদুরে' ব্রকম্যান ফিশ প্রভৃতি ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র বাঙালী-সাহেব মিঃ সিংও স্মরণীয়। আবার মহাপুরুষ জাতীয় চরিত্রের অভিনয়েও তিনি অশেষ সাফল্য প্রদর্শন করেন। রামকৃষ্ণদেবের অনুসরণে কল্পিত নসীরামের ভূমিকায় তিনি যেরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন কেহ কেহ তাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ অভিনয় মনে করেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ বিদূষকের ভূমিকায়ও তিনি একাধিকবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। খল চরিত্রের অভিনয়েও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। রমেশের ভূমিকায় তিনি অর্ধেন্দুশেখরকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র নিজে মনে করিতেন শ্লেষাত্মক হাস্যরসিকের ভূমিকায় অমৃতলাল ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[২২১ক] বস্তুতঃ সর্বপ্রকার রসের অভিনয়ে তাঁহার সমান পারদর্শিতা ছিল।

অমৃতলালের এই সর্বাত্মক অভিনয়দক্ষতার পরিচয় পাইয়া সুখ্যাত অ্যাড্-ভোকেট নরেন্দ্রকুমার বসু সুপ্রসিদ্ধ বিলাতি অভিনেতা স্যর চার্লস উইণ্ডহ্যামের সহিত অমৃতলালের তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—

> 'আমি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ অভিনেতাদিগের অনেকেরই অভিনয় দেখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে সার চার্লস উইণ্ডহ্যাম, সার হার্বার্ট ট্রি, বুরশিয়ার এবং ডুমরিয়ারের অভিনয় আমার নিকট সর্বোত্তম মনে হইয়াছিল, বিশেষতঃ উইণ্ডহ্যামের। এমন সহজ সুন্দর অভিনয় আমি খুব কমই দেখিয়াছি। দেখিলে অভিনয় বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশের এক ষ্টার থিয়েটারের শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর অভিনয়ে ঐ সহজ ভাব পরিলক্ষিত হয়। পনর ষোল বৎসর পূর্বে অমৃতবাবুর অভিনয় দেখিতাম। উইণ্ডহ্যামকে দেখিয়া অমৃতবাবুর কথা খুব মনে পড়ে। Mannerism-এর একান্ত অভাব, যাহা আছে তাহা ঠিক অমৃতবাবুর মত।'[২২১খ]

২২১ক 'হাস্যরসাভিনয়ে অর্ধেন্দুবাবু, বেলবাবু এবং ভুনিবাবু (নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু) এই তিনজনেই সর্বশ্রেষ্ঠ।...যে চরিত্রে শ্লেষ আছে তাহার অভিনয়ে ভুনিবাবু অতুলনীয়।'—'রূপ ও রঙ্গ', ৫ই পৌষ ১৩৩১।

২২১খ 'য়ুরোপ ভ্রমণ' (১৩১৯) : নরেন্দ্রকুমার বসু, পৃ ৩৬-৩৭

অমৃতলালের সমকালীন অপর এক নাট্যরসিক অমৃতলালের আভিনয়িক অঙ্গভঙ্গী, ইঙ্গিত ইত্যাদির সুখ্যাতি করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

'আমরা বন্ধুতে বন্ধুতে, পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামীস্ত্রীতে বা শত্রুমিত্রে যখন কথাবার্তা কহি তখন আমরা উভয়ে উভয়কে, উভয়ের বক্তব্যবিষয় পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত আবশ্যকমত কত প্রকারে মস্তক সঞ্চালন, হস্ত সঞ্চালন, দৃষ্টিভঙ্গী স্বরভঙ্গী করিয়া থাকি ; একজন কথা কহিবার সময়ে অপরে তাহার কথা যে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, ইহা বক্তাকে বুঝাইবার জন্য নির্বাক শিরঃকম্পন, গ্রীবাভঙ্গী প্রভৃতির দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়। অভিনেতৃদ্বয়ের মধ্যে অভিনয়কালে যদি এইগুলি ত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে সে অভিনয় কখনই দর্শকের বোধগম্য ও তৃপ্তিপ্রদ হয় না। যাঁহারা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'রমেশ' এবং 'মিঃ সিং'এর অভিনয় দেখিয়াছেন,… তাঁহারাই এইগুলির আবশ্যকতা বুঝিতে পারিবেন।'[২২১গ]

আভিনয়িক উৎকর্ষ সাধন করিতে গেলে নটনটীকে যে সকল নীতিনিয়ম অবি[illegible]

কবিতায় 'পরামর্শ' দিয়াছেন—

'…কিবা দৃশ্য কিবা শ্রাব্য, পড়িবে বিবিধ কাব্য,
পাত্রের ব্যথায় ব্যথা করিবে অভ্যাস।
যদি হ'তে চাও কৃতী, জাগ্রত রাখিবে স্মৃতি,
হেলায় আবৃত্তি হবে বচনবিন্যাস ॥

লক্ষ লক্ষ নারীনরে, যে বিদগ্ধ মুগ্ধ করে,
সে কেন না নরবরে করিবে আদর্শ।
অভিজ্ঞতা শাস্ত্রদীক্ষা, আমারে যা দিল শিক্ষা,
নটনটী শুভলক্ষ্যে দিনু পরামর্শ ॥'[২২১ঘ]

২২১গ 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' : ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় পৃ ৯৫
২২১ঘ 'নটনীতি' : অমৃত-মদিরা পৃ ২২৭

নাটক-প্রহসন রচনায় এবং অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শনে তিনি যেমন সকলের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন, অধ্যক্ষরূপে থিয়েটার-পরিচালনায়ও সেইরকম সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়কার স্টার থিয়েটার যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অমৃতলালের অধ্যক্ষতার অসাধারণ দক্ষতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

হাতিবাগানে স্টার থিয়েটারের পত্তনের সময় গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডে ছিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি স্টারে যোগদান করেন এবং ১৮৯১ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্টারের অধ্যক্ষতা করেন। এই সময়ের মধ্যে একবার স্টার থিয়েটারের কিছু অখ্যাতি হয়। 'ষ্টার থিয়েটারের ভয়ানক দুর্নাম' এই শিরোনামে 'অনুসন্ধান' পত্র (৩০এ সেপ্টেম্বর ১৮৯০) রঙ্গালয়ের নানাপ্রকার ত্রুটির বিস্তৃত সমালোচনা করেন।

এই 'অনুসন্ধান' পত্রই আবার স্টার থিয়েটার সম্বন্ধে পরবর্তীকালে নিম্নরূপ 'মতামত' দিয়াছিলেন—

'**ষ্টার থিয়েটার।**—ধরণ ধারণ, চালন চলন, আদব কারখানায়, ইহাদের বিশেষ বাহাদুরী দেখা যায়। এ বিষয়ে এ কোম্পানীর ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইহাদের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাদের বন্দোবস্তগুণে বাস্তবিকই আমরা অনেক সময় মুগ্ধ হইয়াছি।'[২২২]

অমৃতলালের উপযুক্ত অধ্যক্ষতায় স্টারের গৌরব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছিল। কয়েক বৎসর পরে 'অনুসন্ধান' পুনরায় লিখিলেন—

"আজিকালি কলিকাতায় চারিটি নাট্যশালায় নাটিকাভিনয় হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সৌভাগ্যলক্ষ্মী সকলের প্রতি সুপ্রসন্না নহেন। সাধনায় কার্যসিদ্ধি—'ষ্টার'ই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাই সৌভাগ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে—'ষ্টার'। 'ষ্টার' বহুদিন হইতে বাঙ্গালা থিয়েটারের গৌরবস্থল, বড়ই আনন্দের বিষয় যে সুদক্ষ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় 'ষ্টারে'র গৌরব এতাবৎকাল সমভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ

---

২২২ 'অনুসন্ধান' : ১৫ই আষাঢ়, ১৩০১

হইয়াছেন। কি প্রাসাদতুল্য সুদৃশ্য নাট্যশালায়, কি সুনিপুণ অভিনয়ে, কি সুদৃশ্য দৃশ্যপটে, কি যথাযোগ্য পরিচ্ছদে, কি কার্য-বিভাগের সুতীক্ষ্ণ পরিদর্শনে, সর্বোপরি সময়োপযোগী বিষয় নির্বাচনে—'ষ্টার' প্রকৃতই সর্বশ্রেষ্ঠ। অতিবড় শত্রুকেও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়।"[২২২ক]

শুধু রঙ্গালয়ের উন্নতিতেই তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন এমন নহে। 'চলচ্চিত্র'-শিল্পের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অবহিত। স্টার থিয়েটারে একবার তিনি 'বাইওস্কোপ' প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ১৩০৬ সালের 'অনুসন্ধান' হইতে এ বিষয়ে জানা যায়—

"**ষ্টার থিয়েটার**। বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে 'ষ্টার' গৌরবস্থানীয়, ষ্টার আদর্শ-স্থানীয়। ষ্টারে যখন যে নাটক অভিনয় হয়, তাহাই দর্শনযোগ্য। দর্শনের অযোগ্য কোন নাটকের অভিনয়, প্রায়ই ষ্টারে দেখি নাই। অভিনয়ের নৈপুণ্য, বন্দোবস্তের শৃঙ্খলা, রচনার সৌন্দর্য সংরক্ষণ—সর্ব বিষয়েই ষ্টার চিরদিনই সর্বোন্নত। ষ্টারের ন্যায়, স্থান সময় কার্য ও ব্যক্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অভিনয় অতি অল্পই দেখা যায়। যখনই যে-অভিনয় দেখিয়াছি, তাহাই অতি স্বাভাবিক, অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে। ষ্টারের প্রত্যেক অভিনেতা যেরূপ দক্ষতার সহিত নিজ নিজ অংশ অভিনয় করে, তাহাতে রঙ্গভূমে রঙ্গ দেখার বিভীষিকা দূর হয়, মনে প্রকৃত শিক্ষার সহিত ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহ যেন খেলিয়া বেড়ায়। সুযোগ্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের অমৃত-লেখনী হইতে মধ্যে মধ্যে যে অমৃতের উদ্ভব হয়, তাহা পান করিলে মানুষ যে অমর হয়! তাই বুঝি সে অমৃত আস্বাদে আবাল-বৃদ্ধের এত উৎসাহ! সম্প্রতি 'ষ্টারে' 'বাইওস্কোপ' জীবন্ত ছবি প্রদর্শিত হইতেছে। সে ছবি প্রত্যেকেরই দেখা কর্তব্য। না দেখিলে জীবনের একটা নূতন সাধ অপূর্ণ রহিবে।"[২২৩]

'অনুসন্ধান'-পত্র অমৃতলালের অধ্যক্ষতার সুখ্যাতির সহিত স্টার থিয়েটারে যে-'বাইওস্কোপ' প্রদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার দ্বারাও অমৃতলালের বিচিত্র কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ষ্টীভেনসন্ নামে এক সাহেব কলিকাতায় প্রথম বায়োস্কোপ দেখান। তাঁহার সহিত যোগাযোগ করিয়া

২২২ক 'অনুসন্ধান' : ২রা ভাদ্র ১৩০৫

২২৩ 'অনুসন্ধান' : ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩০৬

অমৃতলাল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে স্টার থিয়েটারে বায়োস্কোপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একবার সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের* নিকট একটি পত্র লেখেন। অমৃতলাল তখন ১১নং শিকদারবাগান ষ্ট্রীটে থাকিতেন। ১২ই ডিসেম্বর ১৮৯৮ সনের এই পত্রের শেষাংশ নিম্নরূপ :

'......Why not all come to see the Bioscope performances at the Star Theatre. The show is so entertaining.'[২২৪]

সৌরীন্দ্রমোহন বায়োস্কোপ দেখিতে গিয়াছিলেন :

"সে রাত্রে 'গ্রাম্য-বিভ্রাট' নাটিকার অভিনয় হয়েছিল এবং তারপর ষ্টীভেনসন্ সাহেবের বায়োস্কোপ দেখান হয়। বায়োস্কোপের পরে হয়েছিল মিস্ নেলী মাউন্টকশলের 'সর্প এবং রামধনু নৃত্য'।"[২২৫]

শুধু বায়োস্কোপ প্রদর্শন নয়, এদেশে ছায়াচিত্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে এবং রঙ্গালয়ে আলোকের উৎকর্ষসাধন বিষয়ে তিনি সম্ভবতঃ ষ্টীভেনসনের সহিত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। কারণ বিলাতে প্রত্যাবর্তনের পর ষ্টীভেনসন্ এ বিষয়ে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রটি এই :

'49, Broomgrove
Sheffield, England
22. 6. 1899

Dear Mr. Bose,

I have been sometime in London and have seen most of the things I wanted. The......projection of coloured pictures would, I am sure, prove an attraction. The recent improvements to the Bioscope can all be fitted to my old machine. Regarding the lighting of the theatre, I enclose a list. The light is splendid and is no trouble; they offer me 25% discount if I take 100 burners. These will give 3000 C.P. and burn but 500 feet of gas

---

* 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-দলের নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র

২২৪ সচিত্র শিশির : বৈশাখ ১৩৩৪

২২৫ ঐ ঐ

per hour if all are burning at the same time. The whole plant would not cost more than 500/- and would save that in a season besides giving a much better light than the present system does. The light does not have the green effect that the incandescent mantle light does. This makes it suitable for a theatre while the other is not......

......Nelly wishes to be remembered to all. I hope all the partners are having the best of health......

Faithfully yours,

J. J. Stevenson'*

এই সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী হইতে আমরা অমৃতলালের সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পাই। 'Show business'কে কি ভাবে উন্নত, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আদর্শস্থানীয় করিয়া তোলা যায় ইহাই ছিল তাঁহার ব্রত। এই বৈচিত্র্য হিসাবে তিনি পূর্বে এক সময়ে স্টারে হিন্দুস্থানী নাটকাভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন।** নানা বিষযে চিন্তা করিতে গিয়া তাঁহার অধ্যক্ষতায় ত্রুটি

* অপ্রকাশিত পত্র। স্টীভেনসনের পত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে যে, অমৃতলাল এই সময়ে মঞ্চে আলোকসম্পাতের উন্নতির বিষয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন। কয়েকমাস পরেই অভিনীত তাঁহার 'আদর্শ বন্ধু' নাটকের উদ্বোধন রজনীতে (২৮.৪.১৯০০) স্টার মঞ্চে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবহার দেখা গেল · '...and a feature—new to the Indian Stage—has been added to it in the shape of lighting with electricity ...' (The Indian Mirror : 28.4.1900) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—'শুধু স্টীভেনসনের বায়োস্কোপ নয়—প্রোফেসর গ্রসির ম্যাজিক···থট্ রীডিং—আরো নানা বিদেশী শো তিনি ষ্টারে আনিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করে'ছিলেন। এই বায়োস্কোপ দেখে বাঙ্গালী হীরালাল সেন পেয়েছিলেন প্রেরণা। তিনি সিনেমা যন্ত্রাদি কিনে সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তারপর আরো কজন বাঙ্গালী সিনেমার দিকে প্রেরণা পান'। (সচিত্র শিশির : বৈশাখ ১৩৬৪)

** "STAR THEATRE—The management of this theatre have lately produced a new Hindusthani drama, entitled 'Ram-Sea or Sita's Exile' which is now being played every Saturday evening."—The Statesman : 17. 6. 1893

কোন দিন দেখা যায় নাই। ইহার দুই বৎসর পরে 'রঙ্গালয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' বলিতে গিয়া 'রঙ্গালয়' পত্র লিখিয়াছেন :

'......যে দেশে থিয়েটার করিয়া অনেক কাপ্তেনকে ভাসিতে হইয়াছে, সে দেশে লোকে থিয়েটারের নিন্দা করিলে ক্রোধ করিবার আমরা কোন কারণই দেখিনা। ১৪-১৫ বৎসর পূর্বে পাড়ার বখাটে ছেলেরা থিয়েটার করিত, প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অবিদ্যাদিগের উৎকট লীলা হইত। সে সময়ে থিয়েটারের নাম করিলে লোকে যে ভাবে শিহরিয়া উঠিত, এখন ততটা আর নাই। ইহার কারণ ক্রমোন্নতি। রঙ্গালয়ের বর্তমান উন্নতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু দ্বারা যে সংসাধিত হয় নাই, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। বাবু অমৃতলাল বসু বহু দিবস হইতে রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। রঙ্গমঞ্চের যত মজা, তিনি সকলই অবগত আছেন, সুতরাং বহুদর্শিতা, অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার ন্যায় মেধাবী ব্যক্তি যে এক্ষণে অনেক নবীন অনভিজ্ঞ অভিনেতা বা অধ্যক্ষের অপেক্ষা রঙ্গালয়ের উন্নতিসাধনে সমর্থ হইবেন, চরিত্র অটুট রাখিয়া কার্য করিতে পারিবেন, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। অমৃতলালবাবু যেভাবে থিয়েটার চালাইতেছেন, যদি প্রথমাবধি কোন ব্যক্তি এরূপে থিয়েটার চালাইতে পারিতেন, তাহা হইলে থিয়েটার এত নিন্দার বিষয়ীভূত হইত না।......ষ্টার রঙ্গমঞ্চ করিয়া অমৃতবাবু লোকের ভ্রম অনেকটা ঘুচাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, বারবনিতা লইয়া থিয়েটার করিলেও, নষ্ট চরিত্রের লোকের সংসর্গে থাকিলেও, মানুষ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, অর্থোপার্জন করিতে পারে, সুকৌশলে ব্যবসা চালাইতে পারে, তাই থিয়েটারের প্রতি লোকের ঘৃণা যেন একটু উপশমিত হইয়াছে।'[২২৬]

এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত অমৃতলালের একটি পত্র উল্লেখ-যোগ্য। এই পত্রে তাঁহার চরিত্রের আর একটা দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

'পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,......আমি যদি আমার ব্যবসায়কে—সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিব, তবে অপরে কেন সম্মান করিবে?......আশীর্বাদ করুন যেন আমি বিশুদ্ধ থাকিয়া ষ্টার থিয়েটারের নাম হইতে থিয়েটারী কলঙ্ক মোচন করিতে সমর্থ হই। গোঁড়ার দল বা থিয়েটারকে ঘৃণা দেখান যাঁহাদের

২২৬ 'রঙ্গালয়' : ৩রা শ্রাবণ ১৩০৯ (১৯.৭.১৯০২)

স্বার্থের সহিত জড়িত, তাঁহারা ভিন্ন অপর সমস্ত উচ্চ সম্প্রদায়ের নিকট ষ্টার এক্ষণে সাধারণ থিয়েটার অপেক্ষা সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত নাট্যশালা বলিয়া সাদরে পরিচিত হইয়াছে······স্নেহাভিলাষী অমৃত।'*

শুধু থিয়েটার পরিচালনা নহে, তাঁহার নির্দেশে হিসাবপত্র নির্ভুলভাবে এবং সততার সহিত রক্ষিত হইত। অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারের সহিত তুলনা করিয়া 'রঙ্গালয়' লিখিতেছেন—

'ষ্টার থিয়েটারের টিকিট বিক্রয়ের টাকা যেরূপ সংরক্ষিত হয়, ক্লাসিকে তদ্রূপ হয় কিনা, আমরা তাহা জানি না। তবে আমাদিগের বিশ্বাস, ক্লাসিকে অভিনয়াদির যেরূপ সুবন্দোবস্ত আছে, আয়ব্যয়ের যদি তদ্রূপ সুবন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলে অমরবাবুর নাম অধিকতর উজ্জ্বল হইত।...'২২৭

যখন স্টার থিয়েটারে নূতন নাটক অভিনয়ার্থ প্রস্তুত থাকিত না, তখন অধ্যক্ষ অমৃতলাল তৎকালীন 'বিকৃতরুচির প্রভাবকালে'ও 'ইংরাজি বাঙ্গালা সুর বিজড়িত জংলাসুরের গান' সমন্বিত নাট্যাভিনয় দ্বারা সুলভ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে চাহেন নাই ; বরং পুরাতন নাটকেরই পুনরভিনয় করাইতেন। পুরাতন নাটক দেখিবার জন্য দর্শকরা ভীড় করিবে না বুঝিয়াও তিনি ভীত হইতেন না। স্টার থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিপ্রসাদ বসু ইহাতে অপ্রসন্ন হইতেন, কিন্তু ভাল নাটকের জন্য সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। ফলে অমৃতলালকেই একা সমস্ত দায়িত্ব লইয়া পুরাতন নাটকের অভিনয় করাইতে হইত, দর্শক হইবে না বুঝিয়াও তাঁহাকে মঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইত। এ সম্পর্কে ২২এ মে ১৮৯৭, শনিবার-এর দিনলিপি হইতে অমৃতলালের বক্তব্য উদ্ধৃত করি .—

"......'Rishyasringa' and 'Kalapani' were performed this night, I taking part (Tincowry) in the latter piece. House very bad, Hari Babu was complaining about the want of of nice plays, but his responsibility stops there. Following my advice, they will never sit together with me or

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র (৬৭) উদ্ধৃত।

২২৭ 'রঙ্গালয়' : ৩রা শ্রাবণ ১৩০৯ (১৯.৭.১৯০২)।

Girish Babu to talk about literary matters and subjects of plays."*

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতলালের পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের এই প্রয়াসকে 'পুরুষকারের লক্ষণ' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। ১৩০৭ সালের আশ্বিন মাসে স্টারে 'লীলাবতী'র অভিনয় দেখিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

'বর্তমান বিকৃতরুচির প্রভাবকালে,— যখন লোকে অস্বাভাবিক নৃত্য দেখিয়া মত্ত, ইংরাজি বাঙ্গালা স্বর বিজড়িত জংলাস্বরের গান শুনিয়া আত্মহারা, তখন একখানি পুরাতন নাটক লইয়া অভিনয়চেষ্টা, অবশ্যই পুরুষকারের লক্ষণ। যাহা লোকে ভুলিয়াছে, যাহা লোকে অনুপযোগী ভাবিয়া ছাড়িয়াছে, তাহাই, এতদিন পরে, লোকের মনে জাগাইয়া তোলা দুঃসাহসের পরিচায়ক। ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ বসুজ মহাশয় লীলাবতী নাটকের উপর স্থানে স্থানে কলম চালাইয়াছেন; তাঁহার কলমের গুণে অনেক স্থান মিঠাও লাগিয়াছিল।...'[২২৮]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়েই মনোমোহন বসুর বিস্মৃতপ্রায় নাটক 'প্রণয়-পরীক্ষা' প্রায় সাতাশ বৎসর পরে স্টারে পুনরায় অভিনীত হয়।

অমৃতলালের এই সর্বমনস্ক ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন 'বাংলা থিয়েটারের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি।'[২২৯]

বাস্তবিকই অমৃতলালের ন্যায় কেহ একটি রঙ্গালয়ের স্থায়ী উৎকর্ষের জন্য আত্মনিয়োগ করেন নাই। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র থিয়েটার হইতে থিয়েটারে ঘুরিয়াছেন। ফলে স্টার ভিন্ন অন্য কোন রঙ্গালয়ই দীর্ঘস্থায়ী সুনামের অধিকারী হয় নাই। ১৩০৯ সালে 'মিনার্ভা'র কি অবনতি হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাই 'অনুসন্ধান' পত্রের সাময়িক প্রসঙ্গে:

'**থিয়েটরে অভদ্র ব্যবহার**। কলিকাতার থিয়েটরগুলিতে আজিকালি সাধারণতঃ যে সকল বিষয় অভিনীত হয় তাহা ভদ্রলোকের দেখিবার অনুপযুক্ত; তাহার উপর আবার তাঁহাদের অভদ্র ব্যবহার।...মিনার্ভা

* 'খড়্গশৃঙ্গ' (রাজকৃষ্ণ রায়) ও 'কালাপানি' দুইটি নাটকই ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৮৯২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে স্টারে অভিনীত হইয়াছিল।

২২৮ 'অনুসন্ধান': ১লা কার্তিক ১৩০৭

২২৯ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি': দেশ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

থিয়েটরে একটি ভদ্রলোকের প্রতি দুর্ব্যবহারের একটি ঘটনা সহযোগী ['সময়'] উল্লেখ করিয়াছেন। থিয়েটরে আরও নানা রূপের ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে।...সুতরাং ভদ্রলোকদিগের থিয়েটর দেখিতে হইলে, কোন্ থিয়েটরে কিরূপ শ্রেণীর পুস্তকের অভিনয় ও কোথায় কিরূপ ভদ্রস্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তির কর্তৃত্ব—অগ্রে তাহার পরিচয় লওয়া কর্তব্য।'[২২৯ক]

অধ্যক্ষ অমৃতলালের তত্ত্বাবধানে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংযমের আদর্শে স্টার থিয়েটার তখন অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে অমৃতলালকে লেখা রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর পত্রেও (অপ্রকাশিত) এ বিষয়ে সপ্রশংস ইঙ্গিত আছে। ১৯১০এর ১২ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুর হইতে তিনি লেখেন—

'...You have elevated the tone of the Indian Stage and have given to Bengal the productions of a master mind. Your sparkling and incisive humour appeals to cultured minds and enlivens them...' ১৯১১র ১৬ই এপ্রিল দার্জিলিঙের 'হার্মিটেজ' হইতে লেখেন—'...Your kind congratulations on the recent honours conferred on me as a member of the Executive Council in the shape of a salute of 13 guns. You are a friend of my family and you have given a new and improved tone to our native stage...' আবার ১৯১২র ১০ই জানুয়ারী ১২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা হইতে লেখেন—"Words of appreciation [কিশোরীলাল 'রাজা' উপাধিভূষিত হইলে] from a friend like you who has made a mark as the regenerator of the Bengali stage and God willing will leave an honoured name behind, are indeed most gratifying to me."

অমৃতলালের মৃত্যুর পর ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে অনুষ্ঠিত শোকসভায় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

২২৯ক 'অনুসন্ধান' ২২ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

'আমি নিজে তাঁহার সময়ে ষ্টারে কাজ করিয়া দেখিয়াছি, এমন অপূর্ব নিয়মানুবর্তিতা, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যপ্রণালী, খুঁটিনাটি প্রত্যেক জিনিষটির প্রতি এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি, এমন ব্যবহারকৌশল, আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ষ্টার থিয়েটারের কাজ চলিত ঠিক যেন কলে, ঠিক যেন ঘড়ির কাঁটার তালে। আড়ম্বর নাই, হৈ হৈ নাই, ঢক্কানিনাদ নাই, ধাপ্পা নাই, চাল নাই, হুজুগ নাই,—নিরুপদ্রবে, নীরবে যে যাহার কাজ করিয়া যাইতেছে। সব বিষয়েই এখানে একটা ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল।'[২৩০]

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

'তাঁর আমলে ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য যে রাত্রে যে সময় নির্দিষ্ট থাকতো···ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত···রোগশোক···যা কিছু ঘটুক, অভিনয় সুরু হত ঠিক সেই নির্দিষ্টসময়ে···তার এক মিনিট এদিক ওদিক হতো না।'[২৩১]

১৯০১ খৃষ্টাব্দের এক শনিবার দিন প্রবল বর্ষণে উত্তর কলিকাতার রাস্তা 'খরস্রোতা নদীতে' পরিণত হইয়াছিল। হিন্দু হোস্টেলের দুইটি কলেজ-ছাত্র ব্যতীত আর একটিও দর্শক আসে নাই। অমৃতলাল অভিনয় বন্ধ করিলেন না— যথাসময় অভিনয় আরম্ভ হইল।[২৩২]

তাঁহার সময়ে স্টারের থিয়েটার হল যতটা পরিচ্ছন্ন রাখা হইত ততটা অন্য কোন থিয়েটারে দেখা যাইত না। দর্শকের আসনে বসিয়া ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। বক্সে বসিয়া যাঁহারা গড়গড়া টানিতেন, তাঁহারা পটক্ষেপকালে অভিনয়ের বিরাম সময়ে ওই কাজ সারিতেন। প্রোগ্রামে লেখা থাকিত 'রঙ্গালয়ে ধূমপান ও শান্তিভঙ্গ নিষেধ'। কেহ চীৎকার করিলে তাহাকে প্রথমে 'ওয়ার্ণিং' দেওয়া হইত। তাহাতে কাজ না হইলে টিকিটের দাম ফেরৎ দিয়া তাহাকে 'ভদ্রভাবে' বাহির করিয়া দেওয়া হইত। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, তাহার ফলে,

'ষ্টার থিয়েটারে ছেলে ছোকরারা যেতে চাইত না। তাদের ছিল মিনার্ভা, কোহিনূর, বিডন ষ্ট্রীটের থিয়েটারগুলি।···খুব প্রবীণ বনিয়াদী পরিবার বা শান্ত ভদ্র প্রকৃতির যুবক, এঁরাই বেশীর ভাগ যেতেন ষ্টার থিয়েটারে।

---

২৩০ 'মাসিক বসুমতী' : শ্রাবণ ১৩৩৬

২৩১ 'অমৃতলাল বসু' : সচিত্র শিশির : বৈশাখ ১৩৩৬

> ...তবে অমরবাবু যখন এই থিয়েটারের লেসী, তখন পুরানো ষ্টারের কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে।'[২৩৩]

তখনকার দিনে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা সুযোগ বুঝিলেই অন্য থিয়েটার হইতে ভাল অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে নিজেদের থিয়েটারে ভাঙাইয়া লইয়া আসিতেন। ইহা তৎকালীন একটি চলিত রীতি হইলেও অমৃতলাল কখনও ইহা সমর্থন করেন নাই এবং ব্যক্তিগতভাবে কখনও তিনি দলভাঙানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। 'বোনাসে'র প্রলোভনও তাঁহার ছিল না। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শরৎকুমার রায় 'ক্লাসিকে'র বাড়ী কিনিয়া 'কোহিনূর' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তখন অভিনয় করিবার মতো দল তাঁহাদের নাই — বই নাই। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তখন অমৃতলালের শরণাপন্ন হইলেন :

> 'পরামর্শ করিবার জন্য আমরা প্রথমে গেলাম স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকটে। তিনি বরাবরই দল ভাঙ্গানোর বিরুদ্ধে ছিলেন।... পরামর্শ দিলেন — নূতন লোক লইয়া শিখাইয়া দল তৈয়ারী কর।'[২৩৪]

তাঁহারা অমৃতলালকে 'ছয় হাজার টাকা বোনাস' ও তাঁহার 'প্রাপ্য মর্যাদা অনুরূপ অ্যালাওয়েন্স' দিয়া কোহিনূরে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু অমৃতলাল স্টার ছাড়িয়া যান নাই।

গিরিশচন্দ্রের সহিত অমৃতলালের এই দিক দিয়া একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত 'বোনাস' লইয়া একাধিকবার থিয়েটার পরিবর্তন করিয়াছিলেন। স্টার হইতে গোপাললাল শীলের এমারেল্ডে, এমারেল্ড হইতে পুনরায় স্টারে যোগ দেন। মিনার্ভা থিয়েটার স্থাপিত হইলে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধক্রমে মিনার্ভায় যোগ দেন। নাগেন্দ্রভূষণ গিরিশচন্দ্রের প্রতি 'বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কর্মচ্যুত' করিলে স্টারের স্বত্বাধিকারিগণ 'তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নিজ সম্প্রদায়ের নাট্যাচার্যরূপে বরণ' করেন।

২৩৩ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি', দেশ : ৭ই ফাল্গুন ১৩৭৬। 'পুরানো ষ্টারের কড়াকড়ি' সম্পর্কে অন্য একটি গ্রন্থে অহীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—'নাট্য ব্যবস্থাপনায় ক্ষেত্রে নিজস্ব মতবাদে আস্থাশীল দৃঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন অমৃতলাল। তাঁর সুদৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাবের জন্যই তৎকালের রঙ্গালয়-দর্শকগণের অসংযত চাপল্য ষ্টার প্রেক্ষাগৃহকে কখনই কোলাহলপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে পরিণত করতে পারেনি।'—বাংলা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র'—পৃ ১৬৯

২৩৪ 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৃ ১৯০

এই ঘটনাটি অমৃতলালের দিনলিপিতে (বুধবার : ২৫এ মার্চ ১৮৯৬) স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁহার প্রকৃত মনোভাবও সেখান হইতে জানা যায়—

'...বৈকালের সংবাদ। মিনার্ভার প্রোপ্রাইটারদ্বয় গিরিশবাবুকে ত্যাগ করিয়া নীলমাধব চক্রবর্তীর দল ('city') আনিয়াছে ও গিরিশবাবুর নামে চোর প্রভৃতি অপবাদ দিতেছে। গিরিশবাবু মর্মে পীড়া পাইয়াছেন শুনিয়া আমাদের বড় কষ্ট হইল। রাত্রি দশটার পর অমৃত ও হরিবাবুর* সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে যাইলাম। অমৃত একেবারে গিরিশবাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন, আসুন আমাদের কাছে। তিনি হৃদয়ে আমাদের স্নেহভক্তি উপলব্ধি করিয়া সঙ্গে আসিলেন। থিয়েটারে পূর্বে কেহ জানিত না, সকলে আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে প্রণামাদি অভ্যর্থনা করিল।'

কিন্তু কয়েকমাস পরেই গিরিশচন্দ্র পুনরায় মিনার্ভায় যোগ দেন এবং অধ্যক্ষ হন। কিছুদিন পরে আবার মিনার্ভা ছাড়িয়া যোগ দিলেন ক্লাসিকে। 'নানা কারণে ক্লাসিক থিয়েটারে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, গিরিশবাবু উক্ত থিয়েটার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।'[২৩৪ক] আবার যোগ দিলেন মিনার্ভায়। এবারও তিনি মাসিক পাঁচশত টাকা বেতন ও দশ হাজার টাকা বোনাসে কোহিনূরে যোগ দিলেন ম্যানেজাররূপে।[২৩৫]

অধ্যক্ষরূপে অমৃতলাল কি ভাবে রঙ্গালয়ের সংস্কারসাধনে ও অভিনয়ের মানোন্নয়নে নিষ্ঠিত থাকিতেন তাহার আভাস দিয়াছেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের সহিত তিনি তুলনা করিয়াছেন—

'নাটক প্রযোজনার শক্তি ছিল তাঁর অসামান্য। মঞ্চে নাট্য-উপস্থাপনায় দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও অন্যান্য বস্তুর বাস্তবানুগতার দিকে তাঁর ছিল সদাজাগ্রত দৃষ্টি। যেমন জিনিস ঠিক তেমনভাবেই তিনি রূপায়িত করতে চেষ্টা করতেন, এজন্য প্রচুর অর্থব্যয়েও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।** এই বিষয়ে

* স্টার থিয়েটারের চিরন্তন নট-নায়ক অমৃতলাল মিত্র ও অন্যতম সত্বাধিকারী হরিপ্রসাদ বসু।

২৩৪ক 'গিরিশ গীতাবলী' : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পৃ ৫৬১-৫৭০। গিরিশচন্দ্রের মনোভাবের এই অস্থিরতা ন্যাশনাল থিয়েটার-প্রতিষ্ঠা-পর্বেও লক্ষ্য করা যায়।

২৩৫ 'Rs. 5,000—cash and Rs. 5,000/—with a post-dated Cheque'—'The Indian Stage'—H. N. Dasgupta, Vol IV, P.126

** ইহার একটি দৃষ্টান্ত 'খাস-দখল' নাটকে গোয়ালিনীদের পোষাক। Milk-maid নামক

তিনি গিরিশচন্দ্রকে অনেকটা অতিক্রম করে গেছেন। গিরিশচন্দ্র খ্যাতিমান নাট্যপরিচালক হলেও এই সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেক সময় দৃষ্টিক্ষেপ করেন নি।'[২৩৬]

বৃদ্ধ বয়সেও নাট্যাচার্যের কর্তব্যপালনে অমৃতলালের শৈথিল্য ছিল না। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন —

'গিরিশ-অর্ধেন্দুকে মহলায় দেখবার সুযোগ আমার হয় নি বটে, কিন্তু··· বিখ্যাত নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুকে আমি মহলা দিতে দেখেছি একাধিক নাটকে। তিনি অভিনয় শিখিয়েছেন, নাটকের ভাব ও মূলকথা সকলকে বুঝিয়েছেন এবং আরও কোন কোন দিক নিয়ে অল্পবিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন···'[২৩৬ক]

অনেক নবীন নাট্যকারের নাটক স্টারে অভিনয় করিয়া অমৃতলাল তাঁহাদের খ্যাতিলাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন। নাটকের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসঙ্গতি নিজেই সংশোধন করিতেন। প্রয়োজনবোধে নাটকীয় চরিত্রকে পরিপূর্ণতা দিবার জন্য নিজেই লিখিতেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যপ্রতিভার বিকাশে অমৃতলাল অনেকটা সহায়তা করিয়াছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকাররূপে প্রসিদ্ধ হইবার বহু পূর্বে — যখন তিনি জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌সটিটিউশনে রসায়নের অধ্যাপক (১৮৯২) — অমৃতলালের সহিত তখন তাঁহার পরিচয় হয় —

'It was about this time that I first knew him and in the spirit of the traditional manager received him with all courtesy, but was doubtful of his success as a playwright; his dramas, I thought, at the best, will be by-products from his intellectual laboratory'...[২৩৭]

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটক যে স্টার

দুধের কৌটায় গোয়ালিনীদের যে ছবি আছে, অমৃতলাল তাহারই নকল করিয়া 'হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসন' হইতে পোষাক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এইরূপ শোনা যায়।

২৩৬ 'বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র'—অহীন্দ্র চৌধুরী, পৃ ১৬৮

২৩৬ক 'বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার', পৃ ২২

২৩৭ 'Ksherode Prosad'—Amritalal Bose : Forward, 24.7.1927

থিয়েটারে অভাবনীয় সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়, তাহার মূলে অমৃতলালের বিশেষ প্রয়াস ছিল :

"ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে ভবানন্দ-চরিত্র ফলাও করে নাট্যকার লেখেন নি···অমৃতলালের হাতেই ভবানন্দ এ মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে।"[২৩৮]

অধ্যক্ষ অমৃতলালেরই আগ্রহে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম নাট্যপ্রয়াস 'বিরহ' (১৮৯৭) স্টারে অভিনীত হয়।[২৩৯] দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনচরিত-রচয়িতা নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখিয়াছেন—

"অমৃতবাবুকে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাকে 'ঠাকুরদা' সম্ভাষণ করিতেন এবং অমৃতবাবুই প্রথমে দ্বিজেন্দ্রের 'বিরহ' নাটক ষ্টারে অভিনয় করিয়া বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে দর্শকসমাজে দ্বিজেন্দ্রের নাট্যকার খ্যাতিলাভের সহায় হইয়াছিলেন।"[২৪০]

কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় যখন বীণা থিয়েটার করিয়া সর্বস্বান্ত ও বিশেষ বিপদগ্রস্ত তখন অমৃতলালই তাঁহাকে স্টারে নাট্যকাররূপে আশ্রয় দিয়াছিলেন। 'অনুসন্ধান' পত্রের 'বিবিধ প্রসঙ্গ' হইতে জানিতে পারি—

'শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়

এই হতভাগ্য দেশের একজন কবি। দুর্ভাগ্যক্রমে কি এক কুক্ষণে তিনি কবিতাকানন ছাড়িয়া, দেশীয় রঙ্গভূমির সংস্কার করিতে যান। আজ তাই তিনি সর্বস্ব ঘুচাইয়া বিপন্ন অবস্থায় পতিত। ·· তাই আজ তিনি সাধারণের নিকট কৃপাপ্রার্থী।'[২৪১]

রাজকৃষ্ণের তৎকালীন ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হইয়াছে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে—

২৩৮ '৺অমৃতলাল বসু'—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : সচিত্র শিশির, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪। ১৮৯৭ সনে ক্লাসিকে 'আলিবাবা' অভিনীত হইয়া ক্ষীরোদপ্রসাদের যশের সূচনা, 'প্রতাপ-আদিত্যে' তাহার প্রতিষ্ঠা। ১৯০২ সনে তাঁহার 'সপ্তম প্রতিমা' স্টারে অভিনীত হয়। নাটকটির পূর্বনাম ছিল 'ছায়া'। নামান্তর অমৃতলালের। এই নাটকের অনেকগুলি গানও অমৃতলালের রচনা। (দ্রঃ নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' ২য় সং, ২য় ভাগ, পৃ ৬৬১)

২৩৯ 'নাট্যমন্দির' : শ্রাবণ ১৩১৭

২৪০ 'দ্বিজেন্দ্রলাল'—পৃ ২০৪

২৪১ 'অনুসন্ধান' : ১৫ই পৌষ ১২৯৭

'সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিবার সংকল্পও তিনি কখনও কখনও করিতে লাগিলেন।... ঠিক এই সময় ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় রাজকৃষ্ণের সহায় হইলেন। সেই সহায়তার ফলে ষ্টারে তাঁহার আশ্রয় মিলিল।'[২৪২]

ষ্টারে একে একে তাঁহার 'নরমেধ যজ্ঞ', 'লয়লা-মজনু', 'বনবীর', 'ঋষ্যশৃঙ্গ' প্রভৃতি অভিনীত হয়। ১৮৯৩ খৃঃ হইতে রাজকৃষ্ণ খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ১৮৯৪ এর ৫ই মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়।

অমৃতলালের সহায়তার কথা কৃতজ্ঞ রাজকৃষ্ণ আমৃত্যু স্মরণে রাখিয়াছিলেন—"তিনি কথায় কথায় বলিতেন, '...অমৃতবাবুর (ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ বাবু অমৃতলাল বসুর) ঋণ আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।' মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও, তিনি আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন, আর কাঁদিয়াছেন।"[২৪৩]

১৯

অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া অথবা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কখনও 'কবিযশঃপ্রার্থী' নবীনদের উপেক্ষা করিতেন না। অনেকেরই নাটক সংশোধন করিয়া দিতেন। হরনাথ বসুর 'মহারাষ্ট্র-গৌরব', হরিশচন্দ্র সান্যালের 'বিশ্বামিত্র' প্রভৃতি নাটক তিনিই সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।[২৪৩ক] ভাল গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপদানের আগ্রহও তাঁহার কম ছিল না। এ বিষয়ে তৎকালীন অনেক সাহিত্যিকই তাঁহার উৎসাহ লাভ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি পত্র উদ্ধৃত করি :

২৪২ 'বঙ্গভাষার লেখক'—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় পৃ ৮৪৮

২৪৩ 'কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়' : 'অনুসন্ধান', ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

২৪৩ক হরনাথ বসু 'মহারাষ্ট্র-গৌরবে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্যত্রয়ে গোবর্ধন চরিত্রাঙ্কনে আমি প্রবীণ নাট্যকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলাম।' হরিশচন্দ্র সান্যাল 'কৃতজ্ঞতা' নিবেদন করিয়াছেন এইভাবে'... ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন-প্রণেতা এবং নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় অভিনয়োপযোগী করিবার জন্ত যত্নসহকারে আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।'

"গয়া

১লা শ্রাবণ ১৩২১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

'মানসী'র প্রীতি-সম্মেলনে সেদিন আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আপনার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ সাহিত্যাচার্যের নিকট হইতে আমার সামান্য রচনাগুলি সম্বন্ধে যে উচ্চ প্রশংসা এবং উৎসাহবাক্য আমি পাইয়াছি, তাহাতে নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। ইহা আমার অক্ষম সাহিত্যসাধনার আশাতীত পুরস্কার।

আমার কোন কোনও গল্প আপনি নাটকাকারে পরিবর্তন করিয়া লইবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাহাও আমার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমার এক সেট বহি আপনার জন্য রাখিয়া আসিয়াছি, আমার পুত্র বোধ হয় এতদিনে সেগুলি আপনার কাছে লইয়া গিয়াছে বা ২।১ দিনে লইয়া যাইবে। কোন্ কোন্ গল্প নাটকোপযোগী তাহা নির্দেশ করিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই, তবে আপনার অনুরোধ প্রতিপালনস্বরূপ, নিম্নলিখিত গল্পগুলির প্রতি আপনার মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছি :
'মানসী' হইতে 'লেডি ডাক্তার'। 'গল্পাঞ্জলি'—(১) 'বাল্যবন্ধু' (২) 'মাদুলী' (৩) 'রসময়ীর রসিকতা'। 'দেশী ও বিলাতী'—(১) 'আমার উপন্যাস' (২) 'প্রত্যাবর্তন'। 'ষোড়শী'—(১) 'সচ্চবিত্র' (২) 'খুড়া মহাশয়'। 'নবকথা'—(১) 'অঙ্গহীনা' (২) 'পত্নীহারা' (৩) 'বিষবৃক্ষের ফল'।
আপনি আমাকে যে বহিগুলি উপহার দিবেন বলিয়াছেন, সেগুলি যদি স্বহস্তাঙ্কিত করিয়া পাঠান তবে সমধিক প্রীতিলাভ করি।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন।

ভবদীয় গুণমুগ্ধ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়"*

জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পর অমৃতলাল যখন কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় অনুরূপা দেবী 'বিদ্যারণ্য' নামে একটি নাটক লিখিয়া তাঁহাকে দেখান—

"আমার 'বিদ্যারণ্য' নাটকখানা সেই সময়ের লেখা, দেখাইলে বলিলেন, 'পড় ত ভাই, শুয়ে শুয়ে শুনি।'

* পত্রটি অপ্রকাশিত

আগাগোড়া পড়িলাম, মধ্যে মধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। শেষকালে বলিলেন,—'দিদি! তোমার নাটকের ভাষা চমৎকার হয়েছে। ভাব ত' ভালই,— কিন্তু ক'জন মহামহোপাধ্যায় দর্শক অভিনয় দেখতে আসবে? থিয়েটারের ঠিক উপযোগী হয়নি, ওকে ভেঙ্গেচুরে গড়তে পারলে তবেই চলবে। আচ্ছা, আমি একবার দেখবো, তুমি ওটা আমায় দিয়ে যাও।' .. তাঁর আগ্রহে তাঁহাকে দিয়া আসিতে হইল।"[২৪৪]

সম্ভবতঃ অমৃতলাল 'বিদ্যারণ্যে'র অভিনয়োপযোগী নাট্যরূপ দিবার অবকাশ পান নাই। কারণ তাঁহার দীর্ঘ নীরবতায় মনঃক্ষুন্ন হইয়া অনুরূপা দেবী তাঁহাকে নিম্নের পত্রটি লিখিয়াছিলেন—

'৺

মজঃফরপুর
৬ই বৈশাখ

[পোস্ট মার্ক হইতে গৃহীত তারিখ ১৯. ৪. ১৯১৫]

সবিনয় নিবেদন,

আপনাকে নাটকখানি পাঠাবার পর আমি আরও একখানি কার্ড লিখেছিলাম, উত্তর না পেয়ে বড়ই দুঃখিত হয়েছি। আপনার নিকট হতে এর চেয়ে স্নেহ প্রত্যাশা করেছিলাম। বইটা তো কাশীতে আপনার ভালই লেগেছে বলেছিলেন! সেটা কি থিয়েটারের এতই অনুপযুক্ত? বড় হয়, কিছু বাদ দিয়ে তো চালাতে পারেন? দেশের লোকের রুচি কি শুধুই অর্থহীন হাসি তামাসায়? কেন, ভাল কথা কি আপনাদের বইতেই নেই? পত্রোত্তরটা এবার আশা করি। একটু শীঘ্র জানাবেন, মনে রাখবেন রঙ্গালয়ের উপর আমাদেরও কিছু দাবী আছে। আমার মাতামহ* বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই যত্ন নিতেন। আপনি কি তাঁর স্থানীয় নন?

আশা করি সমস্ত কুশল।

আপনার স্নেহের
নাতিনী
অনুরূপা'**

২৪৪ 'অমৃতলাল বসু'—অনুরূপা দেবী, মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৩৬

* 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

** পত্রটি অপ্রকাশিত।

এই পত্রের উত্তরে অমৃতলাল লিখিয়াছিলেন—

'দিদি,

তোমার প্রথম পত্র পাই নাই, পরের খানি পাইয়াছি। ১ম খানির প্রাপ্তির সময়ে আমি অসুস্থ ছিলাম (স্নায়বীয় অবসাদে প্রায় ৩ সপ্তাহ)। ২য় খানি লিচু আনিয়াছিল। মজঃফরপুরের কণ্টকিত-কলেবর সুন্দরীরা ঝাঁপির অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকায় কিছু মলিন হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তর বেশ সাদা, সরস ও সুমিষ্ট— আনন্দে খাইয়াছি ও বিলাইয়াছি।

আমার তৃতীয় পুত্রটি* ১৩ দিন শয্যাগত··· বিশ্বনাথ আমাকে আবার সংসারারণ্যে পাঠাইয়া এই বিড়ম্বনা ঘটাইয়াছেন।

থিয়েটারের পক্ষে এটা বড় বদ সময়, তোমার 'বিদ্যারণ্যে'র পাণ্ডুলিপি আমি রাখিয়া দিয়াছি, সিজনে অভিনয় করিবার চেষ্টা করিব, এখন দিলে ভাসিয়া যাইবে।··· মানসীতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত-সংকলিত আমার পূর্বস্মৃতি বাহির হইতেছে (বৈশাখ হইতে), তাহাতে নগেনের কথা থাকিবে, সুতরাং তোমার মাকে লিখিয়া যদি তার একখানা ফটো পাঠাইতে পার ত' ব্লক করিয়া চিত্র প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

তোমার বুড়ো দাদা।'[২৪৫]

. কিছুদিন পরেই অনুরূপা দেবী 'বিদ্যারণ্যের' অভিনয় সম্পর্কে জানিতে চাহিয়া অমৃতলালকে আর একটি পত্র লেখেন—

'মজঃফরপুর

মাননীয়েষু,

···বিদ্যারণ্য কতদিনে প্লে হবে? দৃশ্য এবং পোষাক যেন বেশ জাঁকাল হয়। ভাল করিয়া প্লে করুন, দেখুন নিশ্চয় ইদানীংকার অনেকের চেয়ে পয়সা হইবে।

মার শরীর বিশেষ অসুস্থ। শীঘ্রই কাশী যাইব। বিহিত সম্ভাষণ লইবেন।

বশম্বদা

শ্রীঅনুরূপা দেবী'**

* শশিভূষণ বসু

২৪৫ 'অমৃতলাল বসু'—অনুরূপা দেবী, মাসিক বসুমতী : ভাদ্র ১৩৩৬

** পত্রটি অপ্রকাশিত।

শেষ পর্যন্ত অমৃতলাল 'বিস্তারণ্যের' নাট্যরূপ দিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ দিবার আগ্রহ তাঁহার ছিল :

"আমার 'পোষ্যপুত্র', 'মন্ত্রশক্তি' ড্রামাটাইজ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, এ আমায় করতেই হবে। আমার দিদির লেখা আমি থাকতে আর কেউ করবে, সে হতে পারে না,— (অবশ্য এটি ঘটিয়া উঠে নাই, এবং তিনি থাকিতে আর কেহও করেন নাই, তাঁর মৃত্যুর পর অন্যের দ্বারা* হইবার উপক্রম হইয়াছে)।"[২৪৬]

কবি কামিনী রায়েরও ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার 'অম্বা' ও 'পৌরাণিকী' অভিনীত হয়। এ বিষয়ে তিনি অমৃতলালকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটিতে অভিনেতাদের সম্পর্কে দেশের লোকের মনোভাব কি ছিল তাহাও বর্ণিত হইয়াছে—

"৪২এ হাজরা রোড
বালীগঞ্জ, কলিকাতা
২৭শে মাঘ ১৩৩১

মান্যবরেষু,

আপনি বলিয়াছিলেন যে আমার 'আলো ও ছায়া' আপনার ভাল লাগিয়াছে। তাই তাহার পরবর্তী অন্য বইগুলিও আপনার ভাল লাগিতে পারে সেই আশায়, যে কয়েকখানা পাইলাম আপনাকে পাঠাইতেছি। আশা করি এগুলি পড়িবার অবসর পাইবেন এবং কেমন লাগিল আমাকে তাহা জানাইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আমি বিশেষভাবে 'অম্বা' ও 'পৌরাণিকী' আপনাকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।··· ইহা রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার যোগ্য কি না তাহা আমি জানি না। আপনি সে কথা ভাল বলিতে পারিবেন।··· 'পৌরাণিকী'তেও অভিনয়ের কথা না ভাবিয়া চরিত্র-অঙ্কনেরই চেষ্টা হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে আপনার মতামত শুনিবার জন্য আমার বিশেষ ঔৎসুক্য আছে।

* অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'মন্ত্রশক্তি'র নাট্যরূপ দেন। অমৃতলালের মৃত্যু-বৎসরেই (১৯২৯) নাটকটি স্টারে অভিনীত হয়—অভিনয়ের তারিখ ২৩এ নভেম্বর।

২৪৬ মাসিক বসুমতী : ভাদ্র ১৩৩৩

আপনি একদিন আমার সহিত হয়তো দেখা করিতে আসিবেন, আপনার কথায় এইরূপ মনে হইয়াছিল। যদি কখনও আসেন, বিশেষ অনুগৃহীত ও আনন্দিত হইব; এবং অভিনয়ে কাব্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা আপনার মত অভিজ্ঞ লোকের নিকট শুনিয়া উপকৃত হইব।

আপনি প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে কন্যাস্থানীয়া বলিয়া আমার স্বাভাবিক ভয় ও সংকোচ দূরীভূত করিয়াছেন। এক সময় ছিল যখন আপনাদের নাম আমাদের বিভীষিকা উৎপাদন করিত। বিধাতার আশীর্বাদে আমাদের দেশের সে দিনের আশ্চর্য পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে।...

আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

বিনীতা

শ্রীকামিনী রায়"*

অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া অমৃতলাল কখনও স্নেহাস্পদ ও বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিদের নাটক ভালমন্দনির্বিশেষে থিয়েটারে চালাইতেন না। নাটক নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও কঠোর ছিলেন। এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রলাল একবার তাঁহার প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'পাষাণী' নাটিকাটি রচনা করিয়া অভিনয়ার্থ অমৃতলালকে দেন। অমৃতলাল এই নাটকের পৌরাণিক চরিত্রগুলির আদর্শভ্রষ্টতা ও মহিমাচ্যুতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পুরাণের সংযমশ্রী লঙ্ঘিত হইয়া নারী-পুরুষের অবাধ প্রেম বিঘোষিত হওয়ায় অধ্যক্ষ অমৃতলাল ইহা স্টারে মঞ্চস্থ না করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী রচয়িতা নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখিয়াছেন—

'একবার ষ্টার থিয়েটারে ঐ নাটকখানি অভিনয় করাইবার প্রস্তাব হয়। উক্ত থিয়েটারের তৎকালীন অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য শ্রীঅমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, ঐ নাটকের পাত্রপাত্রীদের নাম পরিবর্তন করিয়া কাল্পনিক নাম দিলে তিনি ঐ নাটিকা অভিনয় করিতে পারেন— নতুবা নহে।'[২৪৭]

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্মত হন নাই— অমৃতলালও মঞ্চস্থ করেন নাই। নাটক কি ভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত হইলে দর্শকবৃন্দের অধিক হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহা অমৃতলাল যতটা বুঝিতেন ততটা তৎকালীন অপর কোন মঞ্চাধ্যক্ষ বুঝিতেন

* পত্রটি অপ্রকাশিত।

২৪৭ 'দ্বিজেন্দ্রলাল': পৃ ১০০

বলিয়া মনে হয় না। 'রাণা প্রতাপ' নাটক লইয়া এই কারণেই একবার দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২২এ জুলাই যখন স্টারে 'রাণা প্রতাপ' অভিনীত হয়, তখন অমৃতলাল নাটকের একটি দৃশ্যে গিরিশচন্দ্রের 'হলদিঘাটের যুদ্ধ' কবিতাটি :

'তিনটি কি চারিটি বিভিন্ন দূতের মুখে যুদ্ধ-বর্ণনাচ্ছলে জুড়িয়া দেন।... এই জোড়াটা রায় মহাশয়ের মনঃপূত হয় নাই।... অমৃতবাবু নাকি বলিয়াছিলেন যে, গিরিশবাবুর কবিতা দিয়া নাটকের মর্যাদা তিনি বাড়াইয়াছেন, কমান নাই।... প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পরেই রায় মহাশয় ষ্টারের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেন।'[২৪৭ক]

স্টার ত্যাগ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল মিনার্ভার মহেন্দ্র মিত্রকে অনুরোধ করিয়া পরের সপ্তাহেই (২৯এ জুলাই) মিনার্ভায় 'রাণা প্রতাপ' অভিনয় করাইলেন। এখানে 'হলদিঘাটের যুদ্ধ' কবিতাটি স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই প্রস্তাবনা হিসাবে কয়েক রাত্রি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। অপরেশচন্দ্রের ছিল শক্তসিংহের ভূমিকা (স্টারে এই ভূমিকা করিতেন অমৃতলাল)। অপরেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—'এ প্রতিযোগিতার সময়ে আমরা ঠিক জিতিতে পারি নাই।'

'রাণা প্রতাপে'র একটি হাস্যকর দৃশ্য অমৃতলাল বাদ দিয়াছিলেন। সেই দৃশ্য অনুযায়ী মিনার্ভায় শক্তসিংহরূপী অপরেশচন্দ্র সেলিমকে পদাঘাত করিতেই দর্শকবৃন্দ 'হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।' দ্বিতীয় রাত্রি হইতে এ প্রহসনের পুনরাবৃত্তি মিনার্ভায় হয় নাই। এই দৃশ্যের হাস্যকরত্ব নাট্যকারও বুঝেন নাই—

'রায় মহাশয়ও... বলিয়াছিলেন— 'আমি ওটা বুঝতে পারিনি।'[২৪৭খ]

অভিজ্ঞ অমৃতলাল পূর্বেই দৃশ্যটি বাদ দিয়া দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন।

নট, নাট্যকার, নাট্যাচার্য ও অধ্যক্ষ অমৃতলাল এইরূপে অর্ধশত বৎসরেরও অধিককাল বঙ্গ-রঙ্গালয়ের সেবা ও নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। যে-সমাজ অভিনেতৃকুলকে নিদারুণ ঘৃণা করিত, সেই সমাজের অপরিসীম সম্মান তিনি আদায় করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিতেন—

'এখন তো থিয়েটার এক রকম দাঁড়িয়েছে, কিন্তু একে দাঁড় করাতে আমাদের শিরদাঁড়া প্রায় ভেঙ্গে যাবার মত হয়েছিল। সমাজে আমরা

২৪৭ক 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৃ ৮৭

২৪৭খ ঐ ঐ পৃ ৯৩

ছিলাম অপাঙক্তেয়, যদিও থিয়েটারে হাততালি দিত সবাই। পয়সাকড়ির অভাব, নাটকের অভাব এতো লেগেই ছিল, তাই নিজেদেরই সব যোগাড় করতে হ'ত, লিখতে হ'ত। প্ল্যাকার্ড থেকে স্বরু করে নাটক পর্যন্ত। ত্বপুর বেলায় আবার মহলা দেওয়া। কি কষ্টই না করেছি! দাড়ি কামিয়ে সন্ধ্যে বেলায় থিয়েটারে ঢুকলুম, ভোরবেলায় আর এক প্রস্থ দাড়ি গজালে তবে বেরিয়ে আসতে হবে। শেষরাতে আবার প্ল্যাকার্ড মারার হাঙ্গামা। অর্ধেন্দুশেখর আর আমি কাগজ আর ময়দার লেই নিয়ে, মই ঘাড়ে রাতের অন্ধকারে প্ল্যাকার্ড মারতে বেরোতুম। ঘণ্টা দুয়েক আগেই মনে কর, সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যটা দিল্লীর সিংহাসনে বসে চালিয়ে এলুম, কিন্তু তার কিছু পরেই যে এই রকম ফকির হয়ে রাস্তায় কাগজ মারবো, একথা দর্শকরা জানতে পারলে বোধ হয় আর থিয়েটারমুখো হ'ত না কোনদিন। কিন্তু সব করতে হয়েছে আমাদের।'[২৪৮]

রঙ্গালয়ের প্রতি স্বাভাবিক মমতাবশতঃ তাঁহার বাসনা ছিল যে ছোট বড় সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনী-সম্বলিত একটি প্রামাণ্য রঙ্গালয়ের ইতিহাস যেন রচিত হয়। এ বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তিরূপে গিরিশচন্দ্রকে তিনি অনুরোধ করেন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন :

'যখন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর* শোকসভা সমাবেশিত হয়, তখন আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করি, ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, তিনিও তাঁহার হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং সেই শোকসভার অব্যবহিত পরেই তিনি আমায় একখানি পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করেন, যাহাতে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্যকলাপ বর্ণিত থাকে। অমৃতবাবু মনে করেন, আমার দ্বারা

২৪৮ 'বাংলা রঙ্গমঞ্চ'—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র : আনন্দবাজার পত্রিকা ৩০এ শ্রাবণ ১৩৬৭। অমৃতলালের মৃত্যুর পর শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, 'তিনি নটশ্রেষ্ঠ ছিলেন, নটনায়ক ছিলেন, তাই তিনি নটজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলেন. সমাজের কাছ থেকে তাঁর সম্মান আদায় করে নিয়েছিলেন।—একাজ আর কারুর দ্বারা হয়নি—স্বয়ং গিরিশচন্দ্র পারেন নি। তিনি সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছিলেন।—কিন্তু অমৃতলাল সমাজের সঙ্গে মিশে নটের সম্মান আদায় করেছিলেন।—অমৃতলাল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে নটকে জাতির মধ্যে বসিয়েছিলেন, সেইজন্য তাঁকে স্মরণ করি।'

* অর্ধেন্দুশেখর (জন্ম : ১০ই মাঘ ১২৫৮ বুধবার। মৃত্যু : ৩১এ ভাদ্র ১৩১৫ বুধবার)

অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্যকলাপ বর্ণিত হইলে এবং কোন্ সময় কি অবস্থায় তাহারা কার্য করিয়াছে, তাহা বিবৃত থাকিলে, এক প্রকার বঙ্গ-রঙ্গালয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিবে। এ পুস্তকে জীবিত ও মৃত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিষয় যাহাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়, ইহাই অমৃতবাবুর অনুরোধ। কিন্তু সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমি সাহস করি নাই।'[২৪৮ক]

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে সমাজ-অশ্রদ্ধেয় যে নটজীবন তিনি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন সেই জীবনাদর্শ হইতে তিনি কখনও ভ্রষ্ট হন নাই। ৭৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেও তিনি অভিনেতারূপে নাট্যানুরাগীদের অভিবাদন করিয়া মৃত্যুর নেপথ্যে প্রস্থান করিয়াছেন।

২০

নাট্যসাধনায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিলেও অমৃতলাল সাহিত্যসাধনায় কখনও বিরত ছিলেন না। বালক বয়সে তাঁহার সাহিত্যানুরাগ কিরূপ প্রকট হইয়াছিল তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্লেষ-রচনায় স্বভাবগত ঝোঁক থাকায় সেই অপরিণত বয়সেই রচনা করিয়াছিলেন 'একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা?' এবং 'মডেল স্কুল' নামক দুইটি নক্শা। এই শ্লেষ এবং রঙ্গই ছিল তাঁহার সাহিত্যসাধনার প্রধান অবলম্বন। দেশবাসীও তাঁহাকে 'ব্যঙ্গ সুনিপুণ' 'শ্লেষবাণ-সন্ধান-দারুণ' দেখিয়া 'রসরাজ' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছে। একথা সত্য যে অমৃতলাল নাটক-প্রহসনের মধ্যে ব্যঙ্গের অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়া পথভ্রষ্ট বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ করিবার প্রয়াস

২৪৮ক ৩রা আশ্বিন ১৩১৫, মিনার্ভা থিয়েটারে পঠিত প্রবন্ধ 'নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী'। গিরিশচন্দ্র অবশ্য প্রধান কয়েকজন অভিনেতা সম্পর্কে লিখিয়া গিয়াছেন, যেমন, মহেন্দ্রলাল বসু (রঙ্গালয়: ২ চৈত্র ১৩০৭), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (রঙ্গালয়: ১৩ বৈশাখ ১৩০৮), অঘোরনাথ পাঠক (রঙ্গালয়: জ্যৈষ্ঠ ১৩১১), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু): (রূপ ও রঙ্গ: ৫ পৌষ ১৩৩১ প্রথম প্রকাশিত) অমৃতলাল মিত্র (নাচঘর ১৩৩১ সালে প্রথম প্রকাশিত)। অমৃতলালও খ্যাত অখ্যাত অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীর মৃত্যুর পর 'স্মৃতির সম্মান' দিয়াছেন। অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির সম্পর্কে তো লিখিয়াছেনই, উপরন্তু গঙ্গামণি দাসী, প্রমদাসুন্দরী প্রভৃতি অভিনেত্রীর 'স্মৃতির আদর' করিতেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। (দ্রঃ অমৃত- গ্রন্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড পৃ ১৯৯-২০২)।

করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র এই সকল রচনারই মধ্যে অমৃতলালের সম্পূর্ণ পরিচয় মিলিবে না। প্রহসনগুলিতে তাঁহার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের অন্তরালবর্তী তীব্র বেদনা সর্বদা আমাদের লক্ষ্যগোচর হয় না। ফলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যায়।

নাটক-প্রহসনের কথা ছাড়িয়া দিলে অমৃতলালের বিচিত্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখা যায় সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত শতাধিক রচনায় এবং তাঁহার অপ্রকাশিত দিনপঞ্জীর জীর্ণ পত্রগুলিতে। দেশের নানাবিধ বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে তিনি যে কত গভীরভাবে চিন্তা করিতেন তাহা তাঁহার সর্ববিধ রচনায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার রচনার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা আমাদের বিস্মিত করে। ইংরাজী রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। এই সকল রচনার অধিকাংশই তাঁহার স্বহস্তলিখিত নহে। এ বিষয়ে তিনি নিজে একবার বলিয়াছিলেন—

'নিজের রচনা নিজের হাতে লেখা প্রায় আমার অভ্যাস নাই, কোন না কোন স্নেহশীল যুবকের অবসর মত লেখনীর সাহায্যের জন্য আমাকে সতত অপেক্ষা করিতে হয়।'*

নাট্যজগতে এমন বহুমুখী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী আর কেহ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সমকালে কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিতেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

'আমার মনে হয় আমাদের দেশে যে সকল প্রতিভাশালী লেখক জন্মিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি যত বই লিখিয়াছেন, যতদিন বঙ্গভাষা টিকিবে ততদিন সবগুলি টিকিবে কিনা বলিতে পারি না, তবে অনেকগুলি টিকিবে সেটি নিশ্চয়··· আশ্চর্য অমৃতবাবুর ক্ষমতা। পঁচাত্তর বৎসর বয়স হইল এখনও রস ফুরায় না। তিনি এখনও নিমে দত্ত অ্যাক্ট করেন। সেদিন বসুমতীর বার্ষিকীতে একটি গল্প লিখিয়াছেন, তাহাতে গাঁজায় দমটি দিয়াই এক বুড় বদমায়েস মরিয়া গেল।[২৪৯] রস আর কাহাকে বলে!

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।'**

---

* দ্রষ্টব্য বীরভূমে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ১৭শ অধিবেশনে (১৩৩২) সভাপতির সূচনা-বচন।

২৪৯ 'ব্যারণ অ্যাণ্ড পিপ্‌লাই কোম্পানী'—বার্ষিক বসুমতী, ১৩৩৪

** পত্রটি ১৯২৭ সনের ১৭ই নভেম্বর মজঃফরপুরের অতুলানন্দ সেনকে লিখিত।

অমৃতলালের অনেক রচনা সাময়িক ও দৈনিক পত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। অনেক রচনা 'ত্বরিত ভঙ্গুর' দৈনিক পত্রাদির বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনাবলীর (পুস্তক ও অন্যবিধ) একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

নাটক

হীরকচূর্ণ নাটক (১৮৭৫), তরুবালা (১৮৯১), বিমাতা বা বিজয়বসন্ত (১৮৯৩), হরিশ্চন্দ্র (১৮৯৯), আদর্শ বন্ধু (১৯০০), খাস-দখল (১৯১২), নবযৌবন (১৯১৪) ও যাজ্ঞসেনী (১৯২৮)

অনূদিত নাটক

রত্নাবলী (নাট্যমন্দির, ১৩১৭, অসমাপ্ত)

উপন্যাসের নাট্যরূপ

(রচনার বহুকাল পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত)

বিষবৃক্ষ (১৯২৫), চন্দ্রশেখর (১৯২৫), রাজসিংহ (১৯২৬) ও সরলা (স্বর্ণলতার নাট্যরূপ : ১৯৫১)

প্রহসন

চোরের উপর বাটপাড়ি (১৮৭৬), তিলতর্পণ (১৮৮১), ডিসমিশ (১৮৮৩), চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে (১৮৮৪), বিবাহ-বিভ্রাট (১৮৮৪), তাজ্জব ব্যাপার (১৮৯০), রাজা বাহাদুর (১৮৯২), কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা (১৮৯৩), বাবু (১৮৯৪), একাকার (১৮৯৫), বৌ-মা (১৮৯৭), গ্রাম্যবিভ্রাট (১৮৯৮) সাবাস আটাশ (১৯০০), কৃপণের ধন (১৯০০), অবতার (১৯০১), সাবাস বাঙ্গালী (১৯০৬), ব্যাপিকা-বিদায় (১৯২৬) ও দ্বন্দ্বে মাতনম্ (১৯২৬)

ইহা ব্যতীত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার আর দুইটি অভিনীত প্রহসনের নাম সম্মতি-সঙ্কট (স্টার : ২১.৩.১৮৯১) ও বাহবা বাতিক (স্টার : ২৫.১২.১৯০৪)।[২৪১ক]

২৪১ক এই প্রহসন দুইটি অমৃত গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত আছে।

নাট্যরাসক, পঞ্চরং ও একাঙ্ক নাট্যলীলা

ব্রজলীলা (১৮৮২), যাদুকরী (১৯০১) ও নবজীবন (১৯০২)

শোকনাট্য

বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন (১৮৯১) ও বৈজয়ন্ত-বাস (১৯০১)

নক্শা ও গল্প-প্রবন্ধ-কাব্যসংকলন

নিমাইচাঁদ (১৮৮৯) ও কৌতুক-যৌতুক (১৯২৬)

উপন্যাস (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত)

হামিদের হিম্মৎ (১৩৩৩-৩৪) ও যুবক-জীবন (১৩৩৪-৩৬)

কাব্য

অমৃত-মদিরা (১৩১০) ও ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাল্যলীলা (১৩৩৬)

জীবনস্মৃতি

পুরাতন প্রসঙ্গ—দ্বিতীয় পর্যায় (১৯২৩)

সাময়িক ও দৈনিক পত্রে প্রকাশিত রচনাবলী

(ক) গল্প, নক্শা, চিত্র, প্রবন্ধ, স্মৃতিপূজা, আত্মজীবনী প্রভৃতি — ঘরের কথা (ভারতী ১৩১২), গোকুল তুই ক্ষান্ত দে (নাট্যমন্দির, ১৩১৮), সৌন্দর্য (সৌন্দর্য, ১৩২১), লাউডারের কথা, এনকোর তত্ত্ব, শীব রহস্য (নাট্যমন্দির ১৩২১), শিরোমণির তীর্থযাত্রা (মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৩), চরকা (মা. বসুমতী, ১৩২৯) আত্মসমর্পণ (মা. বসুমতী, ১৩২৯), স্বরাজ-সাধনা (মা. বসুমতী ১৩২৯-৩০), বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদিন (মজলিস : ১৩২৯), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (মা. বসুমতী : ১৩৩০), বিসর্জন, চোখ গেল (মা. বসুমতী : ১৩৩০), পুরাতন পঞ্জিকা (মা. বসুমতী : ১৩৩০-৩১), হত্যাতেও কাঁদি, ফাঁসীতেও কাঁদি (মজলিস : ১৩৩০), অকাল বোধন (সোনার বাংলা :

১৩৩০)[২৫০] পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা (রূপ ও রঙ্গ : ১৩৩১), ফলার ফিলজফি, হেল অর্ডিন্যান্স (মা. বসুমতী ১৩৩১), পত্রিকা ও নাট্যশালা (সচিত্র শিশির : ১৯২৪), সারস্বত ব্রতকথা — মধুসূদন (মা. বসুমতী : ১৩৩১), আমার পূজা (মা. বসুমতী : ১৩৩২), ১৯৭৫ (বার্ষিক বসুমতী : ১৩৩২), গজুর ভজন (মা. বসুমতী : ১৩৩২), বঙ্গের অশ্রুজল (মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩২), মধু-মঙ্গল (বঙ্গবাণী : ১৩৩২), হোরিখেলা (আনন্দবাজার পত্রিকা : ফাল্গুন ১৩৩২), রূপকথা (মা. বসুমতী : ১৩৩২-৩৩), সেকালের কথা (ভারতী : ১৩৩৩), শুভদিন (বা. বসুমতী : ১৩৩৩), আবোল তাবোল (মা. বসুমতী : ১৩৩৩), ভুবনমোহন নিয়োগী (মা. বসুমতী : ১৩৩৪), ব্যারণ এণ্ড পিপলাই কোং (বা. বসুমতী : ১৩৩৪), ছুটির বৈঠক (উড়ো খৈ : ১৩৩৪), বাংলার কথা (বাংলার কথা : ১৩৩৪), অন্নপূর্ণা পূজা (বাংলার কথা : ১৩৩৪), তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে, (বাংলার কথা : ১৩৩৫), সপ্তমীর রাত (নাচঘর : ১৩৩৫), টুনটুনী (মা. বসুমতী ১৩৩৫),

ইহা ভিন্ন দৈনিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে অমৃতলালের নিম্নলিখিত রচনাবলী প্রকাশিত হয় :

মহাসমিতি, পৌষপার্বণ, বৃটিশ-বিদায়, প্রকৃতির প্রতিশোধ, স্বাধীনতার পথে, কচুরিপানা, ঘুষ ও ঘুষি, গ্রামদর্শন-ধানকুড়ে, নূতন দমকল, মেদিনীপুর দর্শন, চড়কপূজা, লুচিসন্দেশ, রান্নাঘর, খসড়াখাতা হইতে, বৃদ্ধের আশীর্বাদ। ঐ পত্রিকাতেই ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায় — জাতির প্রস্থান ও দলাদলির প্রবেশ, গ্রহণ, খেলাঘর ও নিতাইএর স্বপ্ন।

অমৃতলালের মৃত্যুর পর এই দুইটি রচনা প্রকাশিত হয় — বরণীয় বাঙ্গালী জীবন, (মা. বসুমতী : ১৩৩৬) ও বসিরহাট — ধান্যকুড়িয়া (পঞ্চপুষ্প : ১৩৩৬)

(খ) কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা, রঙ্গগীতি, ছড়া, গান প্রভৃতি —

রাতের চৌকিদার, তালের তত্ত্ব, (সমালোচনী : ১৩১০), স্মৃতির সম্মান (নাট্যমন্দির : ১৩১১), নববর্ষ (ভারতী : ১৩১২), পতিনির্বাচন (নাট্য-মন্দির : ১৩১৮), ষ্টার থিয়েটারে বিজয়া-সম্মিলনীর গীত (১৩১৮), তালের তত্ত্ব,

২৫০ 'সোনার বাংলা'র ৮ম সংখ্যায় (শনিবার ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০) এই রচনা প্রকাশিত হয়। অমৃতলাল নাম গোপন করিয়া 'শ্রীপথিকস্থ'—এই নামে লেখেন।

গঙ্গাতটে (জাহ্নবী : ১৩২১)[২৫১] ফ্যাসান (সৌন্দর্য : ১৩২১), কাঁঠাল (মা. বসুমতী : ১৩২৯), বঙ্গীয় নাট্যশালার পঞ্চাশৎ বাৎসরিক জন্মোৎসব সঙ্গীত (মা. বসুমতী : ১৩২৯), বাল্যের বেসাতি (মা. বসুমতী : ১৩৩০), আনন্দময়ী কেন দ্বন্দ্বময়ী[২৫২] (সোনার বাংলা : ১৩৩০), জাগো জাগো রাধানগরী (মা. বসুমতী : ১৩৩১), বিজয়া (বঙ্গবাণী : ১৩৩১), আস্তাবোলে অমৃতলাল (মা. বসুমতী : ১৩৩১), দাম্পত্য চণ্ডীপাঠ (মা. বসুমতী : ১৩৩২), ভৈরবী গেয়োনা এবং হৃদয়ের তান (মা. বসুমতী : ১৩৩২), নীরব ভেরীর রব (মা. বসুমতী : ১৩৩২), হারাধন অন্বেষণে (মা. বসুমতী : ১৩৩২), নিত্যজীবী চিত্তরঞ্জন (মা. বসুমতী : ১৩৩২), কবিতার কাতরতা (মা. বসুমতী : ১৩৩২), চুপি চুপি সারো পূজা (মা. বসুমতী : ১৩৩৩), তেত্রিশের ত্রাস (মা. বসুমতী : ১৩৩৩), শারদ শিশির (শিশির : ১৩৩৩) মাতৃপূজা, অপরাধী (মা. বসুমতী : ১৩৩৩), বড়দিনের গান (দৈনিক বসুমতী : বড়দিন, ১৯২৬), পাটকেল (দৈ. বসুমতী : ১৩৩৪), ব্যূহদ্বারে (আত্মশক্তি : ১৩৩৪), পৌষপার্বণ (মা. বসুমতী : ১৩৩৫), আক্ষেপ, এগজামিন, ফিংয়ের নাচন, ভারতচন্দ্র (মা. বসুমতী : ১৩৩৫)।

ইহা ব্যতীত নভেল-লিখন-প্রণালী, নব বন্দেমাতরম্, বিজয়াদশমী (১), অনুযোগ ও উত্তর, শোভাময়ী, আদর, ফাগুন, পূজার আব্দার, কেরাণীর আগমনী গীত, মুস্কিল আসান, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে কীর্তন (রূপক), বিজয়া-সঙ্গীত, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি, অপরাধ, বিজয়াদশমী (২), ভারতে ধর্মসংঘ, ফুলশয্যা প্রভৃতি কবিতা ও গান অমৃত-গ্রন্থাবলী ৪র্থ ভাগে মুদ্রিত আছে। ইহা ভিন্ন উক্ত গ্রন্থাবলীতে আরও অর্ধশত গান 'গানের ঝঙ্কার' বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং গঙ্গামণি দাসী, প্রমদাসুন্দরী, অমৃতলাল মিত্র, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি নাট্যসঙ্গিনী ও নাট্যসঙ্গীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত শোক-কবিতাগুলি 'স্মৃতির আদর' বিভাগে সংগৃহীত হইয়াছে। ১৩২২ সালের

২৫১ 'তালের তত্ত্ব' কবিতাটি এগার বৎসর পূর্বে সমালোচনী পত্রিকায় ১৩১০-এর ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'জাহ্নবী' পত্রিকার ১৩২১ এর চৈত্র সংখ্যায় 'গঙ্গাতটে' নামে যে কবিতাটি প্রকাশিত হয় তাহার দুই স্তবক পরে 'রাতের চৌকিদার' কবিতাটি শিরোনামহীন অবস্থায় বেমালুম জুড়িয়া গিয়াছে!

২৫২ কবিতাটিতে রচয়িতা অমৃতলালের সম্পূর্ণ নাম নাই। আদ্যক্ষর 'অ' রহিয়াছে।

চৈত্র মাসে (ইং ১৯১৬) এবং তাহার পরে অনুষ্ঠিত জেলেপাড়ার সঙের যে ছড়াগুলি তিনি লিখিয়াছিলেন তাহারও কয়েকটি উক্ত গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত রহিয়াছে।

১৩২৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ (১৯১৮) শোভাবাজার রাজবাটীর গোপীনাথ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হাফ্ আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রাম উপলক্ষে তাঁহার রচিত গানগুলি তাঁহারই সম্পাদিত বীণার ঝঙ্কার গ্রন্থে* (৮ম সং পৃ ৬০৮-৬১৮) সংকলিত হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে অপরের নাটকেও তিনি গান লিখিয়া দিতেন। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুঠাকুর প্রহসনের চতুর্থ 'রঙ্গে' জেলেনী-গণের যে গীতটি আছে তাহা অমৃতলালেরই রচনা। ভূপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন— 'গীতটি আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ নটকবি শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় কর্তৃক বিরচিত।' ক্ষীরোদপ্রসাদের সপ্তম-প্রতিমা নাটকের কতকগুলি গানও অমৃত-লালেরই রচনা ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।**

(গ) বক্তৃতা ও অভিভাষণ—

নাট্যশালা, নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতা ('অমৃতবাবুর বক্তৃতা'— রঙ্গভূমি : মাঘ ১৩০৭), বসিরহাট বাণী-সম্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ (পল্লীবাণী : চৈত্র ১৩২৭), নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ (ভারতী শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৩০), পাঠাগারে বক্তৃতা (বঙ্গবাণী : ভাদ্র ১৩৩১) : বাঁশবেড়িয়ার সাধারণ পাঠাগারের ৮ম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ, বীরভূমে অনুষ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির সূচনাবচন (মা. বসুমতী : চৈত্র ১৩৩২), মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত বিহার সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ (মা. বসুমতী : চৈত্র ১৩৩৩), ধলা, বীণাপাণি সাহিত্য সম্মিলনীর ৩য় বার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ (মা. বসুমতী : ফাল্গুন ১৩৩৪), মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের ১৬শ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ (মা. বসুমতী : চৈত্র ১৩৩৫)।

* গানগুলি গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য রচিত 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থেও (পৃ ৫১-৫৬) সংকলিত রহিয়াছে।

** প্রমথ চৌধুরী অমৃতলালের লেখা 'সবুজ পত্রে' ছাপিবার জন্য উৎসুক ছিলেন এবং লেখা যোগাড় করিবার জন্য হারীতকৃষ্ণ দেবকে একাধিক পত্র লেখেন। হারীতকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

(ঘ) **ইংরাজী রচনা—**

ইংরাজী রচনাতেও অমৃতলাল বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী রচনাবলীতে একপ্রকার দুর্লভ প্রসন্ন সাহিত্যিক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার এই সব রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল :

'Visarjan (An appreciation)'— 'Indian Daily News' : Sept. 4, 1923

'Looking Backward'— 'The Servant' : 7. 3. 1925

'Step Aside'— 'Calcutta Review' : August 1925

'The Puja in the Retrospective, its social and festive aspects'— 'Forward', Puja No. : 1926

'Christmas under the Sunshine'—'Forward', Congress No. : Dec. 1926. 'Ksherod Prosad, his contribution to Bengali Drama' — 'Forward' : 24. 7. 1927

'A stroll in the Hogg Market'— 'Municipal Gazette' : 19. 11. 1927

'A Divine Messenger' : 'Forward' : October 26, 1928

'Calcutta as I knew it once : Tales of a Grandfather' : 'Municipal Gazette' : Nov. 1928

'Social Evil in Cornwallis Street' ('The Bengalee' : 15. 3. 1903) নামক প্রস্তাবটিও উল্লেখযোগ্য।

২১

সাহিত্যসাধনা ও রঙ্গালয়-পরিচালনার সহিত তিনি বিদ্যালয়-পরিচালনার দায়িত্বও স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯০৭ সন হইতে স্টার রঙ্গালয়ের সহিত শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ও (পরে শ্যামবাজার এ. ভি.) তাঁহাকে পরিচালনা করিতে হইত। শৈশবের শিক্ষানিকেতন শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ের সহিত তিনি কোনদিনই সংযোগ ছিন্ন করেন নাই। কাশীতে হোমিওপ্যাথি-চর্চার

'৺অমৃতলাল বসুর কোন লেখাই আমি সবুজপত্রে ছাপবার জন্তে যোগাড় করতে পারিনি।' (দেশ : ২০এ কার্তিক ১৩৬৬)

অবকাশে কলিকাতায় আসিয়া অমৃতলাল এখানে অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করিতেন। তখন তাঁহার বয়স ১৯।২০ বৎসর মাত্র। কোন কারণে বিদ্যালয়ের ইংরাজীর শিক্ষক অনুপস্থিত হইলে অমৃতলাল তাঁহার ক্লাসে পড়াইতেন। তাঁহার ছাত্র ডাঃ চুনিলাল বসু লিখিয়াছেন—

'তাঁহার ইংরাজী উচ্চারণ অতি সুন্দর ছিল এবং তিনি যে পাঠ দিতেন, তাহাতে আমরা সবিশেষ লাভবান হইতাম।'[২৫৩]

শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

'তিনি যেদিন প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়া ইংরাজী কবিতা পড়াইতেন সেদিন ছাত্ররা তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া তন্ময় হইয়া যাইত...'[২৫৪]

ইংরাজী কবিতা বিশেষতঃ শেক্‌সপীয়র পাঠ ও আবৃত্তির বিশেষ প্রবণতা তাঁহার ছিল। তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক H. W. B. Moreno অমৃতলালের সপ্তসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে ৩১এ মার্চ ১৯২৯* তাঁহাকে যে পত্রটি লেখেন তাহার একস্থলে ইহার আভাস আছে। তদ্‌ভিন্ন একজন বিদেশী অমৃতলালের কিরূপ গুণমুগ্ধ ছিলেন তাহাও পত্রটি হইতে জানিতে পারি। পত্রটি এই :

"Telephone Cal. 2767 — 2, Wellesley Square
Calcutta 31st March, 1929.

My dear and valued friend of many days,

May I offer my heartiest felicitations on your coming 77th birth anniversary? We have been friends together and your histrionic and academic talents have always drawn my admiration and devotion for you. These are not the days, my dear friend, when Shakespeare and greater artists are studied so closely as when you and I were younger. These modern days of young men are days when they are satisfied with a little here and a little there. In those days, my good friend, days and

---

২৫৩ 'অমৃত-স্মৃতি' : মাসিক বসুমতী : শ্রাবণ ১৩৩৬

২৫৪ 'অমৃতলোকে অমৃতলাল' : ঐ ঐ

* ঐ বৎসরই ২রা জুলাই অমৃতলালের মৃত্যু হয়।

nights were spent in the study, perhaps, of one play like 'Hamlet', and only then was it considered mastered when every line was understood with all its various readings and annotations. Perhaps the only great artist who did it in England was the late Sir Henry Irving, who taught me to recite and whose pupil I still am proud to call myself. I remember when you and I sometimes spent an evening or so over Shakespeare in the side-room of the Star Theatre. You are getting old and so am I; and it is the wish of my heart, for the future, that the name of Amrita Lal Bose will be to the last day of his life as popular as it was when he wrote and acted his own dramas and comedies, winning the applause of thousands of admirers.

If this letter be some source of consolation to you in the evening of your days, it is to be its own reward.

With continued expression of my friendship and admiration for your good self,

Your very devoted friend,
H. W. B. Moreno
(Henry William Burn Moreno)*

১৯০৭ সনে এই বিদ্যালয়ের ভার একটি সমিতির উপর ন্যস্ত হইলে অমৃতলালকে সম্পাদক করিবার প্রস্তাব হয়। অমৃতলাল এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কারণ কম্বুলিয়াটোলার মৈত্র-বংশ পুরুষানুক্রমে এই বিদ্যালয়ের সম্পাদকতা করিতেন এবং তখনও ওই বংশের একজন জীবিত ছিলেন বলিয়া অমৃতলাল তাঁহাকেই সম্পাদক করিয়া নিজে তাঁহার সহকারী হন। অবশ্য সম্পাদকের যাবতীয় কার্য তিনিই প্রথম হইতে করিতেন। ১৯১৩ সনে সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর বিশেষ দক্ষতার সহিত বিদ্যালয়ের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

* পত্রটি অপ্রকাশিত

সম্পাদকরূপে তিনি বিদ্যালয়ের সহিত প্রত্যক্ষ এবং অন্তরঙ্গ যোগ চিরদিনই রাখিয়াছিলেন। প্রধান শিক্ষকের "Daily Report Register" বা "Log Book"এ নিয়মিত নোটিস লিখিতেন অমৃতলালই। ছুটি প্রভৃতি মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকেই নোটিস লিখিতে হইত। তিনি শুধু পঞ্জিকা মিলাইয়াই ছুটি দিতেন না— ছুটি দিবার উপযুক্ত মনে করিলে বিশেষ কারণেও বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতেন। একটি দুর্ঘটনা উপলক্ষে ১৯২৩ সনের ২৬এ জুন তিনি এইরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন :

'Tragedy at the Mahomedan Orphanage.

A dreadful event occurred at a Mahomedan Orphanage situated in Syed Sally's Lane off the Central Avenue yesterday afternoon. The building suddenly collapsed and 37 innocent lads were killed outright; 40 or more seriously injured. The joys and sorrows of children ought to be shared by children of the same age. In order to give their souls a lesson in brotherly sympathy, our school is to be dismissed at once and let the pupils return home in mournful silence.

27th June, 1923. Amrita Lal Bose.'

সম্পাদক থাকাকালীন বিদ্যালয়ের গচ্ছিত অর্থের সহিত নিজের সংগৃহীত অর্থের যোগে বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে ত্রিতল অট্টালিকাটি নির্মাণ করেন। মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ (প্রায় ৬০,০০০ টাকা) সংগ্রহ করিয়া ত্রিতল ভবনটি সম্পূর্ণ করেন। তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকর্তা W.W. Hornell বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন—

'I congratulate Amrita Babu on the splendid new building which is now completed.'

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে স্কুলটিকে তিনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করেন।*

* প্রধান শিক্ষকের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি : 'The Senior Department in the new block opens from this day (3.1.1924) with five pupils only as new admission...'

হর্ণেল পরে হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। অমৃতলালের সহিত তখনও তাঁহার বন্ধুত্বের সূত্র যে ছিন্ন হয় নাই, নিম্নের পত্রটি তাহার নিদর্শন। পত্রটিতে শ্যামবাজার এ.ভি. স্কুল সম্পর্কে কয়েকটি কথা আছে :

'The Vice Chancellor's Lodge
University of Hongkong,
January 20th, 26.

My dear Amrita,*

...I also have the fondest recollections of the Shambazar School and my last visit there with Dr. Dunn [Dr. T. O. D. Dunn হর্ণেলের পরে D.P.I. হন]···I am glad that your school is now a high school recognised by the University of Calcutta. I wish it every prosperity and may you live long to enjoy life and cherish the school. There are not very many old gentlemen like you left—more is the pity.

* * *

I am, with all best wishes,

Yours very sincerely,
W.W. Hornell.' **

শিক্ষাবিভাগের Dunn, Gunn, Oaten প্রভৃতি সকল পদস্থ ব্যক্তিই অমৃতলালের গুণমুগ্ধ ছিলেন। বিদ্যালয়ভবন নির্মাণের ব্যাপারে সরকারী সাহায্য সত্ত্বেও কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ চাঁদা তুলিয়া আংশিকভাবে এই ব্যয়জনিত ঋণ পরিশোধ করেন।

* সম্বোধনটি লক্ষ্য করিবার মতো। হর্ণেল সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় ইহার অনেকদিন পূর্ব হইতে। ১৯১৪র ৭ই মে দার্জিলিঙের 'The Ridge, No. 1' হইতে তিনি অমৃতলালকে যে পত্রটি লেখেন (অপ্রকাশিত) তাহা উল্লেখযোগ্য—"Dea Babu Amritalal Basu, Thank you very much for the two Books—'Khas-dakhal' and 'Naba-jouban', which have reached me safely. I only wish I had more time to study Bengali. However, I hope some day to read these plays of yours."

** পত্রটি অপ্রকাশিত

দেশের শিক্ষাসমস্যা সম্পর্কেও অমৃতলাল অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচরণ সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির মতো শিক্ষক বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে বলিয়া তাঁহার সর্বদাই একটা ক্ষোভ ছিল। তিনি মনে করিতেন শিক্ষকগণের স্থান সমাজের যে স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার জন্য শিক্ষকরাই দায়ী—

'...সেকালে গুরু মহাশয়গণের মধ্যে অনেকেই অসভ্যের ন্যায় হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া হুঁকা হাতে পড়াইতে বসিতেন। সকল সময় তাঁহাদের গালাগালিগুলিও সাহিত্যসঙ্গত হইত না।...কিন্তু যাহা কিছু শিক্ষা দিতেন, তাহা পাকা করিয়াই দিতেন। তাঁহাদের পাঠশালায় প্রায় backward boy থাকিত না। সে রকম বালককে হয় বিচুটির চোটে একেবারে পাঠশালা ত্যাগ করিয়া পলাইতে হইত অথবা গুরুমহাশয়ের শিক্ষার আঁটাআঁটিতে নিদান মাঝামাঝি forward এর দিকে অগ্রসর হইতে হইত।... এখন শিক্ষক বলিয়া একটা জাতিরই অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে, বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকতা অনেকে অনন্যোপায় হইয়াই করেন। যেমন ইদানীং ব্রাহ্মণের ঘরে যে বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারে না, প্রায় তাহাকেই শালগ্রামকে নৈবেদ্য নিবেদন করিতে ও যজমানের বাপের শ্রাদ্ধ করাইতে নিয়োজিত করা হয়, তেমনি যাঁহার ইংরাজী আপিসে তেমন চাকরীর যোগাড় হয় না, তিনিই অনেক সময় নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকতা করিতে আইসেন। দেশের শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট করজোড়ে নিবেদন, আমায় মার্জনা করিবেন, আমি শিক্ষকদিগের জন্য দুঃখই করিতেছি, তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছি না, শিক্ষকবংশে আমার জন্ম, শিক্ষকের নিন্দা করিলে আমার পিতৃনিন্দার পাতক হয়; আমি নিজেও এক সময় শিক্ষকতা করিয়াছি। বাংলায় Normal School অনেকদিন হইতেই আছে। ইদানীং L.T.,B.T. ডিগ্রিরও সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু যথার্থ শিক্ষক সেই সব শিক্ষালয় হইতে কয়জন বাহির হন?'[২৫৫]

বিদ্যালয়গুলির জন্য নির্দিষ্ট বিরস পাঠ্যপুস্তকের উপর অমৃতলাল যথেষ্ট বীতরাগ ছিলেন:

'...পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন, কত বালকের পাঠ্যপুস্তকের

২৫৫ পল্লীবাণী: চৈত্র ১৩২৭ (সভাপতির অভিভাষণ: বসিরহাট বাণী-সম্মিলনী)

নীচে এক একখানি বাজারে উপন্যাস খোলা আছে, পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যদি সে উপন্যাসের মাধুর্য ও আকর্ষণী শক্তি অনুভব করিতে পারে, তবে কি তাহার ঐ সাহিত্যিক কদন্ন ভোজনে প্রবৃত্তি হয়?...'[২৫৬]

সুতরাং গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়া বালকের মনে শিক্ষার আগ্রহ জাগ্রত করিতে হইবে, ইহাই ছিল অমৃতলালের মত। তিনি বলিয়াছেন—

'...উপন্যাসেই শিক্ষারম্ভ করা যে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি, তা গ্রীসের ঈস্‌প ও ভারতের বিষ্ণুশর্মা অনেকদিন আগে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। উপন্যাসের ছলে রামায়ণ মহাভারতের সত্য বিবৃত করে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস লোকশিক্ষার অমর গুরু হয়ে রয়েছেন। এই শেষ বয়সে বাঁধা-ধরা কর্মজীবন থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে আমি কলকাতার একটি প্রাচীন বিদ্যালয়ের কার্যে সংশ্লিষ্ট রয়েছি; আর সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত কেবল প্রার্থনা করি যে, কবে ভগবান শিক্ষাবিভাগকে সুমতি দেবেন — যাতে ভাল ভাল উপন্যাস [রবিনসন ক্রুসো, গালিভার্স ট্রাভেলস্‌, এ ট্রিপ টু দি মুন প্রভৃতির অনুরূপ] বেছে তাঁরা পাঠ্যপুস্তকে পরিণত করেন।...'[২৫৭]

পাঠ্যপুস্তক রচনার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁহার একটা অভিযোগ ছিল:

'অমিত-তেজ-হৃদয় বিদ্যাসাগর কি কখনও কাহাকেও ভয় করিতেন, নিজের বিবেকবিরুদ্ধ হইলে তিনি কি রাজাধিরাজেরও আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইতেন? তবে কেন তিনি জাতীয়-ভাবশূন্য পাঠ্যপুস্তক লিখিলেন? Fort William Collegeএর সাহেব সিভিলিয়ানদের পড়াইবার জন্য তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি, সীতার বনবাস লিখিয়াছিলেন, আর বাঙ্গালীর ছেলের পাঠ্যপুস্তকের জন্য কেন তাঁহার লেখনী Rudiments of Knowledge, Moral Class Book, Chamber's Biography অনুবাদ করিল?...'[২৫৮]

অনেক সময়ে যে আবার শিক্ষার্থী অপেক্ষা পুস্তক বিক্রেতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তক নির্বাচন করা হয়, তাহা অমৃতলাল জানিতেন। 'স্বাধীনতার পথে—বিশ্ববিদ্যালয়' নামক প্রবন্ধে সে কথা তিনি লিখিয়াছেন—

২৫৬ মাসিক বসুমতী: চৈত্র ১৩৩২ (বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির সূচনা-বচন)

২৫৭ মাসিক বসুমতী: চৈত্র ১৩৩৩ (বিহার সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ)

২৫৮ পল্লী-বাণী: চৈত্র ১৩২৭

'…বিশ্বসৌধের সিঁড়ির প্রথম ধাপ হইতে আরম্ভ করিয়া চিলের ছাদে পৌছান পর্যন্ত পুস্তক বিক্রেতার তুষ্টি ও পুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যখন কি সিনেট, কি সিণ্ডিকেট, কি টেক্‌সট বুক কমিটি দেশে শিক্ষা বিস্তারকল্পে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন ইংরাজ বলিলেন, যাও, এইবার তোমরা চরে খাও গে, আর আমাদের ভয় নাই।…'[২৫৯]

অমৃতলাল লক্ষ্য করিয়াছিলেন বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকে 'পয়ার ছন্দে'র কবিতার নামে অনেক ছন্দোদুষ্ট অর্থহীন কবিতাও ছাত্রদের পড়িতে হইত। পাঠ্যগ্রন্থে কবিতার এই দুর্গতি দেখিয়া তিনি রহস্যচ্ছলে কয়েকটি 'আদর্শ কবিতা' লেখেন, যদিও অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি সর্বত্র যতিভঙ্গ করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ছাত্রগণের কর্তব্য' নামক কবিতার কয়েকটি পংক্তি
করি—

'…শিক্ষকেরা লিখিবেন যতগুলি বই।
মনোযোগ দিয়া সব ক্রয় করা চাই॥
* * *
যত ক্রয় কর বই বিদ্যা বেশী হয়।
শিক্ষক আর সরস্বতী সন্তুষ্ট উভয়॥'[২৬০]

২২

শ্যামবাজার এ.ভি. স্কুলকে তিনি তাঁহার আবাসে পরিণত করিয়াছিলেন। প্রত্যহ বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে এবং রাস্তার ধারে তাঁহার বসিবার ঘরটিতে একটি বড় মজলিস বসিত। অমৃতলাল প্রায় প্রতিদিনই অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা-১১টা পর্যন্ত এখানে থাকিয়া নানাপ্রকার আলোচনা করিতেন। এই মজলিসের মধ্য দিয়া তিনি সে যুগের সহিত এ যুগের একটি যোগসূত্র গাঁথিয়া দিয়াছিলেন। ছোট বড় সকলের সহিত মিশিবার তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'সতীর পতি' উপন্যাসে অমৃতলালের এই

২৫৯ দৈনিক বসুমতী : ৮ই ফাল্গুন ১৩৩৫
২৬০ 'অমৃত-মদিরা' পৃ ১৫৭-১৬০

মজলিসের একটি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। 'প্রতিভাশালী নাট্যকার ও ক্ষণজন্মা অভিনেতা' অমৃতলালের নিকট তাঁহার উপন্যাসের দুইটি চরিত্র আসিয়াছেন এবং

'নটচূড়ামণি মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ইঁহাদিগকে বসাইলেন। কাগজ-পত্র যাহা তিনি দেখিতেছিলেন, একপার্শ্বে সরাইযা রাখিয়া ইঁহাদের সহিত সদালাপে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সরল অমায়িকতা, সরল বাক্যবিন্যাস সর্বোপরি প্রতিভায় সমুজ্জ্বল তাঁহার বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় বিপিনবাবুকে মোহিত করিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন শুধু নাটক বা থিয়েটারের বিষয় নহে— নানা বিষয়ে যে সকল মন্তব্য তিনি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা যেমন সারগর্ভ ও সুচিন্তিত, তেমনি বিশুদ্ধ রসিকতায় ওতপ্রোত। দেখিতে দেখিতে দুই ঘণ্টাকাল কোথা দিয়া যে চলিয়া গেল, তাহার হদিশ পাওয়া গেল না।'[২৬১]

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'নামজাদাদের মধ্যে' তাঁহার 'অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে ভাল কথা-কইয়ের' তালিকায় অমৃতলালের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়া লিখিয়াছেন—

'শ্যামবাজারের স্কুল-প্রাঙ্গণে অমৃতবাবুব সঙ্গে কথা কইতে দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে।'[২৬২] অমৃতলালের 'মজলিসী কথাবার্তা' ধূর্জটিপ্রসাদকে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিত: 'অমৃত বোস মশাই আমার কাছে প্রধানতঃ মজলিসী মানুষ ··। তাঁর মজলিসী কথাবার্তায়, তাঁর জ্ঞানের বহুমুখিতায়, তাঁর রসিকতায় মুগ্ধ হন নি এমন লোক দেখি নি।'[২৬৩]

বৈঠকী আলাপে কৃতী, সামাজিক অমৃতলাল সম্পর্কে স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর অভিমত নিম্নরূপ :

'...অমৃতলালের ন্যায় বৈঠকী আলাপে কৃতী এবং ইচ্ছুক শক্তিশালী সামাজিক আমি অল্পই দেখিয়াছি। গল্পে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন বিদ্যাসাগর মহাশয় আর পারিতেন দীনবন্ধু মিত্র। তারপর অমৃতলালের সমকক্ষ আর দেখি নাই।'[২৬৪]

এই ধরণের বৈঠকী আলাপ সম্পর্কে অমৃতলালের নিজেরও সুস্পষ্ট অভিমত ছিল, এবং তিনি তাহা এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—

---

২৬১ 'সতীর পতি' (চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ : মনীষী-সঙ্গমে) পৃ ১৯৩-৯৪

২৬২ 'মনে এল' পৃ ৩৩

২৬৩ ঐ পৃ ১০৭

২৬৪ ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৭

'সামাজিক বৈঠকে বসিয়া জন্‌সন্‌, গ্যারিক, থ্যাকারে, ডিকেন্স প্রভৃতি মনীষিগণ কত রসের কথা কহিয়া গিয়াছেন; সাময়িক বন্ধুরা তাহার অনেকই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে উহা পুস্তকের পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়া আমরা কতই না আনন্দ উপভোগ করি, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম প্রভৃতির কত মজার কথা,—মজা অথচ জ্ঞানানন্দপ্রদ—কিন্তু সে সব কথা একেবারে চিরদিনের জন্য হারাইয়া গিয়াছে।... আমাদের—এই কাঙ্গাল অভিনেতাদের—কতক কতক কথাও হয়তো বাসি হইলে খাটিয়া যাইবে।'[২৬৪ক]

অমৃতলাল বলিতেও পারিতেন অনর্গল। বাগজল্পনার একটানা স্রোতে কৌতুকোচ্ছল রসফেনিল তরঙ্গের অভাব ঘটিত না এক মুহূর্ত। কিন্তু একই রসিকতা তিনি বারংবার করিতেন না। প্রতি মুহূর্তেই তাঁহার নূতন নূতন রসের কথা জোগাইত—ফলে সর্বক্ষণই শ্রোতাকে হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া থাকিতে হইত—

'অথচ সকল কথাতেই চাবুক থাকতো, সেটা হাসিমুখেই সকলে হজম কোরতো।...দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া, আবার তাই দিয়েই খুসি করে দেওয়া, এ ক্ষমতা বড়ই বিরল।...মনে হয়, রসরাজ আমাদের Lay of the last minstrel শুনিয়ে এবং দিয়ে গেলেন।'[২৬৫]

গ্রে স্ট্রীটে 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে'র আলোচনা-বৈঠকে অমৃতলালের মজলিসী আলাপ শুনিয়াছিলেন সাহিত্যিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্মৃতিকথা বিবৃত করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

'ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরে অপরাহ্ণ পাঁচটায় উপস্থিত হতেন রসরাজ অমৃতলাল ...বসুমতীর বৈকালী আসরে বসে তাঁদের আমলের নাট্যশালার কথা ও কাহিনী বলতেন, আর আমরা সকলে তন্ময় হযে শুনতাম। বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগের সকলেই সে সময় কাঁচ-দিয়ে-ঘেরা সুদৃশ্য সম্পাদকীয় কক্ষ ছেড়ে সামনের দিকে সারি সারি কেদারা-পাতা মজলিসে বসতেন রসরাজেব মুখের কথা শোনবার আগ্রহে। বাইরে থেকেও বহু নামকরা সাহিত্যিক ও সম্পাদক আসতেন পুরাতন কথা শোনার আকর্ষণে। যেমন,

২৬৪ক অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা' গ্রন্থের ভূমিকা

২৬৫ 'অমৃতাস্বাদ' — কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৩৬

নাট্যকার রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, বঙ্গবাণীর বিহারীলাল সরকার, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কি ক'রে বঙ্গীয় নাট্যশালার সৃষ্টি হয়, স্রষ্টাদের মধ্যে কে কি ভাবে কাজ করেছেন, এঁদের আগে কলকাতার অভিজাতবর্গ যে সব থিয়েটার করেন, তাঁদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য, আদি অভিনেত্রীদের কথা, এমনি বহু বিষয় নিয়ে তিনি যখন গল্প বলার ভঙ্গীতে বলতেন, আমরা সকলেই স্তব্ধ হয়ে শুনতাম।'[২৬৫ক]

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধরণের মজলিসের উল্লেখ করিয়াছেন, সে ধরনের সাহিত্য-মজলিস অমৃতলালকে কেন্দ্র করিয়া স্টার থিয়েটারে এবং পরবর্তীকালে শ্যামবাজাব এ. ভি. স্কুলে বসিত। ইহা ব্যতীত শোভাবাজার রাজবাটীতে কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের উদ্যোগে যে সাহিত্য-মজলিস বসিত, অমৃতলাল ছিলেন তাহারও কেন্দ্রস্থ ব্যক্তি। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের এই সাহিত্য-মজলিসই বোধ হয়, ১৩৩৫ সালে 'অমৃত-চক্রে' রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই অমৃত-চক্রের উদ্যোগে অমৃতলালের জীবদ্দশায় দুইবার তাঁহার জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম জন্মোৎসব হয় ৬ই বৈশাখ, ১৩৩৫ সালে। সভাপতিত্ব করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পরবর্তী উৎসব হয়, তাঁহার সাতাত্তর বৎসর বয়সে, ১৩৩৬এর ৬ই বৈশাখ। এই সভায় সভাপতি ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁহার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতি বৎসর ৬ই বৈশাখ সমাজের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সভাপতিত্বে তাঁহার জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইত।

২৩

অমৃতলাল মনে প্রাণে সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। নাট্যজগতের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও তিনি কোনদিন একান্তবাসী ছিলেন না। সাধারণতঃ রঙ্গালয়ের অভিনেতৃকুল সমাজের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমাজকে এড়াইয়া চলেন। গিরিশচন্দ্র এই কারণেই সভাসমিতিতে বড় একটা যাইতেন না, বলিতেন—

২৬৫ক দেশ: ১লা ভাদ্র ১৩৬৯

'সভা যাঁরা করেন তাঁরা আমাকে পাবার জন্যে ব্যস্ত নন। আর যেতেও আমার ইচ্ছা হয় না। উচ্চশিক্ষিতরা থিয়েটারে আমাদের অভিনয় দেখে খুশী হন বটে, কিন্তু বাইরে মনে মনে আমাদের ঘৃণা করেন। তাই তফাতে থেকেই মান বাঁচাতে চাই।'[২৬৬]

সমাজঘৃণিত এই নটজীবন বরণ করিয়া অমৃতলালকেও 'নিজ পরিবার মাঝে বিরক্তি কারণ' ও 'কুটুম্বসমাজে লজ্জা নিন্দার ভাজন' হইতে হইয়াছিল। তথাপি 'দেশের দশের' 'শ্লেষ-ব্যঙ্গ-হাসি'তে ভীত হইয়া তিনি 'তফাতে থাকিয়া মান বাঁচাইতে' চাহেন নাই। সমাজের নিকট হইতে তাঁহার প্রাপ্য সম্মানটুকু আদায় করিয়া লইয়াছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহিত মিশিয়া। সমাজকে তিনি ত্যাগ করেন নাই বলিয়া সমাজও তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত এই কারণেই অমৃতলালকে 'a beloved social figure' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২৬৬ক] কি সাহিত্য-বাসরে, কি রাজনৈতিক জনসভায়, কি রঙ্গালয়ের বক্তৃতা-মঞ্চে—সর্বত্রই তাঁহার আমন্ত্রণ ছিল। নাট্যসাধনার প্রথম পর্ব হইতেই তিনি সমাজের সকল স্তরে আপন স্থান করিয়া লইয়াছিলেন।

১২৯৩ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখি সমিতি' নামে যে মহিলা সভা স্থাপন করেন তাহার অন্তর্গত 'মহিলা শিল্পমেলায়' কেবল মাত্র মহিলাদের দ্বারা নাটকের অভিনয় হইত। এই অভিনয়ের ব্যাপারে অমৃতলাল নানাপ্রকার সহায়তা করিতেন। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন—

'সেই অভিনয়ে অমৃতবাবু আমাদের অনেক প্রকারে সাহায্য করিতেন। দৃশ্যপট সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, আমার একখানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করা এবং এ সম্বন্ধে অন্যান্য বহুবিধ কার্যের ভার তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার যত্নে— তাঁহার সাহায্যে আমাদের অভিনয়কার্য বেশ সহজসাধ্য হইয়াছিল। এই সূত্রে তাঁহাকে আমি সাহিত্যবন্ধুরূপে প্রাপ্ত হই। ক্রমে সেই বন্ধুতা আত্মীয়তায় পরিণত হয়।'[২৬৭]

২৬৬ 'যাঁদের দেখেছি' (২য়), হেমেন্দ্রকুমার রায়, পৃ ২৬

২৬৬ক Drama : 'Studies in the Bengal Renaissance', P. 283.

২৬৭ মাসিক বসুমতী : শ্রাবণ ১৩৩৬। মহিলা শিল্পমেলার রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য অমৃতলালের ১২৯৭ সালে লিখিত 'পর্দার পশ্চাতের পত্র' (অমৃত গ্রন্থাবলী, ৪র্থ ভাগ)

ব্রাহ্মদের কিছু কিছু গোঁড়ামি ও আতিশয্যকে তিনি তাঁহার রচনায় তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেও ঠাকুরবাড়ীতে অমৃতলালের সমাদরের অভাব কখনও হয় নাই।* ১৩০৪ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ভারত-সঙ্গীত-সমাজে' রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ'এর অভিনয় দেখিবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ অমৃতলাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান। তাহার একস্থলে আছে—

'…বসুজ অমৃতলাল পুরিয়া প্রাণের থাল,
স্নেহ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা দেয় উপহার ॥…'[২৬৭ক]

১৯০৫ সনে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের 'খেয়াল' হইয়াছিল 'পূর্ণিমা-মিলনে'র : প্রতি পূর্ণিমায় সাহিত্যিকদের এক সমাবেশ। অমৃতলালও এই 'খেয়ালে' যোগ দিয়াছিলেন। সেবার ঝুলন-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় অমৃতলালের উদ্যোগে স্টার থিয়েটারে বসিয়াছিল 'পূর্ণিমা-মিলনে'র আসর।

বস্তুতঃ লোকের সহিত মিশিবার একটা আগ্রহ তাঁহার বরাবরই ছিল। 'একাকার' প্রহসনে (১৩০১) তিনকড়ি মামার প্রসঙ্গে নিজের কথাই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন—

'জান তো, বুড়ো চিরকালই একটু লোকজন ভালবাসে, এই বড়দিন উপলক্ষে বিস্তর ভদ্রলোকের পায়ের ধুলো তার ওখানে পড়বে, জনকতক বিদেশী বড় বড় লোকেরও আসবার কথা আছে। তাঁদের অভ্যর্থনা, আমোদ-টামোদ দেবার জন্য বুড়ো ভারী ব্যস্ত, তার মাথার ঠিক নেই।'

হইতে পাওয়া যাইবে। ইন্দিরা দেবীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থেও এ সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে। স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পর্কে অমৃতলালের প্রীতিপ্রসন্ন মনোভাব তাঁহার 'কৃপণের ধন' প্রহসনের এক স্থলে ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কুন্তলা বলিতেছে —'মেয়েমানুষ যদি লেখাপড়া শেখে, যেন স্বর্ণকুমারীর মতই শেখে। দেখ দেখি কেমন লিখেছেন, যেখানটা পড়ি সেইখানটাই মিষ্টি।'

* তাঁহার অনেক প্রহসনে ব্রাহ্মদের ভাবভঙ্গী ও গোঁড়ামিকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্মদের সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন বিরাগ ছিল না। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকনাথ মৈত্র, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি ছিলেন তাঁহার আত্মীয়তুল্য।

২৬৭ক 'সঙ্গীতসমাজের নিমন্ত্রণে' : 'অমৃত-মদিরা' পৃ ২৯

স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ থাকাকালীন অনেক সময়ে তিনি থিয়েটারের ভিতরে না বসিয়া সাধারণের সহিত মিশিবার জন্য বাহিরের দিকে বসিতেন। 'পত্রিকা ও নাট্যশালা' প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—

> 'আমি একটু রাস্তা দেখিতে ভালবাসি, আর লোকজনও আমার সঙ্গে অনুগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন বলিয়া সকালে বিকালে বাহিরের দিকে বসিতাম, স্বভাবতঃই দুই-দশজন আসিয়া আমার সঙ্গী হইতেন।'[২৬৮]

মনে হয়, তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া দেশের লোক তাঁহাকে যতটা জানিয়াছে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী জানিয়াছে তাঁহার সহিত কথা কহিয়া। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিয়াছেন—

> '…অমৃতলালকে দেখেছি আমরা বহু সভাসমিতিতে এবং সাহিত্যিক ও শিল্পীদের বৈঠকে। যে কোন সভা তাঁর উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো· ·।'[২৬৯]

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। দেশীয় করদ নৃপতি ও ভূম্যধিকারীদের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল গভীর। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত তাঁহার ছিল যথেষ্ট হৃদ্যতা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি বিদ্বজ্জন ছিলেন তাঁহার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, জলধর সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, অনুরূপা দেবী, কামিনী রায় প্রভৃতি সাহিত্যসেবী ছিলেন তাঁহার গুণমুগ্ধ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কের সহিত তাঁহার নিয়মিত সাক্ষাৎ ও অন্তরঙ্গ পত্র বিনিময় চলিত। এমন কি কলিকাতার তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজের অত্যন্ত পদস্থ ব্যক্তিবর্গও যে তাঁহাকে কতটা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন তাহা তাঁহাদের পত্রাবলী

২৬৮ সচিত্র শিশির : বড়দিন সংখ্যা ১৯২৪
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন —'এ আসরে উপস্থিত হয়ে আমিও পেতুম বসবার জন্য চেয়ার। ওঁদের নানা কথা আমি শুনতুম…অভিনয়, নাটক নিয়ে আলোচনা…তা ছাড়া সমাজতত্ত্বের কথা।' (সচিত্র শিশির : বৈশাখ ১৩৩৪)

২৬৯ 'যাঁদের দেখেছি' (২য়), পৃ ৪১

হইতে প্রতীয়মান হয়। স্যার ডেভিড ইউল তো একটি পত্রে তাঁহাকে 'the Irving of the East' আখ্যাই দিয়াছিলেন।*

সমাজের নানা স্তরের বিভিন্ন মনোভাবসম্পন্ন লোকের সহিত আমৃত্যু সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া চলা কম ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নহে। তিনিই প্রথম এবং একমাত্র 'থিয়েটারের লোক' সমাজ যাঁহাকে সসম্মানে এবং সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিল।

বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেরও সহিত অমৃতলালের সংযোগ ছিল। তিনি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব-প্রতিষ্ঠিত দাতব্যসভার (শোভাবাজার বেনেভোলেণ্ট সোসাইটির) সভ্যরূপে এবং কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের সহায়করূপে দুঃস্থের সেবা করিয়া গিয়াছেন।** ১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে যখন 'ইংরেজীপড়া ছেলেদের মনে বাংলা পুস্তক পড়িবার প্রবৃত্তি জাগরণের জন্য সাধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা' হয়, তাহারও সহিত অমৃতলালের 'ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল'।[২১০]

তৎকালীন শাসক সম্প্রদায়ও জানিতেন যে অমৃতলাল বাঙালী সমাজের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি। তাই লাটভবনের এবং লাটসাহেব কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত।***

---

* ১৯১২ সনের ৮ই জানুয়ারীতে লেখা পত্রটির আরম্ভ এইরূপ :

'My dear friend,

How can I thank you for your graceful words. I do feel honoured indeed to receive such a letter from your pen — 'the Irving of the East'.

** অমৃতলাল রাজা বিনয়কৃষ্ণের এই প্রকার 'স্বদেশের হিতসাধন চেষ্টার' উল্লেখ করিয়া 'আদর্শ বন্ধু' নাটকটি তাঁহাকে উৎসর্গ করেন।

২১০ ১৩৩২ সালে বীরভূম সাহিত্য-সম্মেলনে তাঁহার ভাষণ দ্রষ্টব্য।

*** এইরূপ দুইটি নিমন্ত্রণপত্রের নিদর্শন —

১। 'The Private Secretary to H. H. the Lieutenant Governor is commanded to invite
Babu Amritalal Bose
to a
Durbar at BELVEDERE, at 4-30 P.M., on the 7th December, 1897, for the investiture of certain gentlemen on whom Titles have been conferred by His Excellency the Viceroy and Governor General of India.'

দেশকে ভালবাসিবার, দেশের সেবা করিবার আগ্রহ নিতান্ত বালক বয়স হইতে অমৃতলালের মনে বদ্ধমূল হয়। এ বিষয়ে তাঁহার প্রথম দীক্ষা নবগোপাল মিত্রের নিকট। বয়সে তিনি তখন 'দশকের থাক' অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে লিখিত 'প্রজানীতি' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধের সূত্রপাত তিনি করিয়াছিলেন এইভাবে—

'কিঞ্চিদধিক ৬০ বৎসর পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ স্বল্প কতিপয় প্রধান পুরুষের ব্যবস্থায় ও নবগোপাল মিত্রের পৌরোহিত্যে ন্যাশনাল বা জাতীয়তা নামে রাজনীতি পূজার যে ঘটস্থাপনা করা হইয়াছিল এবং যে পূজার জন্য দশকের-থাকে-স্থিত আমরা কয়েকটি কিশোর — পুষ্পচয়নে, চন্দনঘর্ষণে, ধূপদীপাদি প্রজ্বলনকার্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেই ঘটপূজা ক্রমে প্রতিমা হইতে প্রতিমান্তরে পরিণত হইতে হইতে কংগ্রেসের দুর্গোৎসব সমারোহে দেশকে উৎসব-রবে মাতাইয়া তুলিয়াছিল।'[২১০ক]

ক্রমে তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সুগভীর পর্যবেক্ষণ তাঁহার স্বাদেশিকতাকে অপর সকলের দেশহিতৈষণা হইতে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট রূপ দান করে। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের সময় নিষ্ক্রিয় থাকেন নাই। দেশের অতি প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক দুর্গতি-দুর্দশার সমাধান-প্রয়াসই তাঁহার নিকট দেশসেবার বড় আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সুরেন্দ্রনাথের সহযোগীরূপে তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন, গান লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় ও গানে ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা অতিবাস্তব সমস্যাগুলিরই প্রতি ইঙ্গিত আছে।

তাঁহার দেশপ্রেম বা স্বাদেশিকতা বঙ্গদেশকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত

২। 'The Lieutenant-Governor
requests the honour of
Babu Amritalal Bose's company
at a
Garden Party
On Monday, the 28th February [1898], at 4-30 p.m.'

২১০ক 'প্রজানীতি', দৈনিক বসুমতী, ১৩৩৫

হইয়াছিল। তিনি 'নবজীবন' নাট্যে 'ভারতমাতা'র দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত দিলেও রাজনীতিক্ষেত্রে বঙ্গজননীকেই অধিক চিনিতেন। তিনি 'স্বজাতি বলিতে ভারতবাসী অপেক্ষা বাঙালীকেই বুঝিতেন বেশী। নিজেও বলিতেন সে কথা—

'সারা ভারতবর্ষটা এক করে আঁকড়ে ধরবার মত প্রশস্ত বক্ষঃস্থল আমার নেই, তাই আমার সমস্ত ভালবাসাটা চিরজীবন ধরে বাঙ্গালার নামে—বাঙ্গালীর নামে উৎসর্গ করে দিয়ে রেখেছি।'[২৭১]

বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির সহিত বাংলা ভাষাকেও তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন :

'আমার বাংলা ভাষাকে আমি বড় ভালবাসি, সকল বাঙ্গালীই বাসেন, কিন্তু আমি যেন বড্ড ভালবাসি ; আমার ভাষাকে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী ভালবাসেন, একথা মনে হলে আমার যেন একটু ঈর্ষা, একটু গায়ের জ্বালা হয়। শুধু বাংলা ভাষাকে কেন, আমি বাংলা দেশকেই ভালবাসি, বাঙ্গালীকেই ভালবাসি। আমি ভারতবাসী হতে পারি, কিন্তু Indian নই, আমি বাঙ্গালী।'[২৭২]

এইজন্য তাঁহার নাটক-প্রহসনে বাংলা দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়, এবং বাঙালীর চরিত্রগত, পরিবারগত ও শিক্ষাগত, নানাপ্রকার সমস্যার অবতারণা দেখিতে পাই। বাঙালী-চরিত্রেও তিনি নানা দিক হইতে আলোক-পাত করিয়া ত্রুটি ও অসঙ্গতিগুলি আমাদের দেখাইয়া দিয়াছেন: সাহেব বাঙালী, ফিরিঙ্গি-ভাবাপন্না শিক্ষিতা বাঙালী নারী, পুত্রের বিবাহে পণলোভী বাঙালী, চাকুরীলোভী ও আত্মসম্মানত্যাগী বাঙালী, ভোটদ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত বাঙালী, ভণ্ড দেশহিতৈষী বাঙালী, উপাধিলোলুপ বাঙালী, বকধার্মিক বাঙালী ইত্যাদি। আদর্শভ্রষ্ট নকলনবিস বাঙালীকে আত্মস্থ করিবার সাধনাকেই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেম এইভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছিল।

পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার প্রভাবে দেশসেবা ও পরোপকারের নামে আমরা কি ভাবে আত্মবঞ্চনা করিয়াছি তাহা তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় নাই—

২৭১ ১৩৩৩ সালে মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনে অমৃতলালের ভাষণ দ্রঃ।

২৭২ ১৩২৭ সালে বসিরহাটে বাণী-সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে অমৃতলালের ভাষণ দ্রঃ।

"ইংরাজের শিক্ষা ও সংসর্গের প্রভাবে আমাদের সর্বাপেক্ষা বলবান হইয়াছে পরোপকার প্রবৃত্তিটি ; এই সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজনাতে আমরা গর্ভধারিণী মাতাকে পাঁচ টাকা মাসহারা বন্দোবস্তে কাশী পাঠাইয়া সস্ত্রীক শকটারোহণে দেশমাতার 'বন্দমাতা' গাহিয়া বেড়াই ; এই পরোপকারব্রতে মত্ত হইয়াই আমরা সহোদর ভ্রাতার নামে হাইকোর্টে মোকর্দমা রুজু করিয়া দিয়া প্রয়াগে, আগ্রায়, কানপুরে ভাই খুঁজিয়া আলিঙ্গনের আকুলতায় কাঁদিয়া ফিরি…।"[২৭৩]

এই সুতীব্র বাঙালীয়ানাই তাঁহার দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার স্বাদেশিকতা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ন্যায় বাঙালীরই কল্যাণচিন্তায় মূর্ত হইয়াছে।

'স্বরাজ-সাধনা'[২৭৪]নামে তিনি যে দীর্ঘ প্রবন্ধটি (অসমাপ্ত) এক সময়ে লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বক্তব্য ছিল এই যে, আমরা যে-স্বরাজ লইয়া এত মাতামাতি করিতেছি উহা মূলে হুবহু বিলাতীর অনুকরণ, এবং পরধর্ম বলিয়াই উহা আমাদের মনুষ্যত্ব নাশ করিতেছে। উহা ক্রমেই প্রাণহীন, শক্তিহীন ও ধর্মহীন হইয়া পড়িবে ; কারণ জাতির চিরাগত সাধন ও সংস্কার এবং তাহার চরিত্র-নিহিত যে ধর্মজ্ঞান তাহার উপরেই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা না হইলে এ জাতি আত্মভ্রষ্ট হইবে ; আত্মভ্রষ্ট হইলে স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না।

'বাল্যের বেসাতি' কবিতায় এই কথাই লিখিয়াছিলেন,

> '…স্বদেশ স্বদেশ স্বরাজ স্বরাজ যতই মুখে ফুটছে।
> দিশি খাদ্য দিশি বাদ্য দিশি গন্ধ ততই শিকেয় উঠছে॥
> হারমনিয়ম নিয়ম এখন হয়েছে হরিনামে।
> গুমর করে কুমোর গড়ে দেবী বিবিঠামে॥
> ইউনিটি ইউনিটি করে ভিরকুটী করি মুখে।
> বিদ্বেষের উদ্দেশে আগুন লকলকাচ্ছে বুকে॥…'[২৭৫]

---

২৭৩ 'অকাল বোধন' — সোনার বাংলা, ১৯এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০। 'বাবু' প্রহসনে (১৩০০) দীর্ঘকাল পূর্বেই অমৃতলাল দেখাইয়াছেন, দেশহিতৈষী ষষ্ঠীচরণ মায়ের মাসিক তিন টাকা খোরাকি হইতে (দুইটি একাদশীর দরুণ) তিন আনা কাটিয়া লইয়া মাকে বলিতেছে — 'আমি খুব মাতৃভক্তি করতে জানি, ভারতমাতার জন্ত আমি দিনরাত ব্যতিব্যস্ত …'

২৭৪ মাসিক বসুমতী, ১৩২৯-৩০

২৭৫ ঐ ভাদ্র, ১৩৩০

এই অন্তঃসারশূন্য দেশহিতৈষিতার বহ্বারম্ভ ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যালের মধ্যে অমৃতলাল ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। একজন দুর্গত গ্রাম্য মণ্ডলকে ষষ্ঠী বলিতেছে —

'দেখছি তোমরা অতি অসভ্য জায়গায় থাক; দেশহিতৈষিতায় কি কি দরকার, কিছুই জাননা; তোমাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করতে যাব, আমি ইনটারমিডিয়েটে গেলে আমায় চিনবে কে? ফার্ষ্ট ক্লাশে যাবার আসবার টিকেটের দাম ঠিক কর, আর আমি কেলনারের হোটেলে খাব, লেকচার দেব, তার জন্য একজন ফিরিঙ্গি রিপোর্টার এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে, তার সেকেণ্ড ক্লাশের ভাড়া, আর ফি যে ক'টাকা নেয়। তারপর আমি যে যাচ্ছি, তার জন্য রাজসাহী, ঢাকা, যশোর, পাটনা, বেনারস, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সিলোন, বিলেত আর যে যে জায়গায় আমাদের ব্রাঞ্চ-সভা আছে, সেখানে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে…।'*

কিন্তু মানুষের অসঙ্গত আচরণের ব্যঙ্গমণ্ডিত সমালোচনাই শুধু নহে, তাহার চরিত্রগত মহত্বের প্রশংসা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া 'লিবার্টি' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছিল —

'While he had no patience with shams and unrealities, his admiration for real nobility and greatness in his people was spontaneous and sincere. That explains why the author of *Babu* produced *Sabash Atas* or Bravo Twenty-eight'.[২৭৬]

* 'বাবু' : ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

এই প্রহসনটি ইংরাজীতে অনূদিত হওয়ায় অমৃতলালের শ্লেষ ও উদ্দেশ্য অন্য প্রদেশবাসীও উপলব্ধি করিয়াছিল। পণ্ডিত হরিনাথ দে 'দি হেরাল্ড' পত্রে ১৯০৯ সনে প্রথম 'বাবু'র ইংরাজী অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। ১৯১১ সনে নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনূদিত 'The Babu' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'কৃপণের ধন' প্রহসনেও দেখিতে পাই অমৃতলাল প্রসঙ্গ সৃষ্টি করিয়া মধুখুড়োকে দিয়া বলাইয়াছেন — 'আমা হতে দেশের উপকার চাও তো — সব গাঁজা ধরাও। এই যে সভা করে দেশের উপকার — না খেয়ে গেঁজেলি, আমায় বড়ই বিরক্ত করেছে।'

২৭৬ 'In memorium' : The Liberty : 3.7.1929.

অমৃতলাল যে শুধু তাঁহার রচনাদির দ্বারা বাঙালী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সক্রিয়-ভাবেও তিনি তাঁহার আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তৎকালীন এক সভায় উপস্থিত ছিলেন সুসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখিয়াছেন,

'...[অমৃতলাল] আসছেন শুনে আলোমবাজারে বহু জনসমাগম হয়; আমিও উপস্থিত হই।...এই ধপ্‌ধপে লোকটির যুবাকণ্ঠের আন্তরিক উচ্ছ্বাস, ভাষার সরস আচ্ছাদনে, সকলের অন্তরেই দারুণ অপমানের সাড়া জাগিয়ে প্রতিবিধানের জন্য বদ্ধপরিকর ক'রে দিয়েছিল।...আমি কেবল লক্ষ্য করছিলুম তাঁর কথাগুলি। তারা যেন উৎসমুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত, চিন্তা-চেষ্টা-চর্চার ধার ধারে না!'[২৭৭]

এই বক্তৃতায় তাঁহার শেষ কথা ছিল বিলাতী-বর্জন। এই সময়ে লেখা 'সাবাস বাঙ্গালী' নামক নক্‌শায়ও বিলাতী-বর্জনের কথা তিনি বলিয়াছেন। 'ওরা জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান' এই গানটিতেও তিনি ওই একই পথ নির্দেশ করিয়াছেন, বাঙালীকে স্বাবলম্বী হইবার মন্ত্র দিয়াছেন।

একদা শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজকল্যাণ, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হইত অ্যাল্‌বার্ট হলে। জাতীয়তাবোধে জনচিত্ত উদ্বুদ্ধ করিবার মানসে অমৃতলালও বক্তৃতা করিবার জন্য অ্যাল্‌বার্ট হলে আহূত হইতেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিয়াছেন —

'বর্তমান শতকে...রসরাজ অমৃতলাল বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, এনি বেসাণ্ট, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ মনীষী ও নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে।'[২৭৭ক]

এইসব কারণে অমৃতলাল শাসক সম্প্রদায়ের বিশেষ সুনজরে ছিলেন না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জের মিটিবার পূর্বে (১৩১৯) 'চন্দ্রশেখরে' ইংরাজ-নিন্দা আছে এই অজুহাতে পুলিশ কমিশনার অমৃতলালকে অভিনয় বন্ধের নোটিশ দিয়াছিলেন।[২৭৮]

২৭৭ মাসিক বসুমতী : ভাদ্র ১৩৩৬

২৭৭ক 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র' পৃ ১৭৪

২৭৮ 'পুরাতন পঞ্জিকা' — মাসিক বসুমতী : ফাল্গুন ১৩৩১

'প্রজানীতি' (১৩৩৫) প্রবন্ধের একস্থলে অমৃতলাল লিখিয়াছেন — '৫৬ বৎসর পূর্বে যখন

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন ফরিদপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ হয় তখন অমৃতলাল স্টারের সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যালের সহায়তায় একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। চাঁদা তুলিয়া এবং স্টারে সাহায্য-রজনীর ব্যবস্থা করিয়া প্রায় বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই সাহায্য-রজনীর ব্যাপারে 'বেঙ্গলী' অফিস হইতে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া এই পত্রটি লেখেন—

'The Bengalee 70, Colootola Street,
Calcutta 3. 7. 1906

My dear Amrita Babu,

I do hope you will give a benefit night in aid of the famine-stricken sufferers of East Bengal. I am sure, you will do so, having regard to the keen personal interest which you have taken in the matter.

I hope you are in good health.

Yours affly,
Surender N. Banerjea'*

বক্তা হিসাবে তাঁহার অত্যন্ত সুনাম ছিল বলিয়া সকলেই তাঁহাকে আহ্বান করিতেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

'কোন সভায় বা কোন বক্তৃতামঞ্চে তাঁহাকে দেখিলে লোকে আনন্দে উৎফুল্ল হইত। আর কেবল কলিকাতায় কেন, বাঙ্গালা, বিহার, পশ্চিম—কোথায় না তাঁহাকে লইবার জন্য দেশের লোক ব্যস্ত হইত?'[২৭৯]

নীলদর্পণের প্রকাশ্য অভিনয় করি, তখন হাতে দড়ি পড়িবে ভাবিয়া মনকে তাহার জন্ত বেশ কড়া করিয়া গড়িয়া রাখিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে সে আনন্দ নীলদর্পণ না দিলেও বছর চারি পরে অন্ত কোন নাটক আমাকে দিয়াছিল।' নাটকটি 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী', 'হাতে দড়ি'র কারণ ইংরাজকে বিদ্রূপ।

* পত্রটি অপ্রকাশিত।

২৭৯ মাসিক বসুমতী : শ্রাবণ ১৩৩৬

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল ১৯২৭ সনের এক বিবেকানন্দ স্মৃতিসভায় প্রধান বক্তারূপে অমৃতলালকে দেখিয়াছিলেন —

'প্রধান বক্তা দুইজনের কথা মনে আছে, রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং মনীষীপ্রধান বিপিনচন্দ্র পাল।...ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা অনেক কথা বলিলেন।' — 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতবর্ষ' — শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৭০।

তাঁহার 'নবজীবন' নাট্যের (১৯০২) প্রথম দৃশ্যে যে ভাগলপুর কন্‌ফারেন্সের উল্লেখ আছে, সেই কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া নিমন্ত্রণ করা হয়।[২৮০]

তাঁহার বাগ্মিতাশক্তি সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন—

'তাঁহার কথায় পর্যাপ্ত রসিকতা থাকিত, কিন্তু সেগুলি প্রতিভাদীপ্ত বাচালতা নহে, তাঁহার বক্তৃতা ছিল হিতগর্ভ। তাঁহার বক্তৃতার লক্ষ্য ছিল লোকশিক্ষা। বড় বড় বাগ্মীর বাক্যপল্লব ও আড়ম্বরময়ী ভাষা অমৃত-বাবুর বক্তৃতার পর বিফল হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাঙ্গা আসর জোড়া দিতে পারিতেন, এবং তাঁহার বক্তৃতার পর আর কেহ আসর জমাইতে পারিত না। যেমন কীর্তনের পর আর কথকতা জমে না, অমৃতবাবুর বক্তৃতার পর ভাল ভাল বক্তার কথা আর জমিত না।'[২৮০ক]

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথও জনসাধারণের উপর তাঁহার বক্তৃতার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৯২৩ সনের ৩০এ নভেম্বর যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচন-দ্বন্দ্বে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সুরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী হন, তখন তাঁহার নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য অমৃতলালকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ নিম্নের পত্রটি লেখেন—

'Barrackpore
2/11/23

My dear Amrita Babu,

You have always been a good friend to me in my troubles, and you were kind enough to promise to attend a meeting which my rival candidate Dr. Bidhan Roy was going to hold against me. We did not requisition your good services as we knew that the meeting would prove

২৮০ এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, '১৯০০ সনে ভাগলপুরের বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব।...রাজা বিনয়কৃষ্ণ টেলিগ্রাম পাঠালেন অমৃতলালকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করে।...পরের দিন অমৃতলাল বক্তৃতা করেছিলেন তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর রেলযাত্রীদের দুর্দশার বৃত্তান্ত বর্ণনা করে।' (সচিত্র শিশির : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪)

২৮০ক 'অমৃত-স্মৃতি' — মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬

a failure even without your support. Dr. Bidhan is going to hold a meeting to-morrow Saturday, at 5 P.M. at Cossipore. I shall deem it a great favour if you would kindly attend and speak. The necessary arrangements for your conveyance will be made by me.

I hope you are quite well.

I am

Yours faithfully,

Surender N. Banerjea.

P. S. I have asked Bepin Babu* also to come and support me.

S. N. B.'**

অমৃতলালের বাগ্মিতা ও সুরেন্দ্রনাথের পত্রটির প্রসঙ্গে নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

'বাগ্মীরাজ বর্ক (Burke) যত বড় বক্তাই (orator) হোন,—শেরিডানের বক্তৃতায় সমগ্র দেশবাসী যেরূপ মন্ত্রমুগ্ধ হইত, বর্কের বক্তৃতায় সেরূপ হইত না। ইহার কারণ অন্য কিছুই নয়, শেরিডান থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট (নাট্যকার ও অধ্যক্ষ) ছিলেন বলিয়া বিশেষ রকমই জানিতেন, দর্শকবৃন্দকে কেমন করিয়া মুগ্ধ করিতে হয়। আমাদের বঙ্গ রঙ্গালয়ে রসরাজ অমৃতলাল ছিলেন এই শেরিডানেরই প্রতীক।'[২৮০খ]

অমৃতলালের স্বাদেশিকতার অন্যতর বিশিষ্ট প্রকাশ হইয়াছে বাংলার প্রাচীন রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা ও অনুরাগে। অনেকে এইজন্য তাঁহাকে সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থী বলিয়া মনে করেন। এ বিষয়ে অমৃতলালের নিজের বক্তব্য এই :

'বুড়ো অমৃতলাল পুরানো বুলি বলে বলিয়া একটা অপবাদ রটিয়াছে ; অর্থাৎ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মনে করেন, অপবাদ ঘোষণা করিতেছি। কিন্তু অমৃতলাল নিজে মনে করেন যে, ইহা অপেক্ষা প্রশংসাবাদ তাঁহার পক্ষে আর

* বিপিনচন্দ্র পাল।

** পত্রটি অপ্রকাশিত

২৮০খ 'অভিনয় শিক্ষা' — পৃ ২৯

বেশী কিছু নাই। চল্লিশ বৎসরের পুরাতন চাউল, একশত বৎসরের ঘৃত, তেঁতুল, পুরাতন আকবরী মোহর, শাল, জামেয়ার, মেহগ্নি কাঠের খাট, পুরাতন কাঁঠাল কাঠের সিন্ধুক আমার ঘরে থাকিলে যেরূপ গর্ব করিতাম, প্রাচীন জ্ঞান, প্রাচীন জ্ঞানীদের বচনের সারার্থ সংগ্রহ করিয়াও আমি সেইরূপ গর্বিত হই।'[২৮১]

এই মনোভাবহেতু আমাদের 'জেলেপাড়ার সঙ'কেও তিনি কোনদিনই হেয় জ্ঞান করেন নাই। বাংলা দেশের সমাজজীবনের এক একটা দিক ফুটিয়া উঠিত চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বাহির হওয়া এই 'জেলেপাড়ার সঙে'। সঙ যে হীন নয়, ছোট নয়, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ১৩২২ সালের চৈত্রসংক্রান্তিতে (ইং ১৯১৬) অনুষ্ঠিত 'জেলেপাড়ার সঙে'র ছড়াগুলি তিনি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।[২৮১ক] জেলেপাড়ার সঙের প্রধান উদ্যোক্তা জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাসের অনুরোধেই তিনি ইহা করেন।

পরেও তিনি নিয়মিতভাবে ছড়া লিখিয়া দিয়াছেন, যেমন ১৯১৭ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র চুরির ব্যাপার লইয়া 'বিদ্যার মন্দিরে সিঁদ'। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিয়াছেন, অমৃতলালের এই সব ছড়াই—

> 'সঙের ছড়া ও গানের আদর্শ হইয়া রহিল। পরে নানা সঙের জন্য ছড়া ও গান বাঁধিবাব সময়ের অভাব ঘটিলে তাঁহারই পরামর্শে সঙের পরিচালকগণ অন্যান্য লেখকের নিকট যাইতে লাগিলেন।'[২৮২]

অমৃতলাল-রচিত সঙের ছড়ার বিশিষ্টতা সম্পর্কে 'বসুমতী'-সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন,

> 'জেলেপাড়ার সঙের ছড়ায় বর্তমান যুগের বাঙ্গালীর জীবনসমস্যা—সমাজবিভ্রাট লইয়া যে সকল অতুলনীয় চিত্র সমাজতত্ত্বজ্ঞ কবিবর অমৃতলাল কবিতায় সুঅঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন—তাহাও সাহিত্যের আসরে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।'[২৮২ক]

বাংলা দেশের প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধার বশে ১৩২৫ সালের ২১এ ও ২২এ অগ্রহায়ণ শোভাবাজারে মহারাজা নবকৃষ্ণদেবের 'ঠাকুরবাড়ি'র প্রাঙ্গণে

---

২৮১ 'প্রজানীতি' : দৈনিক বসুমতী : ১৩৩৫

২৮১ক 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' (৬৭) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৬২

২৮২ গল্পভারতী, চৈত্র ১৩৬১

২৮২ক মাসিক বসুমতী : শ্রাবণ, ১৩৩৬

যে হাফ-আখড়াই সংগীত-সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সংগ্রামে কাঁসারীপাড়ার দল 'আসর' লইয়াছিলেন এবং 'উত্তরী' ছিলেন জোড়াসাঁকোর দল। কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসুর শিষ্য শশিভূষণ দাস ছিলেন কাঁসারীপাড়ার 'বাঁধনদার' এবং অমৃতলাল বাঁধিয়াছিলেন জোড়াসাঁকোর গান। এই সংগ্রামে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় নাই। তবে অমৃতলাল রচিত বিরহের গানগুলি কাঁসারীপাড়ার গান অপেক্ষা ভাল গাওয়া হইয়াছিল।[২৮২থ]

২৫

অমৃতলাল আন্তরিক ও প্রগাঢ়ভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। তবে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বা গোঁড়ামির পক্ষপাতী ছিলেন না।

হিন্দু ও ব্রাহ্ম, উভয় ধর্মের ভাণকেই তিনি সমান বিদ্রূপ করিয়াছেন। 'বাবু' (১৮৯৪) প্রহসনে ব্রাহ্মদের ভাবভঙ্গী ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে যথেষ্ট কটাক্ষ থাকিলেও, তাঁহার আসল বক্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে ফটিকের উক্তিতে—

> 'আচ্ছা কি হওয়া যায় বল্ দেখি? দেশহিতৈষী হই, না ব্রেহ্মজ্ঞানী হই, না আজকাল যে ঐ হয়েছে গেরুয়া কামিজ টামিজ পরে হিঁদুয়ানি—তাই হওয়া যায়? কি করা যায়? বল্ দেখি বেশী সুবিধা কিসে?' (২।১)

'বৌমা' (১৮৯৭) প্রহসনের 'মতিলাল' অমৃতলালেরই মুখপাত্র। সে বলিতেছে—

> '...যে রামমোহন রায়ের গান অতি নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ হিন্দুরাও ভক্তিভরে শুনে আনন্দ করতেন, কেশব সেন (My God) মাই গড! কি জগদীশ্বর! ব'লে ডেকে উঠলে বোধ হতো যেন সামনেই ভগবান বিরাজমান; আর সেই ডাক শোনবার জন্যে লোকে ব্যাকুল হয়ে ছুটতো; যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লোকে হিন্দুযোগীর সর্বোচ্চ সম্মান 'মহর্ষি' উপাধি প্রদান করেছে, যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখলে মনে আবার নবদ্বীপের ভাব উদয় হয়, তাঁদের সেই ব্রাহ্মধর্ম, যা অবলম্বন করে আজও অনেক পবিত্রহৃদয় সাধু

২৮২থ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত "নাট্যপ্রতিভা" — ফাল্গুন ১৩২৫ দ্রঃ

ধর্মপিপাসু যুবক ধীরে ধীরে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হচ্ছেন, সেই ধর্মকেই কতকগুলি মূর্খ ভণ্ড তাদের স্বার্থসিদ্ধি, ভোগতৃপ্তি ও বিলাস-স্ফূর্তির আবরণ করে রেখেছে।' (২।৪) [২৮২গ]

ব্যক্তিগত জীবনে অমৃতলাল নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং দীক্ষিত হইয়াছিলেন গোবরডাঙ্গা গৈপুর নিবাসী তাঁহাদের কুলগুরু কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট।[২৮৩] 'অমৃতমদিরা'র সরস্বতী, বিশ্বনাথ, কালিকা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীর স্তুতি ও বন্দনায় তাঁহার হিন্দুয়ানির বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটিয়াছে। 'কৌতুক-যৌতুকে'র অন্তর্গত 'শারদামঙ্গল' কবিতায় দেবীর নিকট তাঁহার যে প্রার্থনা, তাহাও বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে মনুষ্যত্ব-বোধের দ্বারা চিহ্নিত হইয়া।[২৮৩ক]

তবে হিন্দুয়ানির প্রতি শ্রদ্ধার আতিশয্যে তিনি ইহার অন্তঃসারশূন্য ঠাটকে কোনদিনই বরদাস্ত করেন নাই। 'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা'য় (১৮৯৩) এই হিন্দুয়ানির ঠাটকে তিনি যথেষ্ট বিদ্রূপ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আতিশয্যও তাঁহার শ্লেষ হইতে নিস্তার পায় নাই।

তাঁহাদের কুলদেবতা ছিলেন 'রাজরাজেশ্বর'* বিষ্ণু। সেইজন্য বৈষ্ণবতার প্রতি তাঁহার ছিল জন্মগত শ্রদ্ধা। তাঁহার নাট্যজীবনের প্রথম পর্বে তাই তিনি লিখিয়াছিলেন 'ব্রজলীলা' (১৮৮২)। কিন্তু বৈষ্ণবতার নামে যখনই ভণ্ডামি দেখিয়াছেন, তখনই তাহাকে বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভণ্ড বৈষ্ণবকে ধিক্কার দিবার জন্য 'অবতার' (১৯০১) লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহা গিরিশচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত 'অবতার' প্রহসনের

২৮২গ কেশবচন্দ্র সেনকে ভক্তি করিতেন বলিয়া অনেকে অমৃতলালকে 'বেহ্মজ্ঞানী'ও বলিত। অমৃতলাল লিখিয়াছেন,—"আমার আবার কেশববাবুর চরণে একান্ত ভক্তি ছিল, আর সকল কথায় 'বোধ হয়' বলা অভ্যাস করে ফেলেছিলাম, তাই দলের অনেকেই আমাকে ঠাট্টা করে 'বেহ্মজ্ঞানী' বলত।" ('ভুবনমোহন নিয়োগী')

২৮৩ 'অমৃত-মদিরা': পৃ ২৮০। ইঁহারা দীনবন্ধু মিত্রেরও কুলগুরু ছিলেন।

২৮৩ক 'দাও মা শক্তি শক্তিরূপা, দাও শুদ্ধা ভক্তি অন্তরে।
যেন ভিক্ষা করা শিক্ষা পেয়ে ভুলি না দীক্ষা মন্তরে।
ভিক্ষা যদি করতে হয় করবো দাক্ষায়ণীর পাশে।
আমার অন্ন আমার বস্ত্র দেবেন দেবী আমার ভূমির চাষে।'

* 'কুলের দেবতা বিষ্ণু রাজরাজেশ্বর' (অমৃত-মদিরা)

উৎসর্গপত্র হইতে জানা যায়। উহার একস্থলে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে জানাইয়াছেন,

'প্রকৃত ভক্ত সাধু বৈষ্ণবগণের চরণে আমার কিরূপ আন্তরিক ভক্তি তাহা আপনি জানেন, সুতরাং এই রহস্যচিত্রে উপহাসের পাত্র যে কাহারা তাহাও আপনি চিনিতে পারিবেন।'

বৈষ্ণবধর্ম যে তাঁহার বিদ্রূপের লক্ষ্য নয় তাহা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন পরবর্তী গ্রন্থ 'অমৃত-মদিরা'য় (১৯০৩):

'কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ পতি পুত্র মিতা,
কৃষ্ণতত্ত্ব শাস্ত্র গীতা বেদান্ত পুরাণ।
কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই, রাধাকৃষ্ণ এক ঠাঁই,
গৌর-অঙ্গে আবির্ভাব হয়ে যাক জ্ঞান॥
অলসে কাটায়ে কাল, বসুজ অমৃতলাল,
জীবন-বৈকালে লয় শ্রীপদে শরণ।'[২৮৪]

অমৃতলালের কর্মজীবনের বিচিত্রতার মত তাঁহার ধর্মজীবনও ছিল অভিনব। রঙ্গালয়ের সহিত নিজেকে সম্পৃক্ত রাখিয়া তিনি মনে করিতেন যে, নটনাথের সেবা করিতেছেন। তাই রঙ্গালয়ে তাঁহার দেবতা ছিলেন 'নটনাথ'।[২৮৫] তাঁহার তত্ত্বাবধানে স্টার থিয়েটারে নটনাথের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হইত। এই উৎসব দর্শনের জন্য অমৃতলাল যে নিমন্ত্রণপত্র দিতেন তাহার একটি নিদর্শন এইরূপ:

'শ্রীশ্রীপার্বতীপরমেশ্বরৌ
বিজয়েতাম্।
নটনাথ

বিহিতসম্মানপূর্বক নিবেদনমিদং—

২২এ ফাল্গুন সোমবার ৺দেবের বার্ষিক উৎসব হইবে। অতএব মহাশয় সবান্ধবে অনুকম্পা পুরঃসর ষ্টার রঙ্গালয়ে সমাগত হইয়া নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণে অনুগৃহীত করিলে পরম আপ্যায়িত হইব। কিমধিকমিতি

আশ্রব
১৩০০ সাল, তারিখ ১৯এ ফাল্গুন। শ্রীঅমৃতলাল বসু।'

---

২৮৪ 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ': পৃ ১০৮-৯

২৮৫ এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'নটনাথ' কবিতাটি দ্রষ্টব্য: অমৃত-মদিরা: প

অমৃতলালের ধর্মজীবনে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব ছিল অনেকখানি। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর তাঁহার সংশয়াচ্ছন্ন বিমূঢ় মনকে গিরিশচন্দ্র কিভাবে ধর্মবিশ্বাসের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা অমৃতলাল নিজেই জানাইয়া গিয়াছেন।[২৮৫ক]

পরবর্তীকালে অমৃতলাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মাদর্শে একান্ত বিশ্বাসী হন। ইহার মূলেও গিরিশচন্দ্রের প্রভাব আমরা অনুমান করিতে পারি। গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটকে তিনি 'নসীরামে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শেই এই চরিত্রটি পরিকল্পিত হইয়াছিল। অমৃতলালের উত্তরজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট।[২৮৬]

২৬

সমাজে অশ্রদ্ধেয় নটজীবন বরণ করিয়াও সমাজের সম্মান অমৃতলাল পুরাপুরিই লাভ করিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের প্রতিনিধিরূপে তিনি 'নাট্যজুবিলি'তে সম্মানিত হইয়াছিলেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর।[২৮৬ক] 'নাট্যজুবিলি' সম্পর্কে তিনিই পূর্ব হইতে দেশবাসীকে সচেতন করেন এই কথাগুলি লিখিয়া—

'বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদিন

প্রকাশ্য নাট্যশালার জন্মদিন হইতে আজ পর্যন্ত উহার সহিত কতকটা

২৮৫ক 'গিরিশচন্দ্র': অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়: পৃ ১৮১-৮৪ দ্রষ্টব্য

২৮৬ 'ভারতে ধর্মসংঘ (১৩১৫)', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা' প্রভৃতি রচনার মধ্যে অমৃতলালের ধর্মবিশ্বাসের এই পরিণতির আভাস আছে। 'ভারতে ধর্মসংঘ' কবিতার কয়েক পংক্তি এইরূপ:

> 'রম্য দৃশ্য বিশ্ব সমাজ আমার
> মসজিদ মন্দির গুরু দরবার
> অর্চনার চর্চ, সিনাগগ মঠ
> সর্বতীর্থ যোগ জাহ্নবীর তট,
> পরিচয় নর, পর ভেবোনারে কারে।'

২৮৬ক বঙ্গীয় নাট্যশালার জুবিলী উপলক্ষে ঐ দিন (২৩এ অগ্রহায়ণ ১৩২৯) কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সভা করিয়া অমৃতলালকে অভিনন্দিত করা হয়। সভাপতি নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ বলেন যে, অমৃতলালের লেখনী 'সন্নিপাতগ্রস্ত মুমূর্ষু সমাজের বিনষ্ট চৈতন্যকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় অমৃতেরই ন্যায় কার্য করিয়াছে।'

সংশ্লিষ্টভাবে জীবিত আছি বলিয়া কর্তব্যবোধে আমি বঙ্গের নাট্যানুরাগী সর্বসাধারণ ও রঙ্গভূমির বর্তমান কর্মিবৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এই ১৯২২ খৃষ্টাব্দের আগামী ৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বঙ্গের সাধারণ নাট্যশালার পঞ্চাশৎ জন্মদিবস বা জুবিলি।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে নাট্যশালার সেই শুভ জন্মদিনে প্রথম 'নীলদর্পণ' যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে আজও যাঁহারা জীবিত আছেন, আজ এই সুযোগে তাঁহাদেব সেই প্রথম দৃষ্ট সৈরিন্ধ্রী (বড় বৌ) সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতেছে।'[২৮৭]

এই উপলক্ষে অমৃতলাল 'বঙ্গীয় নাট্যশালার পঞ্চাশৎ বাৎসরিক জন্মোৎসব সঙ্গীত'ও রচনা করিয়াছিলেন।[২৮৮] এই সঙ্গীতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যাঁহারা সাহিত্যসাধনায় নিরত ছিলেন এবং সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনে যাঁহারা উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সকলকেই পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করিয়াছেন অমৃতলাল। একস্থলে লিখিয়াছেন—

'আগু পাছু কিছু ইহারা উদ্যোগী,
স্বার্থত্যাগী যুবা সবে কর্মযোগী,
সাথে সাথে নত মাথে চলিয়াছে এই অভাজন॥'

সাধারণ নাট্যশালার এই পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল স্টার থিয়েটারে। এই সকল উৎসবে অমৃতলালকে তাঁহার যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার গুণগ্রাহীরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হন। নিদর্শনস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :

'Mahamahopadhyaya
Haraprosad Shastri M. A., C. I. E.
Professor
Dacca University

44, Nilkhet Road,
Romna P. O.
Dacca
December 13, 1922

কল্যাণবরেষু,

অমৃতবাবু আপনার ২৫ অগ্রহায়ণের পত্র কাল রাত্রে পাইয়াছি। আশীর্বাদ করি আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার ব্যবসায়ের উন্নতি করুন। নাট্যজুবিলী ও ষ্টার থিয়েটার আপনার সম্মান করিয়াছেন শুনিয়া আমি

---

২৮৭ মজলিস, ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩২৯

২৮৮ মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯

যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। আপনি রঙ্গমঞ্চের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং এখনও উহার উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ৫০ বৎসর অকাতরে পরিশ্রম করিয়া একটা প্রকাণ্ড সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন—বহু সংখ্যক ভদ্রলোকের চাকরী না করিয়াও জীবিকার উপায় করিয়া দিয়াছেন, এবং শ্লেষে ও ব্যঙ্গে দেশের অনেক কদাচার অনাচার নিবারণ করিয়াছেন। আপনার নটজীবনের পুরস্কার ঐ গুড়গুড়ি আর সাহিত্যজীবনের পুরস্কার ফুল। পুরস্কার দুটিকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। ফুল বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি—আপনার মত লোকের হাতে পড়িলেই উহা সার্থক হয়। উহা কবির হাতেই শোভা পায়। নটেদের উপর ঋষিদের শাপ আছে—তাই নটেদের একটু এদিক ওদিক হয়। গুড়গুড়ি তাহার সাক্ষী। আমার মহা আনন্দ, উপযুক্ত লোকের সম্মান করিয়া বাঙ্গালী আজ ধন্য হইল। আমি এখন পরাধীন—তাই আপনার এই সম্মান হইবার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না। কলিকাতায় গিয়াও থাকিতে পারিলাম না। তারিখ বদল হওয়ায় আমায় চলিয়া আসিতে হইল। বৃহস্পতিবারে হইলে থাকিতাম ও আমার যাহা বক্তব্য বলিতাম। বক্তব্য আমি তাড়াতাড়ি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। পড়া হয় নাই, ভালই হইয়াছে এখন ধীরে সুস্থে পূরা করিয়া বলিতে পারিব।

আপনার এই মহাসম্মানের মুহূর্তে আমায় [যে] মনে পড়িয়াছে তাহা [তে] আমি অতিশয় আপ্যায়িত হইয়াছি। কারণ অতি দুঃখের ও অতি সুখের সময় যাহাকে মনে পড়ে সে-ই সুহৃদ। আমি আপনার এই সৌহার্দ্যের প্রমাণ পাইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।...হারীত [হারীতকৃষ্ণ দেব] মাঝে মাঝে আমার এখানে আসে। সে ও সত্যেন [সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক] ভালই আছে।

আপনাদের ওখানে ডাকের সময়ের উৎপাত নাই। এখানে সেটা খুব আছে। দশটার পর দিলে চিঠি যায় না। ডাকের সময় উপস্থিত—আজ এইখানেই বিশ্রাম করিলাম। আমি সর্বদাই ৺স্থানে আপনার মঙ্গল কামনা করি।

শুভার্থী

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী'*

---

* অপ্রকাশিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অমৃতলালের সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৫ সনের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক তাঁহাকে প্রদান করেন। Special Committee* ১৯২৬ সনের ১১ই মার্চ মিলিত হন এবং এই মত প্রকাশ করেন :

'We recommend that the Jagattarini Medal for 1925 be awarded to Srijut Amritalal Basu for original contributions to letters, written in the Bengali Language. Among his chief contributions may be mentioned *Bibaha Bibhrat, Tarubala, Khas Dakhal, Bijoy Basanta, Kalapani, Bowma* and *Sabas Atas.*'

পি. আর. এস.-এর পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া অমৃতলাল আর একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিত হন। ১৯২৮ সনের ১১ই জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল—

'...to act as a member of the Honorary Board of Examiners...for the Premchand Raychand Studentship in Literary subjects for the year 1927, in place of Dr. Rabindra Nath Tagore D. Litt., N. L. resigned.'[২৮৯]

গবেষণার বিষয় ছিল 'The Origin and Development of Bengali Stage and Drama'; গবেষকের নাম অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়। পরীক্ষকদ্বয় উক্ত 'থিসিস' মনোনীত করিতে পারেন নাই।[২৯০]

সাহিত্যসাধকরূপে অমৃতলাল দেশবাসীর প্রভূত শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া-

* কমিটিতে ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ চুনিলাল বসু, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

২৮৯ ডঃ সুনীলকুমার দে ছিলেন অমৃতলালের সহযোগী পরীক্ষক।

২৯০ তাঁহারা বিস্তৃত বিশ্লেষণের পর মন্তব্য করিয়াছিলেন—'We are, therefore, of opinion that the work lacks accuracy of scholarship, follows no proper method, reveals no well-formed taste and judgment such as is necessary for the handling of a literary theme and that it cannot in any sense be regarded as a distinctly original contribution to the study of the subject. Nor can we say that the author understands the spirit of, or shows a capacity for, true research. We regret, therefore, that we are unable to recommend it for the award of the studentship.'

ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যের রসপ্রাচুর্যের জন্য দেশবাসীর নিকট তিনি 'রসরাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। অনেক অখ্যাত লেখকের গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া তিনি তাঁহাদের স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক তাঁহাদের গ্রন্থ অমৃতলালকে উৎসর্গ করিয়া এই ব্যঙ্গরসিক সাহিত্যিকের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'আনন্দ-বিদায়' (১৯১২) প্রহসনটি 'বঙ্গভাষায় ব্যঙ্গ প্রহসনের প্রতিষ্ঠাতা রসিকপ্রবর কবি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের করকমলে' উৎসর্গ করেন। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'কবলুতি' (১৯২৮) নামক গল্প-সংগ্রহটি 'পরম শ্রদ্ধেয় রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের করকমলে' নিবেদন করেন। অমৃতলাল যে সকল গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত 'রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা' (১৯২৩) গ্রন্থের ভূমিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সুন্দর ভূমিকায় হাস্যরস সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মতবাদ প্রকাশ পাওয়ায় ইহার মূল্য ও উপযোগিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাহিত্যকৃতিত্বের জন্য একাধিকবার তাঁহাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে বরণ করা হয়।[২৯১] আমৃত্যু তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। রঙ্গালয়ের নটকুলের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছিলেন। এই সদস্যপদের জন্য তাঁহার নামের প্রস্তাবক ছিলেন পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এবং সমর্থক ছিলেন 'বিজ্ঞান' পত্রের সম্পাদক ডাঃ অমৃতলাল সরকার। ১৮৯৮ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অমৃতলাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২৯২] ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য হন। ২৩শে মে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সভায় প্রথম যোগ দেন। এই দিনের ঘটনাটি

---

২৯১ ১৩২৭ সালে বসিরহাট বাণী সম্মিলনীর (৪র্থ অধিবেশনের) সভাপতি
১৩৩০ সালে কাঁটালপাড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের (১৪শ) সভাপতি
১৩৩২ সালে বীরভূমে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (১৭শ) সভাপতি
১৩৩৩ সালে বিহার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে (১ম অধিবেশনে) সভাপতি
১৩৩৪ সালে ধলা বীণাপাণি সাহিত্য সম্মিলনীর (৩য় বার্ষিক উৎসবের) সভাপতি
১৩৩৫ সালে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের (১৬শ অধিবেশনের) সভাপতি

২৯২ দ্রষ্টব্য Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for January 189 P.2 এবং New Series Vol. XXVI 1930.

তাঁহার দিনলিপিতে লিখিত আছে। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত এই দিনই তাঁহার প্রথম পরিচয়—

'23 Sunday,

...After 5 P. M. went to Rajah Benoy Krishna's house to attend a special meeting of the .....Sahitya Parishad ......This was my first attendance. Babu Dwijendra Nath Tegore was in the chair to whom I was introduced after the......meeting. Amongst others Justice Gurudas Banerjee, Babu Chandra Nath Bose, Rajendra Shastri, Hirendra Dutt, Motilal Ghosh were present.'[২১৩]

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে সম্মানিত হন।

২৭

বয়স যথেষ্ট হইলেও অমৃতলালের মৃত্যু কতকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই ঘটিয়াছিল। ১৩৩৬ সালের ১৪ই আষাঢ় ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষের* শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। চারদিন পরে অর্থাৎ ১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার (ইং ২.৭.১৯২৯) অপরাহ্ণ ৩-২৬ মিনিটে কিঞ্চিদধিক ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার ৩নং শ্যাম স্কোয়ারস্থ আবাসে অমৃতলালের মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিয়াছিলেন :

'গত ৪ দিন হইতে তিনি অন্ত্রের পীড়ার জন্য অম্লশূলে ভুগিতেছিলেন, মৃত্যুর ৫ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল।'[২১৪]

২১৩ দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার পর তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন অমৃতলাল। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে লিখিত 'সেকালের কথা' নামক অত্যুৎকৃষ্ট রচনাটি (ভারতী, চৈত্র ১৩৩৩) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

* তৎকালীন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও অমৃতলালের সুহৃদ্। 'খাস-দখল' নাটকে ইঁহার উল্লেখ আছে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে লোকেন বলিতেছে—'...মিসেস চক্রবর্তীর ত' বড় অসুখ, বিপিনবাবু এসেছিলেন, তিনি বোধ হয় কেসটা ভাল বুঝতে পারেন নি...।'

২১৪ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯এ আষাঢ় ১৩৩৬

সম্ভবতঃ রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা ঠিকমত হয় নাই। কারণ 'বসুমতী'-সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন যে—

'চিকিৎসা-বিভ্রাটে তাঁহার মৃত্যু যেমন শোচনীয়—তেমনি অতর্কিত।'[২৯৫]

কর্মী অমৃতলালের মৃত্যু যে অতর্কিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ, "Only on Friday last he had acted on the screen *'Bibaha Bibhrat'* and the death was so sudden that the news spread like wild fire throughout the length and breadth of the City, and soon a big crowd gathered in his residence to pay their last homage to the departed soul."[২৯৬]

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় পুষ্পাবৃত শবদেহ লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল, স্টার থিয়েটার, মনোমোহন থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটারে থামিবার পর রাত্রি সাড়ে আটটায় কাশী মিত্রের ঘাটে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে নৈষ্ঠিক হিন্দুমতে তাঁহার পার্থিব দেহের সৎকার হয়। পরদিন তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের সর্ববিধ কার্য স্থগিত রাখেন।[২৯৭]

তাঁহার মৃত্যুতে দেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদিতে যে সকল শোকপ্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, এবং শোকসভাগুলিতে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যে সকল কথা বলিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে অমৃতলালের স্বভাবধর্মের ও জীবনসাধনার নানা দিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'ভারতবর্ষ' লিখিয়াছিলেন—

'এমন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক, রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, রসরচনায় সিদ্ধহস্ত, হাস্যরসিক অমৃতলালের পরলোকগমনে দেশের একটা দিক যে শূন্য হইল, তাহার আর পরিপূরণ হইবে না ...

---

২৯৫ 'অমৃতলাল বসু' : মাসিক বসুমতী : শ্রাবণ ১৩৩৬

২৯৬ The Amrita Bazar Patrika : 3.7.1929.

২৯৭ তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার পৈত্রিক নিবাসের সন্নিকটে একটি পথও তাঁহার নামে চিহ্নিত হইয়াছে।

২৯৮ ভারতবর্ষ : শ্রাবণ ১৩৩৬

'পঞ্চপুষ্প' লক্ষ্য করিয়াছিলেন—

'দেশ-জননী ও ভাষা-জননীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় তাঁহার প্রত্যেক রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়।'[২৯৯]

'পুষ্পপাত্র' লেখেন—

'তিনি নানাবিধ পারিবারিক শোক ও অশান্তিতে কাতর হইয়াও কখনো তাঁহার সদানন্দময় স্বরূপটি হারান নাই।... অভিনেতা ও নাটক-রচয়িতা হিসাবে তাঁহার আসন রঙ্গজগতের আর কাহারও চেয়ে নিম্নে নয়।'[৩০০]

'বসুমতী'-সম্পাদক যে সুদীর্ঘ শোকপ্রবন্ধটি রচনা করিয়াছিলেন তাহার একস্থলে অমৃতলালের দেশপ্রেমের স্বরূপ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন—

'স্বদেশ ও স্বজাতি-হিতব্রত অমৃতলাল স্বরাজের লুব্ধ আশ্বাস দিতে ব্যস্ত ছিলেন না।... স্বরাজ লাভ করিবার আন্দোলন-পদ্ধতিতেও বিদেশীর অন্ধ অনুকরণই যে আমাদের একমাত্র সাধনা হইবে, ইহা তিনি কোনদিন কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।... স্বাধীনতা-স্বদেশসেবার অর্থে তিনি বুঝিতেন—জাতীয় আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা—আত্মবিশ্বাসের নির্ভরতা—সমাজের স্বাধীনতা—স্বধর্মনিষ্ঠা—স্বাবলম্বন—পরানুগ্রহ-অসহিষ্ণুতা—পর-তন্ত্রের অনুসরণ পরিহার।... ইংরাজের দয়াদত্ত দানলাভের আশায় স্বরাজভিখারী হইতে তিনি বারম্বার নিষেধ করিয়াছেন।'[৩০১]

'স্টেটস্‌ম্যান' তাঁহার সম্পর্কে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে—

'Babu Amrita Lal Bose... was an institution in himself... His position in calcutta was influential and the city is poorer to-day by the death of one who was practically the last link between the old and new schools of thought in Bengal.'[৩০২]

দৈনিক 'বঙ্গবাণী' তাঁহাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, অমৃতলালের—

২৯৯ পঞ্চপুষ্প : আষাঢ় ১৩৩৬

৩০০ পুষ্পপাত্র : শ্রাবণ ১৩৩৬

৩০১ মাসিক বসুমতী : শ্রাবণ ১৩৩৬। অমৃতলালের 'বাহবা বাতিক' প্রহসন ও 'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৩০২ The Statesman ; 4.7.1929

'... চিরসবুজ অন্তঃকরণ বয়সের আক্রমণে কোনদিনই ধূসর হইল না — প্রথম দিনেও বাঙ্গালী তাঁহার মধ্যে যে রসধারার ফেনিল উচ্ছ্বাস দেখিয়াছিল, শেষ দিনেও তাঁহার সেই রসিকতাই সে দেখিয়াছে।... আজ এই বিংশ শতাব্দীর যুগে বাহিরের নানা ফ্যাসান আসিয়া যখন আমাদের ঘরের বহু সম্পদ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, বাঙ্গালী যখন আপনার জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া দিন দিন অ-বাঙ্গালী হইয়া পড়িতেছে, তখন অমৃতলাল বাঙ্গালার যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য আপনার জীবনে তাহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর তাই এত আপনার ছিলেন।...'[৩০৩]

দীনেশচন্দ্র সেন অনেকের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার বক্তৃতার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন—

'ইদানীন্তন কালে শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্দীপনাময় সমাজ, ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা, কালীপ্রসন্ন ঘোষের জলদনির্ঘোষ ও শব্দচ্ছটা, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের ধীরগম্ভীর শব্দবিন্যাস ও কথা সাজাইবার কৌশল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের চটুল ও মধুর ছন্দের বাক্যপ্রবাহ— এমন বহু লোকের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু অমৃতবাবুর জন্য সভাস্থলে একটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান ছিল...।'[৩০৪]

ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও লিখিয়াছেন— 'বহু বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম।'[৩০৫]

কবিশেখর কালিদাস রায় অমৃতলালের সৃষ্টিধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি মূল্যবান মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—

'আমি বলি, অমৃতলাল ছিলেন গিরিশচন্দ্রের পরিপূরক। অমৃতলালের নাটকগুলি পড়িলেই দেখা যাইবে, অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে যতদূর সম্ভব এড়াইয়া এড়াইয়া চলিতেছেন,— গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি যেদিকে পড়িতেছে না—অমৃতলাল সেই দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন...। এইজন্য অমৃতলালের শক্তিকে কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছে। অমৃতলালের এ কি অল্প কৃতিত্বের কথা যে, নাটকের আখ্যানবস্তু-নির্দেশ, রসনির্বাচন, রচনাভঙ্গী,

৩০৩ বঙ্গবাণী : ১৯এ আষাঢ়, ১৩৩৬

৩০৪ 'অমৃত-স্মৃতি' : মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬

৩০৫ 'অমৃতলালের স্মৃতি-তর্পণ' : ঐ

ভাষাবিন্যাস, রুচিপ্রবৃত্তি, সব দিকেই তিনি স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন!'[৩০৬]

'ইংলিশম্যান' পত্রের অভিমতও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

'Sociable by nature, he was easily accessible to all. Facile in wit, he was never malicious. His humour never hurt. He was one of the most straight-forward men.'[৩০৭]

শুধু লিখিত প্রবন্ধেই নহে, দেশের সর্বত্র সভা করিয়াও তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৪ই জুলাই পূর্ণ থিয়েটারে যে শোকসভা হয় তাহাতে 'যোগসিদ্ধ অমৃতলালের স্মৃতিপূজা করিবার জন্য দক্ষিণ কলিকাতাবাসী দলে দলে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।' সভাপতি ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। সভায় খ্যাতনামা অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অমৃতলালের নাটক হইতে আবৃত্তি করেন। জলধর সেন আক্ষেপ করিয়া বলেন—'এখন কেবল পরশ্রী কাতরতা, মেকি জিনিসই থাকিবে।' দীনেশচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুও তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করেন। সব শেষে সভাপতি তাঁহার ভাষণে অমৃতলালের মনোধর্মের নির্ভুল বিশ্লেসণের পব বলেন—

"আমরা যখন প্রথম 'খাস-দখল' দেখিতে যাই, আমাদের কোনরূপ খটকা লাগে নাই। আমরা ইহা বেশ সম্ভোগ করিয়াছিলাম। ইহার অর্থ তাহার মধ্যে কোন মিথ্যা নিন্দা ছিল না। এমন অপূর্ব সৃষ্টি আর আমার চক্ষুতে পড়ে নাই। সৃষ্টির পশ্চাতে সত্য থাকা চাই। বিদ্রূপের অর্থ সত্যের ছবি ফুটাইয়া তোলা। যাঁহারা বিদ্রূপাত্মক রস দ্বারা সৃষ্টি করেন, তাঁহারা সত্যের অপলাপ করেন না। অমৃতবাবু তাহাই করিতেন।"[৩০৮]

৩০এ জুলাই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ সভা আহূত হয় অমৃতলালের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য। সভাপতি ছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু শোকপ্রবন্ধ পাঠ করেন এবং অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্র দেব, নগেন্দ্রনাথ সোম প্রভৃতি অমৃতলাল সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

৩০৬ 'অমৃতলালের কথা অমৃত সমান': মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬

৩০৭ The Englishman : 3. 7. 1929

৩০৮ বঙ্গবাণী: ৩১এ আষাঢ় ১৩৩৬

১লা আগস্ট অমৃতলালের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন 'অমৃত-চক্রে'র উদ্যোগে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে পুনরায় এক 'মহতী শোকসভার আয়োজন হইয়াছিল।'[৩০৯] সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। অনেক বিদগ্ধ নাগরিক অমৃতলালের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন কবেন। অমৃতলালের অনুগামীদের মধ্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীও এই সভায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ঐ দিন, ১৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, অমৃতলালের অন্যতম কীর্তি ও প্রয়াসের প্রতীক শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল ভবনে তাহাব আদ্যকৃত্য সুসম্পন্ন

৩০৯ পঞ্চপুষ্প : শ্রাবণ ১৩৩৬

সাহিত্য

'কাহিল লেখনী মোর, কোথা পাবে অত জোর,
মসীতে পশিতে ধীরে আগুপাছু করে।'

'নাটকের অর্থ হচ্চে দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ যে কাব্য দেখা যায়। বিভ্রম উৎপাদন হচ্চে এর জীবন, অঘটন ঘটান, অসম্ভবকে সম্ভব করা অর্থাৎ এক কথায় যা নয় তাই করান, এই হচ্চে নাটক। আর ব্যাকরণেই এর বিশেষ প্রমাণ রয়েছে, তা ত আর আপনার অবিদিত নাই। নাটকের ব্যুৎপত্তি হচ্চে যেমন—ন আটক নাটক, যাতে কিছু আটক নাই।'— 'তিল-তর্পণ'

নাটক

প্রহসন রচয়িতারূপে সমধিক পরিচিত হইয়া 'রসবাজ' আখ্যা লাভ করিলেও অমৃতলাল কয়েকখানি পূর্ণাঙ্গ নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাতটি[১] নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সাতটি নাটক বিষয়বস্তু ও রচনারীতিতে একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'হীরকচূর্ণ-নাটক' (১৮৭৫) সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত, 'তরুবালা' (১৮৯১) ও 'খাস-দখল' (১৯১২) নাটকে সমাজচিত্র অঙ্কিত হইলেও উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন, 'বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত' (১৮৯৩) নাটকের বিষয়বস্তু রূপকথা হইতে গৃহীত, 'আদর্শ বন্ধু' (১৯০০) গ্রীক উপাখ্যানের ছায়ায় জল্পিত, 'নবযৌবনে' (১৯১৪) রোম্যান্টিক সমাজচিত্র প্রতিফলিত এবং পৌরাণিক নাটক 'যাজ্ঞসেনী' (১৯২৮) মহাভারত অবলম্বনে রচিত।

অমৃতলাল ঐতিহাসিক নাটকরচনার প্রয়াস কখনও করেন নাই। ইতিহাস হইতে ঘটনা সংস্থাপন ও চরিত্রাঙ্কনের নামে নাট্যকারগণ যে কিরূপ যথেচ্ছাচার করেন, তাহা তিনি বুঝিতেন এবং তাঁহার তথ্যনিষ্ঠ মন তাহাতে পীড়িত হইত। 'তিল-তর্পণ' (১৮৮১) নামক ব্যঙ্গনাট্যে এবং 'থিয়েটারে পিন্টু'[২] নামক নকশায় তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটকের উদ্দেশে তিনি যথেষ্ট বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।[৩] রাজপুতানার রাজাগণকে লইয়া আধুনিক নাট্যকারেরা 'নকড়া ছকড়া করে', ইহা অমৃতলাল জানিতেন। তাই ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব প্রসন্ন ছিল না। আবার যখন রঙ্গালয়ের জন্য পৌরাণিক নাটক লিখিলে আর্থিক সাফল্য সুনিশ্চিত ছিল তখনও তিনি পৌরাণিক নাটকের দিকে না গিয়া সামাজিক সমস্যামূলক প্রহসনের ব্যঙ্গকণ্টকিত পরীক্ষামূলক পথটি নির্বাচন করিয়াছিলেন। যখন মনোমোহন বসুর পর গিরিশচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলি দর্শকদের নিকট প্রভূত

---

১ এই সাতটি নাটকের মধ্যে 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকটিকে ধরা হয় নাই। অনেকে মনে করেন নাটকটি অমৃতলালের রচনা নহে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিয়াছি।

২ 'কৌতুক-যৌতুক' (১৯২৬)-এর অন্তর্ভুক্ত।

৩ অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার 'রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা' গ্রন্থে (পৃ ৭০) ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে অমৃতলালের মনোভাব কি ছিল, তাহার কৌতুকপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন।

সমাদর লাভ করিতেছে, তখন তিনি অতি-ভক্তিবাদের গতানুগতিক পথে সহজ সিদ্ধি প্রত্যাশা না করিয়া পণপ্রথা ও বিকৃত শিক্ষার কুফল প্রদর্শনপূর্বক সমাজকে সচেতন করিবার উদ্দেশ্যে রচনা করিলেন 'বিবাহ-বিভ্রাট'। অমৃতলালের এই বাস্তবতা-প্রীতির উন্মেষ লক্ষ্য করা যায় তাঁহার বালকবয়সের অপরিণত রচনা 'একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা' নামক নক্শার বিষয় নির্বাচনে এবং তাঁহার স্টেজে লেখার হাতেখড়ি 'মডেল স্কুল' রচনায়। মাত্র বাইশ বছর বয়সে (১৮৭৫) রচিত 'হীরকচূর্ণ' নাটকেও অমৃতলালের তথ্যনিষ্ঠা ও সেই তথ্যের নাট্য-রূপায়ণ আমাদের বিস্মিত করে।

২

যে ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া অমৃতলালের প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ' রচিত হয় তাহা নিম্নরূপ :

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে বরোদায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন কর্ণেল রবার্ট ফেয়ার। বরোদারাজ মলহার রাও গাইকোয়াড়কে জব্দ করিবার জন্য কর্ণেল ফেয়ার 'বহুদিনাবধি' চেষ্টা করিতেছিলেন।[৪] মলহার রাও কর্ণেল ফেয়ারের আচরণের বিষয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। 'শেষে যখন সেই সকল কথায় গবর্ণমেণ্টের কর্ণপাত হইল তখন রেসিডেণ্ট স্বয়ং রাজার নামে বিষপ্রদানের অভিযোগ উত্থাপন করিলেন; একেবারে আকুণ্ড-কুণ্ড বাধিয়া উঠিল, কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক সহসা কোন কার্য করিতে স্বীকৃত নহেন। সুতরাং লম্বা চৌড়া কমিশন বসিল।'[৫] কমিশনটি এইভাবে গঠিত হয়—

'কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কাউচ ইহার সভাপতি এবং সিন্ধিয়ার মহারাজ, জয়পুরের মহারাজ, সার দিনকর রাও, কর্ণেল মিড্ এবং ফিলিপ মেলবিল সভ্য নিযুক্ত হন। ২৩এ ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮ই মার্চ পর্যন্ত এই কমিশনের কার্য চলিয়াছিল।'[৬] কর্ণেল ফেয়ারের পক্ষে ছিলেন ভারতের

৪ বামাবোধিনী পত্রিকা : পৌষ, ১২৮১

৫ সাধারণী, ১৩ই বৈশাখ, ১২৮২

৬ বামাবোধিনী, মাঘ-ফাল্গুন, ১২৮১

অ্যাডভোকেট জেনারেল স্কোব্‌ল এবং গাইকোয়াড়ের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন বিলাত হইতে আগত ব্যারিস্টার সার্জেন্ট ব্যালেন্টাইন।

সার্জেন্ট ব্যালেন্টাইন সাক্ষীদের জেরা করিয়া একরূপ প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে গাইকোয়াড নির্দোষ এবং বিষপ্রয়োগের অভিযোগ কর্ণেল ফেয়ার ও বম্বের পুলিশ কমিশনার সুটারের ষড়যন্ত্রের ফল। কিন্তু কমিশনের চূড়ান্ত রায় প্রকাশে বিলম্ব হইতে লাগিল। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি মলহার রাওয়ের পক্ষে প্রস্তাবাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিলাতের Times, Pall Mall Budget প্রভৃতি পত্র মলহার রাওকে সমর্থন করিয়া লর্ড নর্থব্রুকের কার্যপ্রণালীর দোষ নির্দেশ করিলেন। এক কথায় এই কমিশনকে কেন্দ্র করিয়া দেশব্যাপী তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হইল।[৬ক]

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিল। কৃষ্ণদাস পাল-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা দেশের প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করিয়া মন্তব্য করিলেন—

> 'The people have the highest confidence in the Viceroy, and it is of the utmost importance that that confidence should be maintained intact. Far better that a few lakhs should be wasted than that the good name of our Government should be in any way tarnished.'[৭]

এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হইয়া সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রগুলি একবাক্যে পেট্রিয়ট-সম্পাদককে অত্যন্ত তীব্রভাষায় ধিক্কার দিতে লাগিলেন।[৮]

শেষ পর্যন্ত মলহার রাও অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন। 'বিচারে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ না হইলেও তিনি কুচরিত্র, শাসনকার্যে অক্ষম এবং রাজ্যের উন্নতি সাধনে বিমুখ বলিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট দণ্ডিত হইলেন।'[৯]

সিমলা হইতে ১৮৭৫ সনের ১৯এ এপ্রিলের ঘোষণায় 'মহারাণীর গবর্ণমেণ্ট নিষ্পত্তি করিলেন যে, মহারাজ মলহার রাও গুহকুমার বরদারাজ্য হইতে

৬ক জানকীনাথ ঘোষাল-সংকলিত 'Celebrated Trials in India' (1902) (pp.100-146) গ্রন্থে মলহার রাওয়ের বিচারের বিবরণ রহিয়াছে।

৭ The Hindoo Patriot : 22.2 1875.

৮ অমৃতলালও 'হীরকচূর্ণ' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মদন ও আয়ান নামক দুই ভদ্র ব্যক্তির উক্তির দ্বারা কৃষ্ণদাস পালকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করিয়াছেন।

৯ বামাবোধিনী। বৈশাখ ১২৮২

অপসারিত হইলেন, এবং এতৎসম্পর্কীয় যে কিছু স্বত্ব, সম্বন্ধ, সম্ভ্রম আজি হইতে তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ চ্যুত হইলেন।'[১০]

উপরিউক্ত জটিল ঘটনাপরম্পরা হইতে যথাযথ তথ্য আহরণ করিয়া সেগুলিকে নাটকীয় তাৎপর্যে ব্যবহার করা বাইশ বৎসর বয়স্ক অমৃতলালের পক্ষে কম কৃতিত্ব নহে। এই সময়ে একই বিষয় লইয়া আরও দুইটি নাটক রচিত হয়: নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার নাটক' (The Mirror of Baroda) এবং উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের 'গুইকোয়ার নাটক' (The unfortunate Molhar Rao)। তুলনামূলক বিচারে অমৃতলালের 'হীরকচূর্ণ' নাটক (The Diamond Dust)-ই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। কারণ নগেন্দ্রনাথ বা উপেন্দ্রচন্দ্রের মতো অমৃতলাল সত্য ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটান নাই এবং দেশের তৎকালীন অবস্থা ও দেশবাসীর বিক্ষুব্ধ মনোভাব কয়েকটি কল্পিত চরিত্রের সংলাপে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

'হীরকচূর্ণ' নাটকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৮২ সালে। নাটকটি প্রকাশের ছয় মাসেরও অধিক কাল পরে (২৫.১২.১৮৭৫) গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ইহার অভিনয় হয়। নাটকটির আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল হিসাবে কেবলমাত্র ১২৮২ সালের উল্লেখ আছে। তবে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সালে (৪ঠা জুন ১৮৭৫) প্রকাশিত বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারি যে, 'হীরকচূর্ণ' জুন মাসের প্রথমেই প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনটি এই:

'হীরকচূর্ণ

বা

গাইকোয়াড় নাটক।

মূল্য ৸০ ডাকমাশুল ৵০ আনা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে, এবং কলিকাতা শ্যামবাজার

ষ্ট্রীট ১০৭ বা ১৪৯ নং ভবনে* আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।'

১০ সাধারণী: বৈশাখ ১২৮২। "Her Majesty's Government have decided that His Highness Mulhar Rao Gaekwar shall be deposed from the sovereignty of Baroda and that he and his issue shall be hereafter precluded from all rights, honours and privileges hereto appertaining."—The Friend of India 1.5.1875

* ১০৭ নং ছিল ডাঃ দুর্গাদাস করের ভবন ('হীরকচূর্ণ' নাটকের রচনাস্থল) এবং ১৪৯ নং ছিল লেখকের পৈত্রিক নিবাস।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র নাটক 'গুইকোয়ার' ইহার কয়েক দিন মাত্র পূর্বে (১৫.৫.১৮৭৫) প্রকাশিত হয়।*

সমসাময়িক একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইংরাজ সরকারের শাসন-সিদ্ধান্তের বিরোধী মতামত নাটকে ব্যক্ত করিয়া অমৃতলাল নাট্যকার-রূপে নামপ্রকাশে সাহসী হন নাই। নাট্যকারের নামের স্থলে ছিল "BY AN ACTOR"। আখ্যাপত্রে দুইটি কবিতাংশ উদ্ধৃত ছিল। একটি হেমচন্দ্রের, অপরটি মধুসূদনের। হেমচন্দ্রের কবিতায় ভীত নাট্যকারের এবং মধুসূদনের কবিতায় ভাগ্যবিড়ম্বিত গাইকোয়াডের মনোভাব সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

'হীরকচূর্ণ নাটক।

THE DIAMOND DUST

A Drama In Five Acts.

BY AN ACTOR

'ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার'

হেমচন্দ্র।

'কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা-সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি
নীরব রবাব বীণা, মুরজ, মুরলী,'

মাইকেল।"

এই সংস্করণে অমৃতলালের নাম ছিল প্রকাশকরূপে।[১১] দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালে। এই সংস্করণের আখ্যাপত্র হইতে হেমচন্দ্রের কবিতাটি বাদ গিয়াছে এবং নাট্যকারের নাম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।[১২]

* অমৃতলালের নাটকটি 'গাইকোয়াড় নাটক' নামে ছাপা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের নাটক পূর্বে প্রকাশিত হওয়ায় আখ্যাপত্রে 'হীরকচূর্ণ নাটক' এই নামান্তর দেখা যায়।

১১ 'Published by Amritalal Bose, 149, Shambazar Street, Calcutta.'

১২ কলিকাতা, ৪নং শ্যামপুকুর লেন হইতে শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত ও প্রকাশিত।

উনিশ বছর পরে অমৃতলাল আর 'ভয়ে ভয়ে' লিখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।[১২ক]

'হীরকচূর্ণ' পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাটকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮।[১৩] প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে তিনটি করিয়া গর্ভাঙ্ক এবং পঞ্চম অঙ্কে দুইটি গর্ভাঙ্ক আছে। তৃতীয় অঙ্কে কোন গর্ভাঙ্ক নাই।

নাটকটি রচনার ইতিহাস অমৃতলাল পরবর্তী কালে নিজেই দিয়াছিলেন এইভাবে :

"লিখেছি 'হীরকচূর্ণ' পূর্ণপাত্র করে।
বয়স বাইশ যবে বসি 'কর' ঘরে॥
প্রথম নাটক তা'তে খেলার আদর।
বারুণী পূজার সাথে বীণাপাণিবর॥
মাধু লেখে যোগী লেখে মুখে বলে কবি।
লেখনী না চলে যদি সুধা ঢালে গবি॥"[১৪]

'হীরকচূর্ণ' নাটকের বিশিষ্টতা দেখা যায় কমিশন-সভার তথ্যনিষ্ঠ দৃশ্য পরিকল্পনায় এবং কয়েকটি কল্পিত চরিত্রের সংলাপে দেশের তৎকালীন অবস্থা প্রকাশে। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য নগেন্দ্রনাথের বা উপেন্দ্রচন্দ্রের 'গুইকোয়ার' নাটকে নাই। কমিশনে সাক্ষীদের জবানবন্দীতে যাহাতে কোনরূপ তথ্যবিকার না ঘটে সেজন্য অমৃতলাল বিশেষ সচেতন ছিলেন। সেই কারণেই সংবাদপত্রে

১২ক ১২৭৭ সালে (১৮৭০) হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' প্রকাশিত হয়। এই কবিতাবলীর অন্তর্গত 'ভারত বিলাপ' কবিতাটির শেষ স্তবক ছিল—

'ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার।
বাজিত গরজে, উথলি আবার উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ।'

পরের সংস্করণে (১২৭৭) এই স্তবকটি বর্জিত হয়।

১৩ দ্বি সং : পৃষ্ঠা ৭৩

১৪ 'অমৃত-মদিরা' (১৩১০) পৃ ২৩৭, 'কর' ঘরে—ডাঃ দুর্গাদাস করের ঘরে। 'মাধু'—ডাঃ করের ২য় পুত্র রাধামাধব কর : 'সধবার একাদশী'র অতুলনীয় রামমানিক্য। 'যোগী'—অমৃতলালের বাল্যবন্ধু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইনি ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোগী ও হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার নির্মাণের ইঞ্জিনিয়ার। 'গবি'—ডাঃ দুর্গাদাস করের জ্যেষ্ঠ পুত্র : পরবর্তীকালের বিখ্যাত ডাঃ আর. জি. কর (রাধাগোবিন্দ কর)।

প্রকাশিত "The Gaekwar's Trial" এর সাহিত
কোনরূপ তথ্যগত বিরোধ নাই।

সংবাদপত্র হইতে জানা যায় যে, কমিশনে প্রথম সাক্ষী ছিল কর্ণেল ফেয়ারের আয়া আমিনা। বিষপ্রয়োগেব প্রসঙ্গে সে প্রথম যাহাদের নাম করে, পরে সেই নামগুলি সে অস্বীকাব করে।[১৫] 'হীরকচূর্ণে'ও অনুরূপ জবানবন্দী দেখিতে পাই।[১৬]

ফেয়ারের বাটলার পেড্রো ডিসুজার সাক্ষ্য ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাহাব পূর্ববর্তী সাক্ষী রাওজি রহিমন্ তাহাকে বিষ-সংগ্রাহক বলিয়া নির্দেশ করে। কিন্তু সাক্ষ্যদানকালে সে রাজপ্রাসাদ হইতে বিষ সংগ্রহের কথা অস্বীকার করিযা মলহার রাওকে অনেকাংশে চক্রান্তমুক্ত করে।[১৭] 'হীরকচূর্ণ' নাটকে পিদ্রুর সাক্ষ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাক্ষ্যেরই অনুরূপ।[১৮]

'হীরকচূর্ণ' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কমিশন-সভার দৃশ্যটি অমৃতলাল একটু বিস্তারিতভাবেই রচনা করিযাছিলেন। সেইজন্য এই অঙ্কে আর কোন দৃশ্য বা গর্ভাঙ্ক নাই। আমিনা, রাওজি রহিমন্, পিদ্রু ডিসুজা, কর্ণেল ফেয়ার, ডাঃ সিউয়ার্ড, হেমচাঁদ ফতেচাঁদ ও মলহার রাওয়েব জবানবন্দীর পর সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন ও অ্যাডভোকেট জেনারেল স্কোবলেব বক্তৃতায় নাটকীয় কাহিনী

---

১৫ "Baroda, February '23—" '......In cross-examination she denied the names she first mentioned ' (The Hindoo Patriot 1 3. 1875)

১৬ একই সময়ে রচিত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের 'গুইকোয়ার' নাটকে তথ্যের বাষ্পও নাই। এই নাটকে আছে যে আমিনাই কর্ণেল ফেয়ারকে সরবত দেয়। 'বিচারগৃহে' ম্যাজিস্ট্রেট ও আমিনার প্রশ্নোত্তর এইরূপ

ম্যাজি— তুমি বিষপূর্ণ মিছরির পানা রেসিডেণ্টের কাছে এনেছিলে কেন?
এমি— আমাকে পাঠিযেছিল এনেছিলাম।
ম্যাজি— কে পাঠায়?
এমি— মহারাজ। (৩ অ, ১ গ)

১৭ "Baroda 26. 2. 1875...He (Pedro) denied going to the Palace or receiving a Packet of any kind. Never saw the Gaekwar." (The Hindoo Patriot : 1. 3. 1875)

১৮. নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার' নাটকের 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণে'র মধ্যে পিদ্রু চরিত্রই নাই। ফলে নগেন্দ্রনাথের নাটকে কমিশন এর দৃশ্যটি আশানুরূপ গুরুত্ব লাভ করে নাই।

ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র কমিশনসভার দৃশ্যটি বিশ্লেষণ করিলেই নগেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতির নাটক অপেক্ষা অমৃতলালের নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায়।[১৯]

এই নাটকে অমৃতলাল পাঁচটি চরিত্রের রূপায়ণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লইয়াছেন। এই পাঁচটি কল্পিত চরিত্রের মধ্যে দুই জন বাঙালী ভদ্রলোক, কর্ণেল ফেয়ারের দুইটি সাহেব সহচর এবং অপর চরিত্রটি 'শ্বশুর' আখ্যাত পূর্ববঙ্গীয় মহাজন।[২০]

দুইটি ইংরেজ এবং দুইটি বাঙালী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া অমৃতলাল এই কমিশনের প্রতিক্রিয়া উভয়ের মধ্যে কিভাবে দেখা দিয়াছে তাহা যথাযোগ্যভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে মাস্টার ফিলিপ ও মাস্টার উইলসন নামে কর্ণেল ফেয়ারের যে দুইজন সাহেব সহচর সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সংলাপে অমৃতলালের নিজস্বতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সংলাপে তৎকালীন শাসক ইংরাজের যথার্থ মনোভাবটিই ফুটিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার মতো যে ফেয়ারের উক্তি সংযত, রেসিডেন্টের উপযুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য। যেমন—

"উই— কর্ণেল! আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ?

ফেয়া— 'ওভালেও অমৃতবাজার পত্রিকা'।

ফিলি— উইলসন! তোমার সঙ্গে ব্রায়েণ্ট এণ্ড মে কোম্পানির জানাশুনা আছে?

উই— কেন?

ফিলি— তাদের লিখে পাঠাও যে এক রকম ম্যাচ তৈয়ের করে ইণ্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়, that will 'ignite only' the Native Press.

উই— হা! হা! হা!— এই জন্য! তা নেটিভ পেপারের কথা শুনে কে? আপনারাই লেখে—আপনারাই পড়ে—বড় লোকে কেউ গ্রাহ্যও করে না।

ফিলি— না, না, না,— ওরা আজকাল ইংলণ্ডে কাগজ পাঠাতে আরম্ভ

---

১৯ উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যালেন্টাইনকে দিয়া একটি অসঙ্গত উক্তি করাইয়াছেন। ব্যালেন্টাইন বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন গাইকোয়াড়ের পক্ষে সওয়াল করিতে। কিন্তু উপেন্দ্রচন্দ্রের নাটকে তিনিই 'গাইকোয়াড়ের পদচ্যুতি নির্ণিত' করিলেন।

২০ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে কোন কল্পিত চরিত্র নাই।

করেছে। ঐ ওভার্লেণ্ড অমৃতবাজার দেখেই তো 'পেল্ মেল্ বজেট্' সে আর্টিকেলটা লেখে। হোমের কাগজগুলো আজকাল ভাল চলছে না; 'পেল্ মেল্ বজেট্', 'টাইমস' দুই খারাপ হয়ে গেছে, তা নইলে নেটিভ পেপার থেকে 'সিলেকসন' করে? আবার নেটিভ পেপার বলে নেটিভ পেপার—জঘন্য 'অমৃতবাজার'!

ফেয়া—নেটিভ পেপারের মধ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' কতকটা ভাল,—যথার্থ লয়েল্।"[২১] (৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মদন ও আয়ান নামক দুই ভদ্র ব্যক্তির সংলাপে দেশবাসীর বিক্ষুব্ধ মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। হিন্দু পেট্রিয়ট দেশের স্বার্থ বিরোধী মতামত প্রকাশ করায় অমৃতলাল উক্ত পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। আয়ানের উক্তিতে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কটাক্ষ করা হয়।[২১ক] হিন্দু পেট্রিয়ট যেভাবে দেশের জনমতকে পদদলিত করিয়া লর্ড নর্থব্রুকের শাসন ব্যবস্থার সুখ্যাতি করিয়াছিল, তাহাতে সে যুগের যে কোন স্বাদেশিকের নিকট হইতে এই ধরণের কটূক্তি তাহার প্রাপ্য ছিল।[২২] কর্ণেল ফেয়ারকে নির্দোষ মনে করিবার মতো সঙ্গত কোনও কারণ ছিল বলিয়া মনে হয় না।[২২ক]

---

২১ 'পেট্রিয়টের ইংরাজ-আনুগত্যের জন্য প্রায় সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রই তাহাকে ধিক্কার দিয়াছিল। এই স্থলে একটি নিদর্শন উদ্ধৃত কবি : —

'পেট্রিয়ট পত্র।

সম্মিলনী হইতে উদ্ধৃত।

মান্তবর পেট্রিয়ট-সম্পাদক মাননীয় গবর্ণমেণ্টের নূতন ভক্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার অপরাধ নহে।...কিন্তু...প্রতিনিধির পদে অভিষিক্ত হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, যদি কোন পাপ থাকে, পেট্রিয়ট সেই পাপে পাপী। কুমন্ত্রণার কুহক বিস্তার করিয়া, রাজপুরুষদিগকে কুপথে নিলে যদি কোন অপরাধ অশে, পেট্রিয়ট সেই অপরাধে অপরাধী। আর, যাঁহাদিগের কৃপাকটাক্ষে পর্ণকুটীরও প্রাসাদে পরিণত হইতে পারে, তাঁহাদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য মৃত ব্যক্তির মস্তকে পদাঘাত কবিলে যদি কোন কলঙ্ক থাকে, পেট্রিয়ট সেই কলঙ্কে কলঙ্কী।'

—সাধারণী, ২৪এ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২

২১ক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে' (পৃ ৪০৭) ইহা অমৃতলালের 'অনুদার মনোভাব' বলিয়া মন্তব্য করেন।

২২ দ্রষ্টব্য 'কৃষ্ণদাস পালের নির্ভীকতা'— অরুণকুমার মিত্র : দেশ, ১৩ই আষাঢ়, ১৩৭৪

২২ক The Friend of India-র মতো সাহেবী কাগজও মন্তব্য করিয়াছিল—'We are not

'ইংলিশম্যান' (৪. ৫. ১৮৭৫) স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন—

'In Colonel Phayre's conduct at Baroda there may have been much that was very objectionable ;...It may, indeed, be an indication of carelessness on the part of the Supreme Government that such a man was appointed to so important a post.... There can be little question that Colonel Phayre's dislike of Malhar Rao was intense.'

কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপ্রদানের অভিযোগে অভিযুক্ত মলহার রাওয়ের পদচ্যুতি আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু হইলেও, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনাটি ছিল অতিপ্রত্যক্ষ সমকালীন বাস্তব ঘটনা। এই ঘটনায় দেশে যে আলোড়ন দেখা দিয়াছিল তাহার প্রকাশে অমৃতলাল কোথাও অসত্যের আশ্রয় লন নাই। কিছু কিছু অপ্রধান সত্য ঘটনাও অমৃতলাল নাটকের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহার তথ্যানুসন্ধানী বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

বম্বে হাইকোর্টের একজন উকিল সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইনকে অভিনন্দিত করায় উকিলদের তালিকা হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনায়ও দেশবাসীর যথেষ্ট বিক্ষোভ দেখা যায়।[২৩] 'হীরকচূর্ণ' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আয়ান বলিতেছে—

'আহা! নগিনদাস ব্রজভূষণদাস বেচারার জন্য বড় দুঃখ হয়—আহা! দেখুন দেখি সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইনকে কেবল একটু প্রশংসা করেছিল বলে কিনা একেবারে ওকালতি কর্ত্তে নিষেধ?—বড় আক্ষেপের বিষয়।'

এই নাটকের খল চরিত্ররূপে মলহার রাওয়ের একজন প্রধান কর্মচারী

affirming that Colonel Phayre is one of the unfit men, but we fear there is room to suspect it, while the people believe it firmly.'

(1. 5. 1875)

২৩ 'সাধারণী' (২৭এ বৈশাখ ১২৮২) লেখেন: 'সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইনকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হয়, তাহাতে জনৈক উকিল স্বাক্ষর করেন বলিয়া, বম্বে হাইকোর্ট উকিলের তালিকা হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেন। পঞ্চানন বড় ছেলের কিছু না করিতে পারিলে, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্গেন!'

দামোদর পন্থকে চিত্রিত করা হইয়াছে। নাটকের প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সে কর্ণেল ফেয়ারের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে ফেয়ারের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে আসিয়া বিতাড়িত হইতেছে এবং ঐ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে সে অন্তর্জ্বালায় জর্জরিত হইয়া বিলাপ করিতেছে। পার্শ্বচরিত্র-গুলির মধ্যে দামোদরকে এরূপ বিস্তৃত ভূমিকা দান করিয়া অমৃতলাল ঘটনার যাথার্থ্যই রক্ষা করিয়াছেন। কারণ, সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন দামোদরকেই সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূল বলিয়া গিয়াছেন।[২৪]

মলহার রাও, লক্ষ্মীবাই ও কুমাবাইয়ের চরিত্র যথাযথ। প্রথম নাটক হিসাবে নাটকীয় সংলাপ বিশিষ্টতা দাবী করিতে পারে। রাজপরিবারের ব্যক্তিবর্গের বা রেসিডেন্সির সাহেবদিগের অথবা পথের সাধারণ নাগরিকগণের কথোপকথন চরিত্রানুগ। তবে লক্ষ্মীবাইয়ের সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি, দামোদর পন্থের একটি গর্ভাঙ্কব্যাপী আত্মবিলাপ (৪।৩), অথবা মলহার রাওয়ের ছেদহীন আত্মচিন্তা ঘটনাপ্রবাহে মন্থরতা ও কৃত্রিমতা আনিয়াছে। নাটকের নীরসতা দূর করিয়া হাস্যরস পরিবেশনের উদ্দেশ্যে 'শ্বশুর' চরিত্রের পরিকল্পনা। নাটকে প্রহসনে অমৃতলাল পরবর্তীকালে অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করিলেও এই নাটকে তিনি একটি মাত্র সঙ্গীত (তাও অংশমাত্র) রচনা করিয়াছেন। নাটকের অপর সঙ্গীত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি···।'

নাটকটি প্রকাশের অল্পকাল পরেই অমৃতবাজার পত্রিকায় সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিত হয়—

> '···গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু তাহার নিজের মুখে শুনিয়াছি তাহার নাম অমৃতলাল বসু এবং তাহাকে আমরা একজন খ্যাতাপন্ন আক্‌টর বলিয়া জানি। নাটকখানি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহার বিচার করিবার সময় অদ্যাপি হয় নাই, কারণ সাধারণের মনের চাঞ্চল্য অদ্যাপি যায় নাই। গাইকোয়াড়ের বিচারটি সাদা করিয়া লিখিলেও তাহা পাঠ করা দুষ্কর, আমরা এ নাটকখানি পড়িয়াও অশ্রুজল ফেলিয়াছি।··· এই

২৪ 'I have, my Lord, dealt with Damodhur Punt, considering him to have been the origin of the whole matter...'—'Serjeant Ballantine's speech' : The Friend of India : 25. 3. 1875

বিচারের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নাটকখানিতে সন্নিবেশিত আছে ও যাঁহারা গাইকোয়াড়ের দণ্ডে ব্যথিত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই ইহার একখণ্ড গ্রহণ করা কর্তব্য।'[২৫]

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫।৭।৮ সময় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'হীরকচূর্ণ' প্রথম অভিনীত হয়। তখন থিয়েটারের ডিরেক্টর ছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল স্বয়ং। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় 'হীরকচূর্ণ' নাটকের যে অভিনয় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ ছিল দুইটি 'RAILWAY TRAIN ON THE STAGE !!!'[২৬] এবং 'The author himself has kindly consented to take up a part in the play'.*

৩

অমৃতলালের পরবর্তী নাটক 'তরুবালা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে।[২৭] নাটকটি পঞ্চাঙ্ক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৭। নাটকটিকে অমৃতলাল 'মধুর রসাশ্রিত সামাজিক নাটক' বলিয়াছেন।[২৮] অমৃতলালের নাট্যপ্রতিভার স্বাভাবিক স্ফূর্তি ছিল রঙ্গ ব্যঙ্গে, কিন্তু তাঁহার লেখনী যে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনায়ও সক্ষম ছিল 'তরুবালা' তাহার নিদর্শন। পরবর্তীকালে তিনি

২৫ অমৃতবাজার পত্রিকা ৪ঠা আষাঢ় ১২৮২ (১০ ৬ ১৮৭৫)

২৬ এই ট্রেণটি নির্মাণ করেন হীরকচূর্ণ নাটক রচনায় অমৃতলালের সহায়ক বন্ধু 'যোগী' (যোগেন্দ্রনাথ মিত্র)।

* প্রথম অভিনয়ে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম পাওয়া গিয়াছে গাইকোয়াড়— অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, স্কোবল— অমৃতলাল, লক্ষ্মীবাই— লক্ষ্মী, কুমারবাই— জগত্তারিণী।

২৭ দ্বিতীয় সং— ১৩০০

২৮ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র হইতে জানিতে পারি

'তরুবালা।

(মধুর রসাশ্রিত সামাজিক নাটক)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

... ...

সন ১২৯৭।'

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন প্রহসন বা সামাজিক নকশা রচনায় নিজেকে নিবিষ্ট রাখিয়াছিলেন। তাহার অনুরাগী পাঠকবর্গের মধ্যে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব এইজন্য আক্ষেপ ছিল। একবার কেদারনাথের সহিত তাঁহার এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা হয়। কেদাবনাথ লিখিয়াছেন—

"একদিন তাঁর 'খাসদখল' (১৩১৮) নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেইখানাই তাঁর সে সময়ের শেষ রচনা। শরীর ভাল থাকছিল না, বললেন—এবার ওই পর্যন্তই হল।'

বললুম, 'আপনার কাছে যে একটা বড পাওনা রয়েছে।'

তিনি আমার দিকে অবাক হয়ে চাইলেন। বললুম,— 'আপনার জন্ম-কর্ম বাজধানীর সম্ভ্রান্ত সমাজের মধ্যে; বনেদী বাবু থেকে মধ্যবিত্ত কেরাণী, কারবারী ইতব-ভদ্র সবই দেখার মত দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। ধর্মে কর্মে সভ্যতায়, আচাবে বিচারে ব্যবহারে, তাদের বিবর্তনগুলো আপনার চোখের উপরই ঘটেছে। এই ৫০।৬০ বছরের পাওনাটা যে পেতে ইচ্ছে হয়।'

'কেন—কিছু কি দিই নি ?'

'প্রহসনে অনেক ইঙ্গিত করেছেন বটে,—আপনার হাত থেকে দু'তিন-খানা সামাজিক নাটক পেলে, বোধ হয় যেন খাঁটি জিনিস পেতুম।'

'দেখ এলিমেণ্ট (প্রকৃতি) অপরাজেয়, তাকে ঠেলে কিছু করতে গেলে ভেসে যেতে হয়। তাই ও চেষ্টা পাইনি।'

'কেন—তরুবালা...'

'লক্ষ্য কবে থাকবে, তাতেও নিজের দিকটাই বারবার ফুটতে চেয়েছে। যার যা আছে—সে তাই দিতে পারে। যা নেই—তা আমদানী করে বাণীর ভাণ্ডার ভুষির আড়োৎ হয়ে দাঁডাচ্ছে।'

'কিন্তু আপনার 'তরুবালা'য় এমন সব lines আছে, যা অমূল্য।' আক্ষেপের সুরে বললেন—'তা কয়জনই বা লক্ষ্য করে!'"[২৯]

'তরুবালা' রচনা করিবার দুই বৎসর পূর্বে অমৃতলাল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ সেপ্টেম্বর 'সরলা' নামে ইহা স্টারে অভিনীত হয়। বঙ্গ রঙ্গালয়ে তখন পৌরাণিক

---

২৯ 'অমৃতাবাদ': মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৩৬

ও ভক্তিমূলক নাটকের প্রবাহ বহিতেছে। সমাজ-সচেতন অমৃতলাল 'ভক্ত' দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে দীর্ঘকাল পরে সমাজচিত্র তুলিয়া ধরিলেন। 'সরলা' রচিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রও কোন সামাজিক নাটক রচনা করেন নাই। তাঁহার লেখনী তখনও পৌরাণিক নাটকের ভক্তি-বিহ্বলতার মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজিতেছিল। মনে হয়, অমৃতলালের 'সরলা'ই তাঁহাকে নূতন পথনির্দেশ দিয়াছিল; কারণ, পর বৎসরই তিনি রচনা করিলেন তাঁহার প্রথম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল'।

'তরুবালা' রচিত হয় 'প্রফুল্ল' রচিত হইবার এক বৎসর পরে। প্রফুল্লের সহিত তরুবালার সাদৃশ্য উভয়ের পাতিব্রত্যে। ইহা ভিন্ন এই দুইটি নাটকে আর কোন মিল নাই। বিদ্বেষ ও লোভ পারিবারিক জীবনে কিরূপ সমস্যার সৃষ্টি করে তাহা গিরিশচন্দ্রের প্রতিপাদ্য হইলেও, 'প্রফুল্ল' নাটকে এই সমস্যার কোন সমাধান নাই। মুহুর্মুহু মৃত্যু ('নীলদর্পণে'র মত) তাঁহার নাটকের পরিণতিকে অতি-নাটকীয় করিয়া তুলিয়াছে।[৩০] 'তরুবালা' যখন রচিত হয় (১৮৯০) তখন শিক্ষিত যুবকের অতিরিক্ত কল্পনাবিলাসিতা কলিকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে একটা সমস্যা ছিল। অমৃতলাল সেই সমস্যা প্রদর্শন করিয়া সমাধানের চিত্রও নাটকে অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন।

নাটকের কাহিনী নিম্নরূপ:

সঙ্গতিপন্ন যুবক অখিলচন্দ্র 'লভ' অর্থাৎ প্রণয়ের অভাব বোধ করে স্ত্রী তরুবালার মধ্যে। তাই তরুবালাকে সে সহ্য করিতে পারে না। অখিলের মা প্রসন্নময়ী, বা বিধবা ভগিনী শান্ত কিছুতেই তাহার এ বিভ্রান্তি দূর করিতে পারে না। অখিলের আত্মীয়তুল্য বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করেন; কিন্তু অখিল বলে,

> 'আচ্ছা ঠাকুরদা, যাকে নিয়ে চিরকাল ঘর করতে হবে তাকে আপনি পছন্দ করে না নিলে কখন ভালবাসা হতে পারে?

মৃত্যু। কেন হবে না ভায়া, বাপ মা তো আপনি কেউ পছন্দ করে নেয় না, তবু তো শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, ভাইবোনেও তো ভালবাসা হয়, তারাও তো ফরমাসে আসে না, স্ত্রীও তেমনি, বুঝেছ, একসঙ্গে থাকতে থাকতেই ভালবাসা হয়, বুঝেছ।

---

৩০ ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই লিখিয়াছেন—'অতিরিক্ত রঙ চড়ানো না হইলে কাহিনী সত্যকার ট্রাজেডি হইতে পারিত।'—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ ৩০৮

অখিল। ঠাকুরদা, আমি যে ভালবাসার কথা বলছি, তুমি বুঝতে পারবে
না।' (১।২)

অখিল জানে যে, 'পবিত্র প্রণয়ে' ব্যভিচার নেই। সুতরাং 'গে'জ ফেবল' (Gay's Fable) হইতে পোইট্রি 'কোর্ট'-কারিণী পারুল নামে এক বেশ্যার প্রতি সে আকৃষ্ট হইল। তাহার নিকট পারুল 'স্বর্গীয় পবিত্র কবিতাময় প্রণয়পূর্ণ রোমান্টিক' হইয়া উঠিল!

এই যে পবিত্র প্রণয়, অখিল জানে, বিরহ না হইলে ইহা চরিতার্থ হয় না। অনুগত হীরালালকে অখিল তাই বলে,

'বিরহ যন্ত্রণা না সহ্য করলে কখনই পবিত্র প্রণয় হয় না। কারুর কখনও হয় নি, কারুর কখনও হয় নি। রেবেকার হয় নি, জগৎসিংহের হয়নি, রোমিওর হয় নি, লীলাবতীর হয় নি। হীরু! অনেক বিঘ্ন বিপত্তি সৃজন বিনাশন করতে হবে, তবে যথার্থ প্রণয় হবে! এক কথায় যদি মিলন হতো তা হলে দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, কেনিলওয়ার্থ, মেরী প্রাইস— এ সব তিন পাতায় ফুরিয়ে যেতো।' (১।৪)

অখিল জানে যে, স্ত্রী তরুবালার সহিত তাহার 'পবিত্র প্রণয়', 'যথার্থ প্রণয়', 'বিশুদ্ধ প্রণয়' কখনও হইবে না। তাই স্ত্রীকে বলে—

'...তুমি তো জান তোমায় তো সব বলেছি, আমি সবাইকে বলেছি, তোমায় আমায় প্রণয় হবে না, তোমায় আমায় স্ত্রীপুরুষ ভাব হওয়া অসম্ভব। (২।২)

নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অখিল তরুবালাকে পদাঘাত করিয়া পারুলের গৃহে গেল। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে (পারুলের গৃহে) সহাধ্যায়ী বিহারীকে অখিল স্ত্রীর সম্পর্কে বলিতেছে—

'সে যদি পবিত্র প্রণয় জানবে তবে আমি ত্যাগ করবো কেন? তার ভালবাসার আইডিয়াই নেই, পা টিপতে আসে, সেবা করতে চায়, রেঁধে খাওয়াতে চায়, মনে করে এই করলেই বুঝি প্রণয় হয়।' (৩।৪)

এদিকে অখিলের মূঢ় কল্পনা ও অবাস্তব মোহের অবসান আসন্ন হইয়া উঠিল। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে পারুলের গৃহে শোভনলাল নামক এক চোবে ঠাকুরকে দেখিয়া অখিল বুঝিল বেশ্যার নিকট 'বিশুদ্ধ প্রণয়' মেলে না। সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল— 'হা, হা, হা, আমার এত আশার স্বপ্নভঙ্গ হলো...।'

নাটকের শেষদৃশ্যে মৃত্যুঞ্জয় ও আমোদিনীর 'চক্রান্তে' মৃত্যুঞ্জয়ের খিড়কির বাগানে তরুবালার সহিত অখিলের সাক্ষাৎ হইল। অনুতপ্ত অখিল বলিল, 'তুমি দাসী?— তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী! আমার সর্বস্ব! আমার হৃদয়রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী!' (৫।৩)

'তরুবালা' নাটকের মূলকাহিনীর সহিত আর দুইটি উপকাহিনী সংলগ্ন আছে। বিধবার সংযম ও চরিত্রবত্তার নিকট পুরুষের লাম্পট্য যে লজ্জায় মাথা নত করে এবং বিধবাবিবাহ যে অযৌক্তিক তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে বেণী ও শান্তর উপকাহিনীতে।

শান্ত বলে, '···হিন্দুর ঘরে বিধবা বে কবাই পাপ।

বেণী। শান্ত, এটি তোমার সম্পূর্ণ ভুল, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, বিদ্যাসাগর মহাশয় তার প্রমাণ করেছেন। তুমি তো রামায়ণ পড়েছ, দেখ মন্দোদরী, তারা, দুজনেই বিবাহ কবেছিল।

শান্ত। হাঃ হাঃ হাঃ! বেণীদা, খুব দৃষ্টান্তই দিয়েছ, একজন রাক্ষসী একজন বাঁদবী!' (২।১)

মৃত্যুঞ্জয়-আমোদিনীর উপকাহিনীতে জীবনের আর একটি সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অদৃষ্টকে মানিয়া লইবার মতো উদার প্রসন্ন হৃদয় থাকিলে, বৃদ্ধ স্বামী লইয়াও জীবন সুখের হইতে পারে।

অখিলের 'যথার্থ প্রণয়'-রূপ দিবাস্বপ্নের বিপবীতে এই দুইটি উপকাহিনীকে স্থাপন করিয়া নাট্যকার তাঁহার মূল বক্তব্যকে যেমন উজ্জ্বল করিয়াছেন, ঘটনায়ও তেমনই বৈচিত্র্য সৃষ্ট হইয়াছে।

বিহারী-চরিত্র নাট্যকারের ঈপ্সিত চরিত্র*। পরিহাসের ছলে বিহারী বারবার অখিলকে বিদ্রূপ করিয়া স্বস্থ করিতে চাহিয়াছে। নাট্যকারের অভিপ্রেত শ্লেষ তাহারই উক্তিতে প্রকাশিত। এই চরিত্রটিতে 'সধবার একাদশী'র মন্থপ ও স্পষ্টবাদী নিমচাঁদ-চরিত্রের কিছুটা প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের উক্তিতে সস্নেহ তিরস্কার ও সরস যুক্তি তাৎপর্যপূর্ণভাবেই অভিব্যক্ত। অখিলের কল্পনাবিলাসিতা ঈষৎ অতিশয়িত হইলেও অবাস্তব ও অসঙ্গত হয় নাই।

স্টার থিয়েটারে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ ডিসেম্বর 'তরুবালা' প্রথম অভিনীত

* 'তরুবালা'র অভিনয়ে অমৃতলাল এই চরিত্রেই অবতীর্ণ হইতেন।

হয়। গিরিশচন্দ্র তখন স্টারের অধ্যক্ষ। ১৯এ ডিসেম্বর 'তরুবালা'র অভিনয়-বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। নাট্যকাহিনীর কয়েকটি দিক সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়া নাটকটিকে দর্শকদের নিকট আকর্ষণীয় করিবার প্রয়াস এই বিজ্ঞাপনে রহিয়াছে।[৩১]

'তরুবালা' জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহার অভিনয় দর্শনে তৎকালে অখিলচন্দ্রের অনুরূপ অনেক বিকারগ্রস্ত শিক্ষিতের সুমতি হইয়াছিল। এই দিক দিয়াও সমাজ-শিক্ষক অমৃতলালের উদ্দেশ্য ও আশা অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছিল। 'তরুবালা' দর্শকসমাজে কিভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা 'ইণ্ডিয়ান মিরর' হইতে জানিতে পারি। 'মিরর' লিখিয়াছেন—

> "It has often been discussed that Bengali Theatres produce a demoralizing effect on the minds of the audience, and bring degradation on society, and that sooner such institutions are done away with, the better. I quite disagree with this argument. The examples, set forth by the promoters of such theatres, in producing plays, connected with the social condition of the country, representing a true and real picture of Young Bengal in their everyday occurrence in life, are far

৩১ 'NEW DRAMA ! NEW DRAMA ! NEW DRAMA !

STAR THEATRE

Cornwallis Street

Saturday, the 20th Dec., at 9 p.m. sharp

Babu Amrita Lal Bose's New Society Comedy

TARUBALA

Scenes from our Domestic Doings—Dramatically described.

TARUBALA

THE MODEL OF A HINDU WIFE

Heart-enthralling and Tender scenes from our home-life.

Hindu Young Widow's Devotion for her Departed Lord.

Entertaining—Interesting—Amusing—Romantic

Delightful—Humorous—Musical—Picturesque

TARUBALA ....G. C. Ghosh, Manager.'

(The Indian Mirror: 19. 12. 1890)

more instructive and productive of good results in ameliorating their condition than by mere laying down precepts. The production of the play, 'Tarubala' by Babu Amrito Lall Bose, which was put on the boards of the Star Theatre on Saturday night before a large audience, was a fair sample of it.

The exemplary character of the hero, Akhil Chunder, his disregard to the true and unaffected love of his unostentatious wife, Taru, on the one hand, and the infidelity, disregard, and neglect with which he was treated by one Paru,...on the other, are the very touching and effective lessons ever put on the stage. I have heard men of the type of the hero say that they have derived a good lesson from the play, and would henceforth give up their habits as such....The true position of widowhood, in a Hindu home, was well defined and the character well sustained.

The author deserves our hearty thanks for such a production, and we hope, he will continue such works, and put them on the stage."[৩২]

অমৃতলাল তরুবালার মত নাটক আরও লিখিবেন, 'মিরর' এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু অমৃতলাল নাট্যানুরাগীদের সে আশা পূরণ করেন নাই বলিয়া সুদীর্ঘকাল পরে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।*

৪

'বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০০ সালে। নামপত্রে নাটকটিকে 'পারিবারিক নাটক', এবং ১৮৯৩ সনের ২৬এ আগস্টের অভিনয়-

৩২ The Indian Mirror : 7. 1. 1891

* প্রথম রজনীতে অভিনীত ভূমিকাগুলি ছিল এইরূপ : ঠাকুরদা—নীলমাধব ; আমোদিনী—গঙ্গামণি ; তরুবালা—প্রমদা ; অখিল—অমৃত মিত্র ; বিহারী—অমৃতলাল ; শান্তা—নগেন্দ্রবালা ; পারুল—মানদা ; হীরালাল—অক্ষয় কোঁয়র।

বিজ্ঞাপনে 'New Domestic Drama' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নাটকের কথাবস্তু মৌলিক নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবেব পূর্বে বিজয় বসন্তের কাহিনী যে বাংলা দেশে সুপ্রচলিত ছিল তাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন।

রূপকথার আকারে বিজয়-বসন্তের যে কাহিনী বরাবরই বাংলা দেশে চলিত ছিল, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জি. সি. গুপ্ত সেই কাহিনী লইয়াই প্রথম নাটক রচনা করিলেন। তবে রূপকথার নাম পরিবর্তন করিয়া নাটকের নাম দিলেন 'কীর্তিবিলাস'। নামকরণ ভিন্ন আর কয়েকটি বিষয়েও তিনি স্বাধীনতা লইয়াছিলেন। নাট্যকারের অভিপ্রায ছিল ট্রাজেডি রচনার। সেইজন্য 'কীর্তি-বিলাসে'র কাহিনী শেষ পর্যন্ত বিজয়-বসন্তের কাহিনীকে অনুসরণ না করিয়া কয়েকটি মৃত্যুতে শেষ হইযাছে। নায়ক কীর্তিবিলাসের মৃত্যুও লেখকের পরিকল্পিত। এমন কি বিমাতা নলিনীব সপত্নীপুত্র কীর্তিবিলাসকে প্রণয় নিবেদনের প্রসঙ্গও রূপকথা অনুযায়ী নহে।

ইহার কয়েক বৎসর পরে (১৮৫৯) কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার 'বিজয়বসন্ত' নামে একটি আখ্যায়িকা রচনা করেন। এই গ্রন্থে বিমাতা 'দুর্জময়ী'র সপত্নীপুত্র বিজয়ের প্রতি অনুরাগের কোন আভাস নাই। দাসী দুর্লতার পরামর্শ অনুযায়ী বিমাতার চিত্ত বিজয়-বসন্তের প্রতি বিমুখ হয়। এই আখ্যায়িকার চরিত্রগুলির নাম এবং অমৃতলালের নাটকের প্রধান চবিত্রগুলির নাম এক (যেমন, জয়সেন, দুর্জয়ময়ী, শান্তা, দুর্লতা, বিজয়, বসন্ত প্রভৃতি)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) নাটকের নির্বাসিত রাজপুত্রের নামও বিজয়।

অমৃতলাল যে জি. সি. গুপ্তের নাটক ও কাঙ্গাল হরিনাথের আখ্যায়িকার সহিত সুপরিচিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরন্তু এই কাহিনী লইয়া যে সকল যাত্রা রচিত হইয়াছিল সেগুলিরও সহিত তাঁহার পরিচয় কম ছিল না।[৩৩] অমৃতলাল এই সকল গ্রন্থাদি হইতে তাঁহার নাটকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

'বিজয়-বসন্ত' নাটকটি পঞ্চাঙ্ক। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের

৩৩ ডঃ সুকুমার সেন ১৮৮১ সনে রচিত এইরূপ একাধিক যাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রঃ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড (৩য় সং) পৃ ৯৫ ও ৯৬।

প্রতিটিতে তিনটি করিয়া গর্ভাঙ্ক এবং তৃতীয় অঙ্কে চারিটি গর্ভাঙ্ক আছে। নাটকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫১।

নাটকের কাহিনী নিম্নরূপ :

জয়পুরের বৃদ্ধ রাজা জয়সেন দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা দুর্জয়ময়ীর রূপে মুগ্ধ এবং রাজকর্তব্যে বিমূঢ়। বৃদ্ধ রাজার মতিভ্রমের সুযোগে রাজশ্যালক দুর্বুদ্ধি সিংহাসন অধিকারের লোভে চাটুকার বটুকচাঁদের সহিত কুমন্ত্রণায় রত। রাজার প্রথম পক্ষের দুই পুত্র, বিজয় ও বসন্ত, ধাত্রী শান্তার নিকট প্রতিপালিত এবং ভবদেব ও বলবন্তের নিকট শাস্ত্র ও শস্ত্রশিক্ষায় নিরত। রাজা পুত্রদের জন্য স্নেহব্যাকুল, কিন্তু মহিষীর ভয়ে সন্ত্রস্ত। দাসী দুর্লতার পরামর্শে রাণী রাজাকে অনুরোধ করিলেন বিজয়-বসন্তকে প্রাসাদে আনিতে— উদ্দেশ্য উভয়ের প্রাণনাশ। বিজয় রাণীর সম্মুখে আসিলে তাহার রূপে মুগ্ধা রাণী সহসা তাহাকে আত্মনিবেদন করিয়া বসিলেন। সভয় বিস্ময়ে বিমাতার পাপ প্রস্তাব বিজয় প্রত্যাখ্যান করিল। রাণীর প্ররোচনায় ক্রোধোন্মত্ত রাজা দুই পুত্রেরই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। বলবন্ত তাহাদের বনমধ্যে লইয়া গেল এবং মন্ত্রী সুবুদ্ধি ও দাসী শান্তার সহিত সাক্ষাৎমাত্র উভয়কে মুক্ত করিয়া দিল। এদিকে বিজয়ের মৃত্যু-সংবাদে রাণীর অন্তরে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রাজার নিকট সত্যঘটনা প্রকাশ করিয়া রাণী আত্মহত্যা করিলেন।[৩৩ক] রাজা উন্মাদপ্রায় হইয়া গেলেন। শেষে পুত্রদের সহিত রাজার মিলনে নাটক শেষ হইল।

উপরিউক্ত নাট্যকাহিনীর উৎস প্রচলিত রূপকথা। সুতরাং অমৃতলালের স্বাধীনতা ছিল সীমাবদ্ধ। তবে দুর্লতা, দুর্বুদ্ধি, বটুকচাঁদ প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্রের আচরণ ও সংলাপ সৃষ্টিতে তিনি হাস্যরসাত্মক কয়েকটি মৌলিক দৃশ্যের অবতারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার প্রণয় নিবেদনের প্রসঙ্গটি তিনিও গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবত ইহা 'কীর্তি বিলাসে'র প্রভাব।[৩৪] আসলে সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার আসক্তির ব্যাপারটি সকলেই প্রাচীন কাহিনী হইতে লইয়াছেন এবং এইভাবেই প্রসঙ্গটি বাংলা

৩৩ক কাঙ্গাল হরিনাথের গ্রন্থে দুর্জয়ময়ীর আত্মহত্যা নাই। গ্রন্থের শেষে বিজয়-বসন্ত "বিমাতার সম্ভাষণে" গেলে "রাজ্ঞী প্রণত পুত্রদিগকে সলজ্জবদনে 'আয়ুষ্মান হও' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন...।"

৩৪ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ অনুমান করেন যে, এই প্রসঙ্গটি গিরিশচন্দ্রের 'পূর্ণচন্দ্র' (১৮৮৮) নাটকের প্রভাবে রচিত— 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' (২য় সং) পৃ ১৮৭।

নাটকে আসিয়াছে। সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার আকর্ষণের ব্যাপারটি সুপ্রাচীন। Theseusএর পুত্র Hippolitusএর প্রতি তাহার বিমাতা Phaedraর আকর্ষণ গ্রীক আখ্যায়িকায় আছে এবং এই ঘটনা লইয়া Euripides ও Seneca ট্রাজেডিও রচনা করিয়াছেন। সম্রাট অশোকের পুত্র কুণালের প্রতি তাহার বিমাতা তিষ্যরক্ষিতার এবং সেলিউকাসের পুত্র Demetriusএর প্রতি তাহার বিমাতা Stratoniceএর প্রণয় কাহিনীও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই সকল কাহিনী অমৃতলালের অজ্ঞাত ছিল না।

নাটকের চরিত্রগুলি সুঅঙ্কিত। রাণী দুর্জয়ময়ীর তীব্র প্রতিহিংসা, রাজা জয়সেনের অন্তর্জ্বালা ও মর্মপীড়া, ধাত্রী শান্তার স্বভাব মমতা প্রভৃতি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সংলাপও চরিত্রোপযোগী। যেমন দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিজয়ের প্রতি রূপমুগ্ধা দুর্জয়ময়ীর উক্তি :

'কিসে আমি তোমার জননী, কে বলে আমি তোমার জননী? কোন শাস্ত্রে আমি তোমার জননী? তোমায় কি আমি গর্ভে ধারণ করেছি? আমার হৃদয় ক্ষীরে কি তোমার শৈশবদেহের পোষণ হয়েছে? তোমায় কি আমি অঙ্কে ধরে লালন পালন করেছি? কেন তবে তোমার মনে আমার প্রতি মাতৃভাব আসছে?'

নাট্যকারের স্বভাবসিদ্ধ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে অনেক স্থলে হাস্যরস অনায়াস স্ফূর্তি পাইয়াছে। যেমন,

'দুর্লতা। যাও তোমায় এখন আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না, আমায় দাসীর সর্দারণী করবে!

দুর্বুদ্ধি। প্রাণপ্রেয়সি, দেখনহাসি, সোনার শশি, তুমি যে আমার গলার ফাঁসী, তুমি কি যে সে দাসী, তোমায় আমি করবো সেবাদাসী।

বটুক। অ্যাঁ—ছ্যা ছ্যা ছ্যা! দুলোলমণি, হুজুর একটা রসিকতা কাচ্ছলেন তা তুমি বুঝতে পাল্লে না?

দুর্লতা। ইস্! ও কি রকম রসিকতা! ঘাতে ঘা দিয়ে ঠাট্টা? কৈ আমার মাথায় হাত দিয়ে বল দেখি ঠিক আমায় পাটরাণী করবে—করবে—করবে?

দুর্বুদ্ধি। হ্যাঁ, তোমায় ঝাঁটপাটের রাণী করবো—করবো—করবো।'

নাটকের ঘটনা সংস্থাপনে অমৃতলাল একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। যে দৃশ্যে ঘটনাপ্রবাহ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তাহারই পরবর্তী দৃশ্যে

দুর্বুদ্ধি ও বটুকলাল প্রভৃতির স্থূল রঙ্গরসিকতার দ্বারা তিনি ঘটনার ভার লাঘব করিয়া দিয়াছেন।

নাটকে কয়েকটি গান আছে। অধিকাংশই বিজয় ও বসন্তের। এই গানগুলি তাহাদের বয়স ও স্বভাবের উপযোগী ভাষাতেই রচিত। দুর্লতার একটি গানে, 'আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা', কিছুটা হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে। দুর্বুদ্ধি ও তাহার মোসাহেবদের হিন্দী গানটিতে অমৃতলালের হিন্দী ভাষায় অধিকারের পরিচয় আছে। শেষ দৃশ্যে তপোবনে সুললিত সংস্কৃতভাষায় রচিত গীতটিতে গীতগোবিন্দের মত অনুপ্রাস-ঝঙ্কার স্পষ্ট।

১৩০০ সালের ১১ই ভাদ্র (২৬এ আগস্ট ১৮৯৩) শনিবার, স্টার থিয়েটারে 'বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত' প্রথম অভিনীত হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় অধ্যক্ষ অমৃতলাল যে অভিনয়-বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল—

"Cares taken in the selection of dresses and scenes with a view to minister to the occular and intellectual pleasure of the public."...[৩৫]

এই নাটক ও তাহার অভিনয়-বিষয়ে 'অমৃতবাজারে'র মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

"The drama is said to be full of touching incidents and we are told that nothing has been spared by the management in making the piece sufficiently attractive."[৩৬]

'বিজয়-বসন্তে'র অভিনয় দর্শনের জন্য দর্শকমণ্ডলী যে উৎসুক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম অভিনয় রজনীতে স্টার থিয়েটার দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অভিনয় দর্শনে দর্শকবৃন্দ উৎফুল্লও হইয়াছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্র হইতে জানিতে পারি—

"THE STAR THEATRE

As was to be expected, a crowded house met to greet the opening performance of Vijay Basanta at the above theatre last night, and, as was equally to be expected,

৩৫ The Amrita Bazar Patrika, 26. 6. 1893

৩৬ ঐ ঐ

the representation was received with rapturous applause."[৩৭]

'বিজয়-বসন্ত' জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ২৮এ অক্টোবর তারিখে নাটকটিকে 'Popular drama' বলিয়া উল্লেখ করেন।

অমৃতলাল নিজে এই নাটকে অভিনয় করেন নাই। তবে নাট্যাচার্যরূপে অভিনয়-পরিচালনা, দৃশ্য ও সাজসজ্জা-পরিকল্পনা, অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচন ইত্যাদি তিনিই করেন।[৩৮] বস্তুত তাঁহারই সর্বাঙ্গীণ তত্ত্বাবধানের ফলে 'বিজয়-বসন্ত' সেকালের একটি দর্শনীয় নাটকরূপে গৃহীত হয়। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ প্রশস্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাব কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"THE STAR THEATRE

Babu Amrita Lal Bose, the enterprising Manager of the above theatre, seems to have run his fingers through all the keys of the dramatic gamut, beginning with the childish treble of pantomimic farces, and ending with the sonorous bass of domestic tragedy ; for Bijoy Basanta, the dramatic version of a popular story, which he has lately made and caused to be produced comes undoubtedly under the latter class of dramatic compositions, the criterion of which should be, not necessarily a conclusion, brought about by means of cups and daggers, but the embodiment of powerful sentiments and the incorporation of over-powering situations...

The scene in which the shameless step-mother, like

৩৭ The Indian Mirror : Sunday Aug. 27, 1893

৩৮ প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকা নিম্নরূপ :

জয়সেন— উপেন্দ্র মিত্র। বলবন্ত— অমৃত মিত্র। বিজয়— তারাসুন্দরী। বটুকচাঁদ — রাধামাধব কর। দুর্বুদ্ধি— অক্ষয়কালী কোঁয়র। দুর্জয়ময়ী— নগেন্দ্রবালা। শান্তা— গঙ্গামণি।

Phaedra of old, unbosoms herself of her unholy passion before him (Bijoy), and in which he repulses her advances with all the moral heroism of a Hippolitus, was gone through with characteristic strength and spirit ... Of the view of the.. hermitage in the last scene of the drama in which the sun breaks forth gradually in all his crimson glory, it would suffice simply to say that it was not canvas and colour—it was nature. Bijoy Basanta is designed to have a lengthened run both from choice and necessity,— choice because it hits the popular taste, and necessity, because it would be difficult to replace it by a better piece for some time to come."[৩৯]

আটাশ বৎসর পরে ১৩২৮ সালে অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ 'সংমা বা বিজয়বসন্ত' নামে একটি 'আখ্যানমূলক নাটক' লেখেন। ইহাকে 'নাটক' বলিয়া উল্লেখ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাকে 'যাত্রা'ই বলিতে হয়। এই গ্রন্থটি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে উৎসর্গীকৃত এবং 'শ্রীশ্রীচরণ ভাণ্ডারীর প্রতিষ্ঠিত' সিমুলিয়া নাট্যসমাজে অভিনীত।[৪০]

৫

'আদর্শ বন্ধু' নাটকটি ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে তিনটি এবং পঞ্চম অঙ্কে একটি গর্ভাঙ্ক। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৪।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের অকৃত্রিম অনুরাগের জন্য অমৃতলাল নাটকটি তাঁহাকে উৎসর্গ করেন।[৪১]

৩৯ The Indian Mirror. September 5, 1893

৪০ গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৯। গ্রন্থকারের অবাধ কল্পনা অনেক অকল্পনীয় অতিনাটকীয় ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছে। ৪র্থ অঙ্কের ৫ম দৃশ্যে রাণী রাজার দুই চক্ষে শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে এবং ৫ম অঙ্কের ৮ম দৃশ্যে শ্মশানে 'জীর্ণবসনা রুক্ষকেশা শ্বাসরোগগ্রস্তা মুমূর্ষু দুর্জ্জয়ময়ী'কে চণ্ডালেরা প্রহার করিয়া হত্যা করিয়াছে!

৪১ 'রাজন! বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আপনার কতদূর অকৃত্রিম অনুরাগ—

যে আদর্শ বন্ধুত্ব লইয়া নাটকটি পরিকল্পিত সে কাহিনী মৌলিক নহে। গ্রীক সাহিত্যের Damon ও Pythias[৪২] নামক দুই বন্ধুর আদর্শ মৈত্রীই এই কাহিনীর উৎস। ইংরেজীতেও 'Damon and Pythias' নামে একটি নাটক ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল, রচয়িতার নাম Richard Edwards। 'আদর্শ বন্ধু' নাটকের মূল ভাবটি বিদেশী সাহিত্য হইতে সংগৃহীত হইলেও, যেভাবে ভারতীয় পটভূমিতে 'ভায়াত' ও স্বৈরাচারের দ্বন্দ্বে ঘটনাবলী সৃষ্ট হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের রূপায়ণ হইয়াছে তাহাতে নাটকটি একপ্রকার মৌলিক রূপই লাভ করিয়াছে।

নাট্যকাহিনী নিম্নরূপ :

মন্দাবতীতে রাজতন্ত্র ছিল না, ছিল ভায়াত (Bhayad or 'brethren of the tribe')। ভায়াতের সেনাপতি দণ্ডার সিংহ ভায়াতের অবসান ঘটাইয়া রাজা হইবার জন্য ব্যগ্র। অর্থের দ্বারা সদারগণকে বশীভূত করিয়া দণ্ডারের অভিপ্রায় অনুযায়ী অনুগ্রহভাজন মতিচাঁদ হইল ভায়াতের নব সভাপতি। ভায়াতের প্রধান সর্দার রাও দিনকর উপলব্ধি করিল যে স্বদেশের বিপদ এইবার আসন্ন—

'পলায়েছে ধর্ম, এবে মন্দাবতী হ'তে
স্বদেশের হিত, জাতির মঙ্গল
স্বার্থস্রোতে গিয়েছে ভাসিয়া, '

ভায়াত সভায় সভাপতি মতিচাঁদ যখন দণ্ডার সিংহকে 'মন্দাবতী রাজ্যের ঈশ্বর' বলিয়া ঘোষণা করিল, দিনকর তখন প্রতিবাদ জানাইল এবং দণ্ডারকে বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক বলিয়া ধিক্কার দিল। ফলে দণ্ডারের আদেশে সে বন্দী হইল। সেই দিনই তাহার শিরশ্ছেদের আদেশ দিল দণ্ডার।

এদিকে দিনকরের বন্ধু সৈন্যাধ্যক্ষ পৃথ্বীধরের সেদিন বাগদত্তা আশাবতীর

তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ 'সাহিত্য-পরিষদ' ও সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠায় দেদীপ্যমান। এই কারণে আমার এই নূতন নাটকখানি, আপনার মহনীয় নাম সংযোগে অলঙ্কৃত করিতে সাহসী হইলাম।... অনুগত

শ্রীঅমৃতলাল বসু।'

৪২ Encyclopaedia Britannica-র মতে 'Damon and Phintias (not Pythias)' —দ্রঃ vol 7, P-6.

সহিত বিবাহ। পৃথ্বীধর আশাবতীর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কারাগারে দিনকরের সহিত মিলিত হইল এবং দণ্ডারের নিকট কিছুক্ষণের জন্য দিনকরের প্রাণভিক্ষা চাহিল যাহাতে সে স্ত্রী হিরণ্ময়ী ও পুত্র অংশুর নিকট বিদায় লইয়া আসিতে পারে। দিনকরের পরিবর্তে পৃথ্বীধর স্বেচ্ছাবন্দীত্ব লইল। শর্ত হইল, সূর্যাস্তের পূর্বেই দিনকবকে ফিবিতে হইবে, নতুবা পৃথ্বীধরের মৃত্যু হইবে।

স্ত্রীব অনুনয় উপেক্ষা করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইয়া দিনকর দেখে তাহার অশ্বটি নাই। যাহাতে সে আর বধ্যভূমিতে ফিরিতে না পারে সেজন্য তাহার ভৃত্য লট্‌কা সেটিকে হত্যা করিয়াছে! আসন্ন সূর্যাস্তেও দিনকরের প্রত্যাবর্তনের কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া ঘাতক পৃথ্বীধবকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এমন সময় উন্মত্ত বেগে দিনকর বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিল এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল।

এই আদর্শ বন্ধুত্ব দেখিয়া দণ্ডারের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। দিনকরকে সে ক্ষমা করিল এবং বলিল—

'স্বার্থত্যাগ শিখিলাম তোমা দোঁহা দেখে,
বুঝিলাম ধর্মগৌরবের কাছে
অতি ছার রাজসিংহাসন!'

'আদর্শ বন্ধু' নাটকে অমৃতলাল যখন প্রজাতন্ত্রের প্রাধান্য দেখাইয়াছিলেন তখন স্ববাজ-আন্দোলনের বাষ্পও এদেশে দেখা যায় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতের পূর্বে সাহিত্যের মধ্যে জাতীয়তাবোধ কিভাবে প্রতিফলিত হইতেছিল, তাহার ইতিহাসও নাটকটিতে মেলে। প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে দিনকরের আক্ষেপোক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

'মন্দাবতী মন্দাবতী!
মাগো এই ছিল ভাগ্যেতে তোমার!
হা ধর্ম—স্বাধীনতা!'

এবং

'ওগো মা জন্মভূমি!
আজি মনে রেখ তুমি,

তোমার উদ্ধার তরে
অনেক যতন ক'রে না পেয়ে উপায়,
ম্লান রাঙ্গা পায
এই দেহ দিব বলিদান।'

এই নাটকে দণ্ডার সিংহের ভূমিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যলুব্ধ শাসক ও রাজার মনোভাবপরিবর্তনের ব্যাপারটি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাপরম্পরায় ব্যক্ত হইয়াছে। দণ্ডারের ক্রিয়াকলাপের সহিত শেক্সপীয়রের 'Measure for Measure' নাটকের ডিউকের কোন কোন কাজের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন, উভযের ছদ্মবেশধাবণের ব্যাপাবটি। অমৃতলাল নাটকীয় চমৎকারিত্ব স্থষ্টির জন্য বিষয়টি শেক্সপীয়র হইতে গ্রহণ করিলেও ছদ্মবেশধারণের কারণ ও উদ্দেশ্য শেক্সপীয়রের নাটক অপেক্ষা স্পষ্টতর করিয়াছেন—

'দণ্ডার। ·· এনে দাও ছদ্মবেশ মোরে
আপনি ভেটিব পৃথ্বীধরে কারাগারে,
সময় মতন দেখাইব প্রলোভন,
যদি দেখি স্থির এই বন্ধু বীর
রহিল অটল,
যদি জীবনের ডরে
তা'র সত্য নাহি নড়ে,
ধিক্ তবে মুকুটে আমার!' (তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)

এই উদ্দেশ্যেই দণ্ডার কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পৃথ্বীধরের সহিত এবং অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের সহিত ছদ্মবেশে সাক্ষাৎ করিয়াছিল। 'Measure for Measure' নাটকেও ডিউক কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত Claudioর সহিত এবং অন্যান্য চরিত্রের সহিত ছদ্মবেশে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তবে দণ্ডার সিংহের ক্ষেত্রে তাহার আচরণের কারণ ও তাৎপর্য যেরূপ স্পষ্ট, ডিউকের ক্ষেত্রে সেরূপ নহে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ডিউক Claudioকে কতকগুলি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, ইহার কারণও অস্পষ্ট। এইজন্য সমালোচকরা ডিউকের আচরণের অসঙ্গতি সম্পর্কে যথার্থ অভিযোগ করিয়াছেন।[৪৩]

৪৩ 'From the first no one quite knows why he has chosen to absent himself ostentatiously from Vienna and to come back pretending to

দিনকর ও পৃথ্বীধর, এই দুই আদর্শ বন্ধুর চরিত্র নাটকে সুপরিস্ফুট। তাহাদের স্বভাবগত বীরত্ব ও মহত্ত্ব উভয়েরই সংলাপে সুষ্ঠু অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই দুই চরিত্রের বিপরীতে হিরণ্ময়ী ও আশাবতী তাহাদের নারীসুলভ সহজ স্বার্থ লইয়া সুচিত্রিত। দিনকর ও পৃথ্বীধরের নিঃস্বার্থ উদারতার সহিত হিরণ্ময়ী ও আশাবতীর দ্বিধাজড়িত স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি করিয়া অমৃতলাল ঘটনাগত উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বর্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শেষ দৃশ্যে আসন্ন সূর্যাস্তে দিনকর যখন অনুপস্থিত এবং পৃথ্বীধরের মৃত্যুক্ষণ আসন্ন, তখন বধ্যভূমিতে বিভিন্ন ব্যক্তির পল্লবিত সংলাপে এই উৎকণ্ঠা যেন দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। দিন-করের নাটকীয় আবির্ভাবে এই উদ্বেগের অবসান ঘটাইয়া নাট্যকার দণ্ডারের প্রসন্ন উক্তির দ্বারা ঘটনার তীব্রতা হ্রাস করিয়া দিয়াছেন এবং দক্ষ নাট্যকারের মতোই একটা প্রশান্তির মধ্যে নাটক শেষ করিয়াছেন।

চটসাঁই চরিত্রটি শেক্সপীয়রীয় 'fantastic' চরিত্র বা গিরিশচন্দ্রের 'সর্বজ্ঞ' জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ হইলেও তাহার উক্তি বর্ণহীন অনুকরণমাত্র নহে। যেমন,

'জানে সবাই সব মায়া,
কায়াখানা কেবল ছায়া,
জায়া সুত ভগ্নী ভায়া,
খালি ছবির খেলা, ছায়াবাজী।'

উদরায়ণ নামক পুরোহিত চরিত্রটি সৃষ্ট হইয়াছে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে। অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলি যথাযথ।

অমৃতলাল এই নাটকে সর্বপ্রথম ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিলেন। এই ছন্দের সমালোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ বিরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও 'আদর্শ বন্ধু' রচনা করিবার পরে অমৃতলাল তাঁহার শেষ নাটক 'যাজ্ঞসেনী' (১৩৩৫) ব্যতীত আর কোথাও এ ছন্দ ব্যবহার করেন নাই তথাপি ছন্দে সংলাপ রচনায় ক্ষমতা তাঁহার ছিল না একথা বলা যায় না। শেষ দৃশ্যে দিনকর বধ্যভূমিতে তাহার বিলম্বিত প্রত্যাবর্তনের কারণ জানাইতেছে—

be somebody else.' —"Measure for Measure"— Ed. by Sir Arthur Quiller-Couch. pp. xxxiii-iv.

"উঃ সেই বিশ্বাসঘাতক নফর,

নীচমতি ভীল বক্ষিতে আমার প্রাণ
ঘোটকে আমার করেছিল বধ।
করিতাম বিনাশ তাহায়,

অকস্মাৎ দেখিনু অদূরে,
পথিক জনেক আসে
চাপি বেগবান অশ্বে ;
হতাশে হুতাশে হয়ে জ্ঞানহারা,
বিকট চীৎকারে
করিলাম আক্রমণ তারে,
উন্মত্তের ন্যায় করিনু হুকুম
ত্যজিতে পর্যাণ,
করিল সে অস্বীকার।
কিন্তু
স্বীকার বা অস্বীকার কে মানে তখন !
ক্ষুধার্ত শার্দুল যথা ধরে ক্ষুদ্র পশু,
সেইমত লম্ফ দিয়ে
আঁকাড়িয়ে ধরিলাম কণ্ঠ চেপে ;
এইরূপে পৃথ্বীধর ধরিয়া তাহায়
'দে ঘোড়া— দে ঘোড়া— ঘোড়া তোর'
করিনু চীৎকার।

দণ্ডার। (অগ্রসর হইয়া) দিনকর ! দিনকর !

দিন। এই— এই আমি,
চেয়ে দেখ বধ্যমঞ্চ পানে,
দেখ— দেখ না আমায়,
সদর্পে দাঁড়ায়ে আছি নিজ সিংহাসনে।
দেখিতেছ ঐ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ,

রঞ্জিত হয়েছে যাহা
অস্তগামী তপনের রাগে
ও হ'তে উজ্জ্বল সিংহাসন মোর।"

এ ভাষা নাটকেরই ভাষা এবং এ ছন্দ প্রাণহীন নহে। নাটকের অধিকাংশ স্থলেই এই ধরণের ভাষা ও ছন্দ বর্তমান। সুতরাং 'তিনি এক অতি বিকৃত কৃত্রিম এবং হাস্যকর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন' এই মন্তব্যের দ্বারা এক কথায় অমৃতলালের প্রচেষ্টাকে বাতিল করিয়া দেওয়া সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।[৪৪]

'আদর্শ বন্ধু' প্রথম অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ এপ্রিল, শনিবার। এই অভিনয়ের পূর্বে প্রায় দেড় মাস কাল স্টার থিয়েটারে অভিনয় বন্ধ ছিল। বারো হাজার টাকা ব্যয় করিয়া থিয়েটার ভবনের সংস্কার-সাধন করিয়া স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হইল 'আদর্শ বন্ধু'র অভিনয়ে। অমৃতলাল (অধ্যক্ষ) অভিনয়-বিজ্ঞাপনে জানাইয়া দিলেন যে,

'...We have made a daring change in our orchestra by the introduction of the Piano.'[৪৫]

বস্তুত সব দিক দিয়া এই অভিনয় দর্শনীয় করিয়া তুলিতে থিয়েটার-কর্তৃপক্ষের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' হইতে জানিতে পারি, মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোক সম্পাতেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল : 'a feature— new to the Indian stage.'[৪৬]

অভিনয়ে অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল না।[৪৭] নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়। কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

"Uncommon tact and ingenuity have been displayed in Indianizing the theme. The scene is laid in Cutch, the history of which happily for the purposes of the adap-

৪৪ 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'— ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পৃ ১৮৭ দ্রঃ

৪৫ The Amrita Bazar Patrika— 28. 4. 1900

৪৬ The Indian Mirror— 28. 4. 1900.

৪৭ প্রথম অভিনয়-রজনীর ভূমিকা-লিপি মেলে নাই। দানীবাবু করিতেন পৃথ্বীধরের ভূমিকা এবং চুনিবাবু হইতেন দণ্ডার সিংহ।

tation shows that a sort of commonwealth prevailed there in the past under the name of 'Bhayad' or 'brethren of the tribe' and exists even in the present day in a modified form. Those who have read the story in its English form cannot fail to have noticed how vastly the present adapter has improved upon it by introducing characters and incidents of uncommon interest. Babu Amritalal Bose seems, like Sheridan, to be gifted with a sort of alchemy which gives all the characters, on whom he exercises his power, a golden hue... The composition of 'Adarsha Bandhu' affords a striking illustration of the fact that the author is as much at home with poetical thought and nobler sentiments as he is so well known to be with wit and caustic humour. The piece is destined to a long career..."[৪৮]

'আদর্শ বন্ধু' অভিনীত হওয়ার নয় বৎসর পরে (১৯০৯) লণ্ডন হইতে London Comedy Company এই একই নাট্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত 'For the King' নাটকটি কলিকাতায় কয়েক রাত্রি অভিনয় করেন। এ সম্পর্কে 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকা মন্তব্য করেন—

"সুপ্রসিদ্ধ নাটককার ও ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'আদর্শ বন্ধু' নাটক ও এই নাটকের গল্পাংশ এক।'[৪৯]

৬

'খাস-দখল' ('নাট্যলীলা') ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসে (২৮এ এপ্রিল ১৯১২) প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন অমৃতলালের মধ্যম পুত্র কেতনভূষণ বসু। এই সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৩। নাটকটি অমৃত-

৪৮ The Indian Mirror— 3. 5. 1900

৪৯ নাট্য-মন্দির : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩১৮ (পৃ ৮৮১)

লাল 'পরম ভাগবত স্বধামপ্রাপ্ত প্রভুপাদ বলাইচাঁদ গোস্বামীর[১০] স্মরণার্থ উৎসর্গ' করেন।

'খাস-দখল' নাটকটি তিন অঙ্কের। প্রথম অঙ্কের পূর্বে একটি 'পূর্বরঙ্গ' আছে। তিনটি অঙ্কে মোট তেরটি দৃশ্য— প্রথম ও তৃতীয় অঙ্কে চারটি এবং দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য। 'তরুবালা'র ন্যায় এটিও একটি উদ্দেশ্যমূলক সামাজিক নাটক। নাটকে পত্নীত্যাগী কাব্যবিলাসী মোহিতকে ও বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীদের বেশ উপহাস্য চরিত্ররূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সাহিত্যের বাতিকে গৃহবধূ কতখানি কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জিত হইতে পারে তাহাও উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ডাক্তারদের উপরও কম কটাক্ষ হয় নাই। 'কলির প্রধান রাজ্য কলিকাতায়' দেশহিতৈষণার নামে শিক্ষিতদের যে ভণ্ডামি তৎকালে চলিতেছিল তাহার একটি ব্যঙ্গোজ্জ্বল রূপ দেখিতে পাওয়া যায় নাটকের 'পূর্বরঙ্গে'। কলিকামিনীগণের গীতটিতেও নাট্যকারের অভিপ্রেত শ্লেষ স্পষ্ট। নাটকের মূল কাহিনী নিম্নরূপ :

'উন্নতিশীল উকিল' লোকেনের স্ত্রী মোক্ষদা 'প্রেমপিপাসিতা সুশিক্ষিতা মহিলা'। তাহার জগৎ কাব্য ও কল্পনার জগৎ। লোকেনের বন্ধুস্থানীয় মোহিত একজন 'জিনিয়স কবিবর' এবং সেই কারণেই 'কবিতাময়ী' মোক্ষদার একজন গুণগ্রাহী। উভয়ে রীতিমতো কাব্যালোচনাও করে। একদিন লোকেন কোর্ট হইতে অসুস্থ হইয়া ফিরিলে মোক্ষদা স্বামীর চিকিৎসার রাজকীয় ব্যবস্থা করিল! তিনজন নামকরা ডাক্তার ও একজন কবিরাজ একই সঙ্গে 'চিকিৎসা' করিয়া লোকেনকে 'সুস্থ' করিয়া তুলিল। সুস্থ হইয়া লোকেন চেঞ্জে গেল।

লোকেনের অনুপস্থিতিতেও মোহিত নিয়মিত এ বাড়ী আসে। এ বাড়ীতে আশ্রিতা গিরিবালা মোক্ষদার সুখদুঃখের সঙ্গিনী। বিবাহের পরই তাহার স্বামী তাহার মৃত্যুসংবাদ রটাইয়া দিয়া নিজে নিরুদ্দিষ্ট। মোহিতের গিরিবালাকেও ভাল লাগে, তবে 'গিরিবালা লক্ষ্মণ পোদ্দারের দোকানের গিনি সোনার চিক আর মোক্ষদা দেবী হ্যামিলটনের বাড়ীর নেকলেস'! হঠাৎ খবর আসিল লোকেনকে বাঘে খাইয়াছে। এ সংবাদে মোহিত বিশেষ উল্লসিত হইল এবং

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতলাল যখন অন্ধাবস্থায় 'অমৃত মদিরা'র অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন তখন ইনিই সেই রচনাবলীকে মুদ্রণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ অমৃতলাল লিখিয়াছিলেন, 'গোস্বামীপাদ বাণীরই হউন, আর দীনেরই হউন, আমার হৃদয়ে বরণীয় এবং (পারি যদি) চিরস্মরণীয়।' দ্রঃ 'অমৃত-মদিরা' : পাঠকের প্রতি (পৃ ৩)

'মহান্ গরীয়ান্ স্বর্গীয়ান্ কবিপ্রণয়ে'র বশবর্তী হইয়া বিধবা মোক্ষদাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইল। মোক্ষদাও 'সেই মৃত পতির, সেই ডিয়ারেষ্ট লোকেন—তার তৃপ্তির জন্তেই এত শীঘ্রই মোহিতবাবুকে স্বামীপদে নিযুক্ত' করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়েই গিরিবালা লোকেনের আত্মীয় স্থরেশের নিকট হইতে জানিতে পারিল যে মোহিতই তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী!

এদিকে বিধবা-বিবাহ-সভায় 'রাজর্ষি' মনোমোহন মাইতি উভয়কে বিবাহ সংক্রান্ত 'শপথ' করাইবার পর সকলে যখন রেজিষ্ট্রারের জন্য অপেক্ষা করিতেছে সেই সময় সন্ন্যাসীবেশে লোকেন আসিয়া উপস্থিত! লোকেনকে ফিরিয়া পাইয়া মোক্ষদার চিত্তভ্রম দূর হইল এবং সে স্বামীর সহিত নূতন জীবনাদর্শ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল। এদিকে মোহিত প্রাথমিক লাঞ্ছনা ভোগ করিবার পর গিরিবালাকে তাহারই পরিণীতা পত্নী জানিয়া কৃতার্থ বোধ করিল।

কবি ও প্রেমিক মোহিত এবং আদর্শনিষ্ঠ ঠাকুরদা 'তরুবালা'র অখিল ও ঠাকুরদাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 'তরুবালা'য় কবি অখিল পত্নীর সহিত 'যথার্থ-প্রণয়' সম্ভব নয় বলিয়া বেশ্যার সহিত প্রণয় করিতে গিয়াছিল; 'খাস-দখলে' কবি মোহিত 'কুসংস্কারপূর্ণ বিবাহে' পরিণীতা 'পাড়াগেঁয়ে মেয়েটা'র মৃত্যু-সংবাদ রটাইয়া দিয়া মোক্ষদার সহিত 'কবিপ্রণয়' করিতে গিয়াছে। দুই নাটকেই কল্পনাবিলাস ও বিভ্রান্তির মধ্যে শুভবুদ্ধি সঞ্চারিত করিয়াছেন ঠাকুরদা। মোক্ষদা 'বৌমা' প্রহসনের কিশোরীর সদৃশ। উভয়েই অতিরিক্ত সাহিত্য পাঠ করিয়া নিজেদের রোম্যান্সের নায়িকা ভাবিয়াছে। ডঃ স্থকুমার সেন মনে করেন, গিরিবালার সহিত নৌকাডুবির কমলার সাদৃশ্য আছে।[৫১] 'স্থরঙ্গিনীর' সাব-এডিটর নিতাই অমৃতলালের একটি অভিনব এবং অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।[৫২] স্বল্পবুদ্ধি এই মানুষটি তাহার 'ইজ্ দি'র বাহুল্যে কৌতুকের প্রবাহ অনর্গল করিয়া দিয়া নাটকের শেষের দিকে একটি পূরা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।[৫২ক] বিধবা-বিবাহে ইচ্ছুক মোহিতকে সে রীতিমতো অপদস্থ করিয়াছে। আবার মোহিত ও গিরিবালার পুনর্মিলনে আনন্দিত হইয়া বলিয়াছে— 'Beg your pardon is the, মোহিতের সঙ্গে ইজ্ দি আমার ঝগড়া ছিল, নন্দবাবুর* সঙ্গে ইজ দি

৫১ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড (৩য় সং) পৃ ৩২২

৫২ তিনি নিজে এই ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হইতেন।

৫২ক নিতাইয়ের সহিত 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র (১৯২৬) ঘনশ্যামের ঈষৎ সাদৃশ্য আছে।

* মোহিতের পূর্বনাম।

নয়। You are is the গিরিবালা-মা'র বর, your is the beg your pardon!' এখানে হাস্যরস ও করুণরস এক হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যে ডাক্তারত্রয় ও কবিরাজের কথোপকথনের দৃশ্যটি সুরচিত। ডাক্তারদের কথাবার্তা কিছুটা রং চড়ানো হইলেও স্বাভাবিকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং ডাক্তারি কথার ফাঁকে যাদুধনের এই ব্যক্তিগত প্রশ্নটিও খুবই প্রাসঙ্গিক হইয়াছে— 'I say, পাকড়াশী, why this bad blood between you and your Binodini? কেন বেচারাকে তুমি অত কষ্ট দিচ্ছ?' ডাক্তারদের চরিত্র পরিকল্পনায় মলিয়েরের 'L'amour medecin' প্রহসনের প্রভাব আছে। সেখানেও নায়িকা Lucindeকে চার জন ডাক্তার দেখিতে আসিয়া অধিকাংশ সময়ই ডাক্তারির নানা সামাজিক দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছে।

'খাস-দখলে'র বিশিষ্টতা বুদ্ধিদীপ্ত ও শ্লেষতীক্ষ্ণ সংলাপে। এই প্রকার সূক্ষ্ম সংলাপের দুই একটি টুকরা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যেমন, তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে—

'মোহিত। বিধবা-বিবাহ কি মন্দ?

গিরিবালা। আকাশ-পিদ্দিম কি চাঁদ?'

আবার দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে তিন আধুনিকার সংলাপ:

'বিভাস। স্বামী যখন দূরে প্রবাসে থাকে, তখন স্ত্রী গ্রাস-উইডো হয়।

মহালক্ষ্মী। গ্রাস মানে তো ঘাস।

লাবণ্য। তাই হ'ল না, স্বামী কাছে নেই, একা বসে বসে ঘাস কাটেন, তাই গ্রাস-উইডো!'

এইরূপ রঙ্গব্যঙ্গে পরিপূর্ণ কথোপকথন সে যুগে সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল।[৫৩] অমৃতলালের স্বভাবসিদ্ধ অনুপ্রাস-প্রয়োগ-প্রবণতা এখানে বাংলা ভাষার সীমা অতিক্রম করিয়া ইংরাজী পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে।[৫৪]

৫৩ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন— "কথার খেলায়, ধ্বনিমাধুর্যে ও শব্দঝঙ্কারের মধ্য দিয়ে অপূর্ব মায়াজাল রচনা করে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করার যাদু ছড়িয়ে রয়েছে অমৃতলালের 'খাস-দখল' নাটকে।"—'বাংলা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র'— পৃ ১৬৯

৫৪ 'পূর্বরঙ্গ' দ্রষ্টব্য— মুচিরাম বলিতেছে, "And have you condistanted to confirm the inestimable grass of honorable honor on this City of Palaces and Policies? This Sanititarium of Stables and Statues? On this

'খাস-দখলে' অমৃতলালের ইহাই প্রতিপাদ্য যে, যাহারা বিধবা-বিবাহের উগ্র উদ্যোগী তাহারাই নিজেদের সংসারে বিধবা-বিবাহ দেখিলে সর্বাগ্রে প্রতিবাদ করে। লোকেন বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক। কিন্তু তাহার স্ত্রী নিজেকে বিধবা ভাবিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে গেলে বিস্মিত লোকেন বলিয়া উঠে :

'সে কি— সে কি! মোক্ষদা কি আবার বিবাহ কত্তে যাচ্ছিল নাকি? আমার বাড়িতে আজ কি বিবাহ-সভা! আমার স্ত্রীর বিবাহ?'

তৎকালে বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনের ফাঁকি এইভাবেই নাট্যকারের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল।

'খাস-দখল' স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৩১৮ সালের ১৭ই চৈত্র (৩০ এ মার্চ ১৯১২)। স্টারের লেসী তখন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধে অমৃতলাল তখন স্টারের 'Hony. Dramatic Director'। ১৩১২ সালে 'সাবাস বাঙ্গালী' নামক নকশাটি রচনা করিবার পর অমৃতলাল দীর্ঘকাল আর নাট্যরচনার প্রয়াস করেন নাই। অমরেন্দ্রনাথের নির্বন্ধাতিশয্যে প্রায় ছয় বৎসর পরে তিনি 'খাস-দখল' 'নাট্যলীলা' রচনা করিলেন। অমরেন্দ্রনাথও খুব ফলাও করিয়া দৈনিক পত্রিকায় অভিনয়-বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন।[৫৫] 'খাস-দখলে'র অভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয়। মাসের পর মাস দর্শকপরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় চলিয়াছিল। প্রায় ষাট বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল নিতাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া প্রতি রাত্রেই দর্শকবৃন্দকে হর্ষোচ্ছল করিয়া তুলিতেন। প্রথম অভিনয়ের প্রায় পাঁচ মাস পরেও যে 'খাস-দখল' পূরাদমে অভিনীত

Town of Taxes and Taxicabs? Of Rates and Rats, of Riches and Ditches, of Rupees and রূপসীজ—"

৫৫ অমৃতবাজার পত্রিকায় (৩০. ৩. ১৯১২) এইভাবে বিজ্ঞপিত হইয়াছিল—

First-Nighters Look-up Please!

Babu Amrita Lal Bose's New Play at the

STAR THEATRE

Hony. Dramatic Director— Babu Amrita Lal Bose

Saturday the 30th March, 1912, at 8.30 P.M.

The Sparkling Society-Comedy "KHAS-DAKHAL"

"The Re-Entree".

হইতেছিল তাহা জানিতে পারি অমৃতবাজার পত্রিকার ২১এ আগস্ট তারিখের বিবরণ হইতে—

"......It will be simply unnecessary on our part to pass any remark at present on 'Khas-Dakhal', which has been drawing bumper houses, though staged week after week for the last 4 months, on every occasion showing that its worth has been appreciated by the theatre-going public. Babu Amrita Lal Bose in the role of Netai excited laughter now and then from every part of the audience."

অমৃতলালের সুদক্ষ পরিচালনায় সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীই অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।[৫৬]

'খাস-দখল' দেখিয়া 'দৈনিক বসুমতী' যে মতামত দিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

"...যাঁহার 'তিলতর্পণে' গৌড়সমাজের 'আব্রহ্মস্তম্ব' তৃপ্ত হইয়াছিল, যাঁহার 'বিবাহ-বিভ্রাটে' সমগ্র বঙ্গে সমাজচিন্তার কৌতুক-ফেন-কিরীটী তরঙ্গ উঠিয়াছিল, যাঁহার 'বাবু', 'কালাপানি' প্রভৃতি 'নিতুই নব' রঙ্গনাট্যের কলহাস্যে বাঙ্গলার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মুখরিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, সেই রসিকচূড়ামণি অমৃতলাল বহুদিন— প্রায় ছয় বৎসর একপ্রকার অজ্ঞাতবাস করিয়া গত শনিবার আবার নূতন নাটিকা লইয়া ষ্টারের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।... তাঁহার এই নূতন সৃষ্টি তাঁহার কবিযশের উপযুক্ত হইয়াছে।... বাঙ্গালী যদি 'খাস-দখলে'র সমাদর না করে, তাহা হইলে বলিব, বাঙ্গালা দেশে রসিকতা ও রসের কথার কাল গিয়াছে।"[৫৭]

'খাস-দখলে' ভঙ্গীসর্বস্ব একশ্রেণীর ব্রাহ্মদের লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ কম নাই। সমাজকল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্যেই এই রঙ্গরসের অবতারণা— ব্রাহ্মধর্ম বা

৫৬ 'খাসদখলে'র অভিনয়ে কোন্ ভূমিকায় কে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার সম্পূর্ণ তালিকা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত আছে। প্রধান কয়েকটি ভূমিকাভিনেতার ও অভিনেত্রীর নাম— নিতাই— অমৃতলাল; মোহিত— অমরেন্দ্রনাথ; ঠাকুরদা— কুঞ্জলাল চক্রবর্তী; মোক্ষদা— বসন্তকুমারী; গিরিবালা— সুশীলাবালা।

৫৭ নাট্যমন্দির— ১৩১৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় উদ্ধৃত।

ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের অহেতুক আঘাত করিবার জন্য নহে। সে যুগের অনেক ব্রাহ্মপ্রবরই একথা জানিতেন এবং সেই কারণে অমৃতলালের প্রতি তাঁহাদের সশ্রদ্ধ অনুরাগ কোনদিনই বিরাগে পরিণত হয় নাই। বিপিনচন্দ্র পালের ন্যায় একজন ব্রাহ্মনায়ক 'খাস-দখল' দেখিয়া অমৃতলালকে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছেন। পত্রটি এই —

"কালীঘাট

ওঁ ২১এ অগ্রহায়ণ

[সাল দেওয়া নাই]

প্রীতি নমস্কার পূর্বকম্,

সেদিন আপনার 'খাসদখল' দেখিযা কত প্রীতি ও শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহা মুখেই বলিয়াছি। দেখছি আপনার 'খাসদখল' আমাকে বেশ দখল করিয়া রাখিয়াছে। একটা কিছু না লিখলে শান্তি পাব না। একখানা বাংলা মাসিকে কিছু লিখব ভাবছি। তাতে কিছু ছবি দিতে পারিলে ভাল হয়। অগ্রহায়ণের সংখ্যাতেই দিতে চাই। যে ক'খানা ছবি দরকার পত্রবাহক শ্রীমান রমেশচন্দ্র চৌধুরী আপনাকে বলিবেন। সময় বড কম, যদি 'রঙ্গালয়ে'র নিকট হইতে এই ব্লকগুলো ভাডা পাওয়া যায়, সুবিধা হবে। অলমতি বিস্তবেণ।

আমাব মেয়েবা একদিন 'খাসদখল' দেখে ইচ্ছা করি। বালিগঞ্জের হাওয়া যাদেব লাগাব সম্ভাবনা তাদের এখানা দেখা বডই প্রয়োজন। সুবিধামত একদিন লইয়া যাইব। আবার কবে রবিবার সন্ধ্যায় এটী দিবেন ?

আপনার

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

পুনশ্চ— এই কখানা ছবি পেলে ভাল হয় :

(১) আপনি, (২) অমরবাবু; (৩) ঠাকুরদাদা, (৪) মোক্ষদা-সুন্দরী, (৫) গিরিবালা।"*

নাট্যজগৎ হইতে একরূপ অবসর লইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল পরে 'খাস-দখল' রচনা করিয়া নাটকটি দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে অমৃতলাল সম্ভবত একটু সংকুচিত ছিলেন। কারণ 'খাস-দখলে'র বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছিলেন—

* পত্রটি অপ্রকাশিত।

"আজ শ্রীরামনবমী,— উনিশ বৎসর বয়সে সাধারণ নাট্যশালার দ্বার প্রথম উদ্ঘাটনের দিন হইতে নাট্যজীবন আরম্ভ করিয়া আজ আমার একোনষষ্ঠি বৎসর বয়স সম্পূর্ণ হইল, এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল নট, নাট্যকার ও সূত্রধাররূপে আপনাদের নিকট কত উৎসাহ, কত আদর, কত ক্ষমালাভ করিয়া যে কি কোমল কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি তাহা আর কি বলিব। আজ প্রায় ছয় বৎসর হইল নানা কারণে আমি নাট্যকাররূপে সুধীগণের সম্মুখে উপস্থিত হই নাই, আজ তাই বড় ভয়ে ভয়ে হৃদয়ের স্পন্দন করপেষণে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিয়া— এই 'খাস-দখল' লইয়া আপনাদের সম্মুখে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান; আমার নিজের লেখার গুণের উপর আমার বিশ্বাস স্বল্প, এক ভরসা অভিনেতৃগণের আয়াস ও আপনাদিগের সহানুভূতি; সহৃদয় দর্শকের সাহায্য না পাইলে কখনও কোন অভিনয়ই সাফল্য লাভ করে না।"[৫৮]

'খাস-দখলে' অমৃতলাল যে গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলিই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।[৫৯]

৭

১৩১৯ সালের 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় অমৃতলালের 'আশার নেশা' নামে যে নাটকের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাই ১৩২০ সালে 'নবযৌবন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে অমৃতলাল ছিলেন মিনার্ভার নাট্যাচার্য। নাটকটি চার অঙ্কের; পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১১। 'স্বর্গগত কুচবিহার রাজ্যপতি মহামহিমাভূষিত মহারাজ কর্ণেল স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে' নাটকটি উৎসর্গীকৃত।

'নবযৌবন' একটি কৌতুকোজ্জ্বল রোম্যান্টিক কমেডি। ইহার কাহিনী নিম্নরূপ :

বৃদ্ধ জমিদার রায় দর্পনারায়ণ যৌবন ফিরিয়া পাইবার জন্য 'মুহিম বরবাদি'

৫৮ নাট্যমন্দির, চৈত্র, ১৩১৮ (পৃ ৭৬০-৬১ দ্রষ্টব্য)

৫৯ ১৩১৯ সালের ১১ই ভাদ্র কোহিনূর রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সাহায্যকল্পে যে বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন হয় তাহাতে 'নির্বাচিত কয়েকটি সঙ্গীতে'র মধ্যে 'খাস-দখলে'র একটি গান ছিল: 'ভাতার কেমন মিষ্টি'—গিরিবালার এই গানটি সুশীলাবালা গাহিয়া শোনান।

নামে এক দাওয়াইয়ের সন্ধান করিতেছেন। তাঁহার সংসারে আছে কন্যা তুলসী ও পৌত্রী সুকুমার। সুকুমারের সখী অলকা। বৃদ্ধের ইচ্ছা সুকুমারের বিবাহ দিবেন এক বৃদ্ধের সহিত এবং নিজে বিবাহ করিবেন অলকাকে। কিন্তু সুকুমার তাহার মৃতা জননীর ইচ্ছানুযায়ী তিলকচাঁদকে বিবাহ কবিবে স্থির করিয়া রহিয়াছে। অলকা পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছে বাগানের মালী তরুণ বসন্তকুমারকে। দর্পনারায়ণের সমবয়স্ক ফুলচাঁদ মনে প্রাণে যুবাপুরুষ। সে এই পরিবারের হিতৈষী। তাহারই সহায়তায় তিলকচাঁদ গুলজার বাহাদুর নামে এক সন্ন্যাসীর বেশে দর্পনারায়ণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। এদিকে রাজা তেজবাহাদুব নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে আসিয়া দেখিলেন বসন্তকুমারই তাঁহার পুত্র এবং অলকা বসন্তেরই জন্য মনোনীতা পাত্রী! নাটকটি শেষ হইয়াছে সুকুমার ও তিলকচাঁদের এবং অলকা ও বসন্তের মিলনে। নাটকটির নামের সার্থকতা দেখা যায় শেষ দৃশ্যে দর্পনারায়ণের উক্তিতে— 'আমায় আর মুহিম বরবাদি খেতে হবে না, তোদের দেখে আমার প্রাণের ভেতর নবযৌবন ফুটে উঠছে।'

কাহিনীগত রহস্য নাটকের পরিণতি পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত থাকায় কৌতূহল ও আগ্রহ সর্বদা জাগ্রত থাকে। সুকুমার-তিলকচাঁদ ও অলকা-বসন্তকুমারের পরস্পর-সংলগ্ন কাহিনীদ্বয় নাটকের আকর্ষণ ও উপভোগ্যতা বর্ধন করিয়াছে। দর্পনারায়ণের আভিজাত্যের দর্প ও অদৃশ্য যৌবনের পশ্চাদ্ধাবন কৌতুকপ্রদ। অলকা ও সুকুমারের প্রগলভ সংলাপ বৈদগ্ধ্য ও চাতুর্যপূর্ণ।[৬০] যৌবনশক্তিতে ভরপুর বৃদ্ধ ফুলচাঁদের চরিত্রে লেখকের ব্যক্তিগত প্রবণতার ছাপ পড়িয়াছে। আবার বৃদ্ধ দর্পনারায়ণ ও তাহার মোসাহেব ভজনলালের লুব্ধ আচরণ স্থূলরেখায় আঁকিয়া ইহাদের সহিত তাঁহার মনের অসহযোগ সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

নাটকের কোন কোন স্থলে বাগ্‌বাহুল্য ঘটিয়াছে এবং সংলাপ অতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়াছে। গানের সংখ্যাও চব্বিশ। অবশ্য নাট্যকার এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। সেইজন্য 'অভিনয়-দর্শক-সমাজকে একটা কৈফিয়ৎ' দিয়াছেন 'নিবেদনে'—

৬০ 'অলকা এবং সুকুমার শেক্‌সপীয়রের Portia, Rosalind প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাদের ন্যায় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যময়ী, সুচতুরা রমণী।'— 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'— ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পৃ ১৮৬

'নাটক পাঠকালে লেখকের বাক্যবাহুল্যের যতটা অত্যাচার সহৃদয় পাঠক সহ্য করিতে প্রস্তুত, অভিনয়ের ক্রমবিকাশ দর্শনে কৌতূহলী দর্শক ততটা ধৈর্যধারণে সচরাচর সমর্থ নহেন।··· সেইজন্য এই গ্রন্থান্তর্গত কোন কোন উক্তি ও গীত অভিনয়কালে শুনিতে পাইবেন না।'

বসন্ত ও অলকার প্রণয়পূর্ণ কথোপকথনে যে বুদ্ধির দীপ্তি ও কাব্যের লীলা, অলকা ও সুকুমারের কথোপকথনে যে সরস সজীবতা ও সপ্রতিভ চটুলতা, বা ফুলচাঁদের কথায় যে ব্যঙ্গের বক্রোক্তি ও স্নিগ্ধ পরিহাস লক্ষিত হয় তাহা বেশ হৃদয়গ্রাহী। সংস্কৃত শ্লোকগুলি সুপ্রযুক্ত। গানগুলি, অধিকাংশই লঘু ও কৌতুক-তরল। যেমন ভজনলালের একটি গান—

'মেয়েটি কিছু মন্দ মন্দ।
যেন ফুলের মধ্যে রাধাপদ্ম॥
রংটা কিছু চড়া চড়া, গন্ধ কিছু কড়া কড়া,
পাপ্‌ড়ী কিছু ছাড়া ছাড়া, যেন ফুটতে ফুটতে বন্ধ॥'

১৩২০ সালের ৫ই পৌষ (২০এ ডিসেম্বর, ১৯১৩) 'নবযৌবন' মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ইহার কিছুদিন পূর্বে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ে অমৃতলালকে এখানে নাট্যপরিচালকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।[৬১] অভিনয়-বিজ্ঞাপনে নাটকের বক্তব্য অনেকটা ব্যক্ত হইয়াছিল।[৬২]

অমৃতলালের পরিচালন-নৈপুণ্যে 'নবযৌবন' সুঅভিনীত হইয়া দর্শকসমাজে সমাদৃত হইয়াছিল।* অমৃতলাল অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তরুণ বসন্তকুমারের ভূমিকায়। তাঁহার অভিনয়ে 'সাড়া জাগিয়াছিল।'[৬৩] তিলকচাঁদের ভূমিকাটি ছিল অপরেশচন্দ্রের। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"নবযৌবন বেশ পশার করেছিল— নাচে গানে, আখ্যানের বৈচিত্র্যে এবং অভিনয়ের গুণে মিনার্ভায় 'নবযৌবন' নবযৌবন এনে দিয়েছিল।"[৬৪]

৬১ মিনার্ভার অধ্যক্ষ তখন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)।

৬২ দ্রঃ The Amrita Bazar Patrika : 19. 12. 1913

* প্রথম অভিনয়রজনীর সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি গ্রন্থমধ্যে মুদ্রিত আছে।

৬৩ সচিত্র শিশির— ভাদ্র ১৩৫৮

৬৪ 'বাঙলা রঙ্গমঞ্চ'— সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (সচিত্র শিশির : আশ্বিন ১৩৫৮)

১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে অমৃতলালের শেষ নাটক 'যাজ্ঞসেনী' প্রকাশিত হয়। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬। 'সারস্বত-যজ্ঞ-ঋত্বিক' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'অমর স্মৃতি পূজার্থ এই যাজ্ঞসেনী নাটক প্রণতমস্তকে উৎসর্গীকৃত।' দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের সূত্রপাত হইতে কুরুসভায় তাঁহার অপমান ও প্রতিশোধগ্রহণ-প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত নাট্যকাহিনীর ব্যাপ্তি। রচনারীতিতে পূর্ববর্তী কোন পৌরাণিক নাটকের ছাপ নাই। গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, ক্ষীরোদ-প্রসাদ প্রভৃতির পৌরাণিক নাটকে যে ধরণের ভক্তিরস দেখা যায় এবং তাঁহাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে যেরূপ পৌরাণিক মহিমা আরোপিত, 'যাজ্ঞসেনী'তে তাহা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মনে হয়, এ অভিনবত্ব নাট্যকারের ইচ্ছাকৃত। অভিনয়-বিজ্ঞাপনে স্পষ্টই বলা হইয়াছিল— 'প্রাচীন আখ্যানে নবীন ব্যাখ্যা'।[৬৫] অনেকগুলি চরিত্র বেশ জীবন্ত। ভীমের উত্তপ্ত রোষ, শকুনির কূটবুদ্ধি, দুর্যোধনের দর্পিত আত্মাভিমান, হতমান কর্ণের চিত্তক্ষোভ ও জ্বালা, দ্রৌপদীর কোমলতা ও কঠোরতা প্রভৃতি সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মুখ্যত তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা।[৬৬] কুন্তী চরিত্রে বাঙালী ঘরের মাতৃমূর্তি ফুটিয়াছে। নাট্যকার চরিত্রসৃষ্টিতে অধিক মনোযোগী বলিয়া নাটকের ঘটনায় আশানুরূপ গতি সঞ্চারিত হয় নাই। কোথাও কোথাও তত্ত্ব বা বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে গিয়া সংলাপ বেশ দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে।

'আদর্শ বন্ধু' রচনার পর এই নাটকে পুনরায় ভাঙা অমিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুপ্রাসের আতিশয্য মাঝে মাঝে পীড়াদায়ক। যেমন,

'ব্যস্ত হ'য়ে হস্তিনায় ত্রস্ত আবাহন!
হে কেশব! হে কেশব! এ সব কি সব?'

আবার অনেক স্থলে অনুপ্রাসের জন্যই উক্তি রমণীয় হইয়াছে। যেমন—

৬৫ দ্রষ্টব্য নাচঘর: ২১এ বৈশাখ ১৩৩৫

৬৬ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন— "কৃষ্ণের চরিত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ও নবীন সেনের কৃষ্ণের প্রভাব বিদ্যমান।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃ ১৮৮)। সিটি কলেজের অধ্যাপক সুপণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'যাজ্ঞসেনীর' প্রশংসা করিয়া অমৃতলালকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাহার একস্থলে আছে, 'দ্বৈপায়ন বর্ণিত দুর্বোধ চিন্তাতীত চরিত্রগুলিকে আপনার যাজ্ঞসেনী নাটক পাঠক ও দর্শকের হৃদয়ে সুপরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে।' (নাচঘর· ১লা আষাঢ় ১৩৩৫)

'বাণ-মুখে ব্যঙ্গ রাখে চতুরঙ্গপতি দুর্যোধন'; 'ভার্যার পর্যঙ্ক নহে কলঙ্কের শয্যা'; 'বিবাহে বিবাদ, এ প্রবাদ আছে চিরদিন'; 'ভালের তিলক তুমি শ্যালক প্রধান'; 'অর্জুন হয়েছে নাম অর্জনে অক্ষম ব'লে।'

অনেক উক্তি প্রবাদবাক্যের ন্যায় অর্থতাৎপর্যে দীপ্ত। যেমন, 'নির্জনতা দুশ্চিন্তার মন্ত্রণাভবন'; 'আগ্নেয় পর্বত নড়ে অন্তর-উত্তাপে'; 'কাঞ্চন কুটুম্বশ্রেষ্ঠ বিষয়ীর চক্ষে'; 'মদিরা অধিক উগ্র রোষের গরল'; 'আশীবিষ-বিষে জ্বলে যার দেহ, কি করিতে পারে তার ভ্রমর-দংশন।'

ভাব, ভাষা ও ছন্দের সহজ প্রকাশে অনেক সময়ে অনেক অর্থগূঢ় বক্তব্য ব্যক্ত হইয়াছে। যেমন, দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি—

'ক্রিয়াহীন কর্তা আজি আমি এ জগতে;
কর্ম ভাই চারিজন;
কর্তা-কর্মে করি যোগ, ক্রিয়া হ'য়ে তুমি,
সংসার-ধর্মের মন্ত্র করিও রচনা।'

যাজ্ঞসেনীর 'হোমের হবি' হওয়ার সার্থকতা নাটকে ঠিকমত রূপায়িত হয় নাই বলিয়া অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন। হবির সার্থকতা ব্যাখ্যা করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'দৈনিক বসুমতী'তে যে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন তাহা এই—

'নাটকের প্রথম পত্রেই বীজের উদ্ভব, সেটা যাজ্ঞসেনীর হবি হওয়া।… পাঞ্চালীর সঙ্গে পাঁচ ভাইয়ের বিবাহ। হবি ও অগ্নি সংগ্রহ করা হইল। তখনও আহুতি দেওয়া হয় নাই, সে আহুতি পড়িল হস্তিনার রাজসভায়। সেখানে পাঁচ ভাই হইলেন দাস, দ্রৌপদী দাসী। দ্রৌপদীর উপরে কর্ণ, দুর্যোধন ও দুঃশাসন অমানুষিক অত্যাচার করিলেন। অগ্নিতে হবি পড়িল। হোমাগ্নি ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে জ্বলনটা কি? গান্ধারীর অভিশাপ। সে শাপ অতি স্পষ্ট, অতি কঠোর!'[৬৭]

নাটকে অমৃতলাল যে সকল মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমর্থন ও ব্যাখ্যা করিয়া ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'নাচঘরে' 'যাজ্ঞসেনী'র বিস্তৃত সমালোচনা করেন এবং মন্তব্য করেন যে ইহা 'একখানি খাঁটি নাটকরূপে গণ্য হইবার যোগ্য।'[৬৮]

৬৭ নাচঘর পত্রিকায় (২২এ আষাঢ় ১৩৩৫) উদ্ধৃত।

৬৮ ঐ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

নাটকটিতে কোন অলৌকিক দৃশ্য বা প্রসঙ্গের অবতারণা হয় নাই বলিয়া অমৃতলাল সুধীজনের সাধুবাদ লাভ করিয়াছিলেন। 'নাচঘর' মন্তব্য করিয়াছিলেন—

" 'যাজ্ঞসেনী'র কোথাও অতিবাস্তব ঘটনা বা তথাকথিত 'থিয়েটারী' ভাবের উত্তেজনা নেই— পৌরাণিক নাটকের মধ্যে এমন স্বাভাবিকতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।"[৬৯]

'বাঙ্গলার কথা'ও লিখিয়াছিলেন— 'মহাভারতের চিরপুরাতন চিরমধুর কাহিনীটি নাটকেব ভিতর দিয়া নূতন রূপ লইয়া যে ফুটিয়াছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।'[৭০]

মিনার্ভা থিয়েটারে (২২এ বৈশাখ ১৩৩৫) 'যাজ্ঞসেনী' প্রথম অভিনীত হয়। দর্শকসমাজে 'যাজ্ঞসেনী' বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। ২০এ মে ১৯২৮, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন—

"It is very delightful to see the Minerva's 'Jagnaseni' getting so very popular in so short a time."

অমৃতলালের দক্ষ নির্দেশনাই এই সাফল্যের মূলে ছিল—

'কি পুরুষ ভূমিকা, কি নারী ভূমিকা, কি কবিতায়, কি গদ্যে— সংলাপে, কি অঙ্গবিন্যাস, কি ভাবাভিব্যক্তি, প্রত্যেক দিকেই থাকত তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং প্রত্যেক বিষয়টি তিনি তাঁর নিজের দেহের ও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে বিশদ ক'রে তুলতে পারতেন—এমন কি আলোকপাত, দৃশ্যপট ও অঙ্গসংস্কার বা দেহসজ্জা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ না করে ছাড়তেন না।'[৭১]

---

৬৯ নাচঘর: ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও লেখেন— 'ইহার ভিতর কোনও ম্যাজিক নাই।'

৭০ বাঙ্গলার কথা: ২৫ এ আষাঢ় ১৩৩৫

৭১ 'যাঁদের দেখেছি': হেমেন্দ্রকুমার রায়, পৃ ৩৯

'হরিশ্চন্দ্র'-প্রসঙ্গে

অমৃতলালের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকটিব রচয়িতা অমৃতলাল নহেন এইরূপ মত প্রচলিত আছে। স্টার থিয়েটাবে 'হবিশ্চন্দ্র' নাটকের অভিনয়কালে (ভাদ্র ১৩০৫) নাট্যকারের নাম কাগজে বিজ্ঞাপিত হইত না। এই সময়ে 'জন্মভূমি' পত্রিকার 'বাঙ্গলা ভাষাব লেখক' বিভাগে নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্নের পরিচয় প্রদানপ্রসঙ্গে 'হবিশ্চন্দ্র' নাটক তাঁহারই রচনা বলিয়া উল্লিখিত হয়।[১] এই বিবরণ হইতে 'হরিশ্চন্দ্রে'র নাট্যকার অমৃতলাল নহেন এই মতের উদ্ভব। কিন্তু জন্মভূমির এই বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার এক বৎসর পরে (ভাদ্র ১৩০৬) 'হরিশ্চন্দ্র' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং আখ্যাপত্রে নাট্যকাররূপে কাহারও নাম দৃষ্ট হয় না; অমৃতলালের নাম দেখা যায় প্রকাশকরূপে। পরবর্তী সংস্করণে (১৩১১) 'শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত' দৃষ্ট হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৪ সালের কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রথম ও পরবর্তী কয়েকটি সংস্কবণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত করিয়া 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের রচয়িতা সম্পর্কে সংশয় উত্থাপন করেন। ঐ বৎসর ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত তাঁহার 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা (৬৭) গ্রন্থে স্পষ্টই লেখেন, 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক 'প্রকৃতপক্ষে নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্নের রচনা।'[২]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'হরিশ্চন্দ্রে'র দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩১১) প্রকাশিত হইবার পূর্বেই এই নাটকের প্রণেতারূপে অমৃতলালের নাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। ১৩১০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতী'তে 'বাঙ্গালা ভাষার নাটক' প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল, 'চণ্ডকৌশিকের ছায়াবলম্বনে লিখিত হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রকে তিনি [অমৃতলাল] আরও উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়াছেন।'

১ জন্মভূমি: আষাঢ় ১৩০৫ দ্রষ্টব্য। 'হরিশ্চন্দ্র' প্রথম অভিনীত হয় ভাদ্র মাসে। মনে হয় জন্মভূমির আষাঢ় সংখ্যা পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'দি ইণ্ডিয়ান স্টেজ' গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড পৃ ১৫৩) 'Re-cast by Amrita Lal Bose' লিখিত আছে। আবার তাঁহারই 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে (১ম, পৃ ৫৩) 'হরিশ্চন্দ্র' অমৃতলালের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণে যদিও নাট্যকাররূপে অমৃতলালের নাম ছিল না, তথাপি নাটকটি তিনিই উৎসর্গ করেন 'সিয়াড়শোল রাজকুলভূষণ' কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়াকে। উৎসর্গকাল, ভাদ্র ১৩০৬। নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন 'হরিশ্চন্দ্রে'র রচয়িতা হইলে ইহা সম্ভব হইত কিনা তাহা বিবেচ্য। ইহার পরে আরও দেখিতে পাই নৃত্যগোপালের সহিত অমৃতলালের সাহিত্যিক সম্প্রীতি কোনদিন ম্লান হয় নাই, এবং তিনিই 'মিত্র-স্নেহবশে' ১৩০৮ সালে প্রকাশিত অমৃতলালের 'অবতার' প্রহসনের সংস্কৃত বচনগুলি 'দেবভাষায় অনুবাদ' করিয়া দিয়াছিলেন।[৩] 'হরিশ্চন্দ্রে'র প্রকৃত নাট্যকার নৃত্যগোপাল হইলে ইহা সম্ভব হইত কি?

অমৃতলাল অনেক গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন, অনেক নাটক আদ্যন্ত সংশোধন করিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে অপরের নাটকে গানও রচনা করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এক 'সেবক' (গিরিশচন্দ্র)-প্রণীত 'নসীরাম' (১৩০৩) নাটক ভিন্ন কখনও অপরের রচিত গ্রন্থের প্রকাশক হন নাই। হরিশ্চন্দ্র সান্যাল তাঁহার 'বিশ্বামিত্র' নাটকটি (১৩১৮) আদ্যোপান্ত অমৃতলালকে দিয়া সংশোধন করাইয়া লইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ রায় তাঁহার 'শৈব্যা' (১৯১১) নাটকের ভূমিকা অমৃতলালকে দিয়া লিখাইয়াছিলেন। এই ভূমিকা হইতে উপলব্ধ হয় হরিশ্চন্দ্র-কাহিনী সম্পর্কে অমৃতলালের অনুশীলন কত গভীর ছিল।[৪] সুরেন্দ্রনাথ রায় 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' লিখিয়াছেন—" 'হরিশ্চন্দ্র'-প্রণেতার ভূমিকা-মুকুট-ভূষিত হওয়ায় আমার শৈব্যা গৌরবান্বিত।"

৩ অমৃতলালও গ্রন্থমধ্যে এইরূপ স্বীকৃতি দিয়াছেন—

'কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমার এই পুস্তকে 'হলাহলানন্দের মুখে যতগুলি সংস্কৃত বচন ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমার বাল্যসুহৃদ প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপক বৈদ্য বংশভূষণ শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন মহাশয় মিত্র-স্নেহবশে দেবভাষায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীঅমৃতলাল বসু।"

৪ ভূমিকায় অমৃতলাল লিখিয়াছিলেন— 'ত্রিশঙ্কুপুত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের নাম প্রথমে ঋগ্বেদে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়. বেদে কল্পিত কথা নাই, ঋকে যাহা আছে তাহা ঋতম্— সত্যম্, ঋকে কথিত হরিশ্চন্দ্র-বিবরণী বোধহয় ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণে যযাতির নরমেধ যজ্ঞের গল্পে পরিণত হইয়াছে। এখানে ত্রিশঙ্কুপুত্র হরিশ্চন্দ্রের পরিবর্তে নহুষপুত্র যযাতি যজ্ঞকর্তা, আর অজীগর্তপুত্র শুনঃশেপের স্থলে সিদ্ধার্থপুত্র কুশ বলি পশু। হরিশ্চন্দ্রের যে আখ্যায়িকা এক্ষণে সমগ্র হিন্দুস্থানে বিদিত, তাহার পূর্বরূপ আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রথম দেখিতে পাই। এই পুরাণোক্ত হরিশ্চন্দ্র-কথাই আর্যক্ষেমীশ্বর নাটকাকারে পরিবর্তিত করেন, সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নাটক ভারতের দাক্ষিণাত্য প্রদেশকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে।'

'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে অমৃতলালের রচনারীতির ছাপও দুর্লক্ষ্য নহে। 'হরিশ্চন্দ্রে'র পরাহু ও ঝিমন নামক চণ্ডালদ্বয়ের ভাষা ও পরবর্তী 'আদর্শ বন্ধু' নাটকের ভীল বালক লটকার ভাষায় সাদৃশ্য আছে। পরাহু ও লটকার চরিত্রগত সাদৃশ্যও লক্ষ্য করিবার মতো। তপোবনের দৃশ্য-পরিকল্পনায় ও মুনিকুমারদের স্তবে পূর্ববর্তী নাটক 'বিজয়-বসন্তে'র ছাপ আছে। 'হরিশ্চন্দ্রে'র গানেও অমৃতলালের অভ্যস্ত অনুপ্রাস পরিস্ফুট। যেমন,

'জানি জানি হে অনঙ্গ, নারী প্রাণে তব রঙ্গ,
করে বালিকার ব্রত ভঙ্গ ঘুচাও তার অভিমান ॥'

কিংবা,

'ভালা দুলাই দুলাইন্, আঁখে আঁখে ভুলাইন,
যুবন মিলাইন রঙ্গত সঙ্গত সুহাগে গলাই ॥'

'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের অনেক উক্তি পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্তিত হইয়াছে।* বিদূষকের 'আমার শরীরে কোন দোষটি নাই' হইয়াছে, 'আমার শরীরে কোন নিষ্কলঙ্ক নাই।' 'আমি হলুম পুরুষ মানুষ, উপার্জন করলুম আমি' হইয়াছে, 'আমি হলুম পুরুষ মানুষ, বর্ণগুরুর গো ব্রাহ্মণ'। 'রাগ করো না' হইয়াছে, 'রাগরাগিণি, ধৈর্যং ধর'। পূর্বে ছিল না এমন নূতন উক্তিও কিছু কিছু দেখা যায়। যেমন রাজার নিকট বিদূষকের 'আজ্ঞা মানভঞ্জন তো দূতীর দ্বারা হবে না' বা 'মাত্র পদপল্লব দর্শন ও তুরিতে কদলী প্রদর্শন' প্রভৃতি।

'হরিশ্চন্দ্র' জনপ্রিয় নাটক ছিল। অমৃতলালের মৃত্যুর পরেও ইহার সংস্করণ হইয়াছে।[৫] প্রথম অভিনয়কালে নাট্যকারের নাম বিজ্ঞাপিত না হইলেও পরবর্তীকালে নাট্যকাররূপে অমৃতলালের নাম প্রকাশ পাইত।[৬] অমৃতলাল নিজেও হরিশ্চন্দ্র নাটকটিকে তাঁহার নাটকাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।[৭]

* বিদূষকের উক্তিই সর্বাধিক পরিবর্তিত। মাঝে মাঝে এই ভূমিকায় অমৃতলাল অবতীর্ণ হইতেন। প্রথম অভিনয়কালে তিনি করিতেন বিশ্বামিত্রের ভূমিকা।

৫ অষ্টম সংস্করণ—১৩৩৮। ইহাই শেষ সংস্করণ।

৬ 'Mr. Amrita Lal Bose's Harish Chandra, a favourite drama with the play-goers.'— The Indian Daily News 16. 6. 1900

৭ কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর মৃত্যুর (২৮এ শ্রাবণ ১৩৩১) পর তাঁহার শেষ রচনা 'হেমচন্দ্র অস্তাচলে' ঐ বৎসর ফাল্গুন মাসে 'মানসী ও মর্মবাণী'তে প্রকাশিত হয়। এই কবিতা পাঠ করিয়া অমৃতলাল ফাল্গুনের 'মাসিক বসুমতী'তে 'আস্তাবোলে অমৃতলাল' নামে যে কবিতাটি লেখেন তাহাতে তাঁহার নাটক-প্রহসনের একটি তালিকা আছে। 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকটিও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই।

নাট্যানুবাদ

১৩১৭ সালের 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় (শ্রাবণ-ফাল্গুন) অমৃতলাল শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদ করেন। সম্পূর্ণ নাটকটির অনুবাদ হয় নাই, তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত হইয়াছিল। 'রত্নাবলী'র প্রথম সার্থক অনুবাদ (১৮৫৮) করিয়াছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন।[১] ১৩০৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

মূল নাটকে মদনমহোৎসব, কদলীগৃহ, সঙ্কেত ও ঐন্দ্রজালিক এই চারিটি অঙ্ক আছে। রামনারায়ণ অঙ্কগুলিকে দৃশ্য বা 'প্রকরণে' ভাগ করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূলের যথাযথ অনুবাদ করিয়াছিলেন, খণ্ড দৃশ্যের অবতারণা করেন নাই। অমৃতলাল প্রতি অঙ্কে একাধিক দৃশ্যবিভাগ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদে প্রথম অঙ্কে প্রাসাদ-সংলগ্ন ছাদ, মদনোদ্যান, নগরের গলিপথ এবং মধুবন এই চারিটি দৃশ্য। দ্বিতীয় অঙ্কে 'প্রবেশক' ও তিনটি দৃশ্য— অন্তঃপুরস্থ উদ্যান ও বৃক্ষবীথি, প্রাসাদের উদ্যানমধ্যস্থ কদলীগৃহ, উদ্যানের অন্যাংশ ও প্রাসাদোদ্যান— কদলীগৃহ। তৃতীয় অঙ্কেও 'প্রবেশক' ও তিনটি দৃশ্য— প্রাসাদ, অন্তঃপুর প্রবেশের পথ, দণ্ডতোরণ মণ্ডপ, উদ্যানবীথি ও মাধবীলতা-মণ্ডপ।

রামনারায়ণ রত্নাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৬১) যৌগন্ধরায়ণের প্রাথমিক প্রস্তাবটি 'অনুপযোগী বোধে' বর্জন করিয়াছিলেন। অমৃতলালও উহাতে 'হস্তক্ষেপ' করেন নাই।[২] রামনারায়ণের ন্যায় অমৃতলালের অনুবাদও গীতি-বহুল।*

অমৃতলাল-অনূদিত রত্নাবলীর প্রথম অঙ্কের তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্য দুইটি মূলে নাই। অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

'এই তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্য দুইটি মূল সংস্কৃত নাটকে নাই। তবে প্রথম দৃশ্যের

রামনারায়ণের পূর্বে নীলমণি পাল 'রত্নাবলী'র যে অনুবাদ করেন তাহা 'গদ্যপদ্যাকারে পাঠ্য গ্রন্থ'।— 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ডঃ সুকুমার সেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম সং পৃ ৪৩)

'সূচনায় নান্দী সূত্রধরাদি অংশে আপাততঃ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।'

রামনারায়ণ-অনূদিত 'রত্নাবলী'র গান গুরুদয়াল চৌধুরী-রচিত।

বর্ণনা হইতে তখনকার সামাজিক উৎসবের পদ্ধতির কতকটা ভাব বোঝা যায়।'

বসন্তোৎসবকে আরও বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা দিবার জন্যই এই দুইটি দৃশ্যের পরিকল্পনা। বাকভাণ্ড ও পঙ্কেশ্বর নামক প্রাচীন ও তরুণ নাগরিকের কথোপকথন এবং পদ্মাসন, মৃগবাহন, সুমালা, চঞ্চরী, জল্পনা, কামনা প্রভৃতি উৎসব-প্রমত্ত নাগরিক ও নাগরিকাগণের রহস্যালাপ মন্দ হয় নাই। তৃতীয় দৃশ্যে অনেক প্রকার সঙের অবতারণা হইয়াছে। তাহাদের ছড়া ও গান উপভোগ্য।

উদয়ন, বাসবদত্তা, সাগরিকা ও সখীদের কথোপকথন মূলের অনুরূপ। তবে একস্থলে অমৃতলালের পূর্বে রচিত 'আবার আবার তুমি কর তিরস্কার' কবিতাটি উদয়ন কর্তৃক সাগরিকার প্রতি উক্ত হইয়াছে।[৩]

বসন্তকের ঔদরিকতা, প্রগলভতা, হালকা ছড়া-কাটা ও গান গাওয়া মাঝে মাঝে মূলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তবে চরিত্রটি বেশ জীবন্ত। তাহার অনেক উক্তিতে অমৃতলালের বিশিষ্ট রসিকতার ছাপ আছে। শ্রীহর্ষের নাটকের প্রথম অঙ্কে বসন্তোৎসবে বিদূষক রাজাকে বলিয়াছিল—'অহং উণ জানামি ণ ভবদো, ণ কামদেবস্‌স, মম জ্জেব্ব একস্‌স বম্হণবডুঅস্‌স অঅং মঅনমহসস্‌বো…।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নির্ভুল অনুবাদে ইহা এইরূপ—'আপনি যে উৎসবের কথা বলছেন, আমি বলি সে আপনারও নয়, কামদেবেরও নয়, সে শুধু এই ব্রাহ্মণবটুরই উৎসব।' কিন্তু অমৃতলালের অনুবাদের ভাষায় তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—

'আজ বসন্তে মদনোৎসব নয়, বসন্তকের বদনোৎসব।' এইরূপ স্বরচিত বাক্য আরও আছে বিদূষকের কথায়—'ব্রাহ্মণস্য বাক্কাং একেবারে পাক্কাং সামলায় কে ধাক্কাং?' কিংবা 'এ যে একেবারে পায়ের আলতা থেকে মাথার চালতা খোঁপা পর্যন্ত দেবী বাসবদত্তা স্ফুটিতং— ফুটে পড়ছেন।'

বসন্তকের একটি ব্যাকরণসূত্রও বেশ হাস্যোদ্দীপক এবং অর্থগূঢ়—

'যদি পুরুষের পর স্ত্রী থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া বিবাহ হয়, বিবাহের পর পূর্বের প্রেম লোপ হয়, লোপের পর আর সন্ধি হয় না।'

অমৃতলালের অনুপ্রাসপ্রিয়তা সর্বত্র লক্ষিত হয়। প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যে বাসবদত্তার পতিস্তোত্র অনুপ্রাসের আধিক্য সত্ত্বেও কাব্যমণ্ডিত। যেমন—

৩ এই কবিতাটি 'অমৃত-মদিরা'র 'রোষবিহ্বলা' নামে মুদ্রিত আছে।

'প্রণতি হে প্রাণপতি, বিনীতা বনিতা গতি,
রমণী-জীবনজ্যোতি, হৃদয়-ঈশ্বর।
তুমি ধ্যেয় তুমি ধর্ম, তুমি চিন্তা তুমি মর্ম,
বিপদেতে প্রিয় বর্ম, নর্ম-সহচর॥'

এ কাব্য মূলে নাই। বাসবদত্তার 'পতিপূজা'র প্রসঙ্গে ইহা অমৃতলালের নিজের রচনা।

কাব্যানুবাদগুলিও সর্বত্র স্বচ্ছন্দ। একটা দৃষ্টান্ত দিই। মূল নাটকের প্রথম অঙ্কে আছে—

'রাজ্যং নির্জিতশত্রু, যোগ্যসচিবে ন্যস্তঃ সমস্তো ভরঃ,
সম্যক্‌পালনলালিতাঃ প্রশমিতাশেষোপসর্গাঃ প্রজাঃ।
প্রদ্যোতস্য সুতা, বসন্তসময়স্ত্বঞ্চেতি নাম্না ধৃতিম্ ·॥'

এই শ্লোকগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদে এইরূপ—

'জিত-শত্রু রাজ্য এই,
সুযোগ্য সচিবে ন্যস্ত এ রাজ্যের ভার,
সম্যক্‌-পালিত প্রজা,
প্রশমিত উপদ্রব সর্ব অত্যাচার।
প্রদ্যোৎ-তনয়া সেই
প্রেয়সী বাসবদত্তা রাণী,
তুমি বসন্তক ওগো
প্রিয় সখা বসন্ত সমানি। '

ইহার পাশে অমৃতলালের কাব্যানুবাদ কিছুটা স্বাধীন এবং অনেকটাই স্বচ্ছন্দ—

'অরি করি পরাজয়, রাজ্য আজি শান্তিময়
সুযোগ্য অমাত্য হস্তে ন্যস্ত কার্যভার।
প্রদ্যোত ভূপতিদত্তা, দুহিতা বাসবদত্তা
আদরিণী গরবিণী প্রেয়সী আমার॥
বসন্ত ঋতুর তুল্য, সতত সরস ফুল্ল
স্নেহবন্ত বসন্তক সখা তুমি মোর।…'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অনূদিত 'রত্নাবলী'তে 'অনুবাদকের মন্তব্য' আছে। সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'এই নাটকখানি কবিত্ব-অংশে উচ্চদরের না হইলেও, নাট্যাংশে যে ইহা উৎকৃষ্ট তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'

অমৃতলাল-অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় কখনও হয় নাই। তবে একবার অভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল।[৪] মনে হয় এইজন্য অমৃতলাল শেষ অঙ্কটিও অনুবাদ করিয়াছিলেন। তবে তাহার কোন উদ্দেশ নাই।

৪ ১৩৩৪ সালের গোড়ার দিকে স্টার থিয়েটার 'সাগরিকা' নামে রত্নাবলীর অভিনয়ের উদ্যোগ করে। শেষ পর্যন্ত 'সাগরিকা' অভিনীত হয় নাই।

নাট্যরূপ

শুধু মৌলিক নাটক-প্রহসন রচনায় নহে, উপন্যাসের নাট্যরূপদানেও অমৃতলাল কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি মোট চারিটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়াছিলেন—'স্বর্ণলতা' (১৮৮৮), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৯৪), 'রাজসিংহ' (১৮৯৬) এবং 'বিষবৃক্ষ' (১৯০১)। 'সরলা' ('স্বর্ণলতা'র নাট্যরূপ) অভিনীত হইয়া পৌবাণিক নাটক দর্শনে অভ্যস্ত বাঙালীসমাজকে অতি প্রত্যক্ষ গার্হস্থ্যজীবনের বাস্তব সুখ দুঃখের সমস্যার সহিত পরিচিত করে। ইহার প্রভাব গিরিশচন্দ্রের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।[১]

পরবর্তীকালে অমৃতলালের ইচ্ছা হয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কোন গল্প ও অনুরূপা দেবীর কোন উপন্যাসের নাট্যরূপ দানের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা সম্ভব হয় নাই।*

নাট্যরূপ দিতে গেলে কোথায় আরম্ভ এবং শেষ করিতে হইবে, কিভাবে ঘটনাবিন্যাস করিলে দর্শকবৃন্দের মন নাট্যকৌতূহলে আবিষ্ট থাকিবে, এবিষয়ে অমৃতলালের ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই দেখা যায়, 'চন্দ্রশেখব', 'রাজসিংহ' ও 'বিষবৃক্ষে'র নাট্যকাহিনীর সূচনা হইয়াছে উপন্যাসের মধ্যস্থল হইতে; আবার 'সরলা'র যবনিকা পড়িযাছে ঠিক উপন্যাসের মধ্যস্থলে। ইহাতে উপন্যাসের মর্যাদা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, উপন্যাসের মন্থর আখ্যানে যথার্থ নাট্য-গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। চারিটি নাটক সম্পর্কেই একথা বলা চলে।

২

অমৃতলাল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) উপন্যাসের নাট্যরূপ দান করেন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৬। নাট্যকারের

১ 'সরলা' অভিনীত হইবার সাত-মাস পরে গিরিশচন্দ্রের প্রথম সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' অভিনীত হয় (১৮৮৯)।

* তিনি 'সীতারাম' ও 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' নাট্যরূপায়িত করিতে আরম্ভ করেন। ('বিশ্বকোষ', ২য় সং, ২য় ভাগ, পৃ ৬৩১)

জীবদ্দশায় নাট্যরূপটি মুদ্রিত হয় নাই।[২] উপন্যাসের স্বর্ণলতা-প্রসঙ্গ নাটকে সম্পূর্ণ বর্জিত। সরলার মৃত্যুতে নাটক শেষ হইয়াছে। নাটকের নামও সেইজন্য 'সরলা'।

নাটকের ঘটনাবিন্যাসে উপন্যাসের কাহিনীক্রম অনুসৃত হইয়াছে। তবে উপন্যাসে দেখা যায় গদাধর, শশিভূষণ ও প্রমদা শাস্তি ভোগ করিয়াছে সরলার মৃত্যুর পরে। নাটকে ইহাদের কৃতকর্মের ফল সরলার মৃত্যুর পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। নাটকে গদাধরের মুখে যে সকল অতিরিক্ত উক্তি দেওয়া হইয়াছে সেগুলি তাহার চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কৌতুকপ্রদ। যেমন, 'ডুড খেলে কি টামাক খায় না? এই টোমার বাড়ী এয়েছি এখন ডুডও খাব, টামাকও খাব।' অথবা 'আমি হয় গলায় ডরি দেব, নয় হরটুকী খেয়ে মরব।' উপন্যাসে ব্রাহ্মদের প্রতি কটাক্ষ আছে। ব্রাহ্মদ্বয়ের একজনের 'ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন' ও অপরজনের 'মুদিনীর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ'-এর ইঙ্গিতটুকু লইয়া অমৃতলাল মুদিনীর সহিত ব্রাহ্মদের সরস উক্তি-প্রত্যুক্তি ও হাস্যোদ্দীপক গান দুইটি রচনা করিয়াছেন। উপন্যাসে দিগম্বরী ঠাকরুণ মাঝে মাঝে উদ্ভট পৌরাণিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে। নাটকে দিগম্বরীর বর্ধিত উক্তির সহিত আরও কয়েকটি হাস্যকর পৌরাণিক প্রসঙ্গ যুক্ত হইয়াছে। শশিভূষণের মনস্তাপ ও মনস্তত্ত্ব উপন্যাস অপেক্ষা নাটকে অধিকতর পরিস্ফুট। উপন্যাসের অতিরিক্ত যে কয়টি হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে নীলকমলকে স্থাপন করা হইয়াছে তাহা অসংলগ্ন হয় নাই। অন্যান্য চরিত্র উপন্যাসের ভাবাদর্শ যথাযথভাবে প্রকাশ করিয়াছে।

অমৃতলালের সংযম ও নাট্যরসবোধের পরিচয় দিতে গিয়া তৎকালীন এক-জন সমালোচক গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'. 'হারানিধি', 'বলিদান' প্রভৃতির 'ইয়ারকির গান' ও 'অস্থানে রসিকতা'র উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

" 'সরলা' নাটকে করুণরস যতই জমাট হইয়া আসিতে থাকে, 'নীলকমল' 'গদাধরচন্দ্র' প্রভৃতি সামান্য হাস্যরসের চিত্রগুলি নাটকের অঙ্গ হইতে ততই দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে, অথচ ভাবের উচ্ছ্বাসে দর্শকগণ তজ্জন্য একটুও অভাব বোধ করেন না। ঐ নাটকে শ্যামাদাসীর এমন অনেক অবসর ঘটিতে পারিত, যেখানে সে জোবীর মত ['বলিদান'] কলিকালের ভ্রাতার গুণ

---

২ অমৃতলালের মৃত্যুর বাইশ বৎসর পরে (১৯৫১) নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকে অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রীতিভূষণ বসু-লিখিত একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে।

বর্ণাইয়া দুটা গান গাহিতে পারিত, কিন্তু কবির গুণপনায়'এবং নাটককারের অশেষ করুণায় আমরা শ্যামার গান হইতে বঞ্চিত হওয়ায় সুখী বই দুঃখিত নহি। দেখা আবশ্যক 'সরলা' যত পয়সা দিয়াছে 'বলিদান' তত দেয় নাই।"[২ক]

হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার নির্মিত হইবার চারিমাসের মধ্যেই 'সরলা' অভিনীত হয় (২২এ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮)। এই অভিনয় অভাবনীয় সাফল্য ও জনসমাদর লাভ করিয়াছিল। তৎকালীন 'অনুসন্ধান' পত্র লিখিয়াছিলেন—

'ষ্টার কোম্পানী সময় বুঝিয়া— লোকের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নাটকচিত্রের উৎকর্ষ দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। কোম্পানীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়কেও ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না, সুপ্রসিদ্ধ 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস হইতে তিনি বেশ দক্ষতার সহিত 'সরলা'-চরিত্র নাটকাকারে প্রবর্তিত করিয়াছেন। ধর্মের ঢেউ, হরিবোলেব ধুম এখন কিছু মন্দীভূত হইতে চলিল।'[৩]

নাটকে যে 'ধর্মের ঢেউ, হরিবোলের ধুম' নাই— ইহা যে নিতান্তই গার্হস্থ্য ট্রাজেডি তাহা অমৃতলাল-লিখিত অভিনয়-বিজ্ঞাপনেও ব্যক্ত—

'First grand exhibition of the
Domestic Tragedy
SARALA...'[৪]

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"'সরলা'র অভিনয় প্রায় এক বৎসর সমানভাবেই চলিয়াছিল এবং ষ্টার সম্প্রদায় এই পুস্তকে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন।"[৫]

২ক দ্রষ্টব্য 'বঙ্গীয় নাট্যশালা'— ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, পৃ ১৯

৩ অনুসন্ধান: ৩০এ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮

৪ The Indian Daily News : 21. 9. 1888

৫ 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর': পৃ ১১২। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'সরলা'র অভিনয় সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়াছেন— '...after a few nights the audience waned thinner and thinner...' (The Indian Stage, vol. IV. P. 89)। আবার হেমেন্দ্রনাথই উক্ত গ্রন্থে 'Reis and Ryyet' পত্রের যে মতামত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি— 'Sarala proved the greatest of financial successes to her employers.'

'সরলা'র প্রথম অভিনয়ের সময় কোন ভূমিকা গ্রহণ না করিলেও অমৃতলাল পরবর্তী কালে কখনও কখনও নীলকমলের ভূমিকায় অভিনয় করিতেন।

৩

অমৃতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখব' উপন্যাসের (১৮৭৫) নাট্যরূপ দান করেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। তখন হইতে বিভিন্ন সময়ে চন্দ্রশেখর অভিনীত হইলেও নাটকটি দীর্ঘকাল গ্রন্থবদ্ধ হয় নাই। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নাটকটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৬] নাটকটি পঞ্চাঙ্ক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭২।

নাটকের আখ্যানবিন্যাসে ও সংলাপরচনায় উপন্যাসকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করা হইয়াছে। ভীমা পুষ্করিণীতে নাটক আরম্ভ হওয়ায় নাটকীয় ঔৎসুক্য ও আগ্রহ প্রথম হইতেই জাগ্রত থাকে। নাট্যকাহিনীর পরিণতি উপন্যাসের মতই রমানন্দ স্বামীর উক্তিতে।

কিছু কিছু অতিরিক্ত সংলাপ থাকিলেও উপন্যাসের উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি নাটকে যথাসম্ভব গৃহীত হইয়াছে। অনেক স্থলে উপন্যাসের ইঙ্গিত অবলম্বনে নাট্যোক্তি রচিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও বর্ণনার অন্তর্গত শব্দাবলীও নাটকের সংলাপের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে উপন্যাসের মহিমা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং নাটকের চরিত্রগুলি স্পষ্টতর রূপ লাভ করিয়াছে।[৭]

উপন্যাসের সকল চরিত্রই নাটকে যথাযথভাবে চিত্রিত। প্রতাপের ভৃত্য রামচরণের চরিত্রটিও স্বল্প পরিসরে সুন্দর ফুটিয়াছে। শৈবলিনীর সহিত তাহার উক্তিগুলি বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ। আবার দলনী ও কুলসমের সহিত তাহার কথোপকথন যথেষ্ট কৌতুকপূর্ণ। কয়েকটি মৌলিক চরিত্রেরও অবতারণা আছে। বিশ্বাস, শিবু, রতন, ছিরু, সর্বেশ্বর, রাইমণি প্রভৃতি উপন্যাসে নাই। নবাবী আমলের শেষ পর্বে ইংরেজ-সেবক বাঙালী কিভাবে কয়েকটি মাত্র ইংরেজী শব্দ আয়ত্ত করিয়া কথাবার্তা চালাইত, কুঠীর দেওয়ান গন্ধগোকুল বিশ্বাসের কথায় তাহার হাস্যকর পরিচয় আছে। উপন্যাসে আছে চন্দ্রশেখর

৬ নামপত্রে 'শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত' এইরূপ মুদ্রিত আছে। কোন উৎসর্গপত্র নাই।

৭ ১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্কে প্রতাপের স্মৃতিজল্পনা, ২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে চন্দ্রশেখরের দুশ্চিন্তা ও অনুতাপ বা ৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্কে মীরকাশিমের আত্মবিলাপ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন করিলে 'প্রাচীনেরা তাঁহাকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল।' এই ইঙ্গিতটুকু লইয়া অমৃতলাল বেদগ্রামের কয়েকটি প্রাচীন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে কিছু কিছু অতিরিক্ত সংলাপ যোজনা করা হইয়াছে। উপন্যাসটিকে আন্তরিক ও বিশ্বস্তভাবে অনুধাবন ও অনুসরণ করায় এই সকল উক্তি কোথাও অবান্তর বা অসংলগ্ন মনে হয় না।[৮]

নাটকে গান আছে কয়েকটি। তন্মধ্যে দলনীর 'আজু কাঁহা মেরি হৃদয়কি রাজা' ও 'কেন কেন কেন' গান দুইটিতে অমৃতলালের বিশিষ্টতা ফুটিয়াছে। নাটকের প্রথম গানটি বঙ্কিমের বর্ণনা অনুযায়ী বচিত। শৈবলিনী ও সুন্দরীর সন্তরণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভীমা পুষ্করিণীর জলের 'তালে তালে নাচ', 'ঘন ঘন তালগাছের সারি', 'ধাতুকলসী হস্তে জলের সঙ্গে ক্রীডা', 'সন্তরণ-কুতুহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গম', 'বাহুবিলম্বিত অলংকাব-শিঞ্জিত' প্রভৃতি যে বিষয়গুলির উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন, তাহা গানের মধ্যে বেশ সার্থকভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের মূল নাট্যরূপে ইংরেজ চরিত্রগুলির কোন রূপান্তর নাই।[৯] পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে নাট্যরূপের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। ইংরেজ চরিত্রগুলি পর্তুগীজ বোম্বেটে চরিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। লরেন্স ফস্টর, গলস্টন ও জনসন হইয়াছে গঞ্জালিস, আলভারিজ ও গোমিশ। এই পরিবর্তনে সংলাপও পরিবর্তিত হইয়াছে। মূল নাটকে প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কের ক্রোড়-অঙ্কটি (মেরি ফস্টরকে স্মরণ কবিয়া লরেন্স ফস্টর যেখানে গান গাহিয়াছে তাহা) পরবর্তীকালে বর্জন করা হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে চন্দ্রশেখরের অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তীকালেও (১৩১৯) অমৃতলালকে কলিকাতার পুলিস কমিশনারের নিকট এই নাটকের জন্য জবাবদিহি করিতে হয়।[১০] মূল নাট্য-রূপের পরিবর্তনের ইহাই কারণ। দীর্ঘকাল পরে চন্দ্রশেখরের মূল নাট্যরূপ

৮ ২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্কে গুরগণ খাঁর আত্মবিশ্লেষণমূলক উক্তিতে চরিত্রটি স্পষ্টরূপ লাভ করিয়াছে। দলনীর উদ্দেশে তাহার—'ভাল ভগ্নি! তুমি মীরকাশেমের হৃদয় চাও, আমি তার সিংহাসন চাই, দেখি ভাইভগ্নীর যুদ্ধে কে হারে, কে জেতে?'— উক্তিটি বেশ নাটকীয়।

৯ 'The four Englishmen were appropriately dressed according to the fashion in vogue in the latter part of the last century'. (The Statesman, 19. 9. 1894)

১০ 'পুরাতন পঞ্জিকা': মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৩১ দ্রঃ

পুনরায় বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত হয়। পাদটীকায় পূর্ববর্তী সংস্করণের সহিত পার্থক্য কোথাও কোথাও নির্দেশিত হইয়াছে।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে চন্দ্রশেখর প্রথম অভিনীত হয়। তখন স্টার থিয়েটারের বেশ সংকটকাল। স্টারের তৎকালীন নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যুতে (৫ই মার্চ ১৮৯৪) থিয়েটার যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত। এই সময়ে চন্দ্রশেখরের বিপুল সমাদরে স্টার থিয়েটার এই সংকট হইতে উত্তীর্ণ হয়—

'The play, though long, did not for a single moment fail to interest the large audience present.'[১১]

'অনুসন্ধান' চন্দ্রশেখরের অভিনয় দেখিয়া 'মতামত' দিয়াছিলেন—

'প্রায় বিশ বৎসরের ও অধিক কাল পূর্বে বঙ্গরঙ্গভূমিতে* এই চন্দ্রশেখরের অভিনয় করিবার একবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে অভিনয়ে উক্ত রঙ্গভূমি কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারে নাই। বাস্তবিক 'চন্দ্রশেখর' নাটকাকারে পরিণত করা সহজ নহে।··· এখন আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে সেদিন এই নাটকের প্রথম অভিনয় দেখিয়াই আমরা আশাতীত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যিনি এই উপন্যাসকে এরূপ সুন্দর নাটকে পরিণত করিয়াছেন আমাদের মতে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রশংসার্হ। তিনি দুই তিনটি নূতন চরিত্র সন্নিবেশিত করিয়া উপন্যাসের অনেক অস্ফুট চরিত্রকে নাটকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর অস্ফুট চরিত্র নাটকে পরিস্ফুট করা সামান্য বাহাদুরীর কর্ম নহে। আমরা 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'মৃণালিনী'র অভিনয় দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি যে, যেখানে নাটককার নিজের বিদ্যা প্রকাশ করিতে গিয়াছেন, সেইখানেই উপন্যাস-লেখককে একেবারে মাটী করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে বর্তমান নাটকে সে দোষ স্পর্শ করে নাই।'[১১ক]

'স্টেট্সম্যান' দুই দিন (১৩.৯.১৮৯৪ ও ১৯.৯.১৮৯৪) অভিনয়ের ও নাট্যরূপের প্রশংসা করেন। নাট্যকার সম্পর্কে স্টেট্সম্যান মন্তব্য করেন—

১১ The Statesman : 19. 9. 1894

* বেঙ্গল থিয়েটারে

১১ক অনুসন্ধান— ২৯এ ভাদ্র ১৩০১। ৫ই আশ্বিন 'অনুসন্ধান' পুনরায় মন্তব্য করেন— "ষ্টারের 'চন্দ্রশেখর' শত বৎসরের অভিনয়েও পুরাতন হইবে না। আমরা সকলকেই ষ্টারের চন্দ্রশেখরের অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি।"

'...a few words may be said in praise of Baboo Amrita Lal Bose, the dramatiser. The book had hitherto been looked upon as incapable of being dramatised, but he has skilfully overcome all difficulties.'[১২]

চন্দ্রশেখর নাটকের প্রথম অভিনয়কালে অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল না। পরবর্তীকালে তিনি কখনও বিশ্বাস, কখনও ফস্টারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। শেষের দিকে তাহাকে চন্দ্রশেখরের ভূমিকা লইতে হইত।[১৩]

৪

অমৃতলাল 'রাজসিংহ' উপন্যাসের (১৮৮১) নাট্যরূপ দান করেন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই নাট্যরূপ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকে পাঁচটি অঙ্ক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৮।

নাট্যকাহিনীর বিন্যাসে অমৃতলাল উপন্যাসের কাহিনীক্রম অবিকল অনুসরণ করেন নাই। নাটকের সূত্রপাত হইয়াছে উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদের দরিয়া-মোবারকের কথোপকথন দিয়া। দরিয়া-মোবারকের সংলাপে যে চমকপ্রদ নাটকীয়তা আছে তাহাতে পূর্বাপর ঘটনা সম্পর্কে কৌতূহল সহজেই জাগ্রত হয়। সুতরাং এই দৃশ্যটির দ্বারা নাটকের উন্মেষ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। নাটকের শেষে উন্মাদিনী দরিয়া কর্তৃক মোবারককে হত্যা ও জেবউন্নিসার করুণ পরিণতি প্রদর্শিত হয় নাই। জেবউন্নিসা ও মোবারকের মিলনের পর তাহাদের কাহিনীতে যবনিকা পড়িয়াছে।

সংলাপসৃষ্টিতে অনেকস্থলে স্বাধীনতা লওয়া হইয়াছে। অনন্ত মিশ্র, ভজনরাম ও ব্রাহ্মণীর কথোপকথন হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়োজনে পল্লবিত। মাণিকলাল ও পানওয়ালীর সরস সংলাপ ঈষৎ বর্ধিত এবং দিল্লীযাত্রার পূর্বে

১২ The Statesman 19. 9. 1894. তৃতীয় অভিনয়ের পর 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' মন্তব্য করেন— 'The performance was successful. Protap and Chundra Shekhore, the heroes, deserve special praise, and the scenery and dresses are new and tasteful.'—The Indian Daily News : 25. 9 1894.

১৩ চন্দ্রশেখরের ভূমিকাভিনেতা অমৃতলাল মিত্রের মৃত্যুর (১৯০৮) পর ভূমিকাটি তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইত।

মাণিকলাল ও নির্মলকুমারীর দাম্পত্য কলহ কল্পিত ও রসরঞ্জিত। উদিপুরীর মুখে এক আধটি ইংরেজী শব্দ দিয়া তাহার 'খ্রিষ্টিয়ানী' প্রকট করা হইয়াছে। জেবউন্নিসা ও দরিয়ার শোকের তীব্রতা প্রকাশ করিবার জন্য কিছু অতিরিক্ত সংলাপ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'গিরিসঙ্কটে আবদ্ধ' ঔরঙ্গজেবের আর্তনাদ ও আত্ম-বিলাপ একটু দীর্ঘ। উপন্যাসের মত নাটকে উদিপুরীকে দিয়া তামাক সাজান হয় নাই, এখানে চঞ্চলকুমারী 'দাম্ভিকার মস্তক নত' করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সর্বত্র উপন্যাসকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে। নাটক করিতে গিয়া উপন্যাসের ঘটনা কোথাও বিকৃত বা পরিবর্তিত হয় নাই। সংলাপ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ।

নাটকে গান আছে সাতটি। তন্মধ্যে দরিয়ার ও পানওয়ালীর গানে অমৃতলালের রচনারীতির ছাপ স্পষ্ট।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী স্টার থিয়েটারে 'রাজসিংহ' প্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয়। 'স্টেট্‌সম্যান' লেখেন—

"The opening performance of Baboo Amrita Lal Bose's dramatic version of the 'Rajsingha' at the Star theatre last Saturday night was a great success. The house was full to over-flowing long before the appointed time." [১৪]

'চন্দ্রশেখরে'র অভিনয় 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে'রও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তাঁহাদের বিস্তৃত আলোচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল—

'An unusually crowded house turned up at this theatre on Saturday night, when Mr. Bose's dramatised version of Bankim chandra's historical novel, 'Rajsingha' was produced for the first time.......The scenery and dresses introduced were quite up-to-date and very effective, whilst the dialogue was throughout exceedingly taking. Miss Nagendrabala as 'Nirmalkumari' kept the audience in a constant roar of laughter by her drolleries, while 'Jebunnisa' fairly brought the house down with her songs and represented the character to the life. The

১৪ The Statesman 14. 1. 1896

other characters were fully sustained by the various members of the Company." [১৪ক]

'রাজসিংহে' অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল না।

৫

অমৃতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের (১৮৭৩) নাট্যরূপ দান করেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। এই নাট্যরূপ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯১।

নাট্যকাহিনীর সূচনা হইয়াছে উপন্যাসের প্রথম আটটি পরিচ্ছেদের পরে। কুন্দনন্দিনী বিধবা হইয়া নগেন্দ্রের গৃহে আশ্রয় লাভ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।' নাটক আরম্ভ হইয়াছে এই বীজ-বপনের অব্যবহিত পরে। নাট্যকার সুকৌশলে পূর্বপ্রসঙ্গ বিবৃত করিয়াছেন নগেন্দ্রের অন্তঃপুরের বিভিন্ন স্ত্রীলোকের উক্তিতে। নাট্যকাহিনীর উন্মেষেই হরিদাসী বৈষ্ণবীর আবির্ভাব নাটকীয় ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে পরবর্তী ঘটনাসমূহ আকৃষ্ট হইয়াছে অনিবার্যবেগে। নাটকের সমাপ্তি কুন্দের বিষপানে ও সূর্যমুখীর কাতরোক্তিতে। উপন্যাসে ইহার পরেও দেবেন্দ্র ও হীরার পরিণতি চিত্রিত হইয়াছে। নাট্যকার দেবেন্দ্র ও হীরার পরিণাম প্রদর্শন করেন নাই। ৫ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে দেবেন্দ্র ও হীরার কথোপকথন হইতে দেবেন্দ্রের পরিণামের ইঙ্গিত মেলে।

চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার উপন্যাসকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। হরদেব ঘোষাল উপন্যাসে কোন 'শরীরী' চরিত্র নয়, নগেন্দ্রের সহিত পত্রালাপে তাহার মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। নাটকে হরদেব একটি প্রত্যক্ষ চরিত্র। নগেন্দ্রের সহিত কথোপকথনে হরদেবের এই সকল মত প্রকাশ পাইয়াছে। উপন্যাসের ১৭শ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রের এক চাটুকারের উল্লেখ আছে। নাটকে সে ব্রজনাথ। তাহাব উক্তি ও আচরণ হাস্যরসোজ্জ্বল করিবার জন্য কিছুটা অতিশয়িত। দেবেন্দ্র নাটকে সম্পূর্ণ পাষণ্ড হইয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে নৈরাশ্যপীড়িত হতভাগ্য মাতালরূপে করুণা আকর্ষণ করিয়াছে। ২য় অঙ্কে ডাক্তারের সহিত নগেন্দ্রের কথোপকথনের দৃশ্যটি কল্পিত হইয়াছে নগেন্দ্রের

১৪ক The Indian Daily News, 14. 1. 1896

আসক্তি ও অনুতাপের তীব্রতা পরিস্ফুট করিবার জন্য। হীরার আয়ীকে নাটকে একটু প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য চরিত্র যথাযথ এবং কোন নূতন চরিত্রের অবতারণা নাই।

নাটকে বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত গানগুলি ছাড়া আরও ছয়টি গান আছে। তন্মধ্যে তিনটি দেবেন্দ্র ও তিনটি হীরা গাহিয়াছে। হীরার গানে দেবেন্দ্রের প্রতি তাহার আসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে এবং দেবেন্দ্রের গানে মাতালের বাগ্‌ভঙ্গী সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল স্টার থিয়েটারে 'বিষবৃক্ষ' প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতলাল এই নাটকে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই।

'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ 'বিষবৃক্ষ' দেখিয়া মন্তব্য করেন—

"Mr. Amrita Lal Bose's commendable spirit of enterprise in dramatising 'Bankim's' novels has been justly rewarded. On Saturday night last 'Bishabrikha' was staged for the first time, when there was a bumper house..."[১৫]

উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপদানে অমৃতলালের কৃতিত্বের কথা বলিতে গিয়া একালের এক নাট্যরসিক লিখিয়াছেন—

"উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেওয়া, কাজটা তেমন সোজা নয়। এ সুষ্ঠুভাবে তিনিই করতে পারেন—মৌলিক নাটক রচনায় যিনি সিদ্ধহস্ত। ধরা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস; সবগুলিরই নাট্যরূপ কেউ-না-কেউ দিয়ে গেছেন। কিন্তু সে সবের মধ্যে আজ অবধি টিকে আছে গিরিশচন্দ্রের দেওয়া 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', ও 'সীতারাম' আর অমৃতলাল বসুর 'চন্দ্রশেখর,' 'রাজসিংহ' ও 'বিষবৃক্ষ'।[১৬]

১৫ The Indian Daily News, 20. 4. 1901. অমৃতবাজার পত্রিকা মন্তব্য করেন—
'It is needless to say that the piece is likely to be highly attractive as it has been dramatised by that master-hand Babu Amrita Lall Bose.'— (13. 4. 1901)

১৬ 'অথ নট-ঘটিত'— সূত্রধার : বসুধারা, কার্তিক ১৩৬৬

প্রহসন

Wilt thou provoke me? Then have at thee, boy!

Shakespeare]

বালক বয়স হইতেই অমৃতলালের মনোভাব শ্লেষাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে তৎকালেই তিনি রচনা করিয়াছিলেন 'একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা?' বিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই 'মডেল স্কুল' প্রহসন রচনা করিয়া স্যার জন ক্যাম্বেলের শিক্ষা-পরিকল্পনাকেও কবিয়াছিলেন বিদ্রূপ।[১]

প্রাচীন বা সমকালীন বাংলা সাহিত্য তিনি বালক বয়সেই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন একথা তাঁহার স্মৃতিকথা হইতে জানা যায়। স্বভাবধর্মবশত সাহিত্যের রঙ্গব্যঙ্গমূলক অংশেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বেশী। তাঁহার ভাষায় ভারতচন্দ্রের অলংকার-ঝংকৃত বৈদগ্ধ্যদীপ্ত হাস্যচ্ছটা, দাশরথি রায়ের সানুপ্রাস কটাক্ষ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রূঢ় ব্যঙ্গ প্রবলভাবে বর্তমান। আবার ব্যক্তি ও সমাজের নানাপ্রকার আতিশয্য ও ভণ্ডামি সম্পর্কে শিক্ষিত সাধারণকে সচেতন করিবার সাধনায় তিনি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য অনুবর্তী। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যঙ্গরসিকের সহজাত বক্রদৃষ্টি তিনিও লাভ করিয়াছিলেন। 'কঙ্কাবতী'র ষাঁড়েশ্বরের ন্যায় ভণ্ড বৈষ্ণবের স্বরূপ তাঁহার প্রহসনেও উদ্ঘাটিত। তিনি প্রহসন রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র জ্ঞান-তরঙ্গিনী সভায় নবকুমারের বক্তৃতায় মধুসূদনের যে শ্লেষ অন্তর্লীন, অমৃতলালের একাধিক প্রহসনে তাহা কখনও 'উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে' অভিব্যক্ত, কখনও

[১] ১৮৭৩ সনের ১৫ই জানুয়ারী ন্যাশনাল থিয়েটারে 'মডেল স্কুল' অভিনীত হয়। অমৃতলালের আত্মস্মৃতি 'পুরাতন পঞ্জিকা'য় এই প্রহসনের সংক্ষিপ্ত ও সরস বর্ণনা আছে। তাঁহার লেখা হইতে জানা যায়, এই প্রকার আরও আট দশটি নক্শা তিনি রচনা করিয়াছিলেন, যাহার সবগুলিই লুপ্ত (দ্রঃ মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩১)।

বা সমুচ্চ বিদ্রূপে ধিক্কৃত। জ্ঞান-তরঙ্গিনী সভায় নবকুমারের বক্তৃতা ছিল এইরূপ :

'জেণ্টেলমেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর— তাদের স্বাধীনতা দেও— জাতভেদ তফাৎ কর— আর বিধবাদের বিবাহ দেও— তা হলে এবং কেবল তা হলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে— নচেৎ নয়।'

অমৃতলাল, 'বিবাহ-বিভ্রাটে' 'এজুকেটেড' স্ত্রীলোকের কার্যকলাপ, 'তাজ্জব ব্যাপারে' স্ত্রী-স্বাধীনতার চরম রূপ, 'একাকারে' 'জাতভেদ তফাৎ' করিবার ফল এবং 'তরুবালা' এবং 'খাস-দখলে' বিধবা-বিবাহের ও বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের কৌতুকতরল বিশুদ্ধ সরসতাই তাঁহার রচনায় সমধিক সঞ্চারিত। 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র পূর্ণ-বিধুমুখীর কৌতুকোচ্ছল দাম্পত্যজীবনের প্রতিচ্ছবি 'ডিসমিশে'র কৃষ্ণনাথ-প্রমদা, 'সাবাস আটাশে'র রসময়-ক্ষীরোদা ও 'অবতারে'র প্রমথ-হিল্লোলার জীবনে দেখা যায়। আবার 'এমন কর্ম আর করব না'র হেমাঙ্গিনীকে দেখি 'বৌমা' প্রহসনের উলাঙ্গিনীরূপে (woolএর ন্যায় কোমলাঙ্গী)। অমৃতলালের অনেক প্রহসনে মূর্খ ব্রাহ্মণ উদ্ভট কথায় হাস্যসৃষ্টি করিয়াছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' প্রহসনেও ন্যায়রত্ন ও বেদান্তবাগীশের উক্তি ও পাণ্ডিত্যের প্রতি কটাক্ষ আছে।[২]

দীনবন্ধু, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁহারই রচনা তাঁহার চিত্তে রসসঞ্চার করিয়াছে, তাঁহারই প্রসঙ্গ কোন না কোন প্রকারে তাঁহার প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্যারডি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া জয়দেব-ভারতচন্দ্র বা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ কাহারও কবিতা ও গান বা গদ্যের ব্যঙ্গানুকৃতিতে তিনি পশ্চাৎপদ দিলেন না। তাঁহার হাতে 'নীলদর্পণ' হইয়াছে 'তিল-তর্পণ' এবং 'বন্দে মাতরম্' হইয়াছে 'দ্বন্দ্বে মাতনম্'! 'চোরের উপর বাটপাড়ি' নামটি 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদের নামে এবং 'একাকার' প্রহসনের বিষয়বস্তু ও নামটি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র ভক্তপ্রসাদের একটি উক্তির ইঙ্গিত হইতে লওয়া হইয়াছে।

২ ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্য যথার্থ—'প্রহসনে অমৃতলাল যেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য' ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ৫ম সং পৃ ৩৫৪)।

বিদেশী নাট্যকারদের মধ্যে মলিয়ের ও শেরিডানের প্রহসনের প্রভাব তাঁহার রচনায় সর্বাধিক। শেক্সপীয়রের অনুসরণও আছে। মলিয়েরের *L'avare* প্রহসনের কৃপণ Harpagon-এর ছায়ায় 'কৃপণের ধনে'র হলধর চরিত্র সৃষ্ট। *L'amour Medecin*এর ডাক্তার চতুষ্টয় হইতেই 'খাস-দখলে'র চারজন ডাক্তারের চরিত্র চিত্রিত। Tartuffe-এর ধার্মিকতার ভাণ ও ঔদরিকতা 'অবতারে' হলাহলানন্দের চরিত্রে সুস্পষ্ট। Dorine নামক স্পষ্টবাদিনী ঝিকেও যেন অমৃতলালের অনেক প্রহসনে দেখা যায়। শেরিডানের *The Critic* অমৃতলালের 'তিল-তর্পণ' প্রহসনের উৎস। *The Rivals*এর Mrs. Malaprop-এর প্রতিবিম্ব মিসেস পাকড়াশীতে ('ব্যাপিকা-বিদায়') দুর্লক্ষ্য নয়। 'রাজা বাহাদুরে'র ব্লকম্যান ফিশের ভাষায় শেক্সপীয়রের *The Taming of the Shrew*-র ক্রিস্টোফার স্লাইয়ের ভাষার অনুকরণ আছে।

তাঁহার কোন কোন 'কমিক' চরিত্রের পরিকল্পনাও শেক্সপীয়রীয়। ইহাদের কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গীতে একপ্রকার মূর্খতা ও সরলতা আছে। সেই সরলতাও আবার নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। কিন্তু এক একটি অর্থপূর্ণ উক্তি ও ইঙ্গিতে এই সকল স্থূল ও নির্বোধ চরিত্রই তাহাদের পার্শ্ববর্তী চরিত্রের ত্রুটি ও অসঙ্গতি এমন কৌতুকচপল ভাষায় উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় যে আমরা আর তাহাদের সাধারণ ভাঁড় বলিয়া ভাবিতে পারি না। 'খাস-দখলে'র নিতাই ও 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র ঘনশ্যাম এই জাতীয় চরিত্র। শেক্সপীয়রের Fool, Touchstone, Feste প্রভৃতির স্বভাবধর্ম ইহাদের মধ্যে আবিষ্কার করিতে আমাদের বিলম্ব হয় না। ইহা ভিন্ন সমাজের বিভিন্ন মানুষের রূপ ও স্বরূপ প্রকাশ করিবার প্রেরণা তিনি লাভ করিয়াছিলেন ডিকেন্সের সাহিত্য হইতে।[৩] ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল তাঁহার বহুদর্শী অভিজ্ঞতা। প্রহসনের সংকীর্ণ আধারে এই সকল চরিত্রের মধ্যে যাহাদের স্থান হয় নাই তাহাদের বিচিত্র চরিত্র-চিত্র দেখিতে পাই অমৃতলালের গল্প-উপন্যাসে ও গদ্য-নক্শায়। তাঁহার প্রহসনের সকল ঘটনা

৩ ডিকেন্স সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখিয়াছিলেন—

'I think no one has excelled Charles Dickens in portraying such a large number of human characters, varied and life-like in his fictions; and not a few writers are indebted to that creative genius for inspiration for their plays and dramatic sketches.' ('Ksherode Prasad' : Forward : 24. 7. 1927)

ও চরিত্র এমন দক্ষতার সহিত স্ব-সমাজের অঙ্গীভূত যে তাহাদের বিদেশী বলিয়া চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য।

অমৃতলালের অধিকাংশ প্রহসনই তৎকালীন নানাপ্রকার সামাজিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় রচিত। সমাজে যে সকল আন্দোলনের ঢেউ ও পরিবর্তনের প্রবাহ দেখা দিয়াছিল অমৃতলালের মন তাহাতে নির্বিচার সমর্থন জানায় নাই। এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সমগোত্রীয়।[৩ক] বাক্যবাগীশ বাঙ্গালীর অন্তঃসারশূন্য আন্দোলনকে ইন্দ্রনাথের মতই তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের গোঁড়ামি ও আতিশয্যদুষ্ট ভাবভঙ্গীর প্রতি ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের মত তাঁহারও ব্যঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। হিন্দুয়ানীর ঠাট ও ধর্মের ভড়ংও তাঁহার সমান বিদ্রূপের লক্ষ্য হইয়াছিল। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাই তাঁহার প্রহসনগুলিতে উত্থাপিত হইয়াছে। সমাজ বা জাতির পক্ষে যাহা কিছু তাঁহার নিকট অকল্যাণকর বোধ হইয়াছে তাহা তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে শাসন করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন দুঃখের অভিঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া গেলেও তিনি আদর্শভ্রষ্ট হন নাই।[৪] তাঁহার প্রহসনসমূহে যে সকল চরিত্র তাঁহার ব্যঙ্গের লক্ষ্য তাহাদের অসঙ্গতির মাত্রা তিনি ইচ্ছাপূর্বক বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রহসন অনেকটা 'কার্টুনে'র লক্ষণাক্রান্ত, দোষত্রুটিগুলি অতিশয়িত না করিলে সাধারণের চোখে তাহা ধরা পড়ে না।[৫]

অমৃতলালের অধিকাংশ প্রহসনকেই আপাতদৃষ্টিতে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের

৩ক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন— 'অমৃতলাল ভাবাদর্শে ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের সমধর্মী হইলেও তিনি অপর দুইজন ব্যঙ্গকারের ন্যায় নিজের মত ও উদ্দেশ্য কারণে অকারণে জোর করিয়া তাঁহার লেখার মধ্যে ঢুকাইতে চান নাই।'— 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা', পৃ ৪৯৮

৪ 'নবীনচন্দ্র সেন' নামক কবিতায় অমৃতলাল বর্ণনা করিয়াছেন, তীব্রতম শোকের মধ্যেও তিনি কিভাবে প্রহসনগুলি রচনা করিয়াছিলেন ('অমৃত-মদিরা' পৃ ৭২)।

৫ এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত উদ্ধারযোগ্য—
'শ্লেষকাব্য কেন অতিরঞ্জিত হয়, অতিরঞ্জিত করা কেন আবশ্যক, তাহা কেহ বুঝেন না। কিন্তু ভবিষ্যতের অনিষ্ট নিবারণের জন্য ভবিষ্যতের বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতের পুষ্টি সহকৃত করিয়া বর্তমানকে অতিরঞ্জিত না করিলে, prognosis দেখাইয়া রোগের পরিচয় না দিলে, লোকের সতর্কতার শিথিলতা জন্মিবার আশঙ্কা .. ।' ('মডেল ভগিনী'র সমালোচনা)

সমষ্টি মনে হইতে পারে। কিন্তু দৃশ্যগুলির মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম সূত্রের যোগ থাকে যে শেষ দৃশ্যে আসিয়া সামগ্রিক বক্তব্য সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয়। অনেক সময়ে একটিমাত্র গানই একটি দৃশ্য। কিন্তু সেই গানেও প্রহসনের মূল সুর ধ্বনিত হয়। এই বিশিষ্ট রীতি অপর কাহারও প্রহসনে লক্ষিত হয় না। তাঁহার অধিকাংশ প্রহসনেরই প্রতিপাদ্য পূর্বেই 'প্রস্তাবনা', 'নান্দী' অথবা 'সূচনা'র গানে জানাইয়া দেওয়ার রীতি দেখা যায়।

তাঁহার যুক্তিগুলি নেতিবাচক। 'বাবু'র ষষ্ঠীকৃষ্ণ স্ত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজাধারী। ইডেন গার্ডেনে স্ত্রীকে বেড়াইতে যাইতে সে বাধ্য করে, কিন্তু মাতাল গোরা স্ত্রীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলে আত্মরক্ষাই তাহার বড় সমস্যা হয়। 'খাস-দখলে'র লোকেন বিধবা-বিবাহের উগ্র সমর্থক। কিন্তু নিজের 'বিধবা' স্ত্রীর যখন বিবাহের অনুষ্ঠান হয় তখন সেই 'অসম্ভব' ঘটনায় সে অত্যন্ত বিস্মিত হয়!

তাঁহার অধিকাংশ প্রহসন সমসাময়িক ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত বলিয়া গল্প গৌণ, চরিত্রই প্রধান। স্বার্থান্বেষী দেশনেতা, বাক্‌সর্বস্ব 'ভারত সন্তান', সদাচার ভ্রষ্টা ইংরেজী শিক্ষিতা নারী, জাতিগত-বৃত্তি পরিত্যাগকারী, ভণ্ড সমাজসংস্কারক, ভণ্ড ধার্মিক, হুজুগপ্রিয় যুবক, বেকার ভোটভিক্ষু ইত্যাদি সকলেই তাঁহার বিদ্রূপের লক্ষ্য :

> 'For his attack on people he was content with the slenderest factual basis and some remote resemblance to the person to be shot at : to these he added features to make the whole thing absurd, including slander, gossip and invention. In this fashion he assailed and caricatured with incredible audacity all the powerful and eminent figures, and also institutions ; no literary, artistic, musical, moral, religious or social innovation escaped his lash. He has the mentality of the critic and caricaturist which sees the comic side of everything ; but also of the sceptic who scorns to have been taken in.'[৫ক]

৫ক 'History of mankind'—Luigi Pareti, Tr. by Guy E. F. Chilver and Sylvia Chilver, vol II pp. 581-82

অ্যারিস্টোফেনিস সম্পর্কে প্রযুক্ত কথাগুলি অমৃতলাল সম্পর্কেও বহুলাংশে প্রযোজ্য।

বাঙালীর স্বভাবগত সর্ববিধ ভণ্ডামিকে প্রহসন ছাড়াও অন্যান্য রচনার মধ্য দিয়া যৎপরোনাস্তি তীব্রতায় আক্রমণ করিবার লক্ষ্য ও আদর্শ হইতে তিনি কোন দিনই ভ্রষ্ট হন নাই। কিন্তু ইহার জন্য একালের কোন কোন সমালোচক তাঁহাকে সংকীর্ণচিত্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এরূপ 'নিন্দা' বোধ হয় সব দেশেরই 'writer of protest'-এর প্রাপ্য হয়। কথাসাহিত্যিক সমারসেট্ মম্‌ও এ জাতীয় অভিযোগ হইতে নিস্তার পান নাই। এই প্রসঙ্গে নিজের বিষয়ে যে কথাগুলি মম্ লিখিয়াছিলেন তাহা অমৃতলালের ক্ষেত্রেও একই কারণে প্রযোজ্য—

'People often said he [Ashenden : Maugham] had a low opinion of human nature. It was because he did not always judge his fellows by the usual standards.'[৫৭]

চরিত্রোপযোগী ভাষাসৃষ্টিতেও তিনি অশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। উড়িয়া, বাঙাল, মাতাল, ধড়িবাজ, উমেদার, কেরাণী, বড়বাবু, খোনা, হাবা, তোৎলা, কনস্টেবল, পাহারাওয়ালা, বাবুর্চি, ঠাকুর, ঝি, বেহারা ইত্যাদির ভাষা অকৃত্রিম এবং অবিকৃত। ইহার উপর নানা প্রকার মিশ্রভাষা আছে—সাহেবের বাংলা ভাষা, দেশহিতৈষী বাঙালী সাহেবের ভাষা, বাঙালীর মুখে অশুদ্ধ হিন্দী, হিন্দুস্থানীর অশুদ্ধ বাঙালা ও অল্প শিক্ষিতের উদ্‌ভট ইংরাজী! তাঁহার অসামান্য বাক্‌পটুতা এই সকল চরিত্রের মুখে কখনো কৌতুক-পরিহাসে, কখনো বিদ্রূপ-ভর্ৎসনায় সহজ প্রকাশ লাভ করিয়াছে, কোথাও আড়ষ্ট বা কৃত্রিম হয় নাই। তাঁহার প্রহসনগুলিতে বিশেষ বিশেষ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার নৈর্ব্যক্তিকতা বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। তিনি যে-চরিত্র সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন তাহার মুখের ভাষা একান্ত ভাবেই তাহার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র এল. এ-পড়া নন্দলালের ইংরেজী ও বিলাত-ফেরৎ মিঃ সিং-এর ইংরেজী এক নয়। 'খাস-দখলে'র চারজন ডাক্তারের বাগ্‌ভঙ্গীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। 'বিবাহ-

[৫৭] 'Sanatorium'— W. S. Maugham

বিভ্রাটে'র ঝি ও 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র ঝি উভয়েই মুখরা, কিন্তু উহাদের ভাষার স্বতন্ত্র বিশিষ্টতার জন্যই চরিত্র দুইটি এক হইয়া উঠে নাই।

কথোপকথনে প্রবাদবাক্যেরও বহুল এবং সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয়। যেমন, 'আমার যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা', 'তোমার হ'ল অভ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণ', 'এ্যাং যায় ব্যাং যায় খোলসে বুড়ী [পুঁটি] বলে আমিও যাই।'[৬] ভাষায় অনুপ্রাস সৃষ্টির ঝোঁক প্রবল। গানেও অনুপ্রাসের আধিক্য লক্ষিত হয়। মূর্খ ব্রাহ্মণের মুখে সংস্কৃত শ্লোকের বিকৃত প্রয়োগ অনেক স্থলে হাস্যসৃষ্টি করিয়াছে। যেমন, 'পুত্রবৎ পবদারেষু লোষ্ট্রবৎ গোষ্ঠলীলয়া…' বা 'সর্বতীর্থময়ো ঘণ্টা দাম্পত্যঃ কলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া…'। ব্যাকবণেব নিয়ম লঙ্ঘন কবিয়াও কৌতুকসৃষ্টির প্রয়াস আছে। যেমন, বিদুষীর পুংলিঙ্গ বিদূষক, স্বর্গীয়ের স্থলে স্বর্গীয়ান্, উচ্চারণের স্থলে পুবশ্চরণ, জবাইয়ের পবিবর্তে জবাধ্যায়, অনুপ্রাসের স্থলে হনুপ্রয়াস![৬ক] সংস্কৃত প্রবাদের ব্যাখ্যাও বিচিত্র—'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকবী' ও 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' মিলিয়া অর্থ দাঁড়াইল স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে দুকূল যায়। Malapropism এর দৃষ্টান্তও প্রচুর। মিনিষ্টারকে মনষ্টার, ব্লিডিংকে বিল্‌ডিং, ইনফেমাসকে ইনফেক্‌শাস্, সি সাইডকে সুই সাইড, Pay him in his own coinকে Pay him in his own queen ইত্যাদি। অনেক নামেও অপ্রত্যাশিত কৌতুক আছে—যেমন, কুমারী সৌধকিবিটিনী গড়গড়িচাকী, মেঘনাদ-বধ সিংহ, ডাক্তাবের নাম সন্নিপাত সেন, নির্বাচন প্রার্থীব নাম নির্বাণবাবু, কাগজের নাম 'গ্র্যাজুয়েট্‌স গার্ডিয়ান্', 'বুকের পাটা', 'কটাস কামড়', অফিসের নাম 'Swindle Smuggle & Co.', 'Humbug Brothers'.

অমৃতলালের প্রহসনেব প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনে লক্ষিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবারে' অমৃতলালের 'রাজা বাহাদুরে'র

৬ ডঃ সুশীলকুমার দের 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থে অমৃতলাল-ব্যবহৃত প্রবাদগুলি সংগৃহীত আছে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অমৃতলালের ভাষা সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

'He was a representative Bengali and the language and imageries and phrases and the proverbs he used for his plays came not from books but from the lips of the people amongst whom he was born and brought up.' 'Studies in the Bengal Renaissance', p. 283

৬ক মূর্খ ব্রাহ্মণের ভাষা লইয়া রঙ্গকৌতুক রবীন্দ্রনাথও করিয়াছেন। 'রাজা ও রানী'র ত্রিবেদী পঙ্ক্তোচ্ছেদকে বলে পঙ্কচ্ছেদ, বৃদ্ধিকে বার্ধক্য, সন্দিগ্ধকে সন্দষ্ট।

অনুসরণ আছে।[৭] 'প্রায়শ্চিত্তে' স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকের মাত্রাতিরিক্ত রোমান্সপ্রিয়তাও অমৃতলালের প্রভাবজাত। কিন্তু অমৃতলালের অনুরূপ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য না থাকায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলি সার্থক হয় নাই।[৭ক]

অমৃতলালের বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গী ও রচনারীতির ছাপ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসুর রচনায় কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হয়। বাঙালীচরিত্রের দোষগুণ ও বাঙালীসমাজের বিচিত্র রূপ কেদারনাথের রচনায় রঙ্গব্যঙ্গের সরসতায় প্রকাশিত। ভাষায় তিনি ইংরেজী ও হিন্দী শব্দ যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন এবং কথাকে মোচড় দিয়া এমন বক্রভঙ্গী দিয়াছেন যে কৌতুক স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে। অমৃতলালের ন্যায় অনুপ্রাসের দিকে তাঁহারও প্রবণতা প্রবল। যেমন, 'একেবারে শিব হইয়া leave লইব'; 'আমিই গিণ্টি! এই কিল্‌টি নীরবে হজম করাই নিয়ম'; 'পথের পাত্তা লাগিল, কিন্তু আত্মা শুকাইয়া গেল'; 'যে সব শক্তবাত্ চলিতেছে তাহাতে রক্তপাত হইতে আর বিলম্ব নাই' ইত্যাদি।

বাঙালীচরিত্রের সর্ববিধ ভণ্ডামিকে নির্মম ব্যঙ্গে বিপর্যস্ত করিবার প্রয়াসে রাজশেখর বসু (পরশুরাম) অমৃতলালের যোগ্যতম উত্তরসাধক। 'বিরিঞ্চি বাবা' ধর্মের ভণ্ডামি ও ঔদরিকতায় অমৃতলালের 'অবতার'কে স্মরণ করাইয়া দেয়। বিরিঞ্চিবাবার 'পূর্বজন্মের বিবরণ' বলার মধ্যেও অবতার হলাহলানন্দের ভণ্ডামির ভঙ্গীগত সাদৃশ্য আছে। ব্রাহ্মদের শুচিতাবোধের উপরও কিঞ্চিৎ কটাক্ষ আছে। 'উলট-পুরাণ' গল্পের একস্থলে নারীজাতির পুরুষবিদ্বেষ ও তাহাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত মতামতের সহিত 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনের স্বাধীন ও সভ্যা স্ত্রীলোকদের মতবাদের প্রবল সাদৃশ্য আছে। 'উলট-পুরাণে' নারীজাতির মুখপত্র 'দি শি-ম্যান' লিখিয়াছে—'এর পর দরকার হয়তো মুখে কবিরাজী কেশ তৈল মাখিয়া গোঁফ দাড়ি গজাইব।' 'তাজ্জব ব্যাপারে' ডাঃ গিরিবালা লাহিড়ী বক্তৃতা করিয়াছে—

৭ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—ডঃ সুকুমার সেন, ২য় (৫ম সং) পৃ ৩৬৫

৭ক '...অমৃতলালের প্রহসনগুলিতে বাক্‌চাতুর্য (wit) ও শ্লেষ (pun) সৃষ্টির সুনিপুণ কৌশল লক্ষ্য করা যায়।...দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির সংলাপের মধ্যে অমৃতলালসুলভ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য নেই।'— 'দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার'— ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়, পৃ ২২৫

'আমাডিগের উডরের মঢ্যে ওডেরিয়া নামক এক যণ্ট্ আছে, অপারে-শনের ডারা টাহা রিমুভ করা যায়; টাহা হইলে আমাডিগের গোঁফ-ডাডী উঠিটে পাবে··· ।'

'দক্ষিণরায়' গল্পে ভোটাভুটির উপর যে বিদ্রূপ বর্ষিত তাহা অমৃতলালের 'গ্রাম্য বিভ্রাট' ও 'দ্বন্দ্বে মাতনমে'র প্রবল দলীয় ঈর্ষার কথা স্মরণ করায়। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে' তিনকড়ির উপাধি-লোলুপতা—'রাজা বাহাদুরে'র গাণিক্যধনের খেতাব-লোলুপতার অনুরূপ। নামকরণের মধ্য দিয়া কৌতুক সৃষ্টির প্রবণতাও অমৃতলালের সদৃশ। যেমন কোল্ডহ্যাম সাহেব, মেকিরাম আগরওয়ালা, ভল্চার ব্রাদার্স, গেঁড়াতলা কংগ্রেস কমিটি, আমডাগাছি সাব ডিভিসন ইত্যাদি। সংস্কৃত শ্লোকের বিচিত্র ব্যাখ্যাও অমৃতলালের মত—'যথা কুলার্ণবে অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন।' অনুপ্রাসও আছে—'স্বরাজী, না অরাজী, না নিমরাজী, না গররাজী।'[৮]

প্রহসন রচনা করিয়া শ্লেষে ব্যঙ্গে সমকালীন সমাজের নানাপ্রকার আতিশয্যকে কশাঘাত করিবার প্রবণতায় অমৃতলালের অনুবর্তী বলিয়া কাহাকেও বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় না। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অমৃতলালের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা দুইজনেই কতকগুলি প্রহসনও রচনা করেন। ভূপেন্দ্রনাথের 'কেলোর কীর্তি', 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা', 'কৃতান্তের বঙ্গদর্শন', 'বাঙ্গালী', 'ডাববি টিকিট' ও সৌরীন্দ্রমোহনের 'লাখটাকা', 'হারানো রতন' প্রভৃতি প্রহসনে ব্যঙ্গ অপেক্ষা রঙ্গকৌতুকই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

পরবর্তীকালের নাট্যকারদের মধ্যে অমৃতলালের ন্যায় শ্লেষ-রসিকের বক্র-দৃষ্টি ও বক্রপন্থা একমাত্র প্রমথনাথ বিশীই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার 'ঋণং কৃত্বা', 'ঘৃতং পিবেৎ', 'মৌচাকে ঢিল', 'পরিহাস বিজল্পিতম্' প্রভৃতিতে তিনিও বাঙালীসমাজের নানাপ্রকার ভণ্ডামির প্রতি শ্লেষের শরক্ষেপ

৮ পরশুরামের 'গড্ডলিকা' পাঠ করিয়া পুলকিত অমৃতলাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—'আপনি এত ভাল লেখেন— এত ভাল? কি লজ্জা যে আমি এতদিন কিছু পড়িনি।···যদি আপনার মতো লিখতে পারতেম! এ চিঠি না লিখে থাকতে পারলেম না।' ('কজ্জলী' গ্রন্থের শেষে উদ্ধৃত)

করিয়াছেন। ভণ্ডামির মুখোস টানিয়া খুলিতে তিনিও অক্লান্ত এবং অকুণ্ঠিত। উভয়েই মলিয়েরের ভাবশিষ্য, এইজন্য উভয়ের রচনায় ঘটনাগত ও ভাবগত সাদৃশ্য কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। 'ঋণং কৃত্বা'য় সঙ্গীত-শিক্ষক সনৎ ও মঞ্জরীর প্রণয়-প্রসঙ্গ 'কৃপণের ধনে'র গৃহশিক্ষক মন্মথ ও কুন্তলার প্রণয়ের ঘটনা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'ঋণং কৃত্বা'র শেষে ও 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র শেষে গানের পরিকল্পনাও সাদৃশ্যমূলক। সনৎ ও মঞ্জরী এবং ললিত ও মণিকার গীতিভঙ্গীর সহিত 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র পুষ্পবরণ ও মিনি এবং জটিল ও লীলার গীতিভঙ্গীর মিল আছে। ডাক্তার ও উকিলের প্রতি প্র.না.বি.র শ্লেষ-কটাক্ষ 'নবজীবন' ও 'খাস-দখল' নাটকের ডাক্তার ও উকীলের প্রতি উৎক্ষিপ্ত বিদ্রূপের স্মারক। বাংলা নাটক সম্বন্ধে অমৃতলালের যে ধারণা 'তিল-তর্পণ' (১৮৮১) হইতে 'থিয়েটারে পিণ্ডু' (১৯২৬) পর্যন্ত অটল ছিল তাহাই 'পরিহাস বিজল্পিতম্'এ মিনির প্রণয়ীর মুখে ব্যক্ত হইয়াছে : 'বাংলা থিয়েটারে নাটক বলে যা দেখে থাকেন তা সার্কাস, ভোজবাজি আর যাত্রার তে-আঁশলা অপসৃষ্টি।'

অমৃতলালের প্রহসনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তিনি শুধু কৌতুক-কুতুহলী ব্যঙ্গনাট্যকার ছিলেন না, তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ের সুখ্যাত অধ্যক্ষ এবং জনপ্রিয় নটও ছিলেন। অনেক সময়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে রচিত প্রহসনেও তিনি সমাজ-শিক্ষার কর্তব্য ও জনচিত্তবিনোদনের দায়িত্ব দুইই সার্থকভাবে পালন করিয়াছেন। স্টার থিয়েটারের আর্থিক সাফল্যের মূলে তাঁহার প্রহসনগুলির দান যে সামান্য ছিল না এবং রঙ্গালয় যে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দর্শকে পূর্ণ থাকিত, তাহা তৎকালীন সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির বিবরণ ও মন্তব্য হইতে উপলব্ধ হয়। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> 'His satires and farces and skits on social and political events were irresistible.... Play-goers, then, were crazy about them'.[৯]

অমৃতলালের প্রহসনগুলিকে তিন শ্রেণীতে[১০] ভাগ করা যায় :—

৯ 'Studies in the Bengal Renaissance'— p. 283.

১০ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' : ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, (৪র্থ. স.) পৃ ৩৬৫

১ বিশুদ্ধ প্রহসন—যেমন, 'চোরের উপর বাটপাড়ি,' 'ডিসমিশ', 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে', 'তাজ্জব ব্যাপার' ও 'কৃপণের ধন'।

২ শিক্ষাত্মক প্রহসন—যেমন, 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'একাকার', 'গ্রাম্য বিভ্রাট', 'সাবাস আটাশ' ও 'সাবাস বাঙ্গালী'।

৩ বিদ্রূপাত্মক প্রহসন—যেমন, 'তিল-তর্পণ', 'সম্মতি-সঙ্কট,' 'রাজা বাহাদুর', 'কালাপানি', 'বাবু', 'বৌমা', 'বাহবা-বাতিক', 'অবতার', 'ব্যাপিকা-বিদায়'* ও 'দ্বন্দ্বে মাতনম্'।

২

পুস্তকাকারে মুদ্রিত অমৃতলালের প্রথম প্রহসন 'চোরের উপর বাটপাড়ি' ১৮৭৬ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। কয়েকমাস পরে প্রকাশিত ইহার তৃতীয় সংস্করণের (১৮৭৭) আখ্যাপত্র হইতে জানা যায় 'শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত ও সংশোধিত হইয়া তৃতীয়বার প্রকাশিত।'[১১]

পুরুষের লাম্পট্য ও তাহার শাস্তি এই প্রহসনের প্রতিপাদ্য। অঘোর নামক এক চরিত্রহীন বিষয়ী ব্যক্তি নারায়ণ নামক এক বেকার যুবককে দিয়া পাড়ার এক ভদ্র স্ত্রীলোককে ফুসলাইতে গিয়া কিরূপ নাকাল হইল এবং নারায়ণ না জানিয়া অঘোরের স্ত্রীকেই নিজে আয়ত্ত করিয়া কিভাবে চোরের উপর বাটপাড়ি করিল তাহাই এ প্রহসনে রসসঞ্চার করিয়াছে।

প্রহসনটির আয়তন ক্ষুদ্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪। নাট্যকাহিনী আটটি ক্ষুদ্র দৃশ্যে বিভক্ত। প্রতিটি দৃশ্যে কৌতুক-রস ক্রমশ বর্ধিত হইয়া শেষ দৃশ্যে চূড়ান্ত মাত্রায় পৌছিয়াছে। ভাষা সর্বত্র স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও কৌতুকপ্রদ। প্রথম দৃশ্যে মোহান্ত এলোকেশীর প্রসঙ্গ দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। এক, সমসাময়িক ঘটনা ও নাট্যজগতের ইঙ্গিত দিতেছে; দুই, মোহান্তের শাস্তিতে পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তির পরিণাম ব্যক্ত হওয়ায় লম্পট অঘোরনাথের পরিণতির পূর্বাভাস মিলিতেছে। আরম্ভেই কাঙ্গালীর গানটিতে নাট্যকার সুকৌশলে

* অমৃতলাল নিজে 'ব্যাপিকা-বিদায়'কে 'প্রমোদ-প্রহসন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১১ ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালে।

পরোক্ষভাবে অঘোরের নাস্তানাবুদ হইবার ইঙ্গিত দিয়াছেন।* আরও দুইটি গান এই প্রহসনে আছে। একটিতে কন্যাদায়-সমস্যা ব্যক্ত হইয়াছে ও অপরটিতে স্ত্রী-শিক্ষার আধিক্য ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রাবল্যের প্রতি ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমটিতে 'বিবাহ-বিভ্রাট' ও দ্বিতীয়টিতে 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনের বীজ দেখিতে পাই।

কর্তা-গিন্নীর চরিত্রহীনতা বেশ উপভোগ্য রসিকতায় বর্ণিত। যেমন, অঘোর নারায়ণকে বলিতেছে—'হরতনের বিবিতে ইস্কাপনের টেক্কা তুরুপ করতে হবে।' আবার গিন্নী নারায়ণকে বলিতেছে— 'আমার রামে শ্যামে কাজ নেই—তুমি আমায় বাম হয়ো না'; কিংবা 'যখন আমার কাছে আছ, মনে কর গড়ের মাঠের কেল্লায় আছ।'[১২]

লম্পট অঘোরের চিন্তা ও দুশ্চিন্তা বা ক্রুদ্ধ অঘোরের হিন্দী উক্তি বাস্তবতাপূর্ণ।

'চোরের উপর বাটপাড়ি'তে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব আছে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে এই কাহিনীর 'মূল আছে বোকাৎসিয়োর একটি গল্পে।'[১৩]

আখ্যাপত্র হইতে জানা যায়, 'চোরের উপর বাটপাড়ি' 'ইংরাজী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশন্যালে প্রথম অভিনীত।' অভিনয়ের তারিখটি গ্রন্থে নাই।[১৪] তবে অভিনয় যে খুব জমিত তাহার প্রমাণ আছে। 'চোরের উপর বাটপাড়ি'র জনপ্রিয়তার কথা লিখিতে গিয়া গিরিশচন্দ্র একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"রঙ্গালয়ে দর্শকসংখ্যার হ্রাস দেখিলে রামচরণ নামে একজন প্লাকার্ডের

* 'খানির বিত্তন্ত জেনেছে মোহন্ত,
থাকতে জীবন্ত, পরনারীর নামটি আনবে না মুখে।'

১২ 'চোরের উপর বাটপাড়ি'র আলোচনাপ্রসঙ্গে সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন—'মাইকেলের প্রহসন রচনার পর অমৃতলালই প্রথমে সেই পথে পথচিহ্ন (milestone) স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।'— 'দৃশ্যকাব্য পরিচয়', পৃ ৩৩৭

১৩ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, (৫ম সং) পৃ ৩৫৬। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ মলিয়েরের 'স্কুল ফর ওয়াইভস্‌'-এর কাহিনীর সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। (বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃ ১৮৩)

১৪ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে অভিনয়ের তারিখ ১৭ই জুন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বেহারা, প্রসিদ্ধ প্রহসনকার শ্রীমান অমৃতলাল বসুকে আসিয়া বলিত, 'মহারাজ আদর্শ সরস্বতী* আর চোরের উপর বাটপাড়ি লাগাইয়ে।'"[১৫]

৩

'তিল-তর্পণ' অমৃতলালের প্রথম বিদ্রূপাত্মক প্রহসন। ১৮৮১ সনে এই 'শ্লেষকাব্য শিবু কর্তৃক প্রকাশিত' হইয়া 'বঙ্গীয় নট, নটী, নাট্যকার-নিকর-কর-স্থলপদ্মে এই কয়েক পৃষ্ঠা অনেক আশায়' উৎসর্গীকৃত হয়। দুই অঙ্কের প্রহসন। প্রথমে একটি পূর্বদৃশ্য ও মধ্যে একটি ক্রোড়াঙ্ক আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩। গান আছে কয়েকটি।

এই প্রহসনে যেমন একদিকে থিয়েটারের ম্যানেজার, অ্যাক্টর, অপেরা মাষ্টার ও নাট্যকারের প্রতি কটাক্ষ আছে, তেমনই আছে তৎকালে অভিনীত তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটকের প্রতি বিদ্রূপ। প্রহসনটি হইতে তৎকালীন থিয়েটার মহলের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন 'গুঁপোরাণী'র প্রসঙ্গ হইতে জানিতে পারি যে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রীরা অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলেও পুরুষেরা স্ত্রী-ভূমিকা একেবারে বর্জন করে নাই; ঐতিহাসিক নাটকের কালক্রমে ও চরিত্রসৃষ্টিতে যথেচ্ছাচার শুরু হইয়াছে; দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য রঙ্গমঞ্চের উপর অবান্তর বিষয়ের যথেচ্ছ অবতারণা হইতেছে।

'তিল-তর্পণে'র নাট্যকাহিনীকে অতিশয়িত করিয়া অমৃতলাল একেবারে উদ্ভটত্বের চরম সীমায় লইয়া গিয়াছেন। আলিবর্দী চিতোর আক্রমণ করিতেছেন এবং বাপ্পারাও কলিকাতা হইতে 'মার্টিনী হেনরী রাইফেল বন্দুক' আনাইয়া আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্যোগ করিতেছেন! এদিকে বাপ্পারাওয়ের কন্যা হেমাঙ্গিনী বাগানের মালী অজাগর মাইতিকে লইয়া পলায়ন করিয়া একেবারে আলিবর্দীর শিবিরে হাজির! শেষে স্বর্গ হইতে নারদ আসিয়া কন্যাহারা বাপ্পারাওকে আশ্বস্ত করিলেন এই বলিয়া যে অজু মালী শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র!

* বেহারার উচ্চারণ-বিকৃতিতে অতুলচন্দ্র মিত্র-রচিত 'আদর্শ সতী', 'আদর্শ সরস্বতী'তে দাঁড়াইয়াছিল।

১৫ 'রঙ্গালয়ে নেপেন' (গিরিশ গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠ ভাগ, পৃ ২৮৭-৮৮)। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই অভিনয়ের যে ভূমিকালিপি দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, প্রথম অভিনয়ের সময় অমৃতলাল কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, ১ম খণ্ড, পৃ ২৯)।

তৎকালীন ঐতিহাসিক নাটকের কালাতিক্রমণকেই শুধু ব্যঙ্গ করিয়া অমৃতলাল ক্ষান্ত হন নাই। ইতিহাসকে পুরাণের পথে টানিয়া সহসা নারদের শেষ উক্তিতে তাহাকে রূপকথায় পরিণত করিয়া তিনি 'ঐতিহাসিক' নাট্যরচয়িতাদের যথেচ্ছ কল্পনার প্রতি চরম বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন।

দর্শকদের প্রতি শ্লেষ-বক্রোক্তিও স্থলে স্থলে দেখা যায়। যেমন 'তিল-তর্পণ' নামটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে—

'অনেক ভেবে নামটা বের করা গেছে। প্রথমে লোকে শুনেই ভাববে, এটা নীলদর্পণের জবাব, দীনবন্ধু বাবুকে গাল দিয়েছে; আজকালকার Audience গাল শুন্তে ভালবাসে, তাতে আবার মরা মানুষকে গালাগাল··· !'

দর্শকদের রুচি ও অভিরুচির বিষয়ে—

'Audienceকে খুসী করতে হবে, নাচের জায়গা পাইনা—মল্লিকদের মেজো বউকে খিড়কির ঘাটে নাচিয়ে দিলুম।'

নাটকে প্লট না থাকিলেও দর্শকরা খুশী হইতে পারেন, যদি দেখেন—
'এতে Wit আছে, Humour আছে, Blankverse আছে, নাচ, গান, গালাগাল, ভারত, যবন, মূর্ছা, কালিওড়ান, ভূত নাবান, চিতোর, সাহেবমারা' প্রভৃতি সব কিছুই আছে!

ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যের কিছু কিছু ব্যঙ্গানুকৃতিও প্রহসনটিতে আছে। বিদ্যাসাগরের বোধোদয় ও গিরিশচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী-নাট্যরূপের প্রসঙ্গও আছে। ভাষার উপর অমৃতলালের আধিপত্যের পরিচয় এই প্রহসন হইতেই মিলিতেছে। ব্রজবুলি হইতে আরবি-ফারসি পর্যন্ত নানা ভাষার রঙ্গপূর্ণ ব্যবহার এখানে আছে।

অমৃতলাল নিজে একবার 'তিলতর্পণে'র প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—
'...তখন আমার যৌবনযুক্ত জীবনের বাসন্তী হাওয়া ইতিহাসকে ভাসাইয়া প্রণয়কাননের পথ বাহিয়া পৌরাণিকে পরিণত হওয়ার গতি প্রাপ্ত হইতেছে বুঝিয়া লিখিত পত্রাবলী নাট্যসাহিত্যের পিতৃপুরুষের তিলতর্পণে প্রয়োগ করিয়া ফেলিলাম।'[১৬]

১৬ 'পুরাতন পত্রিকা,' মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৩০

অমৃতলাল শেরিডানের ‘দি ক্রিটিক’ হইতে এই প্রহসন রচনায় অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১৮৮১ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ‘তিল-তর্পণ’ প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতলাল বাপ্পারাওয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৮৮৩ সনে অমৃতলালের পরবর্তী প্রহসন ‘ডিসমিশ’ প্রকাশিত হয়।[১৭] এই একাঙ্ক প্রহসনটিতে চারিটি ক্ষুদ্র দৃশ্যের সমন্বয় হইয়াছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১।

নাট্যকাহিনী বেশ রঙ্গপূর্ণ। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রমদার প্রতি স্বামী কৃষ্ণনাথবাবুব অমূলক সন্দেহ এবং শেষে কৌতুককর পরিস্থিতির মধ্যে সেই সন্দেহের নিরসন—ইহাই ‘ডিসমিশে’র কাহিনী। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহের ব্যাপারটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘কিঞ্চিৎ জলযোগে’র প্রভাব অনুমান করা যায়। এই প্রহসনেই প্রথম ব্রাহ্মদের গোঁড়ামির প্রতি সামান্য কটাক্ষ এবং মূর্খ ব্রাহ্মণের বাগাড়ম্বরের প্রতি যথেষ্ট বিদ্রূপ দেখা যায়। তর্কালঙ্কার যেন অমৃতলালের পরবর্তী প্রহসনসমূহের ভণ্ড ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ। তাহার কোন কোন উক্তি হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। কৃষ্ণনাথ তাহাকে ‘আপনাকে কেউ মধ্যস্থ হতে ডাকেনি’ এই কথা বলায় সে বলে, ‘মধ্যস্থ? কার মধ্যস্থ আমি? আমি কার মধ্যে থাকি? আমি সর্বলোকের উপরস্থ।’ সে ‘প্রমদা’ নামের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহাও অপরূপ—‘প্র-ম-দা এ শব্দের অর্থ কি? প্র-টা তো উপসর্গ, মদ ধাতু, অর্থাৎ প্রমদা হচ্ছে মদের উপসর্গ।’

অমৃতলালের অনেক প্রহসনে দেখা যায় বিচিত্র ধরণের বিভিন্ন লোকের ক্ষণকালীন উপস্থিতিতে রঙ্গবৈচিত্র্য বর্ধিত হয়। ইহার সূত্রপাত ‘ডিসমিশে’ই হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে মাতাল, বরফওয়ালা, ‘গুপ্তকন্যার গুপ্তকথা’-বিক্রেতা ছোকরা, ভিক্ষুক, পাহারাওয়ালা, ঝি প্রভৃতি রঙ্গরসের আসর জমাইয়াছে।

‘ডিসমিশে’র আখ্যাপত্রে লিখিত আছে ‘সন ১২৮৯ সালে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।’ অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল কি না জানা যায় নাই।[১৮]

১৭ প্রহসনটি ‘বামনডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরীকে উপহার প্রদত্ত’। তৃতীয় সংস্করণ প্রকশিত হয় ১৩০৫ সালে।

১৮ দেবেন্দ্রনাথ বসু ‘অমৃতস্মৃতি’ প্রবন্ধে এই প্রহসনটি ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয় এবং

'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। প্রহসনটিতে একটিমাত্র দৃশ্য। সংগীত একটিও নাই। কাহিনীতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ নাই, রঙ্গকৌতুকই প্রধান। 'Cox and Box' ও 'Box and Cox' নামক দুইটি ইংরেজী প্রহসনের কাহিনী ও 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে'র কাহিনী এক।[১৯] কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ—

পরস্পরের অজ্ঞাতসারে চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে দুইজনে একই ঘর ভাড়া লইবার পর এক সময়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ শুরু হইল। যখন জানা গেল বাঁড়ুজ্যের পরিত্যক্তা পাত্রী দিগম্বরীকেই চাটুজ্যে বিবাহ করিতে উদ্যত, তখন চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যেকেই দিগম্বরীর পাত্র বলিয়া নির্দেশ করিল। বাঁড়ুজ্যেও চাটুজ্যেকে বুঝাইয়া দিল যে, চাটুজ্যেই দিগম্বরীর পাত্র। দেখা গেল উভয়েই দিগম্বরীকে পরিত্যাগ করিতে চাহে। শেষে যখন জানা গেল দিগম্বরীর অন্যত্র বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহার্দ্যের সূত্রপাত হইল।

'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে'র অনেক স্থলেই হাস্যোদ্দীপক কথাবার্তা আছে; কলা-পাঁউরুটি লইয়াও আছে বেশ খানিকটা রসসিক্ত সংলাপ। যেমন, কলা খুঁজিয়া না পাইয়া এবং পাঁউরুটি দেখিয়া ভবতারিণীর' উদ্দেশে চাটুজ্যের উক্তি—

> '…কৈ কলা— কলা গেল কোথা? আমার কলা গেল কোথা? আমার কলা— ও তাই বেটী, তাই বেটীর আপত্তি! আমার কলা চুরি করবে বলে বেটী পাঁউরুটী-ফাঁদ পেতেছিলে!…তুমি বেটী আমার কাছে উড়বে! বেটী তোমার এক হ্যাচনেচে মিয়োন পাউরুটী দেখিয়ে আমার পুরষ্ট কলা গাপ করবে? কলা আমার যাবে কোথায়? বের করবই!'

ভবতারিণীর (ঝি) চরিত্রচিত্রণে অমৃতলালের স্বাভাবিক দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার বিকৃত শব্দোচ্চারণে মাঝে মাঝে হাস্যরস সৃষ্ট হইয়াছে।

অমৃতলাল কৃষ্ণনাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এইরূপ লিখিয়াছেন (দ্রষ্টব্য মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৩)।

১৯ 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ— পৃ ১৮৪। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করিয়াছেন— 'কাহিনীটির মৌলিক পরিকল্পনার জন্য অমৃতলালের কোন কৃতিত্ব না থাকিলেও, ইহার সংলাপের মধ্যে তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে ('বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস,' পৃ ৪১৬)।
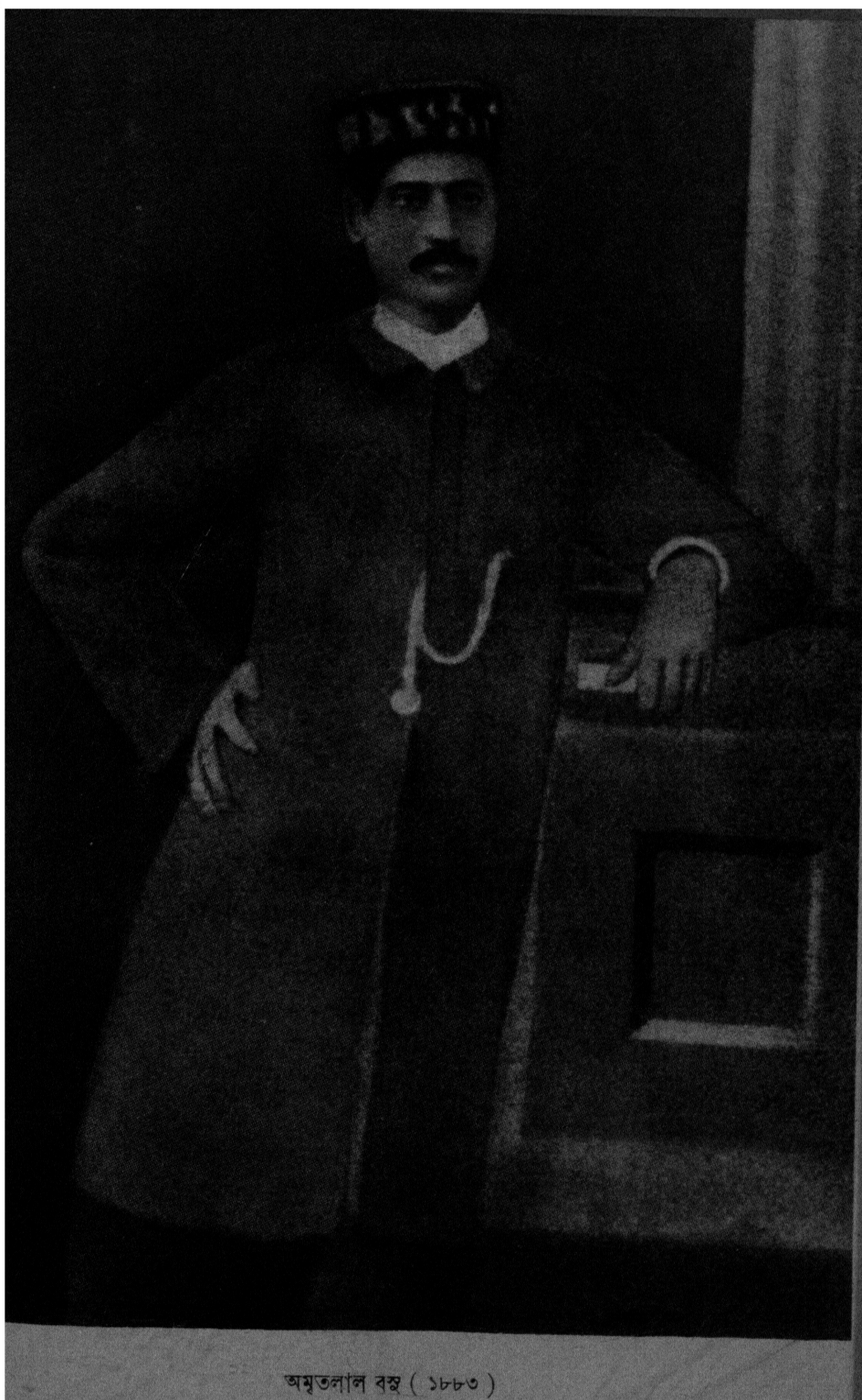
অমৃতলাল বসু (১৮৮৩)

স্টার থিয়েটারে ১৮৮৪ সনের ১৬ই এপ্রিল 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম রাত্রিতে অমৃতলাল চাটুজ্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

৬

১৮৮৪ সনে মধ্যবিত্ত বাঙালীসমাজের কয়েকটি বাস্তব সমস্যাকে জ্বলন্ত নাট্যরূপ দিলেন অমৃতলাল তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন 'বিবাহ-বিভ্রাটে'। দুই অঙ্কের প্রহসন, প্রতি অঙ্কেই চারিটি করিয়া গর্ভাঙ্ক আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৯।

মধ্যবিত্ত বাঙালীসমাজে বরপণের নৃশংস বর্বরতা, বেপরোয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং জাতীয়তা বিসর্জন দিয়া সাহেব সাজিবার উৎকট আগ্রহ এখানে নির্মম ব্যঙ্গে কশাহত হইয়াছে।

এল. এ-পড়া নন্দলালের বাবা গোপীনাথ সরকার কিভাবে কন্যাদায়গ্রস্ত মন্মথ মিত্রকে সর্বস্বান্ত করিয়া বরপণ আদায় করিল এবং নন্দলাল কিভাবে পিতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া পণের টাকা লইয়া বিলাতে চলিয়া গেল তাহাই এ প্রহসনের মুখ্য বর্ণনীয়। প্রসঙ্গক্রমে মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনচিত্তা বিলাসিনী কারফরমা ও অত্যুগ্র সাহেব মিঃ সিংএর ব্যঙ্গরঞ্জিত চিত্রও দেখিতে পাই। নন্দলালের মধ্য দিয়া আমাদের তৎকালীন শিক্ষিত যুবকদের মতিগতি এবং তাহাদের চরিত্রে ইংরেজী শিক্ষার গতি ও বেগ প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রহসনে ঝি লইয়াছে প্রধান ভূমিকা। এ ঝি 'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'ডিসমিশ' বা 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে'র ঝি হইতে স্বতন্ত্র। এখানে সে প্রহসন-কারের মুখপাত্রী। সমাজ-অঙ্গের বীভৎস বিকৃতিতে নাট্যকারের ঘৃণা ও ধিক্কার যেন শতমুখী হইয়া এই কলকণ্ঠী ঝিয়ের মুখ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে গোপীনাথ, বিলাসিনী, সিং কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কয় নাই।

'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রকাশিত হইলে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নবজীবন' পত্রে ইহার সাত পৃষ্ঠা ব্যাপী এক দীর্ঘ সমালোচনা করেন। তাহাতে তিনি প্রহসনটিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে 'শিক্ষা-বিভ্রাটে'র সর্বাত্মক কুফল কিভাবে এই প্রহসনে 'সতেজে উদাহৃত হইয়াছে'। উপসংহারে ইন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'যদি প্রকৃত শিক্ষায় কাহারও আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে, তবে আমাদের ব্যবহার শুধরাইতে হইবে, আমাদের চরিত্রে নিষ্ঠাগুণের সঞ্চার করিতে হইবে, 'চাদর নিবারিণী' অথবা 'ভাতকাপড় নিবারিণী' সভা ছাড়িয়া, ভ্রান্ত অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং কঠোর কশাঘাতকারী গ্রন্থকারের গুণগান করিতে করিতে কিছুকালের জন্য ঋীকেও আমাদের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের মতিগতি ফিরাইয়া লইতে হইবে।'[২০]

'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ব্যঙ্গরসিক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মন্তব্য করিয়াছিলেন—

"'বিবাহ-বিভ্রাটে'র তুলনা নাই, ইহার দাম হওয়া উচিত এক আনা, আর 'ধারাপাত' 'বর্ণপরিচয়ে'র মত বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে ইহার অবাধ প্রবেশ থাকা একান্ত আবশ্যক।"*

পূর্ববর্তী প্রহসনসমূহের সহিত তুলনা করিয়া হারাণচন্দ্র রক্ষিত তাঁহার 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"...তাহার অদ্বিতীয় প্রহসন 'বিবাহ-বিভ্রাট' সকলের শীর্ষস্থানে। স্বয়ং গিরিশবাবু অথবা তাঁহার পূর্ববর্তী নাটককার দীনবন্ধু— এমন কি মাইকেল পর্যন্ত, এ বিষয়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহা আমাদের সরল বিশ্বাস।...বিদ্রূপাত্মক satire-এ তাঁহার যে অদ্ভুত ক্ষমতা পরিদৃষ্ট হয়, এক ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দ ছাড়া, তেমন শক্তি—তেমন দক্ষতা আর কাহাতেও দেখি না।...সমাজ-শরীরে তাঁহার তীব্র-মধুর কশাঘাত এক সময়ে কম কাজ করে নাই।"[২১]

স্টার থিয়েটারে (বিডন ষ্ট্রীটে) ১৮৮৪ সনের ২২এ নভেম্বর 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতলাল মিঃ সিংএর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই ভূমিকাটি তাঁহার শ্রেষ্ঠ অভিনয়সমূহের অন্যতম। 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র অভিনয় খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'বিবাহ-বিভ্রাটের অভিনয়ের পর হইতে কৌতুকনাট্যকাররূপে অমৃতলালের

---

২০ নবজীবন : বৈশাখ ১২৯২

* ১৩৩৬ সালেব শ্রাবণ সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২১ 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য', পৃ ৩২৮

খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।'[২২] তৎকালীন অনেক সংবাদপত্রই 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে অমৃতলালের অকুণ্ঠ সুখ্যাতি করেন।[২৩]

'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রকাশিত হইবার দীর্ঘকাল পরে 'বাঙ্গালা ভাষার নাটক' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া জনৈক সমালোচক 'ভারতী' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—

'বিবাহ-বিভ্রাট নামক প্রহসনের কথা এখানে না লেখাই ভাল। আমার পূর্বে অনেক উৎকৃষ্টতর লেখক ইহার ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী— তাঁহাদের ন্যায় গুছাইয়া বলিতে পারিব কি? Uncle Tom's Cabin বা নীলদর্পণের যাহা মূল্য বিবাহ-বিভ্রাটের মূল্য তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তিনি আরও অনেক প্রহসন রচনা করিয়াছেন সেগুলি বিবাহ-বিভ্রাটের সমকক্ষ না হউক মন্দ নহে; আধুনিক 'মুখসর্বস্ব' বাঙ্গালী বীরদিগের নিখুঁত ফটোগ্রাফ। গ্রীসদেশীয় পরিহাস-রসিক Aristophanes এর ন্যায় তাঁহার গ্রন্থাবলী যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ।'[২৩ক]

কিন্তু বাংলা দেশের অ্যারিস্টোফেনিস্ অমৃতলালের 'শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থাবলী' হইতে এ কালের কোন কোন সমালোচক শিক্ষা লইতে পারেন নাই এবং 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র আলোচনা করিতে গিয়া অমৃতলাল সম্পর্কে 'চূড়ান্ত' মত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন।[২৩খ] ইহার কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট এবং সে কারণটি নাট্যতত্ত্বজ্ঞ Nicoll-এর মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

---

২২ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস': ২য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃ ৩৫৬। Marchioness of Dufferin 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র অভিনয় দেখিয়া (২৩.১.১৮৮৫) তাঁহার 'Our Viceregal life in India' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'As a study of manners and customs, the play was most interesting.' 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র খ্যাতি বঙ্গদেশের বাহিরেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, বিবাহ-বিভ্রাট প্রকাশিত হইবার অল্প পরে জামালপুরে যে অভিনয় হয়, তিনি তাহার দর্শক ছিলেন। (দ্রঃ মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬)

২৩ Reis and Rayyet (10. 10. 1885) লিখিয়াছিলেন— "He has now made a hit as play- wright by his 'Marriage Difficulty' or Bibaha Bibhrat.' He naturally played his own character of Mr. Singh...with great spirit as well as fidelity." বিনোদিনীর (বিলাসিনী) অভিনয়ও উচ্চাঙ্গের হইত।

২৩ক ভারতী: শ্রাবণ ১৩১০

২৩খ 'পুরোনো আদর্শ নিয়ে প্রাণহীন উচ্ছ্বাস ছাড়া, কোনো প্রকৃত উচ্চাদর্শ, উচ্চভাব বা উদার

'The time of unbridled, uproarious, purposeful laughter had gone for Aristophanes, for Athens, and one might even say, for the world.'[২৩গ]

'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসন এবং তাহার অভিনয় আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত সমাজকে কতটা আত্মস্থ করিয়াছিল সে সম্পর্কে 'অভিনয়-বিজ্ঞাপন পত্রে' অমৃতলাল এক সময় লিখিয়াছিলেন—

"'বিবাহ-বিভ্রাট' কি করিয়াছে?

এ বিষয়ে আমাদিগের বেশী বলা ভাল দেখায় না; 'শ্রীচৈতন্যলীলা'র অভিনয়ের অতি অল্প পরেই রঙ্গমঞ্চে 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র অবতারণা করা হয়; এইটুকু মনে করিয়া লইয়া তৎপূর্বের ও পরের সময়ের পর্যালোচনা করুন; কি স্বদেশীয় কলেজে শিক্ষিত, কি বিলাতী বিদ্যালাভান্তে প্রত্যাগত সমাজের ভিত্তিস্বরূপ বঙ্গের মুখোজ্জ্বল যুবকগণের আচার ব্যবহার চালচলনের প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। 'যুবতী'রাও যেন কিছু সংযতা হইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়।"[২৪]

'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনের প্রভাব বঙ্গীয় নাট্যসমাজে কিরূপ গভীরভাবে পড়িয়াছিল সে পরিচয় দিয়াছেন 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' গ্রন্থের লেখক—

"অমৃতবাবু 'বিবাহ-বিভ্রাটে' একজোড়া মিঃ সিং ও বিলাসিনী কারফরমা আঁকিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ঠিক পরের পুস্তক 'তাজ্জব ব্যাপারে' তাঁহার সে ছবি আর ছিল না; কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার 'তাজ্জব ব্যাপার' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট' মিশাইয়া 'রুক্মিণীরঙ্গ' 'অবলা-ব্যারাক' ইত্যাদি যে কতকগুলি প্রহসন বাহির করেন, সে সবগুলিই ঐ দুই পুস্তকের কেবল হেরফের মাত্র। তাহার পর সিটি থিয়েটারের 'পয়জারে পাজী' প্রভৃতিও এই দলে যোগ দিল। অনুকরণে পুস্তক অনেক হইল, কিন্তু বিষয় একটা

মনোবৃত্তি তাঁর কোনো নাটকেই চোখে পড়ে না।'— 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস'— অজিত দত্ত, পৃ ১৫৪। 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র এরূপ ব্যাখ্যা যে কেহ কেহ করিতে পারেন, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কি তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন? নহিলে 'নবজীবন' পত্রে (বৈশাখ ১২৯২) 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র সুদীর্ঘ বিশ্লেষণের পর একথা লিখিবেন কেন— 'পুস্তকের সকল স্থানই এইরূপ মূল্যবান ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইঙ্গিত বুঝিলে ত!'

২৩গ 'World Drama': Allardyce Nicoll, p. 106

২৪ রূপ ও রঙ্গে (১৮ই আশ্বিন ১৩৩১) পুনর্মুদ্রিত।

ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেখা গেল না; বর্ণনাও একই ধরণে হইতে লাগিল,— সকল পুস্তকেই মিঃ সিং ও কারফরমার ছাঁচে ঢালা স্বাধীনতা, সভ্যতা এবং শিক্ষার উৎকেন্দ্রগামী এক এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষের ছবি দেখা দিল।"[২৪ক]

৭

অমৃতলালের 'হাস্যরসোদ্দীপক সাময়িক গীতিরঙ্গ' 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে (দ্বি. স. ১২৯৭)। প্রহসনটিতে মোট সাতটি দৃশ্য ও দশটি গান আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০।

'তাজ্জব ব্যাপারে' গল্প বলিতে বিশেষ কিছু নাই। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকদের ক্রিয়াকলাপ ও অন্তঃপুরচারী পুরুষদের দুর্গতি চূড়ান্ত অতিরঞ্জনে প্রদর্শিত। প্রহসনবর্ণিত এই বিষয়বস্তুর জন্য অমৃতলাল বীরেশ্বর পাঁড়ের নিকট ঋণী। ১২৯৫ সালে বীরেশ্বর পাঁড়ের 'অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব' নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তাহাতেও পাশ্চাত্যদেশসুলভ স্ত্রীস্বাধীনতার অনুকরণকারিণীদের লইয়া রঙ্গব্যঙ্গ আছে। তবে সংলাপের কৌতুকপ্রদ চমৎকারিত্বে অমৃতলালের প্রহসনটি বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। 'তাজ্জব ব্যাপারে'র বক্তব্য প্রস্তাবনার গানটিতে সুপরিস্ফুট। স্ত্রীলোকদিগের পরিচয়ের মধ্যেই যথেষ্ট হাস্যরস আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ হাইকোর্ট আপীলেট সাইডের উকীল, কেহ হুগলী কোর্টের সেরেস্তাদার, কেহ হাওড়া পুলিসের হেড কনেস্টবল, আবার কেহ ভলেনটিয়ার সৈন্যের কর্ণেল। সংলাপ খুবই হাস্যোদ্দীপক। সভাগৃহে স্ত্রীলোকদিগের বিচিত্র ভাষায় বক্তৃতা প্রহসনকারের ভাষার উপর আধিপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। গিরিবালার সাহেবী বাংলা ও অনঙ্গমঞ্জরীর ঢাকাই বাংলা ভুলিবার নহে। সভাগৃহের ছদ্মগম্ভীর পরিবেশে মদ্যপ থাকমণির 'প্রবেশ ও গীত' সীমাহীন কৌতুকজল্পনার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। বিরাজের 'এ প্রস্তাব আমি দ্বিতীয় (second) করি' ও ননীবালার 'আমি এ প্রস্তাবে ভরণপোষণ (support) করি'— উদ্ভট অনুবাদের সম্ভাব্য সীমাও ছাড়াইয়া গিয়াছে! বঙ্গদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার আধিক্য দেখিয়া ভীত উড়িয়াদের কথোপকথন ও গান এবং গড়ের মাঠে ভলেনটিয়ার রমণীদের ড্রিল, রঙ্গরসের চরম উদাহরণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। 'বর

২৪ক 'বঙ্গীয় নাট্যশালা'— ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, পৃ ৮

পাত্রীস্থ করা', 'বিশ্বম্ভরের হাই আমলা বাটা', 'গোয়ালাগিন্নীর উলুবেড়ের হাটে গিয়া গরু কেনা', 'গিন্নী গত হওয়ায় জেঠা মশাইয়ের শুভকর্মের জিনিস ছুঁইতে না পারা' প্রভৃতির মধ্যেও কৌতুকরস যথেষ্ট।

১৮৮৯ সনের ১লা জানুয়ারী স্টার থিয়েটারে 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয়-বিজ্ঞাপনে প্রহসনটিকে 'Burlesque' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহাতে অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল না।[২৫]

৮

অমৃতলালের 'সম্মতি-সঙ্কট' প্রহসনটি (১৮৯১) তৎকালীন একটি পরস্পরবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। ফুলমণি নামে একটি অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বিবাহিতা বালিকার মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া ১৮৯০ সনের শেষভাগ হইতে বাল্যবিবাহ-নিরোধক আন্দোলন ও সহবাস-সম্মতি-বিষয়ক আইন প্রবর্তনের উদ্যোগ চলে।[২৬] এই ক্ষুদ্র প্রহসনে অমৃতলাল বাল্যবিবাহের পক্ষে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়া বাল্যবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এই আন্দোলন সমর্থন করেন নাই। ১২৯৭ সালের ২৯এ আশ্বিন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন— 'বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, আমি ইহাকে কতকটা বৃথাড়ম্বর মনে করি।'*

'সম্মতি-সঙ্কট' প্রহসনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যদি দেশবাসীর তৎকালীন মনোভাব আমরা অবগত হইতে পারি। এ বিষয়ে 'অনুসন্ধান' পত্র 'কি দেখিলাম ও কি শিখিলাম' এই শিরোনামে লিখিয়াছিলেন—

২৫ ১৮৯০ সনে সেপ্টেম্বর মাসে 'তাজ্জব ব্যাপার' পুনরায় অভিনীত হয়। এই সময়ে 'ভারতী ও বালক' পত্র (ভাদ্র ১২৯৭) অভিনয়ে 'সুরুচির অভাব' লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

২৬ ন্যাশনাল ম্যাগাজিন (ডিসেম্বর ১৮৯০) হইতে জানা যায়, আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল 'With surprising suddenness and from a single case...from the death of Phulmani from the effects of violent co-habitation...'

* বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সহ পত্রটি সচিত্র শিশিরে (২২এ কার্তিক ১৩৩১) মুদ্রিত আছে।

'আমরা একদিকে যেমন দেখিলাম, দুর্দান্ত অসুরগণের বিকট আসুরিক অট্টহাসি, অন্যদিকে তেমনই ধর্মপর শান্তশীলগণের মর্মভেদী নিদারুণ হাহাকার। একদিকে যেমন দেখিলাম, রাজা প্যারিমোহন, রাজা শশীশেখরেশ্বর, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাদের ভাবী ভাবনা ভাবিয়া আকুল ; অন্যদিকে তেমনই দেখিলাম, ব্রাহ্ম আনন্দমোহন, দ্বিজরাজ কৃষ্ণকমল ও সর্ববিরোধী শম্ভুচন্দ্র, সকলেই আমাদিগকে দুর্দশার চরম সীমায় পাতিত করিতে পারিলেই যেন সন্তুষ্ট। একদিকে যেমন 'বঙ্গবাসী', 'দৈনিক', 'বঙ্গনিবাসী', 'অমৃতবাজার', 'হোপ', 'হিন্দুরঞ্জিকা', 'ঢাকাপ্রকাশ', 'টাইমস্', 'সুধাকর' প্রভৃতি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও পার্শী প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত শত শত পত্রিকা বিলের বিরোধী ; আর অন্যদিকে দেখিলাম, ব্রাহ্মিকা সখী 'সঞ্জীবনী' ও নিম ব্রাহ্ম 'সময়' প্রভৃতি হিন্দুর গৃহশত্রু কএক জন বিল যাহাতে পাশ হয়, সেজন্য বিশেষ উদ্যোগী।'[২৭]

বিলটি কাউন্সিলে উপস্থাপিত হইবার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে যে অভিমত দেন (১৬. ২. ১৮৯১), তাহাতে তিনি বলেন—

'...I cannot support the Bill as it is, I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to childwives, without in any way conflicting with any religious usage....'

এই সকল মতামত ও ঘটনাবলী হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, এই আন্দোলন এবং তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ সর্বব্যাপী হইয়াছিল।[২৮] এই আন্দোলন অমৃতলালকেও কিরূপ চিন্তিত করিয়াছিল তাহা 'সম্মতি-সঙ্কটে' প্রকাশ পাইয়াছে। প্রহসনটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, অমৃত গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগে মুদ্রিত আছে।

২৭ অনুসন্ধান : ৩০এ ফাল্গুন ১২৯৭। The Indian Mirror (17.1.1891) হইতে জানা যায়—'The Sakti of Dacca, in a long leader, protests against the Age of Consent Bill. The Navajug, in a leading article, protests against the Age of Consent Bill. But the Shomoy supports it most strongly.'

২৮ সহবাস-সম্মতি আইন সম্বন্ধে দেশীয় ধর্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতরাও যে ব্যবস্থাদি দিয়াছিলেন, তাহা সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী একটি পুস্তিকায় (১২ই ফাল্গুন ১২৯৭) সংকলন করেন।

দুই অঙ্কের প্রহসন। সূচনায় কৈলাস পর্বতে মহাদেব, দুর্গা ও নারদের কথোপকথনে 'হিন্দু সন্তানদের বিপদ নিবারণের' ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র তিলক। তাহার ব্যাজস্তুতিমূলক উক্তিতে 'পণ্ডিত প্রবর' নিতাইচাঁদ সাধুখাঁ, গবেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে কটাক্ষ করা হইয়াছে। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার প্রতিও বক্র দৃষ্টিপাত আছে। স্মৃতিরত্নের চতুষ্পাঠীতে সম্মতিবিষয়ক তর্কবিতর্ক উপভোগ্য। তর্করত্নের উল্টাপাল্টা বচন কৌতুকপ্রদ।[২৯] পণ্ডিতদের অর্থলালসা বিদ্রূপবিদ্ধ, রঙ্গিনীর আবৃত্তিতে সংস্কারক ও আন্দোলনকারীরা উপহসিত। বালিকাবধূর নিকট শয়নভীত রাধাকিশোরের চরিত্র রঙ্গপূর্ণ। অন্যান্য প্রহসনের ন্যায় এখানেও স্পষ্টবাদিনী ঝি প্রহসনকারের বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছে। একস্থলে ব্রাহ্মদের বাগ্‌ভঙ্গীর প্রতিও কটাক্ষ আছে।[৩০]

'সম্মতি-সঙ্কটে' ধারাবাহিক কাহিনী নাই। নক্‌শাটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি। নানাভাবে সম্মতি-বিষয়ক আইনের প্রতিবাদই লেখকের অভিপ্রেত ছিল। স্টার থিয়েটারে ১৮৯১ সনের ২১শে মার্চ 'সম্মতি-সঙ্কট' অভিনীত হয়। ইহাতে অমৃতলালের ভূমিকা ছিল না।

৯

অমৃতলালের পরবর্তী প্রহসন 'রাজা বাহাদুর' (সং—রং) ১২৯৮ সালে (বড়দিন ১৮৯১) প্রকাশিত হয়।* পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। অমৃতলাল প্রহসনটিকে বলিয়াছেন 'সং—রং' এবং পাত্রপাত্রীর পরিচয় দিতে গিয়া দিয়াছেন 'সঙের তালিকা'। প্রহসনটিতে মোট আটটি দৃশ্য আছে। প্রহসন শেষ হইবার পর পট-পরিবর্তন ও সাহেব-বিবির বড়দিনের নৃত্য-গীত।

'রাজা বাহাদুরে' মোটামুটি একটা কাহিনী আছে—এক লম্পট এবং মূর্খ বাঙাল জমিদার 'রাজা' খেতাব পাইতে চাহে। কলিকাতার এক ধূর্ত

২৯ 'পুত্রবৎ পরদারেষু লোষ্ট্রবৎ গোষ্ঠলীলয়া।
যঃ পশ্যন্তি সদা নিত্যং শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।'

৩০ একজন নিমন্ত্রিতা রমণী বলিতেছে—"তিনি বলে দিয়েছেন যে, সকল কথাতেই 'বোধ হয়' বলা উচিত, তা হলে সত্য-মিথ্যা কেটে গেল, সব কথা বলতে পারবে।"

* বষ্ঠ সং ১৩১১

ব্যক্তি এক দুর্দশাপন্ন মন্তপ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সেই জমিদারকে 'সনন্দ' দিবার ব্যবস্থা করিল। এমন সময় জমিদারের স্ত্রী দেশ হইতে আসিয়া পড়িয়া স্বামীকে নাকালের একশেষ করিল।

গাণিক্যধনের রাজা হইবার ব্যগ্রতা, মোসাহেবদের স্তাবকতা, ভট্টাচার্যের খনা ও ডাক হইতে উদ্ভট বচনসৃষ্টি, পাঁচী বাইজীর খুকিপনা ও মনসা ঠাকরুণের শাসানি রঙ্গকৌতুকের ঐকতান সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতচন্দ্র ও রসমঞ্জরী হইতে গাণিক্যধনের বাঙাল ভাষায় আবৃত্তিও বেশ হাস্তকর। 'সু-সংস্কারাপন্না স্বাধীনা বিদ্যাবতী' কালিন্দী ও তাহার 'সহুরে তুখোড়' স্বামী কালাচাঁদের উক্তিতে ব্রাহ্মদের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে—

'কালিন্দী। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর! আত্মাবল্লভ!
কালা। ভগিনি, সহধর্মিণী, হৃদয়-রঞ্জিনী, কালিন্দী! কল্লোলিনী!
কালিন্দী। ভ্রাতঃ, প্রেম দাও, প্রেম দাও!
কালা। ভগিনি, আঁচল পাত, আঁচল পাত।
কালিন্দী। প্রিয় ভ্রাতঃ, প্রাণপতি কি দিবে আমায়?
কালা। চল প্রিয়ে, প্রেম দিব ধামায় ধামায়।'

ব্লকম্যান ফিশকে দিয়া একবার কর্পোরেশনের কমিশনারদের উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করা হইয়াছে—

'Ah! God bless the Commissioners! How considerate they are for laying such a layer of sweet soft nine inches deep dust for my comfort. What a delicious cushion for my stone couch....Long live the Corporation!'

শেষ গানটিতে সাহেব বিবিরা যে 'Gala City-Ballad' গাহিয়াছে তাহাতেও মিউনিসিপ্যালিটীর অপকর্মের সমালোচনা আছে।

ফিশের চরিত্রটিতে শেক্সপীয়রের 'টেমিং অব দি শ্রু'র ক্রিস্টোফার স্লাই চরিত্রের, এমন কি, তাহার ভাষারও অনুকরণ আছে।[৩১] তবে ফিশের

৩১ Sly. 'Am I a Lord? and have I such a lady?
Or do I dream? or have I dream'd till now?
I do not sleep; I see, I hear, I speak...'
ফিশ। 'Am I a Lord? Then where is my Lady? Or do I dream? Or have I dreamt till now? I do not sleep—I see, I hear, I speak....'

হাস্যোদ্দীপক মৌলিক উক্তিও অনেক দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার' প্রহসনে (১৩০৭) 'রাজা বাহাদুর'কে অনুসরণ করিয়াছেন।

রাজা বাহাদুরে অমৃতলালের সর্বাধিক কৃতিত্ব— এতগুলি সঙের মুখে সার্থক ভাষা যোজনা। গাণিক্যধনের রসাল বাঙাল ভাষা, ব্লকম্যান ফিশের অনুপ্রাস-ঝঙ্কৃত ইংরেজী ভাষা, কালাচাঁদের তুখোড় সহুরে ভাষা, সভাপণ্ডিতের ছদ্ম-গম্ভীর ভাষা, মুসলমান খানসামার দক্ষিণবঙ্গের ভাষা, কালিন্দীর বক্রোক্তি-মুখর 'স্বাধীন' স্ত্রীলোকের ভাষা, মনসা ঠাকরুণের ক্ষিপ্তা স্ত্রীলোকের ভৎ'সনার ভাষা এবং প্রৌঢ়া পাঁচী বাইজীর আধ-আধ ভাষা হাস্যরসের নির্ঝর উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন ভাষা ও ভঙ্গীতে রচিত এগারখানি গানের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটিতেই অমৃতলালের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। মাঝে মাঝে উদ্ভট প্রসঙ্গের অবতারণায় হাস্যসৃষ্টি হইয়াছে। যেমন 'হাপ্‌সি-গঞ্জের মেমেরা বড়দিনে পেত্নীর নাচ নাচবে' বা 'ইংরেজটোলার মাছ, গরমির সময় পাহাড়ে হাওয়া খেতে গেছে, এখনও ফেরেনি।' মিউনিসিপ্যাল বাজারে গাণিক্যধনের কলা খাওয়ার মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিতটি প্রহসনকার বেশ সরসভাবেই দিয়াছেন।[৩২]

১৮৯১ সনের ২৫এ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে 'রাজা বাহাদুর' প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতলাল ব্লকম্যান ফিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিনয়ে এবং প্রহসনের রঙ্গরসাধিক্যে ইহা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'অনুসন্ধান' লিখিয়াছিলেন—

> 'অমৃতবাবুর সঙ্কলিত শেষোক্ত পুস্তকখানি [রাজা বাহাদুর] বেশ মজাদার। এরূপ হাস্যোদ্দীপক প্রহসন সচরাচর দেখা যায় না। অভিনয় দর্শনে আমাদের প্রীতি জন্মিয়াছিল।'[৩৩]

'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে'র ন্যায় সাহেবী কাগজে 'রাজা বাহাদুরে'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে যে বিস্তারিত প্রশংসা প্রকাশিত হয় তাহা হইতে অধ্যক্ষ ও

৩২ মনে হয় গাণিক্যধনের খেতাব-লোলুপতা কোন বাস্তবচরিত্রের অনুসরণে রচিত। কারণ, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'রাজা বাহাদুর লিখিবার পর কেহ কেহ নাকি তাঁহাকে গুলি করিবার ভয়ও দেখাইতে ছাড়েন নাই।'—মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ ('অমৃতময় অমৃতলাল' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

৩৩ অনুসন্ধান : ৩২এ শ্রাবণ ১২৯৯

নাট্য-পরিচালক অমৃতলালের সর্বতোমুখী মনোযোগের পরিচয় পুনরায় উপলব্ধি করিতে পারি—

"Both on Christmas Eve and on Christmas Day the Star Theatre was gaily decorated with banners, buntings, flowers and foliage, while coloured oil-lamps, Chinese lanterns, and devices in gas combined to increase the decorative effect. The new Christmas pantomime 'Rajah Bahadoor' was produced on both occasions to overflowing houses. The piece is well conceived and well executed. It abounds in jokes, puns, and happy hits at the topics of the day, while comic songs, dances and choruses are plentifully introduced. The rendition of the pantomime was accompanied with a continued roar of laughter from the auditorium. The scenes and dresses are excellent; the 'Municipal Market' scene with its meat, fish, fruit, stalls, etc., etc., and the illuminated *facade of G. E. Hotel* are specially good, and wonderfully realistic. Another new feature of the pantomime is the introduction of some English speeches and one English song. The piece is likely to draw crowded houses for some time to come."[৩৪]

১০

'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা'— ১২৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।* প্রথমে 'প্রস্তাবনা' ও শেষে 'পট পরিবর্তন'। মধ্যে রহিয়াছে ছয়টি দৃশ্য। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১।

'কালাপানি' রচনার কিছুকাল পূর্ব হইতে দেশে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে প্রবল

৩৪ The Indian Daily News. 28.12.1891

* ৪র্থ সংস্করণ ১৩০৬

আলোড়ন চলিতেছিল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব হিন্দুমতে বিলাত যাত্রা করা যায় কিনা এ বিষয়ে বহু পণ্ডিতের অভিমত লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে বিনয়কৃষ্ণ দেবের এক পত্রের উত্তরে তাঁহার মতামত বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন—

'শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ-সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না।'[৩৫]

'হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা' এই নাম হইতেই উপলব্ধ হয় যে, অমৃতলাল এবার আর ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহেন নাই। এই প্রহসনটিতে হিন্দুয়ানির ঠাট বজায় রাখিয়া 'সাহেব' হইবার মূঢ় প্রয়াসকে এবং বাঙালীর হুজুগপ্রিয়তাকে তীব্র বিদ্রূপ করা হইয়াছে। দুলালচাঁদ, সাধুরাম ও মাখনলালের হিন্দুমতে বিলাত যাত্রার অদ্ভুত পরিকল্পনা তিনকড়ি মামার শ্লেষপূর্ণ বাক্যের আঘাতে বার বার বিপর্যস্ত হইয়াছে। যেমন—

দুলাল। আমি একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি— যদি ঠিক হিঁদুমতে বিলাত যাওয়া যায় তাতে দোষ কি?

তিন। কি রকম, নামাবলীর পেণ্টুলেন পরে?

*　　　　*　　　　*

সাধু। এই ভারত-উদ্ধার করবার জন্যই তো আমরা বিলাত যেতে চাচ্ছি।

তিন। চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারের জন্যে তো বাবা গয়ায় গিয়ে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডি দিতে হয়, বিলাতে গিয়ে বাবা ভারতের পিণ্ডিটা কার পাদপদ্মে দেবে?

*　　　　*　　　　*

মাখন। স্বাধীনতা কাকে বলে তাতো জান না? খালি দাসত্ব করতে শিখেছ; এই যে ভারতবাসীরা বড় বড় চাকরী পায়না, দেখ দেখি তার একটা উপায় করে আসতে পারি কি না?

তিন। এ কথার আর আমার উত্তর নাই, চাকরী না করলে কি স্বাধীনতা বজায় থাকে!

স্বয়ং নাট্যকারই এখানে তিনকড়ি মামা সাজিয়া দেশের সামাজিক ও

---

৩৫ হিতবাদী : ২৭এ জুলাই, ১৮৯২ (বঙ্কিম-রচনাবলী, সাহিত্য-সংসদ সংস্করণ ২য় খণ্ড, পৃ ৯২৫) দ্রষ্টব্য।

আর্থনীতিক নানাবিধ সমস্যা পর্যালোচনা করিয়া মতামত দিয়াছেন ;[৩৬] দেশে বসিয়াই কিভাবে ব্যবসা বা কৃষিকর্ম করা যায় তাহা এই সকল মরীচিকা-লুব্ধ ভ্রান্তবুদ্ধি যুবকদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্তঃপুরে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাই দুলালের অন্তঃপুরে কাঁসারিপিসী, নাপতিনী প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া হিন্দুমতে বিলাতযাত্রার উদ্ভটত্বকে ধিক্কার দিয়াছে। কাঁসারিপিসীর গান ও ছড়া এবং নাপতিনীর গান ও কবিতা বেশ উপভোগ্য।[৩৭] কাঁসারিপিসীর 'বিবি হতে চল্লি নাকি ধন্নি মেয়ে তোরা' এবং নাপতিনীর 'টুকটুকে তোর পা দুখানি আল্‌তা পরাই আয়'— গান দুইটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ২য় দৃশ্যে নাপতিনীর ছড়া শুনিয়া কাঁসারিপিসী যে ছড়া বলিয়াছে তাহাও বেশ রঙ্গপূর্ণ—

'হ্যাঁলো ও পরামাণিকের বৌ, তোর মুখে দেখছি খুব মৌ। যেন দাশুরায়ের চেলা, ছড়া বল্লি মেলা। এদিকে বিবিরে যে জাহাজের জন্যে, হয়েছেন সব হন্যে। মুখে আর ভাত রোচে না, শাড়ীতে আবরু ঘোচেনা। আর কি মাথায় দেবেন ঘোমটা, সাহেবের বগল ধরে নাচবেন বিবিয়ানা থ্যামটা।'

ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের বিদায় ও বার্ষিকের লোভ তাহাদের অন্তঃসারশূন্যতা ও ভণ্ডামি প্রকট করিয়াছে। পণ্ডিতজীর বিচিত্র ইংরেজীতে হাস্যসৃষ্টি হইয়াছে। যেমন, 'বিট্ দি ফোর্ট উইলিয়ম— কেল্লা মার দিয়া', 'ডু অপেরা— যাত্রা কর'।[৩৮] মনে হয় এই বিচিত্র ইংরেজী, পণ্ডিত মহেশ ন্যায়রত্নের ইংরেজীকে কটাক্ষ করিয়া কল্পিত।* বাঙাল তর্কনিধি ও উড়িয়া অর্জুন ঠাকুর কৌতুকের মাত্রা অনেকখানি বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

তিনকড়ি যাহাকে 'নামাবলীর পেণ্টুলেন' বলিয়াছে সেই 'হিন্দুমতে সাহেব' হওয়া আসলে হুজুগ ছাড়া কিছু নয়। তাই তিনকড়ি যখন তাহাদের বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে ভিখারী-দমনের হুজুগ তুলিয়া দিল, তখন 'ভিখারী-দমন য়্যাজিটেশন' করিয়া ভারত-উদ্ধারের জন্য তাহারা ভারতেই রহিয়া গেল!

৩৬ পরবর্তীকালে 'বিশ্বকর্মা পূজা', 'প্রজানীতি' প্রভৃতি প্রবন্ধে অমৃতলাল দেশের যে সকল গুরুতর সমস্যা লইয়া সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, 'কালাপানি'তেই তাহার সূত্রপাত।

৩৭ কথায় কথায় কবিতা বলার ধরণ দীনবন্ধুর 'লীলাবতী'র অনুরূপ।

৩৮ পণ্ডিতের গবেষণাও কৌতুকপ্রদ—'ঐ লণ্ডন হচ্ছে টেমস নদীর তীরে, আর বাল্মীকির তপোবন তো জানই, তমসা নদীর তীরে ছিল, তখনকার তমসাকে এখন টেমস্ বলে।'

* মহেশ ন্যায়রত্নকে বিদ্রূপ করিয়া রচিত রস-রচনা 'বিরাট বৃহস্পতি' অমৃত-গ্রন্থাবলীর ৪র্থ ভাগে মুদ্রিত আছে।

প্রহসনটিতে গান রহিয়াছে এগারটি। প্রত্যেকটি গানেই অমৃতলালের বিশিষ্ট রচনারীতির ছাপ রহিয়াছে।[৩৯] শেষ গানটিতে বাঙালী-চরিত্রের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত আছে—

'আমরা খালি হুজুগ চাই হুজুগ চাই।

... ...

দেশ হাজুক আর মজুক,
আমবা বুঝি কেবল হুজুগ,
হুজুগ বিনে বুজরুকি আর চলবার চারা নাই॥
মিছে শাস্ত্র ধর্মাধর্ম, বাণিজ্য আর শিল্পকর্ম,
শর্মাদের মর্মকথা নামটা জাহির ভাই।...'

গানগুলিতে তিনি ব্যঙ্গচ্ছলে প্রভূত শিক্ষা দিয়াছেন।

স্টার থিয়েটারে ১৮৯২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর 'কালাপানি' প্রথম অভিনীত হয়। এই প্রহসনে অমৃতলাল কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নাই।

পূর্বের 'সম্মতি-সঙ্কট' প্রহসনে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রের প্রতি কটাক্ষ থাকা সত্ত্বেও অমৃতলালের তত্ত্বাবধানে 'কালাপানি' কিরূপ অভিনয় সাফল্য লাভ করিয়াছিল, সে বিবরণ তাঁহারা দিয়াছেন প্রথম অভিনয়ের দুই দিন পরেই—

'The pavilion was filled by an unprecedentedly large audience, the principal attraction being the first rendering of Kalapani, which, as was to be expected, was a thinly veiled fling at some of the leaders of the Sea-voyage Movement. The piece bristled with glistening gems, vocal and verbal, and the mounting was thoroughly characteristic of the Star. The boys and girls, affecting European dress and European games, formed an interesting group, while the procession of tourists, about to start for Europe on strictly orthodox principles, presented the funniest spectacle of all.'[৪০]

৩৯ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, 'সঙ্গীতগুলি স্বরচিত' ('বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস,' পৃ ৪২১)

৪০ The Indian Mirror : 27.12.1892

অমৃতলালের সামাজিক নক্শা 'বাবু' ১৩০০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।* দুই অঙ্কের প্রহসন। প্রথম অঙ্কে চারিটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক আছে। নাট্যারম্ভের পূর্বে আছে 'নান্দী'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯১।

প্রহসনটিতে ইংরেজী আদব-কায়দায় সুপটু দেশহিতৈষী বাবুদের এবং সমাজ-সংস্কারে ও স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনে মত্ত ভণ্ড ও ভীরু সংস্কারক বাবুদের লক্ষ্য করিয়া প্রচণ্ড ব্যঙ্গ বর্ষিত হইয়াছে। দেশসেবক বাবুরা কিভাবে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলিয়া সেই টাকায় নিজেদের 'অন্নকষ্ট' দূর করেন তাহাও নির্মম শ্লেষে বর্ণিত। ভারত-উদ্ধারের নামে কাগজ ছাপাইয়া নেতাদের আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদও প্রচুর নিন্দিত। যে সকল সংস্কারক বাবুরা আপন কন্যাকে দীর্ঘকাল অনূঢ়া রাখিতে কুণ্ঠিত নহেন এবং যাঁহাদের 'পবিত্র দায়িত্ব' কেবলমাত্র বিধবাদের বিবাহবিধানে, তাঁহাদের প্রতি প্রহসনকারের বিদ্রূপের আঘাত মাত্রাতিরিক্ত। দেশহিতৈষী বাবু ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যালের বক্তৃতার দ্বারা ভারত উদ্ধারের প্রয়াস যথেষ্ট উপহসিত। পূর্ববর্তী প্রহসন 'কালাপানি'তেও ষষ্ঠীবাবুর 'লেকচারে'র উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে।[৪০ক] এই ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যাল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইঙ্গিত করিয়াই পরিকল্পিত।[৪১]

ষষ্ঠীর লেকচারের ভাষা ও বক্তব্যে কেন যে প্রহসনকারের বিদ্রূপ অত্যন্ত মর্মঘাতী হইয়াছে তাহা বোঝা যায় উভয়ের বক্তৃতা পাশাপাশি দেখিলে।

* ৪র্থ সংস্করণ ১৩০৪

৪০ক অমৃতলালের বিদ্রূপাত্মক প্রহসনগুলিতে ব্যঙ্গ সর্বত্র সুপ্রকট। 'স্যাটায়ার' উদ্দেশ্যমূলক শিল্প বলিয়া ভাষার আবরণে বিদ্রূপকে আচ্ছন্ন করা চলে না। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের মন্তব্য যথার্থ— 'অন্য শিল্পের মৌলিক প্রেরণা যাহাই হোক, মূলটা গুপ্ত থাকে, কিন্তু ব্যঙ্গের মূলটা যে শুধু মুখ্য তাহাই নয়, মূলটাকে অনেক সময়েই গোপন রাখা চলে না।' (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় : 'বাংলার লেখক' পৃ ২৩)

৪১ পরবর্তীকালে বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত নির্বাচনদ্বন্দ্বে পরাজিত সুরেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া অমৃতলাল লেখেন— 'বহুদিন পূর্বে লোক তোমায় যখন জয় জয় করিয়াছে, আমি লীলাচ্ছলে তোমায় ব্যঙ্গ করিয়াছি...' ('বিসর্জন'— মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০)। সুহৃদ সুরেন্দ্রনাথের এই সময়কার নির্বাচনীসভায় অমৃতলাল বক্তৃতাও করিয়াছিলেন।

জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে (বোম্বাই, ১৮৮৯) সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার শেষাংশ ছিল এইরূপ—

'...if I am permitted to take a glance into the future (hear, hear) and to anticipate the verdict of history, this, I will say with confidence— that in the coming times no English name will occupy a higher, a worthier, a more affectionate place in our grateful recollections than that of Charles Bradlaugh (loud cheers that continued for some minutes). ...when...our prayer is pressed by such a man (cheers), there can come but one response which, I am confident, will be in accord with the great traditions of the English people and will serve to consolidate the foundations of British rule in India...'

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে ষষ্ঠী লেকচার অভ্যাস করিতেছে—

'If I live— if I am permitted to breathe the air of this terrestrial globe— if the steam that animates this corporeal mechanism is not exhausted— if the scarlet fluid called blood flows in my veins— if pulsation remains regular in my radial artery,— then I promise you— I give you my most solemn assurance— Ladies and Gentlemen— with all the emphasis I can command, that I will shake the Empire to its very foundation.'

দরিদ্র গ্রাম্য মণ্ডলের সহিত ষষ্ঠীর 'সভ্যতাপূর্ণ' কথোপকথন এবং বিধবা মায়ের মাসহারার টাকা কাটিয়া লওয়ার প্রসঙ্গে প্রহসনকারের অন্তরের জ্বালা তিক্ত বিতৃষ্ণার রূপ লইয়াছে। ভারত-উদ্ধারের সমস্যা যে কত বিচিত্ররূপে সমাজের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে তাহার বাস্তব চিত্র এ প্রহসনে ফুটিয়াছে। স্কুলের ছাত্রদের নিকট তখন হইতেই স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়াইয়াছে উচ্ছৃঙ্খলতা। নেতারা প্রকারান্তরে ছাত্রদের সেই উচ্ছৃঙ্খলতার পথে টানিতেছেন। ইহারই প্রবল প্রতিবাদ দেশের সাধারণ কেরাণী গৃহস্থের প্রতিনিধি গোবিন্দবাবুর মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে। বালক ঘনশ্যাম তাহার পিতৃবন্ধু গোবিন্দবাবুকে বলিতেছে—

'...আমরা অমন মাষ্টারের বকুনির তোয়াক্কা রাখিনে, এক কথা বল্লে অমনি ঝাঁ করে নাম কাটিয়ে যাব, আমাদের ক্লাসে ইউনিটি আছে, সকলে এককাট্টা হয়ে মাষ্টারকে একদিন ছুটীর পর রাস্তায় খুব ঠ্যাঙ্গানি দেব, তারপর গিয়ে ঝাঁ করে ষষ্ঠীবাবুর স্কুলে ভর্তি হব, তিনি বলেছেন, আমাদের মতন মর‍্যালকরেজওয়ালা ছেলে পেলে এক ক্লাশ উপরে ভর্তি করবেন...।'

অমৃতলাল পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে আতঙ্কিত হইয়া ছাত্রসমাজের যে চিত্র অঙ্কন লেন, আজ 'ভারত-উদ্ধারে'র পরে তাহা যেন আরও ভয়াবহ সমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন— 'নাট্যকার এখানে ভবিষ্যদ্‌বক্তা।'[৪২]

আমাদের তৎকালীন 'ভারত-সন্তান'দের শূন্যগর্ভ দেশপ্রেম, মাতার প্রতি ষষ্ঠীর উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে—

'...দিবারাত্রি আপনার মার ভাবনা ভাবতে গেলে ভারত-মাতার কাজ হয় না; আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, মায়া, এনার্জী, য্যাজিটেসন, চাঁদা-রোজগার এখন সবই তাঁর জন্য; ভাবত-মাতা বই আর আমার মা নাই, এখন আমি ভারত-সন্তান।'

এইসঙ্গে 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মদের সর্ববিধ আতিশয্যকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে প্রবলভাবে। পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্ম সংস্কারক কন্দর্পকান্তকে সং সাজাইবার জন্য প্রহসনকার তাহার চাপকানে জুতার কালি পর্যন্ত বুরুশ করিয়া দিয়াছেন! বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে চরম বিদ্রূপ করা হইয়াছে বৃদ্ধা আজিমাকে কন্দর্পকান্তর বিবাহে প্ররোচনা দেওয়ার প্রসঙ্গে। ব্রাহ্মদের বাগ্‌ভঙ্গী ও ভাবভঙ্গী লইয়াও চূড়ান্ত ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের ভ্রাতা-ভগ্নী সম্বোধন লইয়া 'স্বামী-ভ্রাতা' ও 'ভগিনীকে বিবাহ', তাহাদের 'প্রেমাশ্রু বিসর্জন', তাহাদের হাসিমাত্রকেই 'অশ্লীল' বিবেচনা করা, তাহাদের 'অনুতাপ' করা, স্ত্রীকে 'স্বামিনী' বলা প্রভৃতির হাস্যকরত্ব 'সংস্কারক' ও 'ধর্মধ্বজ' বাবুদের কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। 'বৈজ্ঞানিক বাবু' অশনিপ্রকাশের বৈজ্ঞানিক কথাবার্তাও বেশ হাস্যকর। অশনিপ্রকাশ, দয়িতদলনী, ক্ষমাসুন্দরী, সৌধ-কিরীটিনী, শীলদা প্রভৃতি নামও সরস ও তাৎপর্যপূর্ণ।

৪২ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃ ৩৫৯

শেষ দৃশ্যে আপন স্ত্রী নীরদাকে মাতাল সেলারের নিকট বিপন্না অবস্থায় ফেলিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতাকামী ষষ্ঠীর অন্যান্য সংস্কারকদের সহিত পলায়নের মধ্য দিয়া প্রহসনকার ইহাদের আন্দোলনের ভণ্ডামি ও চারিত্রিক ভীরুতা সুপ্রকট করিয়াছেন।* এই অবস্থায় ভাই বাঞ্ছারাম বলিতেছে—'অনুতাপ করুন, অনুতাপ করুন, বিবাদে প্রয়োজন নাই, অহিংসা পরমো ধর্ম'...ষষ্ঠী বলিতেছে—'আমি য়্যাজিটেশন করবো, টাউন হলে মনষ্টার মিটিং কন্‌ভিন করবো, সমস্ত কাগজে করেসপণ্ডেন্স লিখব...।'

'কালাপানি'র মত এই প্রহসনেও নাট্যকারের আবির্ভাব হইয়াছে তিনকড়িমামারূপে। প্রথমে তাহার উক্তিতে রঙ্গব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু শেষ দৃশ্যে তাহার ভর্ৎসনা ব্যক্ত হইয়াছে তীব্রতম ভাষায়। এই প্রহসনের প্রকৃত বক্তব্য সেইখানেই—

'যতদিন না প্রাণ অপেক্ষা মানকে মূল্যবান জ্ঞান করবে, ততদিন কলঙ্কিত জিহ্বায় স্বাধীনতার কথা উচ্চারণও করো না! বুঝতে পাচ্ছ কি,— সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী, একতা, এসব তোমাদের জিভ ছাড়িয়ে প্রাণে পৌছায়নি; ... কেবল হুজুগ, কেবল সস্তায় নাম বাজান, কেবল নীচ, সঙ্কীর্ণ, আত্মস্বার্থ-সিদ্ধির নামান্তর মাত্র!'[৪৩]

'বাবু'তে গান আছে দশটি। তন্মধ্যে স্বাধীন ও সভ্য মহিলাদের, সমাজ-সংস্কারকদের পত্নীদের ও ছাত্রদের গানে ব্যঙ্গ সর্বাধিক।

স্টার থিয়েটারে ১৮৯৪ সনের ১লা জানুয়ারী (১৮ই পৌষ ১৩০০) 'বাবু' প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতলাল তিনকড়িমামার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া

* 'মেয়ে মনষ্টার মিটিং' প্রহসনের শেষের দিকেও এইরূপ ব্যাপার আছে। সেখানে উন্নতবাবু তাঁহার স্ত্রী সৌদামিনীকে জেমস, ফ্রেডেরিক ও পীটার নামে তিনজন গোরাসৈন্যের হাতে ফেলিয়া দলবলসহ পলায়ন করিয়াছিলেন! সৈন্যেরা 'That which is not won by swords',—সেই সৌদামিনীকে, তাহার 'treacherous, bloody, coward' স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেল। দ্রঃ 'বাঙ্গালা নাটকে ভাবের মিলন', শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র: বঙ্গবাণী, পৌষ ১৩৩০।

৪৩ দেশের বর্তমান অবস্থায়ও তিনকড়িমামার অনেক উক্তি ভবিষ্যদ্বক্তার মত। যখন বাঞ্ছারাম বলিতেছে, 'সত্যমেব জয়তে', 'সত্যমেব জয়তে', তখন তিনকড়ি বলিতেছে— 'ফলেন পরিচীয়তে', 'ফলেন পরিচীয়তে'!

প্রহসনের লিখিত বিদ্রূপগুলি 'বাবু'দের উদ্দেশে অভিনয়েও ব্যক্ত করিয়াছিলেন।[৪৩ক]

দর্শকসমাজে 'বাবু'র অভিনয় বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। 'অনুসন্ধান' পত্র অভিনয়ের সমালোচনা করিতে গিয়া লেখেন—

"সম্প্রতি 'বাবু' সামাজিক রঙ্গচিত্র স্টার থিয়েটারে প্রদর্শিত হইতেছে। উক্ত রঙ্গভূমির সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় 'বাবু'র ঐ রঙ্গচিত্র আঁকিয়াছেন। বসুজ মহাশয়ের ওস্তাদী হাত 'বাবু' চিত্রে প্রস্ফুটিত। কি বাবুই আঁকিয়াছেন তিনি! সজীব জীবন্ত রঙ-বেরঙের বাবু— বড় সুন্দরই আঁকা হইয়াছে। মেলতায় ফটোগ্রাফ— উপরে যেন তারই রঙ ফলান। দেখিতে দেখিতে বিস্মিত হইতে হয়, ছবি নয়— যেন জীবন্ত সত্য দেখিতেছি বলিয়াই মনে হয়।...

বাহাদুরী স্টার রঙ্গকর্তাদের। এমন কেতাদোরস্ত শিক্ষা,এমন পরিপাটী পাত্রাপাত্র নির্বাচন, রঙের সঙের সঙ্গে এমন সুন্দর শিক্ষা— বাস্তবিকই অভিনব।

হইতে পারে, দুই একস্থলে রঙের চটক বেশীমাত্রায় পড়িয়াছে, এক-আদ স্থল অতিরঞ্জিতও হইতে পারে; স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত ভাবেরও ছায়া পড়িতে পারে; কিন্তু তবুও—তবুও 'বাবু' সহস্রগুণে দেখিবার মত হইয়াছে।"[৪৪]

৪৩ক অভিনয়-বিজ্ঞাপনেও অমৃতলাল 'বাবু'দের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া দিয়াছিলেন—

"The Babu—Political
The Babu— Ultra-Religious
The Babu— Reformer
The Babu— Scientific
The Babu— Ultra-moralist
The Babu— Famed. [১১ তারিখ হইতে বিজ্ঞাপনে 'Tamed']

The Babu : —Who doesn't know what he is."
(The Amrita Bazar Patrika, 4.1. 1894)

৪৪ 'অনুসন্ধান' : ১৫ই ফাল্গুন ১৩০০। 'বাবু' কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা কয়েকমাস পরে (১৫ই ভাদ্র ১৩০১) 'অনুসন্ধান' হইতে পুনরায় জানিতে পারি— 'অমৃতবাবুর অমৃতময় লেখনীপ্রসূত সেই 'বাবু'র অভিনয় পূর্বের ন্যায় সতেজে চলিতেছে।... এরূপ বর্ষার সময় ষ্টার রঙ্গমঞ্চে যে প্রতি অভিনয়-রাত্রিতেই লোকে লোকারণ্য হয়, ইহা থিয়েটার কোম্পানীর পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।'

পরবর্তীকালে যখনই স্টার মঞ্চে 'বাবু'র অভিনয় হইয়াছে, তাহা দর্শকপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনন্দিত হইয়াছে। ১৮৯৫ সনের ২৮এ ডিসেম্বর 'বাবু'র অভিনয় সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' লেখেন—

"On Saturday night the farcical play 'Baboo', the best of its kind that has ever appeared on the Bengali stage, occupied the board of the Star Theatre, and drew a full house."[৪৫]

'বাবু' প্রহসনের মর্মগত বাণী অন্য প্রদেশবাসীর নিকট প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই মনীষী হরিনাথ দে ১৯০৯ সনে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি-সম্পাদিত 'হেরাল্ড' পত্রে ইংরেজীতে 'বাবু'র অনুবাদে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। গানগুলির অনুবাদেও হরিনাথ দের কৃতিত্ব অসামান্য ছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিই—

অমৃতলালের—

'ঠান্‌দি তোমায় সাজাব লো কনে।
অতি যতনে যত এয়োগণে ॥...'

হরিনাথ দের অনুবাদে হইয়াছে—

'O granny dear ! We've come here
To deck thee as a buxom bride !
With every care, we damsels fair
We, whose husbands have not died !'

১৯১১ সনে বোর্ড অব একজামিনারস্‌-এর সুপারিণ্টেনডেণ্ট নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-অনূদিত 'The Babu (A Bengali Society Farce)' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয় পাদটীকাগুলি হরিনাথ দে-ই লিখিয়া দেন।[৪৫ক] এই অনুবাদ পাঠ করিয়া অযোধ্যার সীতাপুর হইতে পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্তশর্মা হিন্দীতে 'বাবু' অনুবাদের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অমৃতলালকে এই পত্রটি (অপ্রকাশিত) লেখেন :

৪৫ The Indian Daily News : 31.12.1895

৪৫ক ভূমিকায় নিবারণচন্দ্র লিখিয়াছেন— 'I am also indebted to Mr. Harinath De, Librarian of the Imperial Library, for some of the footnotes and for some valuable hints which have saved me from error'

"Sitapur, Oudh
The 28th October, 1912

Dear Sir,

'The Babu' is so very highly funny, interesting and instructive a drama that it is a pity that our Hindi Literature should be kept any longer destitute of such a nice book. I beg the favour of your kindly according me, as you did in the case of Babu Nibaran Chandra Chatterjee, permisson to make an adapted translation of your fine book.

Yours sincerely,
(Pandit) Someswar Dutta Sharma
(B. A., F. A. I. A. M., Landowner and Rais)"

১২

অমৃতলালের 'একাকার' ('Social Chaos') প্রহসনটি ১৩০২ সালে প্রকাশিত হয়।* দেশের আর্থনীতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভেদ সংরক্ষণের আবশ্যকতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে প্রহসনটি রচিত হয়। দুই অঙ্কের প্রহসন। প্রথম অঙ্কে চারটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি গর্ভাঙ্ক। প্রথমে এবং শেষে গন্ধর্বলোক। প্রহসনটিতে গান আছে দশটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫।

অমৃতলাল দেখিয়াছিলেন, জাতিগত বৃত্তি ত্যাগ করায় বাঙালীর জীবিকা-সমস্যা ক্রমশঃ তীব্র হইয়া উঠিতেছে এবং চাকরির লোভে আত্মসম্মান বিসর্জন দিতেও সে কুণ্ঠিত হইতেছে না। আপন আপন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকার মধ্যে এ সমস্যার সমাধান আছে বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। তাই এ প্রহসনে তিনি জাতিবৈষম্য মানিয়া জাতিগত বৃত্তি অনুসরণের শিক্ষা দিয়াছেন।

'একাকারে'র প্রস্তাবনায় গন্ধর্বলোক। সেখানে প্রত্যেক প্রাণীই আপন স্বভাবধর্ম ও কার্য পরিত্যাগ করিয়া 'পরধর্ম' গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। পরে অবশ্য

* দ্বিতীয় সংস্করণ ঐ বৎসরই প্রকাশিত হয়।

তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজ নিজ প্রকৃতিতেই সন্তুষ্ট রহিল। এইভাবে সূচনাতেই রূপকে প্রহসনের বক্তব্য বিবৃত হইয়াছে।

অমৃতলালের অন্যান্য কয়েকটি শিক্ষামূলক প্রহসনের মত এখানেও গল্পের কোন ধারাবাহিক প্রবাহ বা অচ্ছিন্ন সূত্র নাই। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে জাতিগত বৃত্তিত্যাগী বাঙালীর জীবিকাসমস্যা ও চাকরিলিপ্সা বিভিন্ন দিক হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে। চাকরি-সম্বল বাঙালীসমাজের জীবন্ত আলেখ্য প্রহসনটিতে লক্ষ্য করা যায়। বড়বাবুর দাম্ভিকতা, কেরানীদের কর্মচ্যুতির ভীতি, কর্মপ্রার্থী উমেদারদের নির্লজ্জতা, সাহেবের পেয়াদার খাতির, ফিরিঙ্গি কেরানীর 'আভিজাত্য', কর্মপ্রার্থী শিক্ষিত যুবকের দেশসেবার বাগাড়ম্বর প্রভৃতি প্রহসনকারের বিদ্রূপের লক্ষ্য; আবার স্ববৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আত্ম-প্রত্যয়শীল রাধানাথ কর্মকার, নন্দু চামার ও তাহার সহকারীগণ তাঁহার সহানুভূতি ও প্রীতির পাত্র। কর্মচ্যুতির সংবাদে মুচিদের আনন্দের বিপরীত চিত্র ফুটিয়াছে গদাধর দত্তের অসহায় আর্তনাদে। হাতের কাজ না জানা কর্মহীন বাঙালীসন্তানদের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে প্রহসনকার সমাজের আর্থনীতিক দুর্দশার যে-ভয়াবহতা সার্থক ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছিলেন, আজ তাহা আরও মর্মান্তিক আকার ধারণ করিয়াছে। এ বিষয়ে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সমভাবাপন্ন।

রাধানাথ কর্মকার প্রহসনকারের মুখপাত্র। সে উচ্চশিক্ষিত হইয়াও জাতি-ব্যবসায় পরিত্যাগ করে নাই। তাহার উক্তিসমূহ আমাদের সতর্ক ও আত্মস্থ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।[৪৬] দাসত্বত্যাগ ও জাতিগত বৃত্তিগ্রহণই যে আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ তাহাই রাধানাথের মুখ্য বক্তব্য। নিজের সম্পর্কে সে বলিতেছে—

'এই গ্রামার ছেড়ে হ্যামার ধরেই ভাই আমার সাম্যভাব গিয়ে গ্রাম্যভাব এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছি।'

জাতিভেদের সমর্থনে অমৃতলালের যুক্তি রাধানাথেরই উক্তি হইতে জানিতে পারি—

'যেমন পরকালে তরবার জন্য তাঁতিকে ব্রাহ্মণের কাছে জোড় হাত করে

৪৬ রাধানাথ ও যাদবের কথোপকথনের সম্পূর্ণ দৃশ্যটি (১।৩) 'অনুসন্ধান' পত্র 'জাতীয়ত্ব' নামে মুদ্রণ করেন। (দ্রঃ অনুসন্ধান : ১৮ই মাঘ ১৩০১)

দাঁড়াতে হবে, তেমনি ব্রাহ্মণকেও ইহকালের লজ্জা নিবারণের জন্য তাঁতির দ্বারস্থ হ'তেই হবে ; প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মান আছে, জোর আছে। আমি প্রত্যেক জাতিকেই সম্মান করি, তবে কাক কাকের মধ্যেই সুন্দর, তিনি যদি ময়ূরপুচ্ছ পরেন, তবে আমি শ্রীদাঁড়কাকচন্দ্র রায় তাঁকে একটু ঠোকরাব।'

অমৃতলালের গভীর পর্যবেক্ষণক্ষমতা প্রহসনের প্রতিটি চরিত্রকেই বাস্তবতাপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। আফিসের বড়বাবু মধুবাবুর চরিত্রটি সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত উপহাস্য করা হইয়াছে। অধস্তন কর্মচারীদের নিগৃহীত করিবার আগ্রহ তাহার যেমন প্রখর, সাহেবের অনুগ্রহলাভের আকুলতাও তাহার তেমন প্রবল। অন্যান্য প্রহসনের ঝিয়ের মত এখানে লেখকের বিদ্রূপ ভৃত্যের মুখ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহার উল্টাপাল্টা কথার ব্যঙ্গ মধুবাবুর মর্মে গিয়া বিঁধিয়াছে।

মাঝে মাঝে রঙ্গকৌতুকের অবতারণা করিয়া সমস্যার গুরুভার লাঘব করা হইয়াছে। নিমতলার স্নানের ঘাটে ধোপা-বৌ ও কলু-বৌয়ের রসকলহ এবং কায়েত-গিন্নীর বক্রোক্তিক্ষেপ বেশ উপভোগ্য। পুলিশকোর্টে বিচারের প্রহসনটিও খুব জমিয়াছে। আসামীদের স্পষ্টবাদিতায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভণ্ডামির মুখোস খসিয়াছে।

গানগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রহসনকারের মনোভাব-প্রকাশক। কোনটিতে ইংরেজীশিক্ষিত স্বধর্মভ্রষ্টদের প্রতি ব্যঙ্গ, কোনটিতে দাসত্বের প্রতি ধিক্কার আবার কোনটিতে বা জাতিভেদ ঘুচাইয়া সব একাকার করিবার প্রয়াসের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

জাতিভেদ আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবল হইয়াছিল। মধুসূদনের প্রহসন দুইটিতে (১৮৬০) ইহার আভাস আছে।[৪৭] রাজনারায়ণ বসু জাতিভেদের সমর্থক ছিলেন। 'একাকার' প্রহসনটি তাঁহাকে উপহার প্রদান করিতে গিয়া অমৃতলাল একটি পত্র তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। পত্রটিতে 'একাকার' রচনার উদ্দেশ্য তিনি নিজেই বিবৃত করেন। পত্রটি এই—

৪৭ 'একেই কি বলে সভ্যতায়' নব বলিতেছে— 'জাতভেদ তফাৎ কর', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র ভক্ত বলিতেছে— 'আমি শুনেছি যে কলকেতায় সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।'

"দেব,

দেবদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটেনা, কিন্তু অতি পাপীরও দেবপূজায় অধিকার আছে। তাই যিনি বঙ্গভাষার অমৃত-সরসীতে শুভ্র শতদল সৃজন করিয়া তাহার হার গাঁথিয়া নিজ কণ্ঠ শোভিত ও সৌরভে দিক আমোদিত করিয়াছেন উহাতে আজ সেই সরসী-কূল হইতে একটি ক্ষুদ্র ঘেঁটু ফুলে পূজা করিতে এই দীনহীনের বড় সাধ হইয়াছে। এই ইচ্ছার আকস্মিক হেতু আর একটি— এই মাত্র 'দাসী' নামক একটি পত্রিকা খুলিয়াই দেখিলাম যে আপনার আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি বিবরণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম কথাটি বহুদিন পূর্বে ভাগলপুরে পূজনীয় রামতনুবাবুর সহিত জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করিয়া মহাশয়ের তর্ক। যে ঘেঁটু পুষ্পের কথা বলিয়াছি তাহা সেবক-প্রণীত একখানি কৌতুক-নাট্য, নাম 'একাকার'— উদ্দেশ্য জাতিভেদ রক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন।

ক্ষুদ্র নাটকের মধ্যে সংসারের অতবড় একটা কথার বিস্তার তর্ক ও শেষ মীমাংসা অসম্ভব। বিশেষতঃ নাট্যশালার অধ্যক্ষতা আমার কার্য, অভিনয় আমার নাটকের প্রথম প্রয়োজন। প্রায়ই আমাকে অতি শীঘ্র লিখিতে হয়। এমন কি এক এক দৃশ্য লিখিয়াই অভিনয়-শিক্ষার জন্য রঙ্গমঞ্চে প্রেরিত হয়।...এই সব কারণে অনেক মনের কথা 'একাকারে' খুলিয়া বলিতে পারি নাই, যাহা কিছু হইয়াছে আপনাকে দেখাইতে ইচ্ছা হইল। বোধ হয় এ ইচ্ছার সঙ্গে একটু আত্মগরিমা হৃদয়ে অজানিতভাবে লুক্কায়িত আছে। বহু দর্শনে আপনি এক প্রকার অন্তর্যামী হইয়াছেন, অবশ্যই মনোভাব কার্যে বুঝিতে পারিবেন।..ইতি ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ সন। দেবোপম চরিত্রে বিমোহিত

সেবক অমৃতলাল বসু।"[৪৮]

১৮৯৫ সনের ২৫এ ডিসেম্বর 'একাকার' প্রথম স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহাতে এই প্রহসনের শিক্ষামূলক দিকটির বিশেষ প্রশংসাই হইয়াছে। 'অনুসন্ধান' বিস্তৃত সমালোচনা করেন। তাঁহাদের মতে—

"'একাকার'— খৃষ্টমাসের প্যান্টোমাইম্— বড়দিনের পঞ্চরং— কিনা

৪৮ পত্রটি ১৩৬৯ সালের 'শারদীয় যুগান্তরে' প্রকাশিত হয়।

বড়দিনের আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-তামাসা বা সঙ-রঙ্গ। অর্থাৎ বড়দিনের ছুটিতে বাঙ্গালী বাবুরা থিয়েটার দেখিয়া একটু আমোদ-আহ্লাদ করিবেন, এই উপলক্ষেই 'একাকার' লিখিত।... কিন্তু শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন... সং-নাচের আমোদ ছাড়া, 'একাকারে' নূতন আরও কিছু আছে।... হিন্দুর পবিত্র প্রথা জাতিভেদ— জাতিগত কর্মভেদ— যাহার অরক্ষণে দিন দিন আমরা এই চরম দুর্গতির সীমায় নিপতিত হইতেছি, 'একাকারে'র রঙ্গচিত্রে তাহারই দোষগুণ বড় সুন্দররূপে চিত্রিত।... 'একাকার' উপদেশমূলক অথচ আকর্ষক— উহা দেখিতে দেখিতে মুখ প্রফুল্ল ও হাস্যময় হয়, অথচ ভাবিতে গেলে অশ্রু অনিবার্য হয়। হাস্যামোদের ভিতর অশ্রুর এমন অন্তঃশীলা গতি— কে কোথায় দেখিয়াছ বল দেখি? আমোদের সঙ্গে এমন অন্তস্তলস্পর্শী শিক্ষা— বল দেখি, কোথায় কবে পাইয়া থাক?"[৪৯]

'কিন্তু'— 'অনুশীলন ও পুরোহিত' পত্রের মন্তব্য— 'এরূপে অভিনয় দেখিয়া যে বাঙ্গালীর চৈতন্য হইবে, প্রহসনকর্তার যদি এরূপ মনে থাকে তবে তাহা ভুল। চিরপদানত চাকুরে বাঙ্গালী প্রত্যহ আপীষে বসিয়া হয়তো এরূপ অভিনয় দেখিতেছেন। গ্রন্থকার কি সেই অসাড় প্রাণে চৈতন্য জন্মাইতে পারিবেন? তবে আমাদের সমাজকলঙ্ক অকীর্তিগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকা আবশ্যক।'[৫০]

১৩

অমৃতলালের 'বৌমা' নামক 'সামাজিক নক্সা'টি প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালে। দুই অঙ্কের প্রহসন। প্রথম অঙ্কে ছয়টি ও দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক। গোড়ায় 'প্রস্তাবনা' ও শেষে 'উপসংহার'। গান আছে দশটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০।

এই প্রহসনে অমৃতলালের ব্যঙ্গের লক্ষ্য নভেল-পড়া রোমান্স বাতিকগ্রস্তা বধূ, শিক্ষাপ্রাপ্তা পুরুষভাবাপন্না স্ত্রীলোক, স্ত্রৈণ স্বামী, ভণ্ড সংস্কারক ও আতিশয্যদুষ্ট ব্রাহ্ম।

গৃহধর্ম বিসর্জন দিয়া যাহারা নভেলী প্রণয়ের কুহকে মগ্ন তাহাদের সতর্ক করিবার জন্য কিশোরীর চরিত্র পরিকল্পিত এবং অতিশয়িত। সে নিজেকে সর্বদা

৪৯ অনুসন্ধান— ১২ই মাঘ ১৩০১

৫০ অনুশীলন ও পুরোহিত— জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

উপন্যাস অথবা কাব্যের নায়িকা মনে করে। কখনো সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী, কখনো শেক্সপীয়রের ওফেলিয়া, কখনো মধুসূদনের প্রমীলা, কখনো বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিভিন্ন নায়িকা, আবার কখনো বা হেমচন্দ্রের 'ভারত-ললনা'! নায়িকাদের সম্পর্কে তাহার মতবাদও বিচিত্র। নিজের কিশোরী নামটি বদলাইয়া সে রাখিয়াছে 'উলাঙ্গিনী' (উলের মত অঙ্গিনী)।[৫১]

অমৃতলালের 'নিমাইচাঁদ' নামক নক্শাটিতে (১৮৮৯) অনিলকুমারীর উৎকট রোমান্সপ্রিয়তার মধ্যে কিশোরী চরিত্রের পূর্বরূপ লক্ষ্যগোচর হয়। নিমাইকে সে বলে—

'যদি কুন্দ না আস্ত, নগেন্দ্রের তা'র প্রতি ভালবাসা না হ'ত, তবে সূর্যমুখীর পতি-প্রেমে কার কি এসে যেত? নগেন্দ্রের সোনার সংসার না ছারখার করে দিতে পাল্লে বঙ্কিমবাবুর কি উপায় হত, আর পাঠক-পাঠিকারাই বা কি সুখ ভোগ করত? প্রতাপের প্রতি শৈলের আসক্তি না হ'লে সে ভট্টাচার্যের ব্রাহ্মণীর জন্য কার প্রাণ কাঁদত?'

কিশোরীর স্বামী বাবুরাম আর একটি ভ্রান্তবুদ্ধি 'সংস্কারক ভারত-সন্তান'। আসামে কুলী রমণীদের দুর্দশা, হিন্দুদের বিষম কন্যাদায়, দুর্ভিক্ষ, বিধবাদের ক্লেশ, বম্বে প্লেগ, চ্যারিটেবল সোসাইটি প্রভৃতি সর্ববিষয়েই তাহার সমান উদ্বেগ ও উৎসাহ।[৫১ক] 'র‍্যাডিক্যাল ইস্পিরিট' ও 'নোবল অ্যাসপিরেশন' লইয়া সে দেশের 'মঙ্গল' করে— রাজনীতির পাঠশালায় গিয়া 'পোলিটিক্যাল ট্রেনিং' লয়। বাহিরে সে 'ভারত-মাতা'র জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়, কিন্তু ঘরে স্ত্রীর চায়ের একটু বিলম্ব হইলে আপন মাতাকে শাসাইতে তাহার কুণ্ঠা হয় না!

পুরুষোচিত শিক্ষাপ্রাপ্তা হিড়িম্বার ক্রিয়াকলাপে অতি স্বাধীন স্ত্রীলোকের প্রতি অমৃতলালের স্বভাবসুলভ বিদ্রূপ পুনরায় বর্ষিত হইয়াছে। হিড়িম্বা

৫১ শেরিডানের 'দি রাইভাল্‌স্' (১৭৭৫) প্রহসনের নভেল-পাগল লিডিয়া ল্যাঙ্গুয়িশ সম্ভবত এই জাতীয় চরিত্রের উৎস। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করবো না' (১৮৭৭) প্রহসনের হেমাঙ্গিনীর ছায়া উলাঙ্গিনীতে এবং উলাঙ্গিনীর প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২) প্রহসনের রোমান্সরোগগ্রস্তা ইন্দুমতীতে লক্ষিত হয়।

৫১ক বাবুরাম চরিত্রে অমৃতলালের 'নিমাইচাঁদ' চরিত্রের ছায়া স্পষ্ট। নিমাইয়ের মনেও 'সম্পাদকের ভাবনা, ভারতের ভাবনা, রাস্তার ভাবনা, নর্দামার ভাবনা, পচাপুকুরের ভাবনা, ট্যাক্সের ভাবনা, রেলওয়ের ভাবনা, রঙ্গালয়ের ভাবনা, জর্মনি, প্রুসিয়া, নিউইয়র্কের ভাবনা।'

'হিন্দুদের পূজা'য় বকশিস দেয় না, কিন্তু 'ইদে' দেয়।[৫২] জুতা ছিঁড়িলে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে সে জুতা চিবায় কি না! স্বামীর মুখের মাপে জুতার মাপ স্থির করে![৫৩] স্বামী 'মাইরি' বলিলে অশ্লীলতার দায়ে তাহাকে কান মলিতে বাধ্য করে। স্বামীরা স্ত্রীকে 'মায়ের অধিক মান্য' করিবে, ইহাই সভ্যতা এবং কিশোরী প্রভৃতিকে সে এই সভ্যতাই শিক্ষা দেয়!

হিড়িম্বার স্বামী বামাদাসকে একটি প্রচ্ছন্ন হাস্যরসিক বলিয়া মনে হয়। হিড়িম্বা যতই তাহাকে শ্লেষাঘাত করে, সে ততই হাসির ছলনায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করে—মনে হয় স্ত্রৈণতা তাহার আত্মরক্ষার বর্ম মাত্র। বাবুরামের স্ত্রৈণতায় তাহার প্রতি ঘৃণা হয়, কিন্তু, বামাদাসের ক্ষেত্রে কিছুটা সহানুভূতি দেখা দেয়। বামাদাসের কথায় মাঝে মাঝে বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যচ্ছটা লক্ষ্যগোচর হয়। যেমন, হিড়িম্বাকে সে বলিতেছে—

> 'আমি কে—তুমি ছাড়া আমি কে? তোমার বলেই আমি সম্প্রদায়ের ভিতর কান্না তুলে দিয়ে বীররস প্রবেশ করিয়েছি।... পঞ্চাশের পাঁচ তুলে নিলে যেমন শূন্যটির কোন মূল্য থাকে না, তেমনি হিড়িম্বা, তুমি যদি অধমকে ত্যাগ কর, তা হলে আমি একটি শূন্যের মত পড়ে থাকব, তুমি ইউনিট, আমি জিরো।'

বাবুরামের মতিমামা তিনকড়িমামারই নামান্তর। প্রহসনকার মতিলালের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি ও রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মনায়কদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও পরবর্তীকালের ব্রাহ্মদের ভণ্ডামি ও আতিশয্যের প্রতি তাঁহার তীব্র বিরাগ এই প্রহসনে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাদের 'ভ্রাতা-ভগ্নী' সম্পর্ক লইয়াও কিছু কটাক্ষ আছে।[৫৪]

'বৌমা'য় অমিত্রাক্ষর ছন্দের ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার রঙ্গপূর্ণ অনুকরণ

৫২ এইদিক দিয়া হিড়িম্বা দীনবন্ধুর ঘটিরাম ডেপুটিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। ঘটিরাম বলিয়াছিল, 'আমি ব্রাহ্ম বটে কিন্তু হিন্দুদের মন রক্ষার জন্য ঠাকুর দেখতে গিয়ে ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম করি—'

৫৩ হিড়িম্বা যখন বলে, 'তোমার পায়ে এত জুতো ছেঁড়ে কেন? চিবও নাকি?' তখন বামাদাস বলে, 'হিড়িম্বা, ডিয়ার! সুরুচিসম্পন্ন প্রেম-আলাপ তোমা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।'

৫৪ বামাদাস সম্পর্কে কিশোরী বলিতেছে—

আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি নীতিগত কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে 'কড়ি ও কোমলে'র 'চুম্বন' ও 'বিবসনা' কবিতাদ্বয়ের ব্যঙ্গানুকৃতিতে। 'তপত কচুরী ঘিয়েতে ভাজে' গানটি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে' গানের প্যারডি।

ঝি, মুসলমান চাপরাশি, পুলিশ কনস্টেবল প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্রগুলির ভাষায় প্রহসনকারের অভ্যস্ত দক্ষতা লক্ষিত হয়। গানগুলিতে তাঁহার ব্যঙ্গপ্রবণ মনোভাব সুপরিস্ফুট।

১৩০৩ সালের ১১ই পৌষ (২৫. ১২. ১৮৯৬) স্টার থিয়েটারে 'বৌমা' প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং অভিনয় চলাকালীন প্রহসনের 'দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ' হইয়াছিল। অভিনয়ের দিন 'স্টেট্‌সম্যান' 'বৌমা' সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন—

> 'It is certain to be a success, and it is a pity that the house cannot accommodate a much larger audience. Infinite pains have been bestowed on this production.'[৫৪ক]

অভিনয় দেখিবার পর 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' স্টার থিয়েটার ও 'বৌমা' সম্পর্কে লেখেন—

> "On Friday night this theatre was artistically illuminated and decorated with garlands and flowers and leaves. A prettier picture has seldom been presented

"বামাদাসবাবু দেখলেই বলেন, 'ও পুঁটি,
তোকে করবই সভ্য,—
ভগ্নী-ভগ্নী তোর চোখ দুটি।' "

যে সকল মহিলারা সম্প্রদায়ভুক্ত হয় নাই, বামাদাসের মতে তাহারা 'সম্পূর্ণ ভগিনী' নহে, 'অর্ধভগিনী'। ১৮৭২ সনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'। ইহাতে তৎকালীন 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা (১৬ই আশ্বিন ১৭৯৪ শক) তাঁহার 'নীচতা ও বিকৃত স্বভাবের' সমালোচনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন— 'অবশেষে ব্রাহ্মসমাজের কপালে কি এই হইল?' পঁচিশ বৎসর পরেও একশ্রেণীর ব্রাহ্মের মধ্যে সেই আতিশয্যদোষ অমৃতলাল লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

৫৪ক The Statesman : 25.12. 1896

by a native theatre. A modern society farce, *The wife* was for the first time put on the stage before an exceptionally crowded audience and the piece went with spirit, the encores being numerous and enthusiastic."[৫৪খ]

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি 'বৌমা'র যে সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তীকালে তাঁহার 'সন্দর্ভ সংগ্রহ' নামক সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"ষ্টার থিয়েটারে মহাসমারোহে 'বৌমা' নামক একখানি নূতন সামাজিক নক্সার অভিনয় হইতেছে। নক্সাকার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু। বসুজ মহাশয় নক্সা আঁকিতে সিদ্ধহস্ত। রঙ্গসাহিত্যের এই অংশ এখন তিনিই রাখিয়াছেন। তিনিই এখন এই অংশের অধিনায়ক। অন্যান্য রঙ্গালয়ে যে সকল রঙ্গদার নক্সা অভিনীত হয়, তাহা অমৃতলালেরই আংশিক অনুকরণ, — তাঁহারই গ্রন্থের বিকৃত সংস্করণ,— কিংবা তাঁহারই অমৃতময়ী উক্তির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। সুতরাং কালে অমৃতলালেরই জয় জয়কার হইবে, — রঙ্গসাহিত্যের এই অংশে তিনি অমর হইবেন।

নক্সায় আখ্যায়িকার অংশ খুব কম থাকে। যখন যে চিত্রটির অবতারণা করা হয়, তখন সেইটিই একটি স্বতন্ত্র আখ্যায়িকা। অথচ সমগ্র গ্রন্থের সহিতও সেই চিত্রটির সূতার টান থাকে।··· চুল টানিলেই মাথা আসে। তুখোড় খেলোয়াড় অমৃতলাল, এক বৌমার চুলের মুঠী ধরিয়া সমাজের অনেকগুলি জীবকে নাচাইয়াছেন।··· বড় দুঃখ, এ ছবি দেখিয়াও আবার লোকে হো হো করিয়া হাসে!··· এই চিত্র সর্বত্র অতিরঞ্জিত নহে, ইহা ভাঁড়ের তামাসা নহে। ইহাতে শিক্ষা দীক্ষা ও তিতিক্ষার অনেক জিনিস আছে। ইহা নব্য বঙ্গের হৃদয়ের ইতিহাস, সাহেবপুচ্ছধারী বিকৃতমস্তিষ্ক বাঙ্গালী নরনারীর মানসিক তত্ত্ব, আর ভণ্ড সমাজসংস্কারক· 'অবলাবান্ধবরূপী' একটি অদ্ভুত জীবের নিখুঁত 'ফটো'।··· রঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গসমাজ অমৃতলাল বসুর নিকট অনেক আশা রাখে। তিনি এখন লোকশিক্ষকের পদে আসীন।··· একাধারে লোককে আমোদ দিতে দিতে শিক্ষা দেওয়া আর কাহারও পক্ষে তেমন সহজসাধ্য

৫৪খ The Indian Daily News : 29. 12. 1896

নহে।... সুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী দ্বারা বৌমার অভিনয় হইয়া থাকে।... সাজসজ্জা দৃশ্যপটাদি অতি পরিপাটী।... আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ইতিমধ্যেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ হইয়াছে।"[৫৫]

১৪

'গ্রাম্য বিভ্রাট' ('সামাজিক নক্সা') প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। দুই অঙ্কের প্রহসন। প্রথম অঙ্কে সাতটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে চারিটি দৃশ্য। অঙ্কারম্ভের পূর্বে 'সূচনা' ও প্রহসনের শেষে 'পট-পরিবর্তন'। গান আছে পনেরটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৬। প্রহসনটি 'দীঘাপতি-অধিপতি প্রমদানাথ রায়'কে উৎসর্গীকৃত। প্রমদানাথের 'স্নেহ-প্রণোদিত প্রশংসাবাদে উত্তেজিত হইয়াই' অমৃতলাল 'কিঞ্চিদধিক সপ্তাহকালের মধ্যে এই ক্ষুদ্র নাটকখানির কল্পনা ও রচনা সমাধা করিতে সমর্থ' হইয়াছিলেন।

প্রহসনটিতে লেখকের একটি 'নিবেদন' আছে। তাহা হইতে জানা যায়, 'অভিনয়-সন্দর্শনে বঞ্চিত অথচ পুস্তকপাঠে অনুরাগী' ব্যক্তিদের জন্য অভিনয় কালে পরিত্যক্ত 'অনেক বিষয়' 'পুস্তকে নিবদ্ধ' করা হইয়াছে এবং 'ঐরূপ বিষয় * তারকা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া গেল'।

গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটি প্রবর্তনের সূচনায় কয়েকটি শিক্ষিত গ্রামবাসীর মন হইতে গ্রামকল্যাণের চিন্তা দূর হইয়া কমিশনার হইবার জন্য তাহাদের ব্যক্তিগত লোভ ও জেদ গ্রামের নিরুপদ্রব শান্তি কিভাবে বিনষ্ট করিয়া দিল এ প্রহসনে তাহারই বাস্তব চিত্র অঙ্কিত। গোপাল, সত্য, উপেন, বিজয় প্রভৃতি শিক্ষিত গ্রাম্য যুবকের মতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অর্থ 'আপনা আপনি আপনাদের শাসন।' ইহাদের যুক্তিতে বিভ্রান্ত গ্রামের প্রাচীন অধ্যাপক রমানাথ স্মৃতিরত্নের উক্তি নাট্যকারের মনোভাব প্রকাশক। প্রহসনের মূল বক্তব্য ও বিজয় ও স্মৃতিরত্নের কথোপকথনে ব্যক্ত হইয়াছে—

'বিজয়।...এর ভিতর সব ভয়ঙ্কর কথা! গাঢ় পলিটিক্স!—ইলেকসন, পোলিং, ভোটিং! এ আপনাদের বিশেষ মঙ্গলের জন্য হয়েছে, এ সব আপনারা বুঝতে পারবেন না।

---

৫৫ 'সন্দর্ভ সংগ্রহ'—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (বৈশাখ ১৩০৫)। প্রহসনটির কোথাও কোথাও অমৃতলাল Moliere-এর *Les Precieuses Ridicules* হইতে কৌতুকসৃষ্টির ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন।

স্মৃতি। এ খুব চমৎকার বটে! যাদের মঙ্গল হবে, তারা তার কিছুই
বুঝবেনা, এমন অবোধগম্য মঙ্গল নিয়ে আমরা কর্বো কি?

বিজয়। এতে যদি আমরা ইচ্ছা করি, আপনাকেই মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এমন কি চেয়ারম্যান পর্যন্ত করে দিতে পারি।

স্মৃতি। ওহো হো হো সেই ভোটের পালা।...আমাদের এ গ্রামটির ভিতর ঈশ্বরেচ্ছায় আজ পর্যন্ত পরস্পরে বেশ মিল-জুল আছে, সখ করে ঝগড়া বিসম্বাদের বীজ এনে কেন গ্রামখানিকে ছারেখারে দেবে!'

কমিশনার ইলেকশনের ব্যাপার লইয়া গ্রাম্য যুবকদের তর্ক ও কলহ কয়েকটি দৃশ্যে বাস্তবতা মণ্ডিত রূপ লাভ করিয়াছে। 'দ্বন্দ্বে মাতনম্' প্রহসনের (১৯২৬) বীজ এখানেই পাই।

পূর্ববর্তী 'বৌমা' প্রহসনে যে 'পোলিটিক্যাল পাঠশালা'র ইঙ্গিত আছে, এখানে তাহার পূর্ণাঙ্গ ব্যঙ্গচিত্র দেখিতে পাই। গুরু মহাশয়ের 'পোলিটিক্যাল নামতা' ও 'পোলিটিক্যাল চাণক্যশ্লোকে'র অন্তর্নিহিত বিদ্রূপ মর্মভেদী। 'পোলিটিক্যাল থিয়লজি' শিক্ষাদাতা ইংরেজ পোলিটিক্যাল মাষ্টারের 'Grand Art of Salaaming'-শিক্ষণও উল্লেখযোগ্য! সাহেবদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া গুরুমহাশয়ের 'কলিযুগে গৌরাঙ্গই দেবতা' এই শ্লিষ্ট প্রয়োগ সার্থক।

মদ্যপ মাণিক একটি আপাতলঘু চরিত্র। তাহার অসংলগ্ন মদমত্ত উক্তির মধ্যে অনেক সারগর্ভ কথা আছে। চারটি দৃশ্যে কেবলমাত্র কয়েকটি নারী-চরিত্রের অবতারণা ও উক্তি প্রত্যুক্তি আছে। তন্মধ্যে তিনটি দৃশ্যের সহিত প্রহসনের মূল সমস্যার কোন যোগ নাই, তবে গ্রামের নারীজীবনের তিনটি দিক এই দৃশ্যত্রয়ে ব্যক্ত হইয়াছে। আর একটি দৃশ্যে মিউনিসিপ্যালিটির হাওয়া নারীচিত্তে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।[৫৬]

'গ্রাম্য বিভ্রাটে' অমৃতলালের পরবর্তী 'অবতার' (১৯০১) প্রহসনেরও বীজ লক্ষ্যগোচর হয়।[৫৭]

গ্রাম্য লোকেদের উচ্চারণ-বিকৃতি অনেক স্থলে হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে।

৫৬ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করিয়াছেন—'নারীর গালাগালির ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে অমৃতলাল দীনবন্ধু মিত্রের সমকক্ষ...'। ('বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', পৃ ৪২৩)

৫৭ 'ওরে গোউর গোউর বোল।...
বাগবাজারে বান ডেকেছে বদ্যিনাথে বিষম গোল।'

যেমন, সুঁটকি রতন (স্মৃতিরত্ন), সাবেনেস্ পিচকিরি (সাব ইনস্পেক্টর), নেপ ঠন্ ঠন্ গবানর (লেফটেনাণ্ট গভর্নর), কামিনীর ষাঁড় (কমিশনার) প্রভৃতি।

বিকৃত উচ্চারণের দ্বারা কৌতুকসৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রও 'লোকরহস্য' এবং 'মুচিরাম গুড়'-এ করিয়াছেন। যেমন ডিমরালাইজ— ধেমোরাজা, ফোর্টিনথ সেঞ্চুরী— ফুটন্ত সুন্দরী, পলিশড্ সোসাইটি— পালিশ ষষ্ঠী, লোচনচঞ্চলা— লুচি চিনি ছোলা ইত্যাদি। স্মৃতিরত্নের পৈতা ও টিকির প্রতি কটাক্ষ করিয়া পরাণের 'আপনার মতন তো আমার গলায় দড়ি মাথায় ল্যাজ নেই'... ইত্যাদি উক্তিও হাস্যোদ্রেক করে।

এই প্রহসনে অমৃতলালের বিদ্রূপের লক্ষ্য সেই সব স্বার্থপর অপদার্থ বাক্‌সর্বস্ব গ্রাম্য যুবকগণ যাহারা স্বায়ত্তশাসনের নামে নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় অথচ গ্রামকল্যাণের চিন্তা যাহাদের মন হইতে সম্পূর্ণ নির্বাসিত। সূচনার গানটিতে এই বিদ্রূপ সুপরিস্ফুট।

স্টার থিয়েটারে ১৮৯৮ সনের ১লা জানুয়ারী (১৮ই পৌষ, ১৩০৪) 'গ্রাম্য বিভ্রাট' প্রথম অভিনীত হয়।* অমৃতলাল এই প্রহসনে কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন তাহা নাট্যসংক্রান্ত কোনও গ্রন্থ হইতে জানা যায় না। তবে তাঁহার অভিনয়ে যে দর্শকরা অত্যন্ত আনন্দোৎফুল্ল হইতেন তাহা স্টেট্‌সম্যানের অভিনয়-সমালোচনা হইতে জানা যায়। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অমৃতলাল রমানাথ স্মৃতিরত্নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন।[৫৮] ৯ই জানুয়ারী দ্বিতীয় অভিনয় হয়।

৮ই জানুয়ারী স্টেট্‌সম্যানের বিবরণ হইতে দর্শকদের আগ্রহ সম্পর্কে জানা যায়—

'The proprietors owing to the heavy booking have provided extra seating accommodation.'

'গ্রাম্য বিভ্রাটে'র এই জনপ্রিয়তা ক্রমশ বর্ধিত হয়। ২১এ জানুয়ারী স্টেট্‌সম্যান সমালোচনাপ্রসঙ্গে লেখেন—

* ঘোলাকামারের ভূমিকায় দানীবাবু অবতীর্ণ হইতেন। তাঁহার অভিনয় দেখিয়া অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন— 'অর্দ্ধেন্দুর পরে ওর মত কমিক পার্ট করবার লোক ষ্টেজে নেই।' (বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু— হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ ৪২)

৫৮ 'সচিত্র শিশির'— বৈশাখ ১৩৩৪ দ্রষ্টব্য

"An overflowing house assembled at the Star Theatre last Sunday to witness Baboo Amrita Lal Bose's new piece entitled *Grammya Bibhrat* or 'Rural Sketches.' The object of the play is to portray village life, especially in connection with agitations for Local Self-Government. The production is singularly free from offensiveness and full of humourous situations. It is of a sketchy character, but with incidents that afford a capital evening's entertainment— a fact testified to by the loud and continued laughter that greets Mr. Bose each time he appears on the board."

'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ'-এর বিবরণ হইতে জানা যায়—

"*Grammya Bibhrat*, the latest farcical production of Mr. Amrita Lal Bose, was produced at this theatre on Sunday, when the house was unusually crowded, and as a satire it was fairly well put on. The acting left little, if anything, to be desired; whilst the majority of the *dramatis personae* executed their respective parts with a skill and grace which would compare favourably with anything of the kind of the native stage."[৫৯]

১৫

১৮৯৯ সনে কলিকাতা কর্পোরেশনের আটাশ জন কমিশনারের পদত্যাগের ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া অমৃতলাল 'সাবাস আটাশ' ('নক্সা') রচনা করেন। দুই অঙ্কের প্রহসন। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে সাতটি দৃশ্য। ইহা ভিন্ন গোড়ায় 'সূচনা' ও শেষে 'পট-পরিবর্তন'। গান আছে এগারটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত হিন্দু কমিশনারদের সংখ্যা হ্রাস করিবার

---

৫৯ The Indian Daily News : 11. 1. 1898

উদ্দেশ্যে বাংলার তৎকালীন লেঃ গভর্ণর স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জী একটি নূতন বিল উপস্থাপিত করিলে ১৮৯৯ সনের ১লা সেপ্টেম্বর আটাশ জন কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ব্যতীত সকল দেশীয় সংবাদপত্র পদত্যাগকারী কমিশনারদের অভিনন্দিত করেন।[৬০] ম্যাকেঞ্জী বিল ও কমিশনারদের পদত্যাগ দেশের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। সুরেন্দ্রনাথ নানাভাবে কাউন্সিলে বিলের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল' সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সংশোধিত হইলে উক্ত বিলের প্রতিবাদে ২২এ সেপ্টেম্বর টাউন হলে সভা হয়।[৬১] রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে এই সভায় কমিশনারদের পদত্যাগ অনুমোদিত হয়। পরদিনই অর্থাৎ ২৩এ সেপ্টেম্বর অমৃতলাল 'সাবাস আটাশ' স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ করিয়া পদত্যাগকারী কমিশনারদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ২৭এ সেপ্টেম্বর কাউন্সিলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ এ অভিনয়ের উল্লেখ করেন।[৬২] পদত্যাগকারী কমিশনারদের অন্যতম স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লেখেন,

> "রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁহার 'সাবাস আটাশ' প্রহসনে এই পদত্যাগ ব্যাপার ব্যঙ্গ-নাট্যসাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।"[৬৩]

৬০ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য— 'The action taken by the Commissioners in resigning their posts has no parallel in the annals of British rule in India.' (5.9.1899) 'বেঙ্গলী' 'The extinction of Local Self-Government in Calcutta' এই শিরোনামে সম্পাদকীয় রচনা করিয়া কমিশনারদের পদত্যাগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মন্তব্য করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পর্কে 'অনুসন্ধান পত্র লিখিয়াছেন—"এই সঙ্কট সমস্যার সময়, জানিনা কোন্ নিগূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের বশবর্তী হইয়া ভারতের জমিদার সভার মুখপত্র নামে আখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বিলের সমর্থন করিতে বসিয়াছেন।" (২৩ ভাদ্র ১৩০৬)

৬১ 'It was no school boys' gathering. The meeting represented the wealth, the culture, and intelligence of the town.' (The Bengalee : 23. 9. 1899)

৬২ The Bengalee : 30. 9. 1899 দ্রষ্টব্য

৬৩ 'স্মৃতি-রেখা'—দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, পৃ ১৫৪
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' সময় থাকিতে লর্ড কার্জনকে প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেন—"The resignation in a body of 28 prominent Indian Commissioners...ought to open the eyes of Lord

১লা সেপ্টেম্বর কমিশনারগণ পদত্যাগ করেন এবং ২৩এ সেপ্টেম্বর 'সাবাস আটাশ' অভিনীত হয়। মাত্র ২২ দিনের মধ্যে অমৃতলালকে রচনা ও অভিনয়-শিক্ষাদান সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। প্রহসনটিতে আনুপূর্বিক কোন কাহিনী নাই, সম্ভবতঃ তাহার সুযোগও ছিল না। কমিশনারদের পদত্যাগ অন্দরে-বাহিরে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কয়েকটি চরিত্রের উক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে। কমিশনারদের দ্বিধা ও সঙ্কল্প তাঁহাদের বাস্তবতাপূর্ণ কথোপকথনে প্রকাশিত। সহরতলির কমিশনার ভবানীর স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা প্রহসনকারের বিদ্রূপে বিদ্ধ হইয়াছে। ভবানীর প্ররোচনায় পদত্যাগ প্রত্যাহারে বাধ্য রসময়ের চিত্তদৌর্বল্য ও বিবেক-দংশন সু-অভিব্যক্ত। হাস্যরস সৃষ্টির জন্য বালিকা-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা হইলেও সেখানে অনঙ্গমঞ্জরী ও হেমন্তের সংলাপে পদত্যাগকারী কমিশনারদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। উকীল বটকৃষ্ণের অনুপ্রাস-ঝঙ্কৃত 'ইংরেজীর ছুঁচোবাজী' ও বিচিত্র বাংলা এবং 'লেডীস্কুলের' পণ্ডিত অনক্ষরানন্দ শব্দব্যোমের 'শব্দ-সন্ন্যাস' বেশ কৌতুকপ্রদ। রাজা বিনয়কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া রাজা বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রটি পরিকল্পিত। রাজার উক্তি সংযত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। কমিশনারদের উক্তিতে আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয় সুপরিস্ফুট। গানগুলি প্রহসনকারের অনেক বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। কয়েকটি গানে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ও লাইসেন্সের প্রতি কটাক্ষ, কমিশনারদের কার্যকলাপের প্রতি ইঙ্গিত, পদত্যাগ-প্রত্যাহারকারী কমিশনারকে ধিক্কার ও পদত্যাগী আটাশ জন কমিশনারের প্রশস্তি ব্যক্ত হইয়াছে। পদত্যাগপত্র-প্রত্যাহারকারী কমিশনারের কাজকে অমৃতলাল বিমলি-ঝির মুখ দিয়া 'ষাঁড়ের কাজ' বলাইয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন।

অমৃতলাল 'নসীপুর রাজকুলভূষণ' মহারাজা রণজিৎ সিংহকে 'সাবাস আটাশ' উৎসর্গ করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধনের জন্য কাউন্সিলে রণজিৎ সিংহ যে-'সৎসাহস, সুবিবেচনা ও সদাশয়তা' প্রদর্শন করেন তাহাতে অমৃতলাল মুগ্ধ হইয়াছিলেন।[৬৪]

Curzon to the danger of pushing his scheme of 'Municipal reform' in Calcutta against the unanimous sentiment of the rate payers of that city.' (১৮৯৯ সনের ১৪ই অক্টোবর বেঙ্গলী পত্রে উদ্ধৃত) ১৯০০ সনের ১লা এপ্রিল হইতে এই আইন প্রবর্তিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'A Nation In Making' গ্রন্থে মন্তব্য করেন—"It was the first of a series of reactionary measures." (p. 165)

৬৪ রণজিৎ সিংহ সম্পর্কে (ইনি একজন মনোনীত সদস্য) ২৩এ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ 'বেঙ্গলী'ও

১৮৯৯ সনের ২৩এ সেপ্টেম্বর 'সাবাস আটাশ' স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ঐ দিন অমৃতবাজারে অমৃতলাল যে অভিনয়-বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন তাহাতে 'Bravo ! 28 !'* সম্পর্কে বলা হয় 'A Local Flash Light' 'A Topical Sketch' এবং 'Some new music and novel dance are introduced in this pretty piece.'

এই প্রহসনে অমৃতলাল কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নাই। 'সাবাস আটাশের' অভিনয় দেখিয়া 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' যে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন তাহা এই—

> "There was a bumper house on Saturday evening at this theatre when the farcical play 'Bravo ! 28 !' was staged for the first time. The representation of the 'play-ground' in the second act was a rarity on the native stage. The singing and dancing on the occasion were a treat. The parts of 'Khiroda' and 'Haralal', and the other principal parts were well sustained."৬৫

১৬

সমসাময়িক ঘটনাভিত্তিক প্রহসন 'সাবাস আটাশ' রচনা করিয়া কয়েক মাসের মধ্যেই অমৃতলাল তাঁহার বিশুদ্ধ প্রহসন 'কৃপণের ধন' রচনা করিলেন। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০০ সনে।† দুই অঙ্কের প্রহসন। প্রতি অঙ্কেই চারটি

মন্তব্য করেন—'The Raja is doing Yeoman's service in the popula cause.'

* The Pioneer (7. 10. 1899) লেখেন 'Gallant 28 (as a native Dramatis has christened the commissioners who have resigned)'

৬৫ The Indian Daily News : 26. 9. 1899

† দ্বি. স. ১৯০৩। আখ্যাপত্রে গ্রন্থটিকে 'প্রমোদ প্রহসন' ('A farcical comedy') বলা হইয়াছে এবং ইংরেজী নাম দেওয়া হইয়াছে 'The Miser's Misery'। অমৃতলালের স্বভাবগত অনুপ্রাস প্রয়োগপটুতা ইংরেজী নামেও লক্ষ্যগোচর হয়। প্রহসনটি কুমার মন্মথনাথ মিত্রকে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গপত্র হইতে জানা যায় যে, স্টার নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হইয়াই প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন কুমার মন্মথ মিত্রের প্রাসাদে।

গর্ভাঙ্ক। অন্যান্য প্রহসনের মত 'প্রস্তাবনা' বা 'সূচনা' নাই। গান আছে পাঁচটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০।

অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন স্ত্রীর কলসী-উৎসর্গে এক টাকা খরচ করিতে কুণ্ঠিত এবং ভাগ্নীর বিবাহের যৌতুক দশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিতে উদ্যত পরস্বাপহারী কৃপণ হলধর হালদার কিভাবে লোভের বশে এক ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীকে দশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হইল এবং এক বিধবার দিকে কুদৃষ্টি দিতে গিয়া নিতান্ত নাকাল হইল তাহারই কৌতুকপ্রদ কাহিনী 'কৃপণের ধনে' বর্ণিত।

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেন, এই প্রহসনে মলিয়েরের 'ল্ আভার' এর প্রভাব আছে।[৩৬] তবে অমৃতলাল ঘটনা ও চরিত্র এমনভাবে বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন যে, বিদেশী প্রহসনের স্বল্পতম এবং সূক্ষ্মতম ছায়াও কোথাও লক্ষিত হয় না। হলধরের চরিত্রোপযোগী উক্তিতে তাহার কৃপণতা অত্যন্ত সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। দয়াময়ী কলসী-উৎসর্গের জন্য তাহার নিকট এক টাকা চাহিলে সে মাত্র চার পয়সা দিতে সম্মত হয়। তখন—

'দয়া। চার পয়সায় কলসী-উৎসর্গ ?

হল। ওরে বুঝে কত্তে পাল্লে হয় রে, বুঝে কত্তে পাল্লে হয়। বাবার আত্মশ্রাদ্ধ আমি আট আনায় সেরেছিলুম, দু'পয়সায় নৈবেদ্য, এক পয়সা দক্ষিণে, আধ পয়সা বস্ত্রের মূল্য, আধ পয়সা কলসী। জল কলে আছে, অঢেল হয়ে যাবে।'

কাপড়ের খরচ বাঁচাইবার জন্য সে কাছা-ছাড়া কাপড় পরে। তাহার 'কাছাকে কাছা— কাছা দ্বিগুণে গামছা,— গামছা দ্বিগুণে চাদর— চাদর দেড়ে ধুতি' নামতা বেশ হাস্যকর। এই নামতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হিতে বিপরীত' প্রহসনের 'গামচাকে গামচা' নামতার ছাপ আছে। ধুতি-চাদর কিনিবার জন্য পাঁচ টাকা দিতে তাহার বুক ফাটে। বলে,

'দেখছ না, কাঁদছেন— মা কাঁদছেন— আমার সিন্দুক ছেড়ে যেতে মহারাণী মার চক্ষু দুটি দিয়ে জল গড়িয়ে টাকা চাঁদের বুক ভেসে যাচ্ছে!'

৩৬ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য়) ৪র্থ সং, পৃ ৩৫৬

পরশপাথরের লোভে সে দশ হাজার টাকা দেয় বটে, সেই সঙ্গে তাহার স্বভাবসুলভ সংশয়ও প্রকাশ করিয়া ফেলে—

'দেখো বাবা সন্ন্যাসী ঠাকুর, টাকাগুলি শরীরের বুকের গোরক্ত, খোয়াব না ত? আমি শুনেছি কোন কোন সন্ন্যাসীরা জুচ্চুরিও করে।'

বিদ্যাসুন্দর হইতে সে মালিনীর বেসাতি মুখস্থ বলে। ইহা হইতেও তাহার কৃপণতা প্রকাশে অমৃতলাল সফল হইয়াছেন। হলধর বলে—

"'খুন হয়ে গেছি বাবা চুণ চেয়ে চেয়ে। শেষে ফুরাইল কড়ি আনিলাম চেয়ে॥' সত্যযুগ কি যুগই ছিল, দোকানীরা চাহিলেই জিনিস দিত, ভারতচন্দ্র তাই লিখে গেছে।"

এইভাবে অমৃতলাল হলধরের চরিত্র এমন সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাহার কার্পণ্যদোষ এমন সুপরিস্ফুট করিয়াছেন যে, মলিয়েরের "*L' Avare*" প্রহসনের হারপাগঁকেও সে অতিক্রম করিয়াছে।[৬৭] শেষ দৃশ্যে হলধর তাহার লালসার শাস্তি পাইয়াছে। বিচিত্রিত-বদন, গলরজ্জুবদ্ধ হলধর দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'র হোঁদল কুৎকুতেকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

হলধরের কাহিনীর সহিত মন্মথ ও কুন্তলার প্রণয় কাহিনী যুক্ত। মন্মথই যে কুন্তলার মায়ের মনোনীত পাত্র একথা পূর্বে জানা থাকায় তাহাদের অতিশয়িত ও সরস প্রেমালাপ আমাদের কাছে বিসদৃশ লাগে না। কুন্তলার প্রগলভ উক্তিতে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গমণ্ডিত হাস্যের ছটা দেখা যায়। প্রণয়ী মন্মথর উদ্বেগ ও আকুলতা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই পরিস্ফুট।

মধুখুড়ো এই প্রহসনের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। হলধরকে যথাযোগ্য শাস্তি দিয়া মন্মথর প্রণয়কে সে সফল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার বক্রোক্তিগুলিও বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। হলধর সম্পর্কে সে বলে, 'না খেয়ে মুখ দেখলে অন্ন হয়না, খেয়ে দেখলে অম্বলশূল হয়'; কুন্তলাকে পড়াইতে মন্মথ টাকা লয় না শুনিয়া

৬৭ 'The miser, Harpagon, is rather farcically conceived, and the plot tends to be confused. One has the double impression that Moliere ...is not at his happiest in dealing with miserliness and that his skill of hand is declining.'—'World Drama': A. Nicoll—pp. 331-32. কৃপণের জব্দ হওয়ার কাহিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) প্রহসনেরও প্রতিপাদ্য।

সে বলে, 'এ পড়ান নয়, প্রেমের পাঠশালে এ্যাপ্রেণ্টিস খাটছো'; নিজের সম্পর্কে সে বলে, 'আমি এক রকম মদ্দ-বিধবা'; নেশার বিষয়ে তাহার মত— 'প্রথমে একটু কারণ কত্তে হবে, তারপর রীতিমত উপর্যুপরি ছুটি ছিলিম গাঁজা চড়াতে হবে, তবে তো মাথায় গ্যাসলাইট জ্বলবে, বুদ্ধি আসবে'; নাপিত সাজিয়া হলধরের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বলে, 'এঃ বাবু! নাপ্তে কখনো অবিশ্বাসী হ'তে পারে? আমাদের হাতে ক্ষুর থাকে, লোক গলা বাড়িয়ে দেয়…।' এই জাতীয় চরিত্র প্রহসনকারের বড় প্রিয়। তাঁহার অনেক প্রহসনেই এ ধরনের স্পষ্টবাদী নেশাগ্রস্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। মধুখুড়ো—তিনকড়ি মামা, মাণিক ইত্যাদির সমজাতীয়।

স্বামীর কার্পণ্যকে দয়াময়ী উচ্চকণ্ঠে ধিক্কার দিয়াছে। তাহার তুমুল কলহের ভাষা ও ভঙ্গী অত্যন্ত স্বাভাবিক। পুরোহিতের চরিত্রও সু-অঙ্কিত। তাহার 'এমন দেরী কল্লে চলে?— আজ আমাদের মেইল ডে' প্রভৃতি উক্তিতে বিশিষ্ট হাস্যরস আছে।

প্রহসনটিকে পল্লবিত করিবার জন্য অতিরিক্ত দৃশ্য বা গান সংযুক্ত হয় নাই। ফলে কাহিনীতে বেশ সংহতি দেখা যায়। হলধরের বিকৃত শব্দোচ্চারণে হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়, যেমন, অনুপ্রাস—'হনুপ্রকাশ', উল— 'হুল'। কখনো কখনো উদ্ভট কল্পনার অতিবিস্তার হাস্যজনক, যেমন, 'আমার বাপের নাম রাণী রাসমণি, হুগলীর পোলের নাতি, মনুমেণ্টের প্রপৌত্র…।' 'কৃপণের ধন' এই প্রবাদমূলক কথাটি শেষের গানে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে— 'কৃপণস্য ধনং হরে বহ্নি পৃথ্বী তস্করে।'

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ শনিবার (২৬এ মে, ১৯০০) স্টার থিয়েটারে 'কৃপণের ধন' প্রথম অভিনীত হয়। এই প্রহসনে অমৃতলালের কোন ভূমিকা ছিল না। অভিনয়ের দিন স্টেট্‌সম্যান পূর্ব হইতেই মন্তব্য করিয়াছিলেন—

'The entertainment should certainly prove a varied and attractive one....'

একই দিনে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে'র মন্তব্য ছিল—

"Mr. Amritalal Bose's new farcical comedy, *Kripaner Dhan*, or 'The Miser's Misery',... an event of the first interest, not only to his many admirers, but to the theatrical world in general."

১৭

'কৃপণের ধন'এর পরবর্তী প্রহসন 'অবতার' প্রকাশিত হয় ১৩০৮ সালে। দুই অঙ্কের প্রহসন। প্রতি অঙ্কেই চারিটি করিয়া দৃশ্য। প্রস্তাবনা কিংবা উপসংহার নাই। গান আছে পঁচিশটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০।

তথাকথিত অবতারবাদ যে পাগলামি ইহাই এই প্রহসনে প্রতিপন্ন হইয়াছে। দুই জন অবতারের চরিত্রচিত্র দেখিতে পাই। একজন বিষ্ণুর অবতার গয়ারাম ও অপর জন শঙ্করাচার্যের অবতার হলাহলানন্দ। হলাহলানন্দের উদ্ভট ক্রিয়া-কলাপ এবং ইংরেজী ও সংস্কৃতে বিচিত্র বচন তাহাকে যথেষ্ট উপহাস্য করিয়াছে। ভণ্ড বৈষ্ণব গয়ারামের ধার্মিকতার ভড়ংও লেখক অতি প্রবল বিদ্রূপের আঘাতে উন্মোচিত করিয়া দিয়াছেন।[৬৮] প্রহসনটি গিরিশচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-পত্রের শেষে অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

> "যিনি একদিন ঘোর জড়বাদ-শাসিত উনবিংশ শতাব্দীর শেষে লোকের উপহাসকে তুচ্ছ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নারায়ণের অবতার জানিয়া তাঁহার চরণে প্রথম পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাঁহারই করে ভণ্ড অবতারদলকে সমর্পণ করিলাম।··· আপনার চিরস্নেহের
> 'ভুনীবাবু'।"

আখ্যাপত্রে অমৃতলাল 'অবতারে'র পরিচয় দিয়াছেন, 'প্র-পরা-অপ-সং-হসন্'। নির্মম ব্যঙ্গ ও নির্মল কৌতুক এখানে সমান্তরালে বহিতেছে। প্রথম দৃশ্যে দর্পনারায়ণ, ছকড়ি প্রভৃতির উক্তিতে এবং বিভিন্ন গানে মাংসলিপ্সু বৈষ্ণবাবতার গয়ারামের প্রতি ব্যঙ্গের শরবর্ষণ যেমন প্রবল, দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রমথ-হিল্লোলার কবিত্বপূর্ণ রসোজ্জ্বল দাম্পত্যজীবনের মনোরম চিত্রে কৌতুকের নির্ঝর তেমনই অনর্গল।

৮ ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, 'অমৃতলালের কৌতুকনাট্যে কখনো কখনো ব্যক্তিবিশেষ উদ্দিষ্ট হইলেও বিদ্বেষবিষজ্বালা নাই।' 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড,' (৫ম সং, পৃ ৩৬০) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তথাকথিত বৈষ্ণবতার বাড়াবাড়িকে ব্যঙ্গ করা সত্ত্বেও ভক্ত বৈষ্ণব শিশির কুমার ঘোষ তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকায় 'অবতারে'র বিস্তৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, যদিও 'অবতার' প্রহসনের সহিত শিশিরকুমার ঘোষের প্রসঙ্গ স্পষ্টত জড়িত ছিল। সেকালের লোকের রসবোধ কত গভীর ছিল ইহা তাহারই প্রমাণ। অমৃতলালের ব্যঙ্গবিদ্রূপ যে ব্যক্তিবিশেষের মনে বিদ্বেষের জ্বালা ধরাইয়া দিত না, ইহা তাহারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দর্পনারায়ণের উক্তিগুলি ব্যাজস্তুতিমূলক। দাদাকে সে বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বনের যুক্তি দেখায়— 'এই ঠিক সময় হয়েছে— পেটের অসুখ বেড়েছে, ডাক্তার মাংস খেতে নিষেধ করেছে, কাঁকড়া পর্যন্ত হজম হচ্ছে না, বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বনের এই ঠিক সময়।' মাংসলোলুপ গয়ারাম চাটগাঁ হইতে পাখী আসিয়াছে শুনিয়া বলে— 'আ মরি মরি, সে যে একসঙ্গে মুরগী-মটন···।' ছোটভাই ছকড়ি রঙ্গপরায়ণ ও স্পষ্টবাদী। গয়ারামের বিমূঢ় অবস্থা দেখিয়া সে 'গজবর গামিনী মোরগিনী নন্দিনী'-ভোজনের বিধান দেয়— তবে তুলসীপাতা খাওয়াইয়া 'বেটীদের ব্যাপ্টাইজ' করিবার পর! কীর্তনের ঢঙে রচিত তিনটি গানেই মুরগী-মাহাত্ম্য বর্ণিত! গয়ারামের স্ত্রী মেনকার আপাতসরল উক্তিগুলি যথেষ্ট শ্লেষাঢ্য। স্বামীর সম্পর্কে সে বলে— 'কেষ্ট হতে হতে বলরাম হয়ে শিঙে না ফোঁকেন' বা 'ওঁরা বলেন ভাব— কিন্তু সেটা ভব'! গয়ারামের ভাবাবেশ ও পূর্বজন্মের কাহিনী-কথন, ভক্তদের হরিবোলের পরিবর্তে 'গয়ারাম বোল', নৃসিংহরূপী গয়ারামের 'স্তবচনী' সম্পাদকের পশ্চাদ্ধাবন ও হিল্লোলার 'কলঙ্ক-ভঞ্জন' লেখকের অসামান্য কৌতুককল্পনার চূড়ান্ত নিদর্শন।

গয়ারামের কাহিনী ও প্রমথ-হিল্লোলার কাহিনীকে প্রহসনকার সূক্ষ্ম সূত্রে যুক্ত করিয়াছেন। প্রমথ-হিল্লোলার সকৌতুক সংলাপ বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলকিত। তাহাদের কাব্য-সংলাপগুলি অনুপ্রাস ও কৌতুকে পূর্ণ। তাহাদের বাক্‌চাতুর্য অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চস্তরের 'উইটে'র পর্যায়ভুক্ত। কখনো কখনো প্রায় একরূপ ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের সুযোগ লইয়া অপ্রত্যাশিত যমক সৃষ্টি করিয়া অমৃতলাল বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। হিল্লোলা যখন বলে, 'আর দেখ, কিছু অন্যায় টন্যায় যেন করো না', তখন প্রমথ বলিতেছে— 'আর আমার কবিতাই যখন চললো, তখন আর কি নিয়ে অন্বয় করবো?'

প্রমথ-হিল্লোলার উক্তি হইতে তাহাদের অনুপ্রাসবহুল কাব্য-সংলাপের এবং প্রমথর মার্জার-মানসতার নিদর্শন দেওয়া যায়—

'দেখে মুখ পদ্ম, স্তব্ধ জব্দ মদ্দ
ক্ষুব্ধ মুখে শব্দ শুধু ম্যাও ম্যাও ম্যাও।
হেরে রূপ-দুগ্ধ মনো-মেনি মুগ্ধ
লুব্ধ চোখে চেয়ে কাঁদে ম্যাও ম্যাও ম্যাও

হিল্লোলাও সঙ্গে সঙ্গে শ্লিষ্ট জবাব দেয়—

'তিষ্ঠ তিষ্ঠ কবিবর, মিষ্ট পদ্যে সৃষ্টি জ্বর—
ত্রিপদীতে বুঝি নাথ পাও চতুষ্পদ।
ভয় পাবে মরা মধু, হেম— রবি— দত্তবধূ,*
নবীন ত্যজিবে দেশ, গিরিশ ঘোষ পদ।'

গয়ারাম সম্পর্কে হিল্লোলার উক্তি উল্লেখযোগ্য— 'মেজদিদির স্বামী বিষ্ণুর অবতার না হলেও তিনি যে বুদ্ধির অবতার, তার আর সন্দেহ নেই।' গয়ারাম কর্তৃক হিল্লোলার কলঙ্কভঞ্জনের ব্যাপারটিও খুব হাস্যকর।[৬৯]

প্রহসনের অপর ভণ্ডচরিত্র হলাহলানন্দ স্বামী। বাংলা ইংরেজী ও সংস্কৃত তিন ভাষায় বাক্‌চাতুরী দেখাইয়া সে কার্যোদ্ধার করে। তাহার আত্মবৎ সর্বভূতেষু-ভাব প্রবল্ স্বার্থপরতারই নামান্তর। সে তাহার নিজের পরিচয় দেয় 'ষড়রিপুত্যাগকারী যথেচ্ছাচারী সন্ন্যাসী' বলিযা। 'হলাহল-কাননে'র জন্য চাঁদা লইয়া, তাহা হইতে 'ডারবি টিকিটে ইনভেস্ট' করে সে। তাহার অতিরিক্ত ঔদরিকতাও তাহাব প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণ করিয়া তুলে।

'অবতারে'র উৎসর্গপত্রের শেষে অমৃতলাল ভক্তি ও ভণ্ডামি সম্পর্কে তাঁহার মনোভাবটি যেভাবে প্রকাশ কবিযাছিলেন, তাহার সহিত *Tartuffe* প্রহসনে

* গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

৬৯ কালীপ্রসন্ন-কাব্যবিশারদ-সম্পাদিত 'হিতবাদী'তে ১৮৯৬ সনের ২৪এ জুলাই 'রুচি-বিকার' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পারিবারিক কুৎসা রটনা করা হইয়াছে এই অভিযোগে হেরম্বচন্দ্র কাব্যবিশারদকে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করেন। হিল্লোলার 'কলঙ্ক' এই ঘটনারই অতিশয়িত রূপ। হিল্লোলার কলঙ্কপ্রকাশক 'বিচ্ছেদ ভীতা' কবিতাটিতেও 'রুচি-বিকারে'র অনুকরণের প্রয়াস আছে। প্রহসনে হিতবাদী' হইয়াছে 'সুবচনী' ও কাব্যবিশারদ 'বাক্য বিষরদ'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কাব্যবিশারদ 'অবতার' (১৮৮১) নামে একটি ২০ পৃষ্ঠার প্রহসনে অমৃতলালের নিতান্ত ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেনকে কটাক্ষ করিয়াছিলেন। অমৃতলালও 'বাক্য বিষরদ'কে নৃসিংহ অবতারের কবলে ফেলিয়া কৌতুকের চূড়ান্ত করিয়াছেন! আবার এই 'নৃসিংহ অবতারে'র মধ্যেও সেকালের এক সাংবাদিকের ধর্মজীবনের একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ প্রচ্ছন্ন আছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের জীবনীকার অনাথনাথ বসু লিখিয়াছেন—'শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অবতার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।' (দ্রঃ 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' পৃ ৩৫৫-৫৬)

Moliere-এর বক্তব্যের সাদৃশ্য আছে। অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে জানাইয়াছিলেন—

'প্রকৃত ভক্ত সাধু বৈষ্ণবগণের চরণে আমার কিরূপ আন্তরিক ভক্তি তাহা আপনি জানেন, সুতরাং এই রহস্যচিত্রে উপহাসের পাত্র যে কাহারা তাহাও আপনি চিনিতে পারিবেন।'

Tartuffe প্রহসনেও ভ্রান্তবুদ্ধি Orgonকে তাহার শ্যালক Cleante তার্তুফের বিসদৃশ আচরণের প্রসঙ্গে ভণ্ডামি ও ধর্মের পার্থক্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে—

'As I see no character in life greater or more valuable than to be truly devout, nor anything nobler or fairer than the fervour of a sincere piety, so I think nothing more abominable than the outside daubing of pretented zeal, than those mountebanks, those devotees in show... who make a trade of godliness, and who would purchase honours and reputation with a hypocritical turning up of the eyes and affected transports.'

প্রমথর বাড়ীর 'বয়' বিশেষ কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার কথায় ও গানে অফুরন্ত হাস্যরসের প্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের প্রতি অমৃতলালের পক্ষপাতিত্ব বয়ের ইংরেজী গানটিতে প্রকাশ পাইয়াছে।[৭০] সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যের প্রতি অনুরাগ স্ফূর্ত হইয়াছে হিল্লোলার উক্তিতে।

গানগুলিতে ব্যঙ্গ ও রঙ্গকৌতুকের মাত্রা বাড়িয়াছে। কয়েকটি প্যারডিও

৭০ 'I am a very—very good boy :
When ding-dong rings the parlour-gong,
Merrily I sing a comic song,
Like the famous Dallas Laurie
Or D. L. ROY.'

অমৃতলালের অপর কোন প্রহসনে এত অধিক গান নাই। এইজন্য অভিনয়-বিজ্ঞাপনে 'musical extravaganza', 'shower of sweet songs' প্রভৃতি উল্লিখিত হইত।

আছে।[৭১] কোথাও কোথাও শব্দকে বিকৃত করিয়া হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে।

স্টার থিয়েটারে ১৯০১ সনের ২৫এ ডিসেম্বর 'অবতার' প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতলাল এই প্রহসনে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। দর্শকসমাজ তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গের সমাদর করিয়াছিলেন। 'স্টেট্‌সম্যানে'র মন্তব্য হইতে জানিতে পারি—

'The new Christmas pantomime 'Avatar', the production of Babu Amrita Lal Bose, was put on the stage of this theatre for the third time on Sunday last. The crowded house was a proof of the excellence of the piece. All the actors acquitted themselves very creditably and the audience returned home well pleased."[৭২]

'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে'র মতে—

'The piece has proved to be an amusing one, cleverly written, and well acted.'[৭২ক]

'রঙ্গালয়' পত্রে সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছিলেন— 'অবতারে'র অভিনয় দেখিয়া যিনি রাগিবেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষিত হউন,— নিশ্চয় বুঝিব তাঁহার রসাভাব আছে।'*

১৮

'অবতারে'র পর অমৃতলাল কতকগুলি বাতিকগ্রস্ত বাঙালীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন 'বাহবা-বাতিক' প্রহসনে। 'বাহবা-বাতিক' প্রথম অভিনীত হয় ২৫এ ডিসেম্বর ১৯০৪। প্রহসনটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। অমৃত-গ্রন্থাবলী প্রথম প্রকাশিত হইলে (১৩১৩) তাহার চতুর্থ খণ্ডে 'বাহবা-বাতিক'

৭১ 'শ্রীমুখপঙ্কজ দেখব বলে' ও 'প্রিয়ে চারুশীলে মুক্তময়ি মান' এই দুইটির প্যারডি ব্যঙ্গরসিক অমৃতলালের সহজাত দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছে।

৭২ The Statesman : 7. 1. 1902

৭২ক The Indian Daily News : 8. 1. 1902

* রঙ্গালয় : ৩১. ১. ১৯০২

প্রকাশিত হয়; পরবর্তীকালে মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর (১৩৫৭) তৃতীয় ভাগে প্রহসনটি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই প্রহসনেও প্রথমে প্রস্তাবনা ও শেষে 'পট-পরিবর্তন'; মাঝে দুইটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি গর্ভাঙ্ক। গান আছে বারোটি।

দরখাস্তের জোরে রাজ্যলাভে উৎসুক কয়েকটি অকর্মণ্য বাক্যবাগীশ চরিত্রের অবতারণা এখানে দেখিতে পাই। ইহাদের অন্যতম সীতাহরণ বলে, 'গৃহকার্য চালাতে পারি আর না পারি, একটা রাজ্য যদি হাতে পাই, তা হলে চক্ষু বুজে মোটরকারের মতন দেদার চালাতে পারি।' ফেনিলার স্বামী 'জগদ্বিখ্যাত রঘুপালের অকিঞ্চিৎকর বংশধর' গোপালের বংশ-পরিচয় রীতিমত হাস্যোদ্দীপক।[৭৩] বক্তৃতা করিয়া সে বুঝাইয়া দেয় যে, রাজা হইবার সে-ই উপযুক্ততম ব্যক্তি, কারণ সে-ই 'বঙ্গের রাজবংশের বকেয়া বাকি!' ইহাদের মধ্যে একমাত্র ফেনিলাই সুস্থ। প্রহসনকারের মুখপাত্রী সে। তাহার রসফেনিল ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা বারবার সে সকলের উদ্ভট চিন্তায় আঘাত হানিয়াছে। 'পৃথিবীরূপ নাট্যশালায়' অভিনেতা নটবর লেখকের আর একটি অভীষ্ট চরিত্র। নরবানরগুলিকে সে যথেচ্ছ নাচাইয়াছে। বিশ শতকের সূত্রপাতে অমৃতলাল বাঙালীর যে-জাতীয় মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন আজও তাহার লোপ হয় নাই—

'নট। বলি চাষবাস শিক্ষা চাও?
সকলে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গ্যারান্টি থাকলে।*
নট। ব্যবসা বাণিজ্য কত্তে চাও?
সকলে। মাইনে কত? মাইনে কত?
নট। আচ্ছা শিল্প শিখবে?
সকলে। চাঁদা উঠলে— চাঁদা উঠলে।
নট। বলি, কৌন্সিলের মেম্বার হবে?
সকলে। সবাই সবাই—'

৭৩ ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে 'কৌতুকরসের অবতারণায় রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ আছে।' এই প্রসঙ্গে তিনি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' (নবজীবন ১২৯১)-র উল্লেখ করিয়াছেন ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বি, খ, ৫ম সং পৃ ৩৩০)

* এই ইঙ্গিত সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলালকে লক্ষ্য করিয়া।

মহেশ, মুক্তারাম, যদু ও প্রাণবন্ধু বিভিন্ন মনোভাবসম্পন্ন বাঙালীর চরিত্র উদ্ঘাটিত করিয়াছে। 'অবতারে'র গয়ারামই যেন এখানে মুক্তারাম। কথায় কথায় গোপী ভজিয়া ও বৈষ্ণবতার ভড়ং করিয়া সে চাঁদার সাহায্যে জমিদার হইবার স্বপ্ন দেখে। মহেশ ও যদু পরিকল্পনা করে চাঁদা তুলিয়া স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠার। বাঙাল প্রাণবন্ধু প্রহসনকারের কথঞ্চিৎ সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। সে 'সধবার একাদশী'র রামমাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র! তাহার স্বদেশী মনোভাব অত্যন্ত প্রবল। রামমাণিক্যের কথার অনুকরণ করিয়া সে বলে—

'এংরাজী পরলাম, কাগজ লেখলাম, লেকচার ঝারলাম, হ্যাটকোট নেকটাই পরলাম, অখাদ্য ভৈক্ষণ করলাম, ইসে তবু কিনা নেটিভ বলবার ছারে না। সাহেব অইবই অইব, তা ব্যারিষ্টারই অই, কি কারপেণ্টরই অই।'

'দরখাস্তদেবী'র স্তবে 'শ্রীচরণসেবক দাস' বাঙালীর চরিত্রগত সকল ত্রুটিই ব্যক্ত। দরখাস্তদেবীর আশীর্বাদে তাহারা 'অক্কা ফক্কা দ্বীপে'র রাজত্ব লাভ করিল বটে, কিন্তু সেখানে এক সাহেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের ভিক্ষুকবৃত্তি প্রকট হইয়া উঠিল। গোপাল রাজা হইবার দরখাস্ত দাখিল করিল—

'Sir, Being given to understand that a Kingship is vacant under your Highness, I beg most respectfully to offer myself as a candidate for the same.'

এইভাবে হুজুগপ্রিয় বাঙালীর নানাপ্রকার বাতিক অমৃতলালের বিদ্রূপে ধিক্‌ত হইয়াছে। অনেকস্থলে কৌতুকপ্রদ বাক্যে বাঙালীর স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন united we stand, divided we fall এর অনুকরণে বাঙালীর চাঁদা সংগ্রহের অভ্যাসকে বিদ্রূপ: subscribed we sustain, unsubscribed we starve এবং সাহেবের প্রতি বাক্যবীর ভাবেন্দ্রের উক্তি: *'ইয়েস, ইউ টেক দি বেশন এণ্ড উই দি ওরেশন ডিপার্টমেণ্ট।'* গানগুলিতে বাঙালী-চরিত্রের নানা ত্রুটিকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। কারিগরি বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রা উপহসিত হইয়াছে শেষের গানে। কলের মিস্ত্রীদের গানে তাহাদের স্বাধীন চিত্তবৃত্তির উল্লাস ধ্বনিত। গানটির রচনাকৌশলও লক্ষণীয়।

স্টার থিয়েটারে ১৯০৪ সনের ২৫এ ডিসেম্বর 'বাহবা-বাতিক' প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'স্টেট্‌সম্যান' লেখেন—

"The Christmas programme at the Star Theatre can always be relied upon to furnish ample provision of seasonable entertainment. On Christmas Day that indefatigable playwright, Mr. A. L. Bose, produced a new satirical piece, 'Hurrah, Hobby!' poking lively fun at certain widely advertised current movements, such as the scheme for the improvement of industrial and scientific education. The play, however, is not all social satire. It includes a full measure of song and dance, which, added to its topical up-to-dateness helps to make an attractive piece"[৭৩ক]

'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' 'বাহবা-বাতিকে'র আলোচনাপ্রসঙ্গে অমৃতলাল সম্পর্কেও তাঁহাদের অভিমত দিয়াছেন—

"Mr. Amrita Lal Bose has a keen appreciation of the theatre-going public, and this theatre [Star] is, therefore, well-known as a popular resort. During the Christmas week Mr. Bose successfully carried out a seasonable entertainment, when Mr. Bose's satirical production, entitled *Bahaba-Batik* or 'Hurrah Hobby', was staged."[৭৪]

১৯

'বাহবা-বাতিকে'র পরে অমৃতলালের 'সাবাস বাঙ্গালী' নামক সামাজিক নক্শাটি প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ সরকারীভাবে কার্যকরী হইলে দেশের মধ্যে স্বদেশী-আন্দোলন ও বিদেশী-বর্জন পূর্ণমাত্রায় শুরু হয়। এই আন্দোলনে অমৃতলালও সুরেন্দ্রনাথের সহযোগীরূপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'সাবাস বাঙ্গালী' এই আন্দোলনকেই ভিত্তি করিয়া রচিত।

৭৩ক The Statesman : 31. 12. 1904

৭৪ The Indian Daily News : 4. 1. 1905

১৯০৬ সনের জানুয়ারী মাসে 'সাবাস বাঙ্গালী' ('Bravo Bengalees') প্রকাশিত হয়।* ইহার পূর্বেই স্টার মঞ্চে ইহার অভিনয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে দুইটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে ছয়টি ও দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য। ইহা ব্যতীত 'প্রস্তাবনা' ও শেষে 'পট-পরিবর্তন' আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২।

'সাবাস বাঙ্গালী'তে অবিচ্ছিন্ন কাহিনী নাই। স্বদেশী-আন্দোলন বাঙালী-সমাজের সকল স্তরে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই চরিত্র-চিত্র ইহাতে প্রদর্শিত।

নয়ানচাঁদ ও গরবিণী 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র গোপীনাথ ও তাহার গিন্নীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। পাশকরা ছেলের দাম 'বিলাতী কাপড়ের মত সিকি নেমে গেছে' শুনিয়া গরবিণী বলে, 'এ সব বিধেতার ভিটকিলিমি।' 'থে্ড নিড্ল কোম্পানী'র কর্মচারী অঘোর চাকুরীগতপ্রাণ বাঙালীর প্রতীক। তাহার পুত্র মতি স্বদেশী আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবক। ফিরিঙ্গি জেঙ্কিন্সের মুখ দিয়া অঘোর সুরকে অঘোর সুয়ার বলাইয়া নাট্যকার তাঁহার শ্লেষের চাবুক বেশ জোরেই ব্যবহার করিয়াছেন। জেঙ্কিন্সের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তাহার গান আপাত-হাস্যচ্ছটার অন্তর্নিহিত গভীর বেদনা প্রকাশ করিয়াছে। মিসেস গুপ্তাকে বিলাতী দ্রব্য ক্রয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া এবং বিদেশী বস্ত্রে আগুন দিয়া স্বদেশী-আন্দোলনের সূচনায় প্রহসনকার প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীচরণরঞ্জনের অতিরিক্ত সাহেবভক্তি তাহার নামেই ব্যক্ত। সেবকরাম তাহার উপযুক্ত মোসাহেব। গোলামউল্লা দেশের স্বার্থবিরোধী মুসলমান। তাহার বিপরীত চরিত্র শোভান। দেশের শিশুদের মনে বিদেশী-বর্জনের নীতি কিরূপ ক্রিয়াশীল তাহা টিটির সংক্ষিপ্ত উক্তিতে প্রকাশিত। বিদেশী-বর্জনের সুযোগ লইয়া দেশী দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যাহারা করিতেছিল, চিনিবাস সেই অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি। সে বলে—

'এ দিশী-বিলিতী হাঙ্গামা হয়েছে কেন? এ বিধেতা আমাদের মত গরীব দোকানদারের ভালর জন্যই করেছে।'

মাতাল মাণিকের স্পষ্টবাদিতা ও মাতলামি 'গ্রাম্য বিভ্রাটে'র মাণিককে স্মরণ করাইয়া দেয়। মাণিককে 'বন্দে মাতরম্' বলাইয়া গ্রেপ্তার করার

* গ্রন্থটি 'স্বদেশহিতৈষী মহামহিমান্বিত শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মহদাশয়েষু' উৎসর্গীকৃত।

ব্যাপারে বাঙালী ও হিন্দুস্থানী পাহারাওলার মনোবৃত্তির তারতম্য প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশী-আন্দোলনের প্রবল অভিঘাতে অন্তঃপুরবাসিনী এবং বিলাতী দ্রব্যে অভ্যস্ত মহিলারা পুরাতন সংস্কার বিসর্জন দিয়া চরকা কাটার ব্রত গ্রহণ করার পর নক্‌শাটি শেষ হইয়াছে।

'সাবাস বাঙ্গালী'তে গান আছে ষোলটি। প্রস্তাবনার গানে বিদেশী-বর্জনের আনন্দ অভিব্যক্ত। মুচিদের গানেও বিলাতী-বর্জনের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। আধুনিক নকশাতেও অমৃতলাল 'মায়া'-চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার গানে দেশসেবকদের উৎসাহিত করিয়াছেন। চুড়িওয়ালীদের গানে বিলাতী চুড়ি বিক্রয়-না-হইবার আক্ষেপ প্রকাশিত। চিনিবাসের গানে 'ঝোপ বুঝিয়া কোপ ফেলিয়া' পয়সা বাগাইবার ফন্দী ব্যক্ত। মাতাল মাণিকের গানে শ্লেষের পরিচয় আছে। তাঁতি বৌ, বিনোদিনী, চারু প্রভৃতির গানে বিলাতী-বর্জন ও স্বদেশী-আন্দোলনের নানা দিক ফুটিয়াছে।[৭৫]

১৯০৫ সনের ২৫এ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে 'সাবাস বাঙ্গালী' প্রথম অভিনীত হয়।

২০

'সাবাস বাঙ্গালী' রচনার দীর্ঘকাল পরে ১৯২৬ সনে অমৃতলাল রচনা করিলেন 'ব্যাপিকা-বিদায়'। 'ব্যাপিকা-বিদায়'কে অমৃতলাল বলিয়াছেন, 'প্রমোদ-প্রহসন'। পূর্ববর্তী প্রহসনগুলির ন্যায় এখানে গতানুগতিক অঙ্ক-বিভাগ নাই। প্রথমে 'প্রবেশক' এবং পরে 'পূর্বচিত্র' ও 'উত্তরচিত্র'। গান আছে কম পক্ষে বারোটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২।

এক কর্তৃত্বলুব্ধ ব্যাপিকা, কন্যার সংসারে আসিয়া, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে তুমুল বিপর্যয় সৃষ্টির উপক্রম করিয়া কিরূপে জব্দ হইল তাহাই এখানে রঙ্গব্যঙ্গে প্রদর্শিত।

৭৫ অমূল্যচরণ ঘোষ সম্পাদিত 'বাণী' পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা— মাঘ ১৩১২) 'সাবাস বাঙ্গালী' সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত পুস্তিকা 'কালে লুপ্ত ও অগ্রাহ্য হইয়া পড়িবে। 'নীলদর্পণ' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট' যে এখনও বাঁচিয়া আছে ও থাকিবে, তাহা স্বতন্ত্র গুণের জন্য।'

'প্রবেশকে' মিনি ও পুষ্পবরণের কৌতুকপূর্ণ আলাপে তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য পরিস্ফুট হইয়াছে। 'পূর্বচিত্র'টি বেশ দীর্ঘ। মিনি ও তাহার 'সেবিকা' চমৎকারের কথোপকথন তাৎপর্যপূর্ণ। চমৎকারের 'দর্জালকে কি ইংরেজীতে shrew বলে মা ?' এই প্রশ্নে প্রহসনকার ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত দিয়াছেন। আবার মিনির 'এই আমার মা আসছেন, দেখো, কেমন মা-র মতন মা'— এই উক্তিতে নাটকীয় শ্লেষ ব্যক্ত হইয়াছে।

ঘনশ্যাম একটি বিচিত্র চরিত্র। তাহার তোতলামি, তাহার বিচিত্র ইংরেজী, তাহার দেশের জন্য চিন্তা, তাহার পেট্রিয়টদের শ্রেণীবিভাগ, খদ্দর-সাহেবদের প্রতি তাহার কটাক্ষ, মিসেস পাকডাশীর কথা শুনিয়া অন্তরাল হইতে তাহার অর্থপূর্ণ মন্তব্য ইত্যাদি তাহাকে একপ্রকার অসামান্যতা দিয়াছে। আমরা প্রথমে ঘনশ্যামকে স্থূল, নির্বোধ ও মূর্খ মনে করি। কিন্তু যতই তাহার কথা শুনি আমাদের মনের মধ্যে বিস্ময় সঞ্চিত হইতে থাকে। আমরাও যেন মনে মনে Rosalind অথবা Violaর মত বলিতে থাকি 'Thou speakest wiser than thou art ware of'* বা 'This fellow is wise enough to play the fool.'**

মিসেস পাকড়াশীর চরিত্রে ইঙ্গবঙ্গসমাজের গ্লানিকর প্রভাবটুকু পড়িয়াছে। এই প্রহসনে একমাত্র সে-ই প্রহসনকারের বিদ্রূপের পাত্রী। তাহার অশুদ্ধ ইংরেজী শব্দপ্রয়োগ শেরিডানের 'দি রাইভাল্‌স' প্রহসনের মিসেস ম্যালাপ্রপের অনুরূপ। মিসেস পাকড়াশী প্রোনাউন্সকে বলে 'প্রোনাউন্', মেণ্টালিটিকে 'মর্টালিটি', ন্যাচারাল্‌কে 'ন্যাশানাল্', ফিমেল এমান্‌সিপেশন্‌কে 'ফিমেল এম্যাষ্টিকেশন্', প্রোনান্সিয়েশান্‌কে 'পাংচুয়েশান', ইনফেমাস্‌কে 'ইনফেকশাস্'!

সঞ্জীব চৌধুরীর চরিত্র মিনির একটি কথায় ব্যক্ত হইয়াছে— 'এই সংসারের মঙ্গল-ঘট।' সঞ্জীবের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ মিলিটারী মেজাজের কথা, হিন্দি বুলি ও গান অমৃতলালের রচনাকৌশলের সার্থক নিদর্শন। চমৎকারের সহিত একদিকে সে যেমন রঙ্গরসিকতা করিতেছে, অন্যদিকে তেমনই মিসেস পাকড়াশীর সহিত তাহার শ্লেষাঢ্য বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছে! চমৎকারের নিকট বাংলা গান ও বাংলা ভাষার কোমলতা সম্পর্কে সে বলে, 'রাগে থাপ্‌ খায়না, বিবি, আলাপে কর্‌তপ্‌

* 'As You Like It' (Act II Sc. IV)

** 'Twelfth Night' (Act III Sc. I)

হয় না, বয়েদ মর্দানা নয়…।' বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাহার মত— "যে ভাষায় 'চোপ রাও', 'হারামজাদ', 'বেয়াদব', 'বদমায়েস' নেই, 'ড্যাম', 'র‍্যাস্কেল', 'গো-টু-হেল' নেই, সে ভাষা আবার ভাষা ! বড় জোর অধঃপাতে যাও— !"

অপ্রধান চরিত্রগুলিও স্বাভাবিক রূপ লাভ করিয়াছে। মিসেস পাকড়াশীর ব্যবহারে অতিষ্ঠ ব্রজ-বাবুর্চির ক্ষোভপ্রকাশক বাঙাল ভাষা, শ্রীধর-ঠাকুরের উড়িয়া, বেহারার দেহাতি হিন্দী এবং সখীর মায়ের কলিকাতার ঝিয়ের ক্ষুরধার বচন কথ্য এবং আঞ্চলিক ভাষার উপর অমৃতলালের অসাধারণ আধিপত্যের প্রমাণ দিতেছে।

'ব্যাপিকা-বিদায়ে' মিনির আনন্দোচ্ছল দাম্পত্যজীবনের পাশে বিধবা লীলা লাহিড়ীর চরিত্রচিত্রণ উদ্দেশ্যমূলক। বিধবাদের বিষয়ে বা বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে অমৃতলালের মন যে সংস্কারবদ্ধ ছিল না তাহা এই প্রহসনে স্পষ্ট হইয়াছে। জটিল ও লীলার কথোপকথন হইতে তাহাদের ভাবী পরিণয়ের ইঙ্গিত বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হয় না। বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে অমৃতলালের মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে তাঁহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রগতিবিরোধী মনে হইবে না। 'তরুবালা'র (১৮৯১) বিধবা-বিবাহের অযৌক্তিকতা তিনি যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; আবার বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত 'বিলাপ' (১৮৯১) নামক শোকনাটিকায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। 'বাবু' (১৮৯৪) এবং 'খাস-দখলে' (১৯১২) বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনকারীদের অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরকে উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু 'ব্যাপিকা-বিদায়ে' লীলার নিঃসঙ্গ অপূর্ণ জীবনকে বিবাহ-বন্ধনের দ্বারা পূর্ণতা দিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

মিসেস লাহিড়ীর আঁকা মিনির ছবিটি নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টিতে সফল হইয়াছে। ছবিটিকে উপলক্ষ করিয়া পুষ্পবরণ ও লীলার প্রতি মিনির অমূলক সন্দেহ যে প্রেম-জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রেরণা সম্ভবত Moliere-এর *Sganarelle* রঙ্গনাট্যটি। সেখানে প্রণয়ী Lelieর ছবি-আঁকা লকেটটি মূর্ছিতা Celieর নিকট হইতে হারাইয়া গিয়া অনুরূপ জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। লকেটটিকে কেন্দ্র করিয়া Sganarelleর প্রতি তাহার স্ত্রীর, স্ত্রীর প্রতি Sganarelleর এবং Lelieর প্রতি Celieর ও Celieর প্রতি Lelieর অযথা সন্দেহ রীতিমতো আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে। শেষে প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইলে 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র মতোই মিলনান্ত পরিণতি।

'ব্যাপিকা-বিদায়' প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে।[৭৬]

১৯২৬ সনের ১০ই জুলাই শনিবার মিনার্ভা থিয়েটারে 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র প্রথম অভিনয় হয়। মিনার্ভা থিয়েটার হইতে যে অভিনয়-বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত ছিল—

'ক্লান্তিপ্রদ পরিশ্রমে কাতর না হইয়া এই প্রাচীন বয়সে নাট্যকার নিজে অভিনয়-অভ্যমন-প্রসাধন নির্বাচন ও পটস্থাপনাদি সকল কার্য আপন তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত করিয়াছেন।'[৭৭]

অভিনয় দর্শনের পর হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁহার 'নাচঘর' পত্রে লেখেন—

"গেল শনিবার 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র প্রথম অভিনয় রাত্রে অন্তত আমার মন বারবার ধন্য না মেনে পারেনি।... পাকা পাকা বুলি আর অপর্যাপ্ত হাস্যরস— যে দুটি বিশেষ দুর্লভ বিশেষত্বের জন্যে অমৃতলালের অনেক প্রহসন আখ্যানবস্তুর কোন তোয়াক্কা না রেখেই প্রথম শ্রেণীর উপভোগ্য নাট্যে পরিণত হয়েছে—'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র মধ্যেও তার অভাব নেই কিছুমাত্র। ঘণ্টা তিনেক ধরে দর্শকরা খালি হেসেছে এবং হেসেছে এবং হেসেছে! 'খাস-দখলে'র পর প্রহসন দেখে এত আমোদ আর আমি পাইনি এবং একথা আমার অত্যুক্তি নয়, একথা আর সকলেও বলতে বাধ্য! প্রহসনে অমৃতলাল যে আজও অদ্বিতীয় 'ব্যাপিকা-বিদায়' তারই জলন্ত প্রমাণ!..."[৭৮]

অমৃতবাজার পত্রিকা (৮ই আগস্ট ১৯২৬) সমালোচনাপ্রসঙ্গে লেখেন—

"The new play 'Byapika-Bidaya' at the Minerva Theatre is running before packed houses....The play on the whole is bound to be popular. If anybody wants to laugh to his heart's content and to be cured of his dyspepsia 'Byapika-Bidaya' is the play to help him."

৭৬ 'চিরপূজ্য বর্তমান বঙ্গের বিদগ্ধ পুরুষ ও বঙ্গীয় নাট্যকলার প্রথম প্রতিপোষকাগ্রগণ্য মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের...উত্তরাধিকারী মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুরের অমায়িক স্নেহপ্রীতি স্মরণে তাঁহার গৌরবান্বিত নামে এই ক্ষুদ্র দৃশ্যলীলাখানি' উৎসর্গীকৃত।

৭৭ 'নাচঘর': ২৪এ আষাঢ় ১৩৩৩

৭৮ 'নাচঘর': ৩১এ আষাঢ় ১৩৩৩

শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,

" 'ব্যাপিকা-বিদায়' দেখতে দেখতে এমন জমে গেল যে, সমস্ত থিয়েটারকেই বেশ চঞ্চল ক'রে তুলল। শুনলাম শিশিরবাবু চেষ্টা করছেন অমৃতলালকে নেবার জন্য। স্টার থেকে গেলেন প্রবোধবাবু।"[৭৯]

২১

'ব্যাপিকা-বিদায়' রচনা করিয়াই কয়েক মাসের মধ্যে অমৃতলাল স্টারের জন্য রচনা করিলেন 'দ্বন্দ্বে মাতনম্'। নামকরণে অসাধারণত্ব আছে। বন্দে মাতরমের ধ্বনিসাদৃশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঙালীর আদর্শভ্রষ্টতার প্রতি এমন অব্যর্থ ইঙ্গিত—তাঁহার শব্দসৃষ্টি ও প্রয়োগপটুতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। প্রহসনটি রচনার ইতিহাস জানিতে পারি শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিকথা হইতে—

"সেই সময় কলকাতা কর্পোরেশনের একটা ইলেকশন আসন্ন ছিল।* তখন থেকেই 'ভোট ভোট' চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। ঐ ভোট-যুদ্ধকে ব্যঙ্গ করে ভোটের ব্যাপারটা যে কত অন্তঃসারশূন্য— সেটা বুঝিয়ে একটা নাটক লিখলেন অবিলম্বে, এবং সেটি মিত্র থিয়েটার বা মিনার্ভা নয়, দিলেন আমাদের।"[৮০]

'দ্বন্দ্বে মাতনম্' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সনে। অমৃতলাল প্রহসনটিকে 'হাস্যোৎসব' বলিলেও গভীর চিন্তার বিষয় ইহার সর্বত্র দৃষ্ট হয়। 'বন্দে মাতরম্' এর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তুচ্ছ ভোটের ব্যাপার লইয়া আমরা কিরূপ দ্বন্দ্বে মাতিতে পারি তাহাই এই প্রহসনের প্রতিপাদ্য। প্রহসনকার এবারও গতানুগতিক অঙ্কবিভাগ না করিয়া অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন। প্রথমে 'স্বস্তিবাচন' ও তারপর যথাক্রমে 'বোধন' ও 'উৎসবারম্ভ— সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও বিজয়া'। রঙ্গব্যঙ্গে ওতপ্রোত গান আছে দশটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০।

বহুদর্শী অমৃতলাল আমাদের দেশপ্রেমের ভয়াবহ বিবর্তন অবশ্যই লক্ষ্য

---

৭৯ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি', পৃ ৫১৯

* এই সময়ে অমৃতলালের উপন্যাস 'হামিদের হিম্মৎ' মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। ১১শ ও ১২শ পরিচ্ছেদে অমৃতলাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশনের 'তিন-সনা গাজনে'র ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছেন।

৮০ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি', পৃ ৫২৭-২৮

করিতেছিলেন এবং নির্বাচন-দ্বন্দ্বের অশুভ প্রভাব তাঁহার মনকে পূর্ব হইতেই পীড়িত করিতেছিল।[৮১] তাঁহার অন্যান্য প্রহসনে 'প্রস্তাবনা'র যে বৈশিষ্ট্য, এখানে 'স্বস্তিবাচনে'ও সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। ভোটেশ্বরী দেবীর সম্মুখে গীত গানটিতে ভোটদ্বন্দ্ব ও ভোটপ্রার্থীদের আচরণ বিদ্রূপের সহিত বর্ণিত।

অমৃতলালের অধিকাংশ প্রহসনের মত 'দ্বন্দ্বে মাতনম্'ও চরিত্রের চিত্রশালা। বস্তুত কাহিনী অপেক্ষা চরিত্রসৃষ্টির দিকেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার আদর্শ।

ভোটপ্রার্থীদের আচরণ প্রহসনের সর্বত্র অমৃতলালের তিক্ত বিদ্রূপ লাভ করিয়াছে। একটি ভোটের জন্য যাহারা ঘুঁটে-কুড়ুনী গোবরার মাকে 'গোবর বাবুর মা' বলিয়া সম্মান দেখায় তাহারাই আবার 'জ্যেঠামশাই' ভোট কাড়িবেন এই ভয়ে তাঁহাকে উকিলের চিঠি দিবে বলিয়া শাসায়, বাড়ির মাঝখানে পাঁচিল তুলিয়া দিবে বলিয়া আস্ফালন করে! মুমূর্ষুর ভোটও তাহারা ছাড়িতে নারাজ! বলে— 'উইল দেখিয়ে ওঁর দৌত্তুরকে দিয়ে ভোট দেওয়াবো।' ক্ষীরোদ, নীরদ ও প্রকাশের দলগত স্বার্থরক্ষার জন্য অত্যুৎসাহ বাস্তবতাপূর্ণ। সারদাসুন্দরীর গানে ও কথায় ভোট সম্পর্কে ও ভণ্ড দেশ-সেবকদের সম্পর্কে নির্মম মন্তব্য প্রকাশিত। সে যেন প্রহসনকারের মুখপাত্রী। তাঁহার গানে আজও অনেকেরই মনোভাবের প্রতিধ্বনি শোনা যাইবে—

> 'রেয়োর* মতন ভোট-ভিখিরী সে যে
> দোরে দোরে ঘোরে ছাই;—
> বাজ পড়ুক এই রাজনীতিতে
> কাজ ক্ষতির কি বালাই।'

নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া নেতারা যে 'ক্যানভাসার'দের চিনিতে পারেন না তাহা সারদাসুন্দরীর তিক্ত উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে—

'আটটার সময় গিয়ে ধন্না দিয়ে দেউড়ীর বেঞ্চির উপর ব'সেছিলে, বেলা ডেড্ডার সময় একজন ডেপুটি দেশহিতৈষী দয়া ক'রে খবর দিলেন যে,

---

৮১ 'অকাল-বোধন' প্রবন্ধে (সোনার বাংলা ১৯এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০) এবং 'আনন্দময়ী কেন দ্বন্দ্বময়ী' কবিতায় (সোনার বাংলা ২৩এ আশ্বিন ১৩৩০) তিনি যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই 'দ্বন্দ্বে মাতনমে'র বীজ নিহিত ছিল।

* 'শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপস্থিত··· নাছোড়বান্দা ভিখারী।'— 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'— জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস, পৃ ১৮৭৪

হেড পেট্রিয়ট তখন একজন খুলনার মেথরের সঙ্গে কোলাকুলি কচ্ছেন, যায় তার সঙ্গে দেখা করবার ফুরসৎ নেই।'

সারদাসুন্দরীর দেশপ্রেম ভাবসর্বস্ব নহে। সে বলে, 'আমি করবো পিকেটিং আর তিনি করবেন পকেটিং, সে মেয়ে আমি নই।'

অপরিণামদর্শী হুজুগপ্রিয় বাঙালীর অবস্থা ফিরিওয়ালার মুখে ব্যক্ত—

'বাঙ্গালীকো হাম লোক সব নিকাল দিয়া, দেখো যাকে তেরি বাঙ্গালী ভোট ভোট করকে পাগল ভয়া, আউর হামরা দেশওয়ালী আদমী কাপড়া ফেরিসে মোটভি ঢোলাই করকে পইসা কামাতা।'

মুমূর্ষু গোবিনবাবুকে ভোটকেন্দ্রে লইবার জন্য যখন প্রতিপক্ষ দল মড়ার খাট সাজাইয়া হাজির হইল তখনই প্রহসনকারের বিদ্রূপ নির্মমতম হইয়াছে।

কলমদ্দি, তামিজ, ফকিরা প্রভৃতির কথোপকথন হইতে জানা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ সেই ১৯২৬ সনেই তাহাদের অশিক্ষিত মনে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর 'অ-মুসলমান' পরিচয়কে কটাক্ষ করা হইয়াছে রাধানাথের উক্তিতে।[৮২]

রাজবাহাদুরের চরিত্রটি বিচিত্র।[৮৩] সে দেবতা মানে, ভক্তি করে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে মানে না। ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, রাজনীতি সব বিষয়েই তাহার মতামত অদ্ভুত! তাহার মতে, 'সিরিয়া থেকে স্যূরীয় ক্রমে বাঙ্গলায় স্যুর্যি দাঁড়িয়েছে। ঐ সবিতা রাশিয়ার সোভিয়েট কথা থেকে হয়েছে তা জানেন?'* বিরাজের সহিত তাহার ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাও কৌতুকপ্রদ। তাহাদের আলোচনা হইতে জানা যায়, বশিষ্ঠ ঋষি বেলুচিস্থান হইতে এদেশে আসেন; অশোকের মাদার সাইডে গ্রীসিয়ান ব্লাড; চন্দ্রগুপ্তের টাইম হইতে ঈশ্বর গুপ্তের টাইম পর্যন্ত এদেশে রেসিটেশন প্রচলিত ছিল!

নামকরণেও হাস্যরস উৎসারিত হইয়াছে। যেমন, নেতার নাম 'নির্বাণবাবু', ডাক্তারের নাম 'সন্নিপাত সেন', কাগজের নাম 'বুকের পাটা'! গানগুলিও যথেষ্ট ব্যঙ্গ-প্রকাশক। রাখালবেশী বালকদের 'পোলিং গোষ্ঠলীলার গান',

[৮২] 'হিন্দুর নব-নামকরণ', 'শুভদিন' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও নক্‌শায়ও এই 'অ-মুসলমান' শব্দটিকে লেখক বিদ্রূপ করিয়াছেন।

[৮৩] চরিত্রটি শোভাবাজার রাজবাড়ীর অসীমকৃষ্ণ দেবকে লক্ষ্য করিয়া কল্পিত।

* ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় রাজবাহাদুরের উক্তিতে অদিতি চক্রবর্তীর নাম পাই। এই অদিতি চক্রবর্তী ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি সকৌতুক ইঙ্গিত।

কলিকাতায় ভোটের বিবরণ-প্রকাশক ভাল্লুকওয়ালার হিন্দী গান, 'নকল সকল শঠ' নেতাদের স্বরূপ-ব্যক্তকারিণী উড়িয়া রমণীদের গান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পুরোহিত গুরুচরণ পর্যন্ত নির্বাচনের মহড়া দেখিয়া 'পাল-পার্বণ' কথাটিকে বলিয়াছে 'পোল-পার্বণ'!

১৯২৬ সনের ১০ই নভেম্বর 'দ্বন্দ্বে মাতনম্' আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের তত্বাবধানে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, 'অভিনয়, প্রযোজনা ও সর্বোপরি নাটকটির প্রশংসাও হয়েছিল প্রচুর।'[৮৪] 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মন্তব্য করেন—

> 'The booklet is a masterly production with clever and pointed touch of pathos and humour without the venom in its interpretation— with regard to the present election phobia. The keen observation of the grey haired dramatist Sj. Amritalal did not fail to penetrate deeply into the situation as will be noticed from start to finish of the play... Apart from the merits of the composition the selection of the name *Dwande Matanam* has created a good deal of sensation in the town and eager spectators are daily pouring in numbers to witness the game...'[৮৫]

৮৪ 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি', পৃ ৫৩০

৮৫ The Amrita Bazar Patrika : 13. 11. 1926. ১৩৩৩ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'নাচঘরে' 'দ্বন্দ্বে মাতনমে'র বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হইলে অমৃতলাল এক খণ্ড 'দ্বন্দ্বে মাতনম্' নাচঘর-সম্পাদককে উপহার দেন। ১৮ই অগ্রহায়ণ 'নাচঘর' লেখেন— 'এইটেই তাঁর সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই গুণেই আমরা অমৃতলালকে এত ভালবাসি!' নাচঘরের মতে 'দ্বন্দ্বে মাতনম্' এই অসাধারণ নামের গুণেই গ্রন্থটি অমর হইয়া থাকিবে— " 'দ্বন্দ্বে মাতনম্' নাম যে আর কারুর মাথা থেকে বেরুত না তাতে আর ভুল নেই।"

'নাট্যরাসক', 'পঞ্চরং' ও 'একাঙ্ক নাট্যলীলা'

রঙ্গালয়ের প্রয়োজন ও বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অমৃতলাল কয়েকটি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে 'ব্রজলীলা' পৌরাণিক ও 'যাদুকরী' আরব্যোপন্যাসের কাহিনীভিত্তিক, এবং 'নবজীবন' সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় রচিত রূপক।[১]

ব্রজলীলা

'ব্রজলীলা' (নাট্যরাসক) ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা একটি গীতিনাট্য। তিনটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে একটি, দ্বিতীয় অঙ্কে দুইটি ও তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য; গান আছে ৪৭টি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩। কাহিনী গোপীদের বস্ত্রহরণ হইতে রাসমণ্ডপে রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন পর্যন্ত বিস্তৃত। ৪৭টি গানের মধ্যে একটি (৩২) জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' হইতে উদ্ধৃত। গানের মধ্যে মাঝে মাঝে 'কৃপাং কুরু', 'পাদমেকং ন গচ্ছতি' প্রভৃতি সংস্কৃত বাক্য বা বাক্যাংশ দেখা যায়। সেই সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে অনুপ্রাস। যেমন, কৃষ্ণের উক্তি—

"রাধা মম প্রেমের গুরু, বলি রাধা 'কৃপাং কুরু'…"

কিংবা

"শুন গো শ্রীমতী, তোমার প্রাণের পতি,
'পাদমেকং ন গচ্ছতি' ত্যজি বৃন্দাবন॥"

রাধিকা, কৃষ্ণ, চন্দ্রাবলী, গোপী ও সখীদেব চরিত্র গানে গানে ভালই ফুটিয়াছে। শেষ দৃশ্য 'নিধুবন—রাসমণ্ডপ'; সেখানে সখীদের শেষ গানটিতে ব্রজলীলার মাধুরী সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে—

'আজি ব্রজ মাতিল রে।
ধরা হাসিল রে॥
ঢালি পরিমল, হাসে ফুলদল,
কোকিল কাকলী করে, মধুর লহরে রে।

---

১ ডি. ই. ওয়াচার সভাপতিত্বে কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতেছে তখনই এই সময়োপযোগী নাটিকাটি রচিত ও অভিনীত হয়।

হাসে রাধা-শশী, হাসে শ্যাম-শশী,
হাসি নভে শোভে শশী, সুধা ঝরিল রে।
রাসের রজনী, হাসিছে গোপিনী,
ব্রজবাসি-প্রাণ হাসে নব হাসি রে॥'

বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৮৩ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার 'ব্রজলীলা'র যে অভিনয় হয়[২] ১৯এ ফেব্রুয়ারী 'স্টেট্‌সম্যান' সে সম্পর্কে লেখেন—

"Bengal Theatre—The opera 'Brojo Lilla' was reproduced at this place of entertainment last Saturday before a large audience. The piece was well mounted and was a success throughout."

যাদুকরী

আরব্য উপন্যাসের জেলে ও দৈত্যের কাহিনী অবলম্বনে ১৩০৭ সালে অমৃতলাল 'যাদুকরী' নামে একটি পঞ্চরং রচনা করেন।* দুই অঙ্কের নাটিকা। প্রথম অঙ্কে ছয়টি ও দ্বিতীয় অঙ্কে সাতটি দৃশ্য। সূত্রপাতে 'প্রস্তাবনা'। গান আছে ২০টি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮। 'বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী' বর্ধমানাধিপতি বিজয়চন্দ্‌ মহাতাবের করকমলে 'যাদুকরী' উৎসর্গীকৃত।

'যাদুকরী'র কাহিনী এই— পাহাড় দ্বীপের রাজা অবলাসিংহের রাণী তড়িতা যাদুকরী। রাজার অজ্ঞাতে সে কাফ্রী ভৃত্য শম্বরের প্রেমাসক্ত। তড়িতার সখী সোনালী ইহা রাজার গোচরে আনিলে রোষান্ধ রাজা শম্বরকে হত্যা করায় রাণী রাজপুরী জঙ্গলময় ও রাজার অর্ধাঙ্গ প্রস্তরময় করিয়া দিল। পরে সোনালী রাণীর যাদুদণ্ড চুরি করিয়া প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা হরদম সিংয়ের সহায়তায় রাজাকে যাদুমুক্ত করিল।

আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর ন্যায় যাদুকরী এখানে নিহত হয় নাই, নির্বাসিত হইয়াছে। শম্বরকে এখানে পুনর্জীবিত ও কিছুটা বিবেকবোধসম্পন্ন করা হইয়াছে। সোনালীর চরিত্র সর্বাধিক উজ্জ্বল। তাহার রঙ্গপ্রিয় মনোভাব

---

২ অভিনেত্রী বিনোদিনীর 'আমার কথা' হইতে জানিতে পারি, অমৃতলাল এই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

* দ্বি. স. ১৩১১

কথায় ও গানে সুপরিস্ফুট। তিনকড়ি জেলের চরিত্রে বিশিষ্টতা আছে। পারিষদদের স্তাবকতাও মন্দ নহে। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে হাস্যরসাত্মক অনেক উক্তি আছে। পরী ও অপ্সরাদের গানে অমৃতলালের হিন্দীভাষায় অনায়াস পটুতা সুস্পষ্ট। রাজবাড়ীতে আত্মীয়-প্রতিপালনের বাস্তবতাপূর্ণ নিদর্শন ফুটিয়াছে সোনালীর এই গানে—

'রাজার বাড়ীর ভাত রাঁধা বড় শক্ত কারখানা।
এতে চালাকি চাই চৌদ্দ গণ্ডা বুদ্ধি দু আনা॥...'

সমাজের 'বুড়ো শালিক'দের চরিত্রভ্রষ্টতাকে কশাঘাত করা হইয়াছে উজীরের মুখের 'ভদ্রতন্ত্রের বচনে'—

'ব্যভিচার কদাচার কিছু ক'রো না বাকী।
যদি দিতে পার লুকিয়ে রেখে লোকের চোখে ফাঁকি॥'

১৯০০ সনের ২৫এ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে 'যাদুকরী' প্রথম অভিনীত হয়।[৩] 'বেঙ্গলী' সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন—

'With *Jadukari* on board, the Star Theatre has for the last few weeks been drawing bumper houses. *Jadukari* is a pantomime of very great merit. It is just after English Pantomimes and written accordingly. And this novel plan on the part of Mr. A. L. Bose has been eminently successful. To the so-called people the origin of the plot may not be much encouraging. To the thinking portion it is significant and instructive...The latest production speaks eloquently of the versatility of the distinguished playwright and accomplished Indian Dramatist Mr. A. L. Bose.'[৪]

৩ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (১ম) গ্রন্থে অভিনয়ের তারিখ দেওয়া আছে ২০.১২.১৮৯৯ (পৃ ৫৪), ইহা ভুল।

৪ The Bengali : 26. 1. 1901. পুনরায় ২রা মার্চ বেঙ্গলীতে 'যাদুকরী'র অন্তর্নিহিত শ্লেষ সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য করা হয়—

'*Jadukari* or the Sorceress is a satire from the pen of that able humourist Babu Amrita Lal Bose...It is a true sketch of the social and political foibles of our people...' ইত্যাদি।

নবজীবন

'নবজীবন' ('মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একাঙ্ক নাট্যলীলা') ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়।[৫] এই নাট্যলীলায় তিনটি দৃশ্য ও আটটি গান আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫। এই গানগুলির মধ্যে তিনটি অমৃতলালের, বাকিগুলি অপরের। 'নিবেদনে' তিনি এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"দ্বিজেন্দ্রনাথবাবুর 'মলিন মুখ' সত্যেন্দ্রবাবুর 'মিলে সবে' রবিবাবুর 'অয়ি ভুবন[মনো]মোহিনী' এবং বঙ্কিমবাবুর 'বন্দেমাতরং' এর পরিবর্তে আমার নূতন গান রচনা করিয়া দেওয়া ধৃষ্টতা— তাই সেই হৃদয়োন্মাদকারী অমৃতবর্ষী পদাবলী এই কয়েক পৃষ্ঠায় গ্রথিত করিয়া আমার ক্ষুদ্র গ্রন্থ পবিত্র করিলাম।"[৬]

১৮৭৩ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল থিয়েটারে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'ভারতমাতা' নাট্যের একটি মাত্র দৃশ্য অভিনীত হয়।[৭] 'নবজীবন' এই 'ভারতমাতা'রই ঈষৎ বিস্তারিত রূপ। উনত্রিশ বৎসর পরে 'এই নূতন রূপকখানি' রচনা করিবার মূলে অমৃতলালের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। 'নবজীবন' রচনা ও অভিনয়ের সময়ে কলিকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন চলিতেছিল। জাতীয় আন্দোলনের উদ্দীপনা যে রঙ্গালয়েও সঞ্চারিত হইয়াছে এবং রঙ্গালয়ও যে দর্শকচিত্তে দেশপ্রেম জাগ্রত করিয়া দেশবাসীর শুভবুদ্ধির উদ্‌বোধন ঘটাইতে পারে, তাহা প্রদর্শনই ছিল লোকশিক্ষক অমৃতলালের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আত্মচিন্তা ও স্বার্থপরতা এবং ভারত-সন্তানদের

৫ নাটিকাটি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পুত্র অমৃতলালের 'চিরকল্যাণভাজন' ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শৈশব-সুকুমার কোমল করে বড় আশায় বড় ভালবাসায়' অর্পিত।

৬ অমৃতলালের প্রথম নাট্যজীবনের সঙ্গী দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেখ গো ভারতমাতা গানটিও 'নবজীবনে'র অন্তর্ভুক্ত।

৭ 'নবজীবন' নাট্যে মহেন্দ্র বলিতেছে—'সেই ছোট একটি সিনে যে তখন কি grand sensation কোরে তুলেছিল···তা মনে হলে আজও আমাদের গর্ব হয়।' বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অমৃতলাল একবার বলিয়াছিলেন—'তখন সুরেন্দ্রবাবুও ছিলেন না আর কংগ্রেসও ছিল না। তখন নাটকের সাহায্যে সহরবাসী ও প্রবাসীর মনে এ সম্বন্ধে যে ধারণার বীজ বপন করা গিয়েছিল আজ তা-ই ফল-ফুলে ভরে উঠেছে···।' (রঙ্গভূমি, মাঘ ১৩০৭)

অসীম আলস্যই যে ভারতমাতার দুর্দশার একমাত্র কারণ তাহাই এই নাটিকায় ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রথম দৃশ্যে সুরেন্দ্র ও মহেন্দ্রের কথোপকথনে জাতীয় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি পর্যালোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে বিষণ্ণা ভারতলক্ষ্মী অসাড় ভারত-সন্তানদের জন্য বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বাহন পেচক মাঝে মাঝে শ্লেষপূর্ণ মন্তব্যে ভারতবাসীর বর্তমান মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। কেরাণী, গৃহিণী, পুরোহিত, সভাপতি, উকীল, ডাক্তার, কুসীদজীবী প্রভৃতি সকলেই স্বার্থচিন্তায় মগ্ন, দেশের দুরবস্থার কথা কেহই ভাবে না। তৃতীয় দৃশ্যে ভারত-মাতার বিলাপ ও নির্বীর্য ভারত-সন্তানদের সংলাপে যখন দেশের বর্তমান ও ভাবী দুঃসময়ের চিত্র ফুটিতেছে তখন কয়েকজন নূতন ভারত-সন্তান ও ভারত-রমণী আসিয়া স্বদেশকল্যাণের সংকল্প ব্যক্ত করিল।

স্টার থিয়েটারে ১৯০২ সনের ১লা জানুয়ারী বুধবার 'নবজীবন' প্রথম অভিনীত হয়।[৮] অভিনয়ের দিন 'বেঙ্গলী' (১. ১. ১৯০২) মন্তব্য করেন—

'*Navajiban* breaths sentiments of genuine patriotism and burning words of devotion of one's motherland... We doubt not this evening's entertainment will draw a bumper house.'

স্টেট্‌সম্যান ২১এ জানুয়ারী নাটিকাটির বিষয়ে লেখেন, 'The piece abounds in clever and sensational situations...'[৯]

---

৮ অভিনয়ের কিছুদিন পূর্বে 'ভারতমাতা'-রচয়িতা কিরণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। 'নবজীবনে' মহেন্দ্র এইজন্য শোক প্রকাশ করিয়াছে।

৯ 'রঙ্গালয়' (১৮ই মাঘ ১৩০৮) নাটিকাটি সম্পর্কে বিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শোকনাট্য

অমৃতলাল দুইটি শোকনাট্য রচনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে 'বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন' এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে 'বৈজয়ন্ত-বাস'। দুইটি নাটিকাই কয়েকটি শোকগীতি-সমন্বিত একাঙ্কিকা।

বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন

১৮৯১ সনের ২৯এ জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত 'বিলাপ। বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন' অভিনয়ের দিনই (২২. ৮. ১৮৯১) প্রকাশিত হয়। পাঁচটি দৃশ্য সমন্বিত এই একাঙ্কিকায় সাতটি শোকগীতি আছে। নাটিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬।

নাটিকাটিতে বিদ্যাসাগরের নানাবিধ কর্ম ও সাধনাব প্রতি অমৃতলালের শ্রদ্ধা নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম দৃশ্যে সরস্বতীর কমলবন। শোকে কমলবন মুদিত। বিপন্না বঙ্গভাষার আর্তনাদ ও তাহাকে সরস্বতীর সান্ত্বনাদানের মধ্য দিয়া বিদ্যাসাগরের গুণগরিমা ও দেশের সর্বব্যাপী শোকের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে নিমতলার ঘাটে বিদ্যাসাগরের চিতার অদূরে পাঁচজন নাগরিকের কথোপকথনে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপিত। বিদ্যাসাগরের কীর্তিকলাপও নানাদিক দিয়া বিশ্লেষিত। কেহ বলিতেছে, 'বিপদের বন্ধু আর কোথায় পাব', কেহ বলিতেছে, 'বিধবা-বিবাহের মতটা প্রচার না কল্লে চন্দ্রে আর কলঙ্ক থাকত না', কেহ আবার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বিদ্যাসাগরের চারিত্রধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছে। চতুর্থ নাগরিকের উক্তিতে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে অমৃতলালের মত ব্যক্ত হইয়াছে— 'ব্রহ্মচর্য পালনাক্ষমা বালিকা-বিধবার বিবাহ দেওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।'[১০] তৃতীয় দৃশ্যে কর্মাঠার-সন্নিহিত পার্বত্য প্রদেশে দয়া ও ব্রাহ্মণের কথোপকথনে বিদ্যাসাগরের

১০ কয়েক মাস পূর্বে রচিত 'তরুবালা' নাটকে বিধবা শান্ত যে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করিয়াছে তাহার কারণ, সে 'ব্রহ্মচর্য পালনাক্ষমা' নহে।

সহৃদয় হৃদয়ের প্রশস্তি করা হইয়াছে। পরবর্তী দৃশ্য স্বর্গপথ; ঋষিদের উক্তিতে বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য বর্ণিত। ঋষিদের উক্তি পয়ার ছন্দে ব্যক্ত। শেষ দৃশ্যে বৈকুণ্ঠপুরীতে বিদ্যাসাগরের পুণ্যাত্মাকে আবাহন করা হইয়াছে। সরস্বতী, বঙ্গভাষা, নাগরিকগণ, সাঁওতালগণ, দয়া, অপ্সরাগণ প্রভৃতির শোকগীতি বিদ্যা-সাগর-চরিত্রের নানাদিক পরিস্ফুট করিয়াছে।

স্টার থিয়েটারে ২২এ আগস্ট ১৮৯১ 'বিলাপ' প্রথম অভিনীত হয়।'[১০ক] 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকা সমালোচনাপ্রসঙ্গে প্রতিটি দৃশ্য বিশ্লেষণ করিয়া নাট্যতাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের সমালোচনা হইতে অধ্যক্ষ অমৃতলালের নাট্য-প্রদর্শন-নৈপুণ্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়—

> 'The last scene, an unusually skilful one, carries the spectator in imagination to the pleasure of Paradise, where the Pundit is being received among its immortal inhabitants evidently delighted at his advent. The venerable seer is decorated with flowery garlands, and on this happy scene the curtain falls leaving the audience in a state of mingled grief and joy.'[১১]

বৈজয়ন্ত-বাস

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু (২২. ১. ১৯০১) উপলক্ষে 'বৈজয়ন্ত-বাস' রচিত হয়। প্রচ্ছদলিপি হইতে জানিতে পারি 'শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গগমন উপলক্ষে কলিকাতা ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায়ের অশ্রু-জলকণা অধ্যক্ষ শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্তৃক শোকহারে গ্রথিত।' এই ক্ষুদ্র শোক-নাট্যটিতে দৃশ্য আছে চারিটি, শোকগীতি আছে পাঁচটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭। 'বৈজয়ন্ত-বাস' 'বিস্তীর্ণ ভারতের

১০ক দেশের বরেণ্য ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকনাটিকা রচনা করিয়া রঙ্গালয়ের পক্ষ হইতে দেশবাসী শোকাকুল মনোভাবকে আর কেহ অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

সমস্ত রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের করকমলে···দীন বঙ্গবাসী লেখকের দ্বারা উৎসর্গীকৃত।'[১২]

প্রথম দৃশ্যে রাজভট্ট ও অনুচরবর্গের গান এবং রাজভট্টের কথায় মহারাণীর মৃত্যুজনিত আক্ষেপ ব্যক্ত। দ্বিতীয় দৃশ্যে ব্রিটানিকা, ইউরোপা, এসিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার কথোপকথনে এই সকল মহাদেশে মহারাণীর গৌরবময় প্রভাবের ইতিহাস প্রকাশিত। এসিয়ার উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন ভারতের সর্বাঙ্গীন গৌরবের কথা। তৃতীয় দৃশ্যে কলিকাতার নাগরিকদের মধ্যে তিনকড়িমামারও অবির্ভাব হইয়াছে। মহারাণীর মৃত্যুজনিত শোকের প্রতিক্রিয়া নানাভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির উক্তিতে পরিস্ফুট। শেষ দৃশ্যে অপ্সরাগণের সঙ্গীতে মহারাণীর পুণ্যাত্মাকে ত্রিদিবধামে আবাহন করা হইয়াছে।

তিনকড়িমামার চরিত্রবৈশিষ্ট্য এখানেও অক্ষুণ্ণ। তাহার আত্মপ্রত্যয় ও অবিচল মতবাদ এখানেও অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। সে নাট্যকারেরই মুখপাত্র।

'বৈজয়ন্ত-বাস' অভিনীত হয় নাই। ১৯০১ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী স্টার থিয়েটারে বিভিন্ন নাটকের অভিনয়কালে দর্শকদের মধ্যে 'বৈজয়ন্ত-বাস' বিনামূল্যে বিতরিত হয়। ৭ই ফেব্রুয়াবী অধ্যক্ষ অমৃতলাল অভিনয়-বিজ্ঞাপনে জানান—

'Dramatic literature demands that some record must be kept of the pious memory of our Beloved Sovereign. It is the custom of public theatres to demand door-money. But we cannot sell the tears shed by ourselves

১২ নাটিকাটির শেষে অমৃতলালের একটি পত্র মুদ্রিত আছে—

'পরম প্রেমাস্পদ

ভারত-সঙ্গীত-সমাজের সম্ভ্রান্ত সভ্যমহোদয়গণ সমীপেষু—

···এই হৃদয়বিদারী পবিত্র দিনে আপনারা যে আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে সেই পুণ্যময়ী ভিক্টোরিয়ার পুণ্যকীর্তির সম্মান রক্ষা করিয়াছেন··· এবং দীন আমরা—আপনাদিগের এই মহৎ কার্যে কাঠবিড়ালীর কার্য করিতে আমাদিগকেও যে আহ্বান করিয়াছেন, এই ঘটনা বঙ্গনাট্যসাহিত্যে স্থায়ী রাখিবার আশায় আজ এই কয় পংক্তি আমি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে লিপিবদ্ধ রাখিলাম।···'

and a loyal country on this solemn occasion. Hence the mournful lines written to record our *Grief* and commemorate Her Majesty's Accession to Heaven will be distributed along with Her Majesty's portrait free to our audience...''[১৩]

[১৩] The Bengalee : 7. 2. 1901

কবিতা

প্রহসনের ন্যায় অমৃতলালের কাব্যরচনারও সূত্রপাত হয় নিতান্ত বালক বয়সে। শ্লেষ-রচনায় সিদ্ধহস্ত কাকা প্যারিমোহন বসুর 'সাকরেদ' হইয়া তাঁহার নিকট বালক অমৃতলাল কবিতার পাদপূরণের শিক্ষানবিসি করিতেন। প্যারীকাকার নির্দেশেই তিনি মৃত রাজা রাধাকান্ত দেবের উদ্দেশে মধুসূদনের 'রেখো মা দাসেরে মনে' কবিতার ছন্দে একটি শোক-কবিতা রচনা করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের 'ভাস্করে' ইহা প্রকাশিত হয়। অমৃতলাল তখন চৌদ্দ বৎসরের বালক। এ সম্পর্কে অমৃতলাল বলিয়াছেন—

'এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অক্ষরে দেখি। কবিতাটি আমার নিজেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। কিন্তু শ্লেষ-রচনার দিকেই আমার প্রবণতা বেশী রহিয়া গেল।'[১]

পরবর্তীকালে তাঁহার কর্মজীবন নাটকরচনায়, অভিনয়ে এবং রঙ্গমঞ্চ-পরিচালনায় কাটিয়াছে। তথাপি তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই কবিতাবলীর কতকগুলি 'অমৃত-মদিরায়' (১৩১০) সংকলিত হইয়াছে, কিছু স্থান পাইয়াছে 'কৌতুক-যৌতুকে' (১৩৩৩)।

শেষজীবনে তিনি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবনকথা অবলম্বনে একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনীকাব্য রচনার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তিনি ঠাকুরের বাল্যজীবনের অংশটুকুই কেবল সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মাসিক বসুমতীতে তাঁহার স্মৃতি-সংখ্যায় কাব্যটি 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা' নামে প্রকাশিত হয়। কয়েক দিন পরে পুস্তিকাকারেও মুদ্রিত হয়।[২] ইহা ভিন্ন তাঁহার বহু কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

অমৃতলালের কবিদৃষ্টি বস্তু-নিরপেক্ষ ও ভাবময় ছিল না। তাঁহার কবিতার

---

১ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ৮৪। ইহার পূর্বে তিনি অবশ্য একটি আট পংক্তির 'চিত্রকাব্য' রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতাটিকে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'শব্দের গোঁজামিল মাত্র।'

২ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস কাব্যটিকে পাঁচালিতে রূপান্তরিত করিয়া এক সময় বহু মুগ্ধশ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

ভাষা ও ছন্দ প্রাচীন কবিদেরই অনুরূপ। এই সকল কবিতার ভাব ও ছন্দ লক্ষ্য করিলে তাঁহাকে দীনবন্ধুর সমসাময়িক এবং ঈশ্বর গুপ্তের প্রত্যক্ষ শিষ্য বলিয়া মনে হয়।[২ক] তবে তাঁহার ভাষায় যে-মৌলিকতা আছে তাহা তাঁহার কবিতাগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে। এই সকল কবিতার আলংকারিকতা-পূর্ণ সরস বাগ্‌ভঙ্গীর সহিত ঈশ্বর গুপ্তের সকৌতুক বাক্‌চাতুর্যের বহুল সাদৃশ্য থাকিলেও অমৃতলালেব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ সর্বত্র পবিস্ফুট। তাঁহার কাব্যে পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক জীবন হইতে লব্ধ উপকরণের সহিত যে সব অলংকার প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা একান্তভাবেই তাঁহার আপন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। আমাদের সামাজিক জীবনে ইংরেজের শাসন যে প্রভাব ও পরিবর্তন আনিয়াছিল তাহার মধ্যে অমৃতলাল গুপ্তকবিরই মত ব্যঙ্গকৌতুকের উপাদান খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।

কবিতার বিষয়-নির্বাচনে তাঁহাব কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। যাহা তাঁহার চিত্তে রসসঞ্চাব করিয়াছে, তাহাই তাঁহার কাব্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অনেক কবিতায রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সমস্যাব আভাস আছে। এই সব কবিতায় রঙ্গব্যঙ্গের অন্তরালে সমসাময়িক ঘটনার ও বাংলাদেশেব অন্তর্লোকের নির্ভুল পরিচয় আমরা লাভ করিতে পারি।

তিনি প্রধানত নাট্যকার ছিলেন বলিয়া নিরপেক্ষ দ্রষ্টাব নির্লিপ্তি লইয়া তাঁহার চারিপাশের জগৎ ও জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য সকৌতুকে দেখিতে পারিয়াছিলেন। সুকবি ছিলেন বলিয়া ছন্দ, অলংকার ও মিলেব জন্য তাঁহাকে কখনই কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই। তবে মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলাকাব্যের রীতি ও প্রকৃতিতে একাধিক বার যে হাওয়া-বদল হইয়াছে তাহার কোনও প্রভাব অমৃতলালের কাব্যে নাই। অত্যন্ত সচেতনভাবেই এই প্রভাব তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন। এজন্য শিক্ষিতসমাজের উপহাসকেও তিনি বরণ করিতে প্রস্তুত—

'আমি এক আছি পড়ে সেকেলে বাঁধিয়ে।
করিনু গোঁয়ারগিরি পয়ার ছাঁদিয়ে॥

২ক এ সম্পর্কে 'মানসী ও মর্মবাণী'র মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—'গুপ্তকবির অমৃতরসধারা আমাদের বসু-কবির হাতে বসুধারার মতই বহিতে থাকে..., কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে যজ্ঞপণ্ড না হয়, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, সে ভার কাহার উপর ন্যস্ত রহিবে?'—মানসী ও মর্মবাণী : অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

শিক্ষিতসমাজে জানি পাব উপহাস।
প্রস্তুত তাহার তরে আছে বসু-দাস॥'

('গ্রাম্য বীরাঙ্গনা' : অমৃত-মদিরা)

রসসাহিত্যসৃষ্টিতে অমৃতলালের উত্তরাধিকার যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৩২২ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'কাশীর কিঞ্চিৎ' নামক ব্যঙ্গকাব্যের কবিতাগুলির ভাব ও ছন্দ অমৃতলালের 'অমৃত-মদিরা'র অনেক কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়। কেদারনাথকে অমৃতলাল নিজে বলিয়াছিলেন যে, অনেকে 'কাশীর কিঞ্চিৎ' অমৃতলালেরই রচনা বলিয়া মনে করিতেন।[২৪]

অমৃতলাল তাঁহার কবিপ্রকৃতির স্বরূপ স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহার কালের আধুনিক কোন কবিরই রচনাভঙ্গী বা রসসৃজনপদ্ধতির সহিত তাঁহার সাদৃশ্য নাই, বরং কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত পয়ার-ত্রিপদীতে বাংলাকাব্যের যে ধারা অব্যাহত ছিল সেই পুরাতন ছন্দে কাব্য-রচনাই তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি লিখিয়াছেন—

"নাহি মনে উচ্চ আশ, মহাকাব্য গিরিবাস,
মধু দত্ত পাশে বসি নাহিক প্রয়াস।
না চাহি হেমের সনে নাচিতে বৃত্রের রণে
নবীন-নয়নে কিম্বা দেখিতে প্রভাস॥
নববঙ্গে রঙ্গলাল, খুঁজি ক্ষত্র তরোয়াল,
মাতালে বাদল বীরে চিতোর সমরে।
কাহিল লেখনী মোর, কোথা পাবে অত জোর,
মসীতে পশিতে ধীরে আগুপাছু করে॥
কবীন্দ্র সুরেন্দ্র বিনা, কে আর বাঁধিবে বীণা,
মহীয়সী মহিলার গাহিতে মহিমা।

২৪ দ্রঃ মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৩৬ ('অমৃতাস্বাদ' : কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। কেদারনাথ তাঁহার 'আত্মকথা'র (শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) লিখিয়াছেন, 'কাশীর কিঞ্চিৎ যখন প্রকাশিত হয় 'শ্রদ্ধেয় রসরাজ অমৃতলাল বসু তখন কাশীধামে ছিলেন। লোকে তাঁকেই লেখক বলে ঠাওরায়।'

ব্রাহ্মণ বিহারী বই আর ভাগ্যধর কই,
শুভদা সারদা যাঁর প্রেমের প্রতিমা ॥
রবির মেঘলা করে, দীন স্নায়ু ক্ষীণ করে,
যাই না হিমের ভরে ফিন্ জোছনায়।
নিজের গিয়েছে চোখ, 'চোখ গেল' বলে শোক,
বড়ই বাড়ায় ডেকে পাপিয়া ছানায় ॥
স্মরি কৃত্তিবাস নাম, এস কবি কাশীরাম,
কর্ণেতে ঝঙ্কার কর শ্রীকবিকঙ্কণ।
কোথা রায় গুণাকর, কোথা গুপ্ত কবিবর
তোমাদের ভাষা কর হৃদয়ে অঙ্কন ॥"

('নিবেদন' : অমৃত মদিরা)

২

'অমৃত-মদিরা' কাব্যগ্রন্থটি ১৩১০ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯০। এই সময় অমৃতলাল চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া দৃষ্টিহীন* ছিলেন। এই গ্রন্থে সংকলিত মোট তেষট্টিটি কবিতার মধ্যে অধিকাংশ কবিতাই তাঁহার 'সম্পূর্ণ অন্ধাবস্থায়' ও 'সঙ্কটাপন্ন পীড়ার অবস্থায় রচিত'। এই কবিতাগুলি তিনি মুখে মুখে রচনা করিতেন ও অন্যেরা তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন—

'যাহাকে যখন পাইয়াছি,—কোনরূপে যে আমার রসনার ভাষাকে অক্ষরের আকার দিতে পারিয়াছে, তাহাকে দিয়াই আমি রাশীকৃত খণ্ড খণ্ড কাগজ পূরাইয়া রাখিয়াছিলাম···।' ('পাঠকের প্রতি')

'অমৃত-মদিরা'র কবিতাবলীর কয়েকটি ('ক্ষুধাতুরের খেদ', 'স্মৃতির আদর' ও 'অন্তঃপুরে উদ্দীপনা') 'তাঁহার বহু পূর্বের লেখা'; দুইটি কবিতা ('হেমচন্দ্রের মুক্তি' ও 'বঙ্গের আর এক রঙ্গ') 'তিনি চক্ষু কাটাইবার পর,— বদ্ধচক্ষু,

---

* 'নিজে হয়ে দৃষ্টিহীন,
খেতে-শুতে পরাধীন,
বুঝিয়াছি মর্মে-মর্মে যাতনা তোমার।
অন্ধের বুকের মাঝে কি-যে অন্ধকার।'
—('হেমচন্দ্রের মুক্তি' : অমৃত-মদিরা)

সুতরাং অন্ধাবস্থাতেই আবৃত্তি করেন'; 'নূতন জীবন' কবিতাটি চক্ষু খুলিয়া দিবার দিন রচিত। ইহা ভিন্ন আর সকল কবিতাই তাঁহার অন্ধাবস্থায় বা সংকটাপন্ন পীড়ার মধ্যে রচিত।

বাংলাদেশের পাঠকের নিকট অমৃতলালের কবি-পরিচয়টি এখন লুপ্তপ্রায়। কবি অমৃতলাল যেন তাঁহার কাব্যের পরিণাম রচনাকালেই বুঝিয়াছিলেন। তাই আখ্যাপত্রে কৌতুকভরে লিখিয়া গিয়াছেন—

'পুরিবে কীটের পেট, কিছু বা পাঠাবে ভেট,
পড়িলে পড়িতে পারে কোন সুলোচনা।'

অমৃতলাল তাঁহার কবিতার প্রকৃতি ও কাব্যধর্মের স্বরূপ নিজেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন 'অঞ্জলি' ও 'নিবেদন' কবিতায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা'— অমৃতলালের কবিতা সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। নিজের বাঙালীয়ানা সম্বন্ধে পুরামাত্রায় সচেতন অমৃতলাল তাই নিজের কবিতাবলীকে 'দিশি ফুলদল' বলিয়াছেন। পিতামহ কালীকৃষ্ণের স্মৃতিব উদ্দেশে এই কাব্যপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

'আমার এ ফুলহার, কারে দিব উপহার,
সেঁউতি শেফালি নেবে কে ক'রে আদর।
মণ্টোক্রিষ্টো পল্‌নিরো এখন ফুলের হিরো,
প্রকাণ্ড অর্কিডগুচ্ছ কাঞ্চনের দর॥

... ...

সূর্যমুখী ভরাগন্ধ কুন্দ যে নয়নানন্দ,
জবা বক নিশিগন্ধা মানসমোহন।
সব হ'ল পুরাতন, বিদেশী পাহাড় বন,
কুসুমকানন বঙ্গে রচেছে নূতন॥' ('অঞ্জলি')

ছন্দের ক্ষেত্রে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা না দেখাইয়া তিনি স্বেচ্ছায় পয়ার-ত্রিপদীই অবলম্বন করিয়াছেন। তবে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হিসাবে অলংকার প্রয়োগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি এই সব কবিতায় রাখিয়াছেন, তাহাতে অনেক কবিতাই গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে তাঁহার নিজের কৌতুকরসরসিকতা, যাহা সমকালীন অন্যান্য কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে 'অমৃত-মদিরা'কে চিরদিনই বিশিষ্ট করিয়া রাখিবে।

বিষয়বস্তু অনুসারে 'অমৃত-মদিরা'র কবিতাবলীকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, (ক) দেবতা ও অবতারকল্প মহামানবের স্তুতি, (খ) কবি, সাহিত্যিক ও গুণীব্যক্তির প্রশস্তি, (গ) পরিচিত জনের মৃত্যুতে শোক, (ঘ) সমসাময়িক ঘটনা ও কবিমানসে তাহার প্রতিক্রিয়া, (ঙ) ব্যক্তিগত জীবনের খণ্ডচিত্র ও জীবনদর্শন, (চ) রঙ্গব্যঙ্গ ও অনুকৃতি (Parody), (ছ) প্রকৃতি-বর্ণনা ও (জ) নারীর বিভিন্ন রূপ ও ভাব।

সরস্বতী, কালিকা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, মদনমোহন প্রভৃতি যে সব দেবদেবীর স্তুতি তিনি করিয়াছেন তাহাতে ভাবের অস্পষ্টতা বা দুরূহ তত্ত্বের গভীরতা নাই। হিন্দুর ধ্যানধারণায় এই সব দেবদেবীর যে রূপ বদ্ধ আছে, তাহারই প্রতিচ্ছবি এই সকল কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, সরস্বতীর রূপ এইভাবে বর্ণিত—

'ঢল-ঢল নেত্রপত্রে উজ্জ্বল কজ্জল।
প্রবাল-অধরে চারু কলা ঢল-ঢল॥
আলস্যে ললিত লাস্য হাস্যে নাট্যছল।
পীযূষপূরিত স্তনে মুক্তা ঝলমল॥'

কালিকার রূপ ভয় ও অভয় মিশ্রিত ভয়াল সুন্দর—

'দাঁড়াল দাঁড়াল বামা থামিল সমর।
চরণ হরণ ওই কৈল মহেশ্বর॥
অসুরনাশন অসি নাহি ঘোরে আর।
করাল বদনে নাহি ভীম হুহুঙ্কার॥
আঁধার কেশের রাশি নাহি লটপটে।
নরকর-হার-খেলা স্থির কটিতটে॥
গলবিলম্বিত ওই দৈত্যমুণ্ডমালা।
দুলিতে দুলিতে বন্ধ করে রক্ত ঢালা॥
ত্রিনয়নে ধ্বক্ ধ্বক্ অগ্নি নাহি জ্বলে।
বিশ্ব আর পদতলে নাহি টলমলে॥
চমকে চমক ভাঙে বুঝে বিবসনা।
হরহৃদি হেরি পদে কাটিল রসনা॥
জল স্থল বায়ু ব্যোম সব হ'ল স্থির।
আসন্ন প্রলয় ভয়ে ধরণী অধীর॥

দেখ পদ্মকরতল দেখ আঁখি খুলে।
সন্তানে অভয় মাতা দেন বাহু তুলে॥
আবার দেখরে চেয়ে কারে আর ডর।
অন্য কর প্রসারিত প্রবাহিত বর॥'

এই কবিতাটি রসরাজের অন্তর্লোকের এক বিচিত্র পরিচয় উদ্ঘাটিত করিতেছে। তিনি শুধু রঙ্গব্যঙ্গকার নহেন, তাঁহার অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে হিন্দুসাধকের একাগ্র ধ্যান-তন্ময়তা।[৩]

অমৃতলালের কুলদেবতা ছিলেন রাজরাজেশ্বর বিষ্ণু ('কুলের দেবতা বিষ্ণু রাজরাজেশ্বর'); তাঁহার ধর্মচিন্তায়ও বৈষ্ণবতার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ', 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ', 'শ্রীমতীর অভিসার' প্রভৃতি কবিতা তাঁহার সেই বৈষ্ণবতার ফল।

অমৃতলাল গুণগ্রাহী ছিলেন। 'কালীপ্রসন্ন ঘোষ', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,' 'নবীনচন্দ্র সেন,' 'হারাণচন্দ্র রক্ষিত,' 'লোকনাথ মৈত্র' 'দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর' প্রভৃতি কবিতায় তিনি তাঁহার সমকালীন কবি, সাহিত্যিক ও সমাজ-সেবীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রসঙ্গে কিছু রঙ্গরসিকতা করিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার বিরূপতা ছিল না। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' কবিতাটিতে (তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া বিশ্বখ্যাত হইবার দশ বৎসর পূর্বে) তাঁহার প্রতি অমৃতলালের সস্নেহ মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার প্রথম পর্বে তাঁহার প্রেম-কবিতাগুলিকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অমৃতলাল তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রেমকবি' হইবার পক্ষে একটি সঙ্গত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—

'কনককুসুমবনে জীবন প্রকাশ।
নয়ন খুলিতে দেখ রূপের বিভাস॥
রূপের কোলেতে হ'ল লালন-পালন।
সাক্ষাৎ সৌন্দর্য সব আত্মীয়-স্বজন॥

দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন, 'এই কবিতাটির মধ্যে একটি সৌম্যরস, একটি সুগভীর গুরুতার আভাস আছে, তাহা কালিকার মূর্তি আমাদের মনশ্চক্ষে নূতন করিয়া আঁকিয়া

কর্কশ কঠোর গুরু নাহি দিল দীক্ষা।
লীলায় খেলায় সুরু হ'ল চারু শিক্ষা॥

… … …

দেবেন্দ্র-মন্দির মাত্র এ মহানগরে।
মাধুরী হেরিতে জানে পূজার আদরে॥
সুষমা প্রতিমা সব হৃদি সুধাধার।
সৌন্দর্য সনেতে নাহি পশুর ব্যাভার॥

… … …

সুকণ্ঠ দেছেন বিধি সুচারু শ্রবণ।
ভাষায় মাধুরী ভাসে গীতে আলাপন॥
কবিতা সবিতাশিশু আলো করে মন।
প্রেমের জাহ্নবী বহে জুড়াতে জীবন॥
বাণীর কমলবনে গুঞ্জরি গুঞ্জরি।
মধুপান চিরদিন কুসুমে বিচরি॥
যেদিকে ফিরাও আঁখি সুষমার ছবি।
তবে রবি কেন নাহি হবে প্রেমকবি॥'

'নবীনচন্দ্র সেন' কবিতাটি উভয়ের সৌহার্দ্যের স্মৃতিতে স্নিগ্ধ। এই কবিতাটিতে কবির অন্তর্জীবনের এমন কথা প্রকাশ পাইয়াছে যাহা এতদিন অনভিব্যক্ত ছিল। আমরা জানিতে পারি রঙ্গকৌতুক তাঁহার ছদ্মবেশমাত্র—আসলে তিনি হাস্যরসের অভিনেতা।[৪] তাঁহার সেই 'বুকফাটা হাসি'র কথা নিজেই লিখিয়াছেন—

"আমিও লিখেছি বসে ভ্রাতার শ্মশানে।
'কালাপানি' হিন্দুয়ানি শ্লেষব্যঙ্গ গানে॥
শেষ দৃশ্যে 'হাসি' লিখি বাড়াতে উল্লাস।
সাধের কন্যার গণি শেষ কণ্ঠশ্বাস॥
একমাত্র সহোদরা রাখিয়া চিতায়।
'বাবু'খানি পরদিন করিয়াছি সায়॥

দিল।…ইহা পড়িয়া মনে হইয়াছিল অমৃতবাবুর হৃদয়ে বিষাদজাত কল্যাণময়ী কবিতা কঠোর-ভাবে তুকিভাবে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিয়াছে।' ('ভারতী', মাঘ ১৩১০)

৪ 'নিজ ব্যথা চেপে পারে দর্শকে হাসাতে'। ('লোকনাথ মৈত্র', পৃ ৮৪)

অনুজার দেহোপরে কাঁদে পড়ে জায়া।
'যাদুকরী' ধরে' গড়ি মায়াবিনী মায়া॥
গুরুপত্নী গিরিশের জায়া লয়ে ঘাটে।
'তাজ্জব-ব্যাপার' খানি খাটায়েছি নাটে॥"

দুঃখের এই কঠোর আঘাত হইতেই জীবনের একটি গভীর সত্য কবি লাভ করিয়াছেন—

'হৃদয়শোণিতে হয় জন্ম কবিতার।
অস্থি চূর্ণ করি তা'তে দিতে হয় সার॥
সুখের আসনে বসে' গণিয়া মোহর।
কে কোথা দেখেছে কবে ভাবের লহর॥'

তাঁহার শোককবিতাগুলি আন্তরিক এবং অকৃত্রিম। হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে 'হেমচন্দ্রের মুক্তি' কবিতাটি রচিত। হেমচন্দ্রের দুঃখ দারিদ্র্যগ্রস্ত নিরাশ জীবনের সহিত নিজের তৎকালীন রোগযন্ত্রণাকাতর হতাশ জীবনের একটা মিল তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাই হেমচন্দ্রের 'মৃত্যু' নহে, 'মুক্তি'তে তিনি 'আনন্দিত' হইয়া লিখিলেন—'সত্য আনন্দিত আমি মরণে তোমার···।' অমিতব্যয়িতার জন্য তিনিও যে হেমচন্দ্রেরই মত বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতে জানা যায়—

'আমিও করেছি কালে অর্থ উপার্জন।
শুনেছি মাতাল কানে সুখ্যাতি গর্জন॥
কিন্তু হে তোমারি মত,
ব্যয় করি অবিরত,
বর্ষায় আশ্রয়তরে বাঁধিনি কুটীর।
ভিজেছি তোমারি মত ঢেলে আঁখিনীর॥'

'স্মৃতির আদর' কবিতাটি 'ষ্টারের প্রখ্যাত গায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণি দাসীর স্বর্গলাভ উপলক্ষে' রচিত। রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নরনারীর তখনও কোন সামাজিক সম্মান ছিল না। ইহাদের সম্পর্কে অমৃতলালের চিরকালই প্রীতিপূর্ণ মনোভাব ছিল এবং তাহা একাধিক বার অকুণ্ঠ আন্তরিকতায় অভিব্যক্ত হইয়াছে—

'কতই সম্বন্ধ আহা ছিল তোর সনে।
শিষ্যা সখী সহচরী সব পড়ে মনে॥

রঙ্গমঞ্চে বারবার,
সম্পর্ক হয়েছে আর,
সুখে দুঃখে সম সাথী প্রবাসে সদনে।
নিমেষে ভুলিলি গঙ্গা দেখিয়ে শমনে॥'

'দিল্লীর বাসকসজ্জা', 'অভিষেক দরবার', 'দলপতির দরবারে', 'নগরের বিবাহ' প্রভৃতি কতকগুলি কবিতায় সমসাময়িক ঘটনাবলীর সহিত সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

বিলাতে সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে বড়লাট লর্ড কার্জন দিল্লীতে যে অভিষেক-দরবার আহ্বান করিয়া স্বয়ং রাজসম্মান গ্রহণ করেন তাহার প্রতিক্রিয়া দুইটি কবিতায় ব্যঙ্গমিশ্রিত সরসতায় ব্যক্ত। 'দিল্লীর বাসকসজ্জা' কবিতায় দিল্লীর সাজসজ্জা বর্ণিত হইয়াছে ছড়ার ছন্দে —

'চুল বাঁধ গো দুয়োরাণী মলিন বসন ছাড়।
আঁচলখানা দিয়ে কতক গায়ের ধুলো ঝাড়॥
গোসলখানায় আছে ধরা কলের গরম জল।
নলের তলায় বস্থঝারায় নাইতে হবে চল॥…'

'অভিষেক দরবার' কবিতায় এই বহু ব্যয়ে সম্পন্ন 'রাজসূয় মহাযজ্ঞে'র প্রতি কবির কটাক্ষ তীব্র। একস্থলে লিখিয়াছেন —

'জ'াকে হ'ল দরবার   নেয়া দেয়া টাকা ধার
কমিল না করভার প্রজা বোঝে তাই।'[৪ক]

কুমার অসীমকৃষ্ণ দেবের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রচিত 'নগরের বিবাহ' কবিতাটিতে নগরের বিবাহের সর্বাঙ্গীন চিত্র ফুটিয়াছে। কবিতাটিতে মহিলাদের ক্রিয়াকর্ম, পুরোহিত, নাপিত, মুরুব্বিদের ব্যবহার, ব্যাণ্ডের আওয়াজ, ভোজ্যের সমারোহ সবই আছে। ইহার অতিরিক্ত, যাহা অন্য কেহ লক্ষ্যও করেনা তাহা, ঈশ্বর গুপ্তের মত তির্যক দৃষ্টিতে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন —

৪ক কর্জনের দিল্লী দরবার উপলক্ষে লিখিত 'অত্যুক্তি' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছিলেন — 'আমাদের বিদেশী কর্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে, প্রাচ্য হৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে, এইজন্য ত্রিশকোটি অপদার্থকে অভিভূত করিতে দিল্লীর দরবার নামক একটি সুবিশাল অত্যুক্তি বহু চিন্তায় চেষ্টায় 'ও হিসাবের বহুরূপ কষাকষিদ্বারা খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন।' ('ভারতে জাতীয় আন্দোলন'— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ৮৮-৮৯ দ্রঃ)

'মাতা কন্যা উপবাসী, সর্বগ্রাসী যত দাসী,
রাশি রাশি বাসী লুচি গোপনে সরায়।
বোনপো আছে তো ঘরে, খাবে বেটা পেট ভরে',
নতুন ঝিয়ের সেটি সর্বস্ব ধরায়॥'

নারীর রূপ ও ভাবের বিভিন্নতা লইয়া অনেকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছে। 'রোষ-বিহ্বলা', 'মান', 'বিরহ', 'রূপবর্ণনা', 'স্নানান্তে', 'কিসে মন পাই', 'ইন্দ্রজাল', 'সোহাগিনী' প্রভৃতি কবিতা এই শ্রেণীতে পড়ে। এই কবিতাগুলি কবির মনের প্রসন্নতায় ও স্নিগ্ধ কৌতুকে সমুজ্জ্বল। গুপ্তকবির মত স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট শুধু ব্যঙ্গের পাত্রী নহে, আবার 'মহিলা' কাব্যপ্রণেতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মত নারীকে তিনি 'মহীয়সী মহিলা'-ও করিয়া তুলিতেও পারেন নাই। বরং 'চিরদিন রূপের পূজারী' দেবেন্দ্রনাথ সেনের রূপমুগ্ধ কবিদৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা সহজ। 'স্নানান্তে' কবিতায় অমৃতলাল লিখিয়াছেন —

'কি মাধুরী মরি মরি রূপ গেছে খুলে।
ভিজে ভিজে মুখখানি আধ ভিজে চুলে॥'

দেবেন্দ্রনাথের 'নারীমঙ্গল' কবিতায়ও কবিচিত্তের একই ভাব অভিব্যক্ত —

'নিশান্তে করিয়া স্নান, পরি শুভ্র শাটী
এলাইয়া তরঙ্গিল আর্দ্র কেশরাশি…'[৫]

নারীর রূপবর্ণনা করিতে গিয়া কবি তাহার অঙ্গের প্রতিটি অলংকার তাহার সৌন্দর্যের কতটা সহায়ক হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে ভুলেন না। দু'গাছি মকরবালার কোলে ঢেউ-খেলান-চুড়ি, আঙ্গুরপাতা অনন্ত, চিক, সাতনরী, কাঞ্চনের কাঁটা, ভ্রূমধ্যের খয়ের টিপ, বসুন্তীবরণ শাটী, ছয়গাছি মল, অলক্তরাগ প্রভৃতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন। সেইসঙ্গে—

'হাসিলে দশনে দেখি মুক্তাফল কটি।
ক্ষীণতনুমাঝে রাজে আরো ক্ষীণ কটি॥
ব্যথিতে সেবিতে মুক্ত কমনীয় কর।
হৃদয়ে বুলালে হাত অতি শান্তি-কর॥
কোমল কণ্ঠের স্বরে কোকিল কুহরে।
সরল তরল ভাবে মনের কু হরে॥' ('রূপবর্ণনা')

---

৫ 'অশোকগুচ্ছ'

তিনি সোহাগিনী, মানিনী, রোষবিহ্বলা নারীর যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহার সহিত কোন তত্ত্ব বা অস্ফুট অপ্রত্যক্ষ কল্পনা মিশ্রিত হয় নাই'। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার নারীপ্রকৃতিতে আত্মোৎকর্ষের যে মহিমা আরোপ করিয়াছেন এখানে সেরূপ কোন প্রয়াস নাই। দেবেন্দ্রনাথ সেনের আত্মবিস্মৃত রূপমুগ্ধতা বা গোবিন্দচন্দ্র দাসের দেহসর্বস্ব প্রেমলিপ্সাও এখানে অনুপস্থিত। নাট্যকার যেরূপ নিজেকে নিরপেক্ষ রাখিয়া চরিত্রসৃষ্টি করেন, কবি অমৃতলালও সেইরূপ দূর হইতে নারীর রূপ, তাহার ভাবপরম্পরা লক্ষ্য করিয়াছেন। 'কিসে মন পাই ?' একটি সুন্দর কবিতা। কবি যেন বাঙালী বধূর অন্তরের প্রধানতম বেদনাটিকে রূপ দিয়াছেন এই কবিতায়। কবিতাটি আগাগোড়া 'নারীর উক্তি।' 'তরুবালা' নাটকে তরুবালা যেমন স্বামীর মন পাইবার জন্য সব কিছু করিতে প্রস্তুত ছিল, এখানেও তেমনই স্বামীর নিকট স্ত্রীর প্রশ্ন— সেই একই প্রত্যাশায়—

'কি করিলে বল নাথ তব মন পাই।
কি পিপাসা পোষো প্রাণে বল না সুধাই ॥···
বল না শিখিব সাধি,
কি ছাঁদে কবরী বাঁধি,
রাখিব কি এক বেণী পিঠে ফেলে খুলে।
বাঁধিব বা এলো খোঁপা ফুলো ফুলো চুলে ॥'

এই দীর্ঘ কবিতাটি শেষের দিকে রোম্যান্টিকতায় স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে—

'বসন্তের বিভাবরী,
কাঁপিতেছে থরথরি,
টলমল অঙ্গতরি যৌবন-তুফানে।
ঢল ঢল প্রেমজল প্রাণে কানে কানে ॥
এস বঁধু বসি ছাদে,
আমি দেখি দুই চাঁদে,
চাঁদনীসাগরে দেব দু'জনে সাঁতার।
এক সুরে বাজাইব দুটি হৃদি-তার ॥
নিঝুম নীরব রাত,
অলস আবেশে নাথ,

সোহাগে গলিয়া আমি গাহিব বেহাগ।
ঝরিবে অক্ষরে স্বরে প্রেম অনুরাগ॥
কেশে কুন্তলীন গন্ধ,
বাতাসে ভাসিবে মন্দ,
গীতছন্দ সনে হবে মধুর মিলন।
যাপিব যামিনী সারা করে' জাগরণ॥...'[৬]

'মল' কবিতাটি দেবেন্দ্রনাথের 'ডায়মনকাটা মল' কবিতাটি স্মরণ করাইয়া দেয়।

প্রকৃতি ও ঋতুবর্ণনামূলক কবিতাগুলিতে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের মত বস্তুনিষ্ঠা ও কৌতুকপূর্ণ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় হইয়াছে। 'সমুদ্রবক্ষে' কবিতাটি পোর্টব্লেয়ার যাত্রাকালে (এপ্রিল, ১৮৭৭) সমুদ্রদর্শনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া দীর্ঘকাল পরে রচিত। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'নিসর্গ সন্দর্শনে' সমুদ্রদর্শনে কবির যে বিস্ময় ও উচ্ছ্বাস অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, এখানেও অমৃতলালের অনুরূপ মনোভাব স্ফূর্ত হইয়াছে। প্রমত্ত সমুদ্রের তরঙ্গগর্জন শুনিতে শুনিতে অমৃতলালেরও মনে হইয়াছে— 'খাই খাই মহাশব্দ বিশ্বজুড়ে করে।'

'ঋতুবর্তন' কবিতায় অমৃতলাল ষড়ঋতুর প্রশস্তি করেন নাই। প্রতি ঋতুর বাস্তব অসুবিধাগুলি সকৌতুকে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের মতে— 'ঋতুবর্তন ঈশ্বরগুপ্তের ঋতুবর্ণনার উপর কলাশ্রীসাধনের নিদর্শন।'[৭] ভারতচন্দ্রের ঋতুকবিতাগুলিতে যে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মিলে, তাহার প্রভাবও এই সব কবিতায় কম নাই। যেমন ভারতচন্দ্রে 'বর্ষাবর্ণনা' পাই এইরূপ :

'ভুবনে করিল তূর্ণ নদনদী পরিপূর্ণ
বিরহিনী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভর্সা।
বিদ্যুতের চকমকি ডাহুকের মকমকি
কামানল ধকধকি বড় হৈল বর্ষা॥'

৬ এই কবিতাটি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সৌন্দর্য' (১৩২১) গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৭ বঙ্গসাহিত্য পরিচয় : তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

অমৃতলাল বর্ষাকালে দেখেন—

'মোড়ে মোড়ে হাঁটুজল হড়হড়ে কাদা।
গাড়ির বেয়াড়া দর আপিসে তাগাদা॥
গগনে সঘনে শব্দ বিদ্যুতের দ্বন্দ্ব।
কৃত্রিম তড়িৎ স্তব্ধ ট্র্যামগাড়ি বন্ধ॥...'

গুপ্তকবির শিষ্য দীনবন্ধুর কাব্যরীতির সহিত অমৃতলালের কাব্যরীতির যথেষ্ট মিল আছে। উভয় কবিই পয়ার-ত্রিপদীতে আসর জমাইয়াছেন; উভয় কবিই বস্তুতান্ত্রিক। দীনবন্ধু রচনা করিয়াছেন 'কোকিল'-প্রশস্তি, অমৃতলাল—'কাক'-স্তুতি! তবে দীনবন্ধুর কোকিলা 'সরলা', অমৃতলালের কোকিলা 'কঠিনা'! দীনবন্ধু লিখিয়াছেন—

'সরলা কোকিলা কাছে সাদরে বসিয়ে,
সঙ্গীতে দিতেছে যোগ থাকিয়ে থাকিয়ে।' (কোকিল)

অমৃতলাল জানেন কোকিলা মোটেই সরলা নহে—

'কঠিনা কোকিলা করে নিঠুর ছলনা।
তবু পালে শিশু তার বায়স-ললনা॥' (কাক)

অনেকগুলি কবিতায় রঙ্গব্যঙ্গের সহিত বাঙালীসমাজ ও বাঙালীজীবনের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। 'হরিদাস' কবিতায় বাঙালীর জীবনের বিড়ম্বনা, 'তালের তত্ত্ব' কবিতায় নাগরিক সমাজে কুটুম্বতত্ত্বের বাড়াবাড়ির প্রতি ব্যঙ্গ, 'বঙ্গের আর এক রঙ্গে' বাঙালীচরিত্রের অন্তঃসারশূন্যতা, 'বিড়াল ও বাঙ্গালী'তে বিড়ালের স্বভাবের সহিত বাঙালীর স্বভাবের সাদৃশ্য 'অন্তঃপুরে উদ্দীপনা'য় নারীপ্রগতি লইয়া ব্যঙ্গ, 'ব্যাঘ্র-বক মহাকাব্যে' অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া রঙ্গরস এবং 'আদর্শ কবিতা'য় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অসার কবিতাকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে কবিতার দুর্দশা দেখিয়া তিনি তিনটি 'আদর্শ' কবিতা ('নদী', 'ঝড়' ও 'ছাত্রগণের কর্তব্য') রচনা করেন। এই কবিতাগুলি রচনার কারণ তিনি নিজেই দীর্ঘকাল পরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।[৮]

১৩২৭ সালের ২২এ ফাল্গুন বসিরহাট বাণী-সম্মিলনীর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতি-রূপে যে-ভাষণ দান করেন, তাহাতে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—

"পাঠ্যপুস্তকে কিছু কিছু কবিতা লিখিবার হুকুম আছে; সেকালের 'পাখী সব করে রব' সেকালের নিরক্ষর গৃহিণীদের পর্যন্ত কণ্ঠস্থ ছিল, 'পদ্যপাঠে'র কবিতাও সুন্দর ছিল, মনোমোহন

বাঙালীর স্বভাবধর্মের প্রতি তীব্র কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে, 'বিড়াল ও বাঙ্গালী' কবিতায়। বিড়াল ও বাঙালীর মনোভাবসাদৃশ্য কবি ব্যক্ত করিয়াছেন এইভাবে—

'দেখে ভেবে এই আমি আছি স্থির ক'রে।
বিড়াল বাঙ্গালী দুই এক ধাতু ধরে॥
দুধ আর মাছ বড় প্রিয় দুজনার।
উচ্ছিষ্ট হইলে তা'র আরো বাড়ে তার॥

... ...

লাথি-ঝাঁটা কিলে নাহি বিড়ালের লাজ।
না চাহিতে দেয় তাহা বাবুরে ইংরাজ॥
দিবারাত্রিভেদ নাই তুল্য দুইজনে।
ঘ্যানর ঘ্যানর করে মেনির পিছনে॥

... ...

এখন ইঁদুর দেখে বিড়াল পালায়।
আঁচল আড়ালে বাবু চোর এলে ধায়॥
ন'টা প্রাণ ধরে কিন্তু শুনেছি মার্জার।
বাবুরা মৃত্যুর আগে মরে বহুবার॥
কলিকাতা মাঝে আছে অন্তত এ ভাব।
সভ্যতার সহবাসে মিলেছে স্বভাব॥'

কয়েকটি কবিতা 'প্যারডি' বা 'অনুকৃতি-কৌতুক'। এই ধরনের রচনায় অমৃতলাল সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ' ('আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে') কবিতার অনুকৃত রূপ 'ক্ষুধাতুরের খেদ'—

'আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে।
জ্বালাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
জঠর-মাঝারে আসি ক্ষুধা দেখা দেয় রে॥...'

বহুর কবিতাও বালকদিগের বেশ সুপাঠ্য ,... কিন্তু এক একজন শিশু-মস্তক-ভক্ষক পাঠ্যলেখক যে-পয়ার রচনা করিয়া নিজ নিজ পুস্তকের 'গয়ার কার্য' সমাধা করেন, তাহা কাব্যনগরের 'curiosity museum'এ রাখিবার যোগ্য।" (নিখিলনাথ রায়-সম্পাদিত পল্লীবাণী, চৈত্র ১৩২৭)

স্বয়ং হেমচন্দ্র এই রচনাটির প্রশংসা করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তি হইতে জানিতে পারি—

"তাঁহার [শাস্ত্রী মহাশয়ের] যৌবন হইতেই তিনি অমৃতলালের রচনার বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি বলেন, তাঁহার যৌবনে একদিন বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে হেমচন্দ্রের সম্মুখে 'আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে' এই প্যারডিটি আবৃত্তি করেন, সেই সময় হেমচন্দ্রও অমৃতলালের এই রচনাটির প্রশংসা করেন।"*

'দরবারে প্রভাতবর্ণন'— 'পাখী সব করে রব'-এর, এবং 'শনিবারের বারবেলা'—'খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো'র প্যারডি।*ক

কতকগুলি কবিতায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের খণ্ডচিত্র উজ্জ্বল রূপ লাভ করিয়াছে। 'রোগশয্যায়' 'অমৃত-মদিরা', 'নূতন জীবন' প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবিতা। 'রোগশয্যায়' কবিতাটিতে কবির তৎকালীন রোগগ্রস্ত নিরাশ্বাস জীবনের চিত্র ফুটিয়াছে। 'বালবিধবা' কবিতায় কবি তাঁহার বালবিধবা জননীর জীবনের কয়েকটি ক্লেশকর ঘটনা স্মরণ করিয়াছেন। 'অমৃত-মদিরা' কবিতায় কবি শিশুর মত অকপট সারল্যে আপন হৃদয় পাঠকের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার শৈশবস্মৃতি, নাট্যজীবনের স্মৃতি, সুরাসক্তি, নাট্যসঙ্গী ও সঙ্গিনীদের কথা, ন্যাশনাল থিয়েটার পত্তনের কাহিনী, পরিপক্ক জীবনদর্শন প্রভৃতি এই কবিতায় অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। আত্ম-বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া কবি আমাদের স্বভাবের একটি সত্যচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—

"বয়সবৃদ্ধির সনে সঙ্কুচিত মন।
যৌবনের সখ্যে হয় স্বার্থ-আরোপণ॥
বনের ব্যাধের মত জাল-দড়ি বেঁধে।
অর্থের মৃগয়াতরে ফিরি ফন্দী ফেঁদে॥
'ওহে ভাই' ঘুচে হ'ল 'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড্'।
'সিনসীয়ার্লি' লিখে করি সৌহার্দ্যের এণ্ড্॥

* নাচঘর। ৩য় বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা, ২৮এ বৈশাখ ১৩৩৫ দ্রষ্টব্য।

*ক 'এই অনুকৃতি-কৌতুক বাঙ্গালা ভাষায় নূতন। অমৃতলালবাবু এ সকলই সুন্দরভাবেই লিখিয়াছেন।' (সাহিত্য-সংহিতা : পৌষ ১৩১০)

যত করি মিথ্যা ভাণ তত লিখি 'ট্রুলি'।
বিশ্বাসে সন্দেহ সনে সই 'ফেৎফুলি'॥"

এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'অমৃত-মদিরা'। গ্রন্থের নামও কবিতাটির নামেই চিহ্নিত। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের কবিতা আর নাই। সেইজন্য এই কবিতাটি সেকালের পাঠক-সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন আনে। গ্রন্থটির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অনেকেই মতামত দেন। আমরা কয়েকটি আলোচনার উল্লেখ করিতেছি।

'অমৃত-মদিরা' কবিতায় কবি তাঁহার সুরাসক্তির কথা ও তাঁহার নাট্য-সঙ্গিনী বিনোদিনী নাম্নী অভিনেত্রীর সহিত সম্পর্কের কথা অকপটে ব্যক্ত করায় 'ভারতী' পত্রিকায় দীনেশচন্দ্র সেন ইহাকে 'নিজের কুৎসা প্রচার' ও 'নৈতিক লজ্জাশূন্যতা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'সাহিত্যের আগারে আমরা মদের বোতলের আমদানী কখনই সহ্য করিব না।'[১০]

অথচ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকায় 'অমৃত-মদিরা'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে লেখেন—

"অমৃতলালের 'মদিরা'য় মত্ততা নাই, কিন্তু আরাম আছে; মোহ নাই, কিন্তু শান্তি আছে।... পুস্তকখানি যে উত্তম হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই।"[১১]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'রঙ্গালয়' পত্রে লেখেন—

'অমৃত-মদিরা। এ মদিরার ছিটেফোঁটা রঙ্গালয়ের পাঠকগণ পূর্বে পাইয়াছেন। এখন ভরা পীপা হাজির; যদি কেহ পান করিতে জান, পান

১০ ভারতী, মাঘ, ১৩১০। দীনেশচন্দ্রের এই সমালোচনার জবাব দিয়াছিলেন 'সাহিত্য' পত্রিকা। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন— "দীনেশবাবু অমৃতবাবুকে তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা ও ঘৃণার বাণে বিদ্ধ করিয়া আপনাকে 'সেণ্ট্ দীনেশে'র স্বর্গে উন্নত করিয়া মনে মনে বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ ভোগ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু আমরা তাঁহার এই কদাচারে লজ্জিত হইয়াছি।" (সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩১০)

দীনেশচন্দ্র পরবর্তীকালে লিখিয়াছেন, "আমার সমালোচনাটি যেদিন 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইল, তাহার পরদিনই অমৃতবাবু আমাকে একখানি 'অমৃত-মদিরা' উপহার পাঠাইয়া দিলেন— সেই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার উপরে অমৃতবাবু লিখিয়াছিলেন, সাহিত্যবীর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে উপহার দিলাম।'" (মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৭৬)

১১ সাহিত্য-সংহিতা, পৌষ ১৩১০

করিতে পার, তবে এ মদিরা পান কর। ইহার খোঁয়াবী ভাঙ্গিতে হয় না, নেশা ছুটে না, গোটাও টানে না। এমন বুঝি নাই, এমন বুঝি এখন হয় না। ইহার চোলাই পদ্ধতি নূতন। স্থকবি রবীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতিতে চোলাই করিয়া ভাব-মদিরা পান করাইয়া বঙ্গের সুধীজনকে মাতোয়ারা করিয়া রাখিয়াছেন, অমৃত-মদিরা সেভাবে চোলাই করা নহে। যন্ত্র পৃথক, কারিকর পৃথক। উহাতে জ্যোছনার চাঁদিমা-চুমি নাই; উহাতে সে যেন— কেমন-কেমন অনির্দিষ্ট, অস্ফুট··· ভাবের ও রসের অবতারণা নাই। সেই সেকালের সোজা-খাড়া-মাজা ভাষা, স্পষ্ট স্পষ্ট ভাব, গোটা গোটা কথা, স্বচ্ছ নির্মল সুনির্দিষ্ট রসের ধারা, সুসংবদ্ধ সুসংযত অলঙ্কারবিন্যাস, বহুদিন পরে আমরা আবার দেখিতে পাইলাম। ছন্দে উৎপাত নাই, ভাষায় উৎপীড়ন নাই, রুচির প্রলাপ নাই, শ্লীলতার ব্যামোহবিকৃতি নাই। এমন হয় নাই— হয়তো আর হইবে না।'[১২]

৩

'কৌতুক-যৌতুক'— 'শ্রীঅমৃতলাল বসু মুদ্রাঙ্কিত' (Author's copyright edition), ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৬। গ্রন্থে মোট বিশটি রচনা আছে, তন্মধ্যে ছয়টি কবিতা। এই কবিতাগুলির প্রত্যেকটিই বিচিত্র ভাবরসের।

১৩২৯ সালে কলিকাতার বাজারে আম অত্যন্ত সস্তা হওয়ায় হৃষ্টচিত্ত কবি লিখিলেন 'আমের ধুমধাম'। কবিতাটিতে উজ্জ্বল কৌতুকরসের সহিত সেকালের অন্যান্য দ্রব্যমূল্যেরও স্পষ্ট ও বিষণ্ণ চিত্র পাই—

'আমের বাজার সস্তা, পোস্তায় পচিছে বস্তা,
রাস্তায় রাস্তায় দেখি আঁটি গাদাগাদি।
বোম্বাই পেয়ারাফুলি, চুষে ফেলে দেয় কুলী,
আধুলিতে মধুকুলি করে সাধাসাধি॥
চুণোখালি রাজহেটে, বৃন্দাবনি বেঁটে বেঁটে,
পেটে পূরে আশ মিটে মজা লোটে লোক।

১২ রঙ্গালয় ২১এ কার্তিক, ১৩১০ (৮ই নভেম্বর, ১৯০৩)

মধুর সিঁদুরে রাঙ্গা, চেপ্‌টা কপাটভাঙ্গা,
রামকলা ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা বাবুদের ঝোঁক ॥'

এত আনন্দ সত্বেও দেশের অন্যান্য দ্রব্যের মহার্ঘতার কথা চিন্তা করিয়া কবি বিশেষ উদ্বিগ্ন—

"সাত সিকে মণ 'কোক্' বালাম ন' টাকা খোক,
এক ঢোক্ দুধে প্রায় এক আনা পড়ে।
উঠেছে দাঁড়ির ফেরে, আলু পাঁচ আনা সেরে,
ঘি তেলে বেড়েছে ভেল দাম গেছে চড়ে ॥
সন্দেশের দিতে তুল হোমোপ্যাথি গ্নবিউল
খদ্দরে ভদ্দর সাজি সাতটাকা জোড়া।
ট্রামের বেড়েছে ভাড়া, উপায় নাহিক ছাড়া,
বাবুয়ানা ক'রে ক'রে হ'য়ে গেছি খোঁড়া ॥"

এই দুর্মূল্যের মধ্যে একমাত্র আমই ভগবানের 'অমৃত দান'। অতএব—

'মেয়েরে পাঠাও তত্ত্ব ক'রে রাখ আমসত্ত্ব,
শিশুর সুপথ্য হবে মিশে দুধে ভাতে।
বলিয়া ফেলেছি ভুলে, দুধ কোথা এ গোকুলে,
যেটুকু রেখেছ তুলে বাবু খাবে চা'তে ॥'

কবিতার শেষে বহুদর্শী অমৃতলাল একটি বাস্তব আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন—

'দোহাই বিজ্ঞান বাবা, আমেতে মেরোনা থাবা,
ক'রো নাকো প্রিজার্ভের পথ আবিষ্কার।
জাহাজে চড়িলে ম্যাঙ্গো, পছন্দ করিলে অ্যাঙ্গো,
তাম্রেতে পাবনা বঙ্গে আম্রের স্বু তার ॥'

গুপ্তকবির

'মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ।
যত চুসী তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস ॥'

অথবা

'আনা-দরে আনা যায় কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ ॥' প্রভৃতির পরে এমন রঙ্গ ও ধ্বনিঝঙ্কার আর সৃষ্ট হয় নাই।

'শারদামঙ্গল' কবিতায় কবি একই সঙ্গে দেশজননী ও জগজ্জননীর স্তুতি

করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি, ভক্তি ও আনন্দ ভিক্ষা করিয়াছেন। 'আগমনী' কবিতায় 'নিরানন্দ বঙ্গধামে' কবি আনন্দময়ী দুর্গাকে আবাহন করিয়াছেন। কবির অকৃত্রিম ধর্মনিষ্ঠা ও দেশপ্রীতি এই দুইটি কবিতায় সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

'বৃন্দার আনন্দ' রাধাকৃষ্ণের লীলাকবিতা। কৃষ্ণের অদর্শনে রাধা ক্ষণে ক্ষণে অচেতন হইতেছেন। সখীরা নানাপ্রকার প্রবোধ দিতেছেন। আর—

'চন্দ্রালোকে তন্দ্রাহীনা বৃন্দারাণী চলিছে।
কৃষ্ণ দৃষ্টি তৃষ্ণাতুরা পৃষ্ঠে বেণী দুলিছে॥
... ...
সাধা সুরে রাধা ফুবে দূরে বংশী বাজিছে।
সারা রাতি পাতি পাতি ইতি উতি খুঁজিছে॥
ক্ষুণ্ণ মনে শূন্য বনে তন্ন তন্ন অন্বেষণ।
হা অদৃষ্ট, কোথা কৃষ্ণ, দেহ মিষ্ট দরশন'॥

এই কবিতায় কবির সহজাত বৈষ্ণবতার আন্তরিক স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। অনুপ্রাসের বাহুল্য কাব্যকে ক্লিষ্ট করিয়া তোলে নাই।

'কবির ভাব এসেছে' ও 'প্রেমের আবেগ' কবিতাদ্বয় কাব্যে অতিরিক্ত ভাবাকুলতার প্রতি কবির ব্যঙ্গের পরিচায়ক।

'ইলিশ' কবিতাটির স্বাদ ও গন্ধ, ভাব ও ছন্দ গুপ্তকবির 'এণ্ডাওয়ালা তপ্‌স্যা মাছে'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তপ্‌স্যামাছের স্বাদ গ্রহণ করিবার পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইয়াছে, রসরাজের 'ইলিশ' নতুন স্বাদে পাঠকের রসনা জুড়াইয়া দিল —

'পাডাতে কডাতে কেহ মাছ ভাজে রাতে।
রন্ধনে আনন্দ বাড়ে গন্ধে মন মাতে॥
লাউপাতা সাথে ভাতে সর্ষেবাটা মাখা।
সেই বোঝে মজা তার যার আছে চাখা॥
ভাতে মেখে খাও যদি ইলিশের তেল।
কাজ দেবে যেন 'কড্‌লিভার অয়েল'॥
গরম গরম ভাজা খিচুড়ির সঙ্গে।
বর্ষাকালে হর্ষে গালে তোলে লোকে বঙ্গে॥

কাঁচা ইলিশের ঝোল কাঁচা লঙ্কা চিরে।
ভুলিবে না খেয়েছে যে ব'সে পদ্মাতীরে॥
ভাজিলে ঝালের ঝোলে ইলিশ অসার।
কাঁচাতে অরুচি রুচি মাখমের তার॥
সর্ষেবাটা দিয়ে তা'তে মিশাইয়া দধি।
আমিরী আহার হবে রেঁধে খাও যদি॥...'

মাছের রূপবর্ণনায় গুরুশিষ্যের মধ্যে কাহার উৎকর্ষ অধিক বলা কঠিন। গুপ্তকবির বহুখ্যাত—

'কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥'

ইহার পাশে অমৃতলালের —

'চকচকে চাকা-চাকা সিকি ঢাকা অঙ্গ।
কালাপেড়ে দাঁড়াখানি তনু ধনু-ভঙ্গ॥'— সমান মর্যাদায় দাঁড়াইতে পারে।

তবে অমৃতলালের কবিতা ইলিশ-প্রশস্তিতেই শেষ হয় নাই। দেশ কাল সমাজ ও জীবনকে বাদ দিয়া তিনি কখনও রঙ্গের জন্যই রঙ্গ করেন নাই। ইলিশের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া দেশের বর্তমান সমাজের দুর্বল নিবীর্য মানুষগুলির কথা তাঁহাকে বিষন্ন করিয়াছে। আবার প্রাচীন সমাজের বলবীর্য-সম্পন্ন মানুষগুলি তাঁহার কল্পনাকে করিয়াছে উদ্দীপ্ত। একালের শিক্ষিত ব্যক্তি—

"ইলিশকে বিষ বোধে সারা হন ভয়ে।
হজ্‌ব্যাণ্ড হাইজিন তত্ত্ব পড়েছেন বয়ে॥
ছেলে পড়ে 'স্বাস্থ্যরক্ষা' অম্ল উদ্‌যান।
চাম্‌চে মাপে নাম্‌চে তাই অন্ন পরিমাণ॥
আস্ত গোটা মৎস্য খাবে কোস্তা কুস্তি কস্ত।
কাঙলা বাংলা হ'তে সে পুরুষ অস্ত॥"

কিন্তু এমন একদিন ছিল, জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে আমাদের নারী-দেবতারা বিরাট সংসার ধারণ করিতেন ও দশভুজার মূর্তিতে সেই সংসারের আদ্যন্ত কার্য সম্পন্ন করিতেন —

'দেখেছি, এ দেশে নারী ঢুকে ঢেঁকিশালে।
শ্যামা যেন রণবেশে নাচে তালে তালে॥
প'ড়েছে কেশের রাশি পিছনে ঝাঁপায়ে।
দুম দুম পড়ে ঢেঁকি মেদিনী কাঁপায়ে॥
ঘর্ঘর ঘুরিছে জাঁতা কামিনীর করে।
শিলেতে পিষিছে নোড়া জোড়া ভুজে ধরে॥
জলের কলসী কাঁকে হেলাইয়া অঙ্গ।
আলো করে চলে পথে রূপের তরঙ্গ॥'

কিন্তু আজ এ নারী দুর্লভ। আজিকার নারীরা—

'শুয়ে বসে মাথা ঘ'সে রসে ভেসে কবে।
ফর্কে গিয়ে পর্দাপার্কে সুস্থ দেহ হবে॥'[১৩]

কবিতাটির আরম্ভের প্রসন্ন রঙ্গ শেষে গিয়া বিষণ্ণ ব্যঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

'কৌতুক-যৌতুক' প্রকাশিত হইলে সাহিত্যামোদী পাঠকসমাজ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন; সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থটির বিশেষ প্রশংসা হয়। 'বঙ্গবাণী' লিখিয়াছিলেন—

"...বহুকাল পূর্বে গুপ্তকবির লেখায়, রঙ্গব্যঙ্গে, রূপচাঁদ পক্ষীর তীব্র মধুর কুজনে, হরু ঠাকুর, এণ্টনী, ভোলা ময়রা প্রভৃতির 'ঠাকুরুণ গো, ওসব কর্ম করতে হয়, তুমি কর— আমি পারবো না', 'পদ্মের মৃণালে কাঁটা, ঠাকুরের পিরালী খোঁটা' প্রভৃতি রসাল বচনমালায় বাঙ্গালী প্রাণ ভরিয়া ও আকাশ কাঁপাইয়া হাসিত, কত আমোদ আহ্লাদ করিত। অনশনদিগ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত ক্ষয়োন্মুখ বাঙ্গালী জাতির আজ সেই হাসি নাই, সে হাসি হাসিতে তাহার শীর্ণ কঙ্কাল কাঁপিয়া ওঠে, —পাঁজর ফাটিয়া যায়। —এমনই দুঃখের দিনে এস রসরাজ—তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া 'কৌতুক-যৌতুক' পাঠ করি।... ...এক কথায় 'কৌতুক-যৌতুক' বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিল।

১৩ এই পর্দাপার্ককে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি একবার সঙের ছড়ায় লেখেন,

'...বোসবে যেথা রূপের হাট
(সেটা) পর্দা ঘেরা ফর্দা মাঠ,
সোনার পাথরবাটী শোনা ছিল,
এবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ॥...' ('পর্দাপার্ক')

বাঙ্গালীকে একটা নূতন উপাদেয় জিনিষ উপভোগ করিতে দিয়া রসরাজ অমৃতলাল কৃতজ্ঞতার ভাজন হইলেন।"[১৪]

৪

'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা'—'ভক্তসাধক অমৃতলালের শেষ-জীবনের সাধনা'—তাঁহার মৃত্যুর পর ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়। 'বসুমতী'-সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাব্যটি কবির শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিতরণের জন্য গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১। এই কাব্যে রামকৃষ্ণদেবের জন্মের পূর্ববর্তী ঘটনা হইতে তাঁহার তত্ত্বলাভ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র কাব্যে রামকৃষ্ণদেবের বাল্যজীবন রচনার অবকাশে অমৃতলাল তাঁহার নিজের অন্তর্জীবনের কিছু কিছু আভাস দিয়াছেন। তাঁহার সুনিবিড় ধর্মবুদ্ধি ও সুগভীর ঈশ্বরবিশ্বাস এই কাব্যেব পংক্তি-গুলিতে স্নিগ্ধ রূপ লাভ করিয়াছে। একথা অনুমান করা অসমীচীন নয় যে, প্রবল আধ্যাত্মিকতার অবলম্বন ছিল বলিয়াই রঙ্গালয়ের গ্লানি ও বিভ্রান্তির মধ্যে তিনি কখনও পথহারা হন নাই এবং তাঁহার সাতাত্তর বৎসর আয়ুষ্কালেব শেষ দিনটিও প্রসন্নতায় উজ্জ্বল ছিল।

বাংলাদেশের প্রাচীন কবিদের প্রতি তাঁহার অনুরাগেব কথা তিনি বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার এই শেষ জীবনের কাব্যেরও রূপ ও ভাবে সেইসব কবিদের সজ্ঞান অনুসবণের প্রয়াস দেখা যায়। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যসমূহ বা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীকাব্যসমূহ তিনি যে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা' পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কাব্যের সূচনায় সারদাদেবীর বন্দনা—'মা'। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত অমৃতলালও স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন—

'আদেশ শুনিল কান,   রসনায় এল গান,
জন্মতিথি ব্রতকথা সূচনার সুরে।
নাহি ছিল নিদ্রাবেশ   জাগ্রত এ প্রত্যাদেশ,
এমনি সহজ সেই জগতের গুরু রে॥'

১৪ বঙ্গবাণী, ভাদ্র ১৩৩৩

'মঙ্গল বোধন' রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যবৃন্দের প্রতি কবির শ্রদ্ধার্ঘ্য। 'বন্দনা' মঙ্গল কাব্যের গুরুবন্দনার অনুরূপ। তাঁহার ধর্মজীবনের কথা অমৃতলাল নিজেই এ স্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথম জীবনে ছিলেন ভক্তিহীন, পরে গিরিশচন্দ্রের সহায়তায় কিভাবে 'রামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তে' স্থান লাভ করিলেন, তাহা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে—

'অর্জিত না ছিল পুণ্য, মরু-হৃদি গুরুশূন্য
কারুণ্য কানন কাছে অরণ্য সমান।
জনমে যৌতুক রঙ্গ সুখেতে কৌতুক ব্যঙ্গ,
কপি সম করিয়াছি মাত্র উপহাস॥
. . . .
হে গিরিশ ভক্তবীর, চরণে লুটায় শির,
কৃতজ্ঞ প্রাণের অর্ঘ্য করিছে প্রদান।
নাট্য-রবি কবি বিশ্বে, স্নেহের অনুজ শিষ্যে,
রামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তে দেওয়াইলে স্থান॥'

'কথারম্ভে'—তীর্থ কামারপুকুরের একটি সহজসুন্দর বর্ণনা পাই। 'দেউল মন্দির মঞ্চ দেউড়ী দালানে' কামারপুকুর ছিল লক্ষ্মীমন্ত। 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ তাঁতি কুমার কামারে' সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না। এখানে গামছা, কাপড় বোনা হইত, নলচে, কলসী, তিজেল, সরা, চেঙ্গারি, ধুচুনি, কুলো, চেটাই, মাদুর প্রভৃতি তৈয়ারী হইত। এক কথায় এই গ্রাম ছিল 'স্বভাবের শান্তিকুঞ্জ'; এখানে ছিল 'সন্তোষের জয়'—

'এমনি সুন্দর গ্রাম কামারপুকুর।
যথায় লবেন জন্ম আপনি ঠাকুর॥'[১৫]

রামানন্দের অত্যাচারে দ্বিজ ক্ষুদিরামের পূর্ববাস ত্যাগ ও পুত্রপরিবার লইয়া ইতস্তত ভ্রমণ মঙ্গলকাব্যের কবিদের অত্যাচারিত অবস্থার অনুরূপ। স্বপ্নে দেবতার দর্শনলাভও মঙ্গলকাব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

'শ্রীক্ষুদিরামের গয়াগমন ও দিব্যদর্শনলাভে' রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের

১৫ এই সুন্দর পংক্তি দুইটিতে আমরা যেন বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে'র প্রতিধ্বনি শুনি—

'নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥'

প্রস্তাবনা করা হইয়াছে। চন্দ্রমণির দেহে দিব্যজ্যোতি প্রবেশের কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম—

'কহে ধীরে,	ব্রাহ্মণীরে,	অশ্রুনীরে	বুক ভাসে।
দিব্যদান,	এ সন্তান,	ভগবান	গর্ভবাসে॥
অযোধ্যায়,	মথুরায়,	ধরি কায়	যে উদয়।
সে অচ্যুত,	গুণযুত,	তব সুত	পুনঃ হয়॥
ধর্মে ধৈর্যে,	ব্রহ্মচর্যে,	এ ঐশ্বর্যে,	স্নেহে রক্ষ
এই শুদ্ধি,	এই সিদ্ধি,	এই ঋদ্ধি	এই মোক্ষ॥'

ছন্দ বা মিলের জন্য তাঁহাকে যে ক্লিষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হইত না তাহা এই অংশটি হইতেও বুঝা যায়। ভাব ও ছন্দ এখানে অভিন্ন হইয়া

'আবির্ভাব' অংশে আসন্নপ্রসবা চন্দ্রমণির শারীরিক অবস্থা, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, প্রতিবেশিনীদের সন্তানদর্শন, গ্রামবাসীদের আনন্দোৎসব প্রভৃতি স্পষ্টরেখায় অঙ্কিত। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের জন্য কবির আকুলতা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে।

রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবকালের অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের যে রূপচিত্র অমৃতলাল অঙ্কন করিয়াছেন তাহার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। ফাল্গুন মাস যেন কবির বর্ণনাগুণে সমস্ত রূপবৈশিষ্ট্য লইয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—

'সাঙ্গ বঙ্গে শীত যাগ মিলালো মাঘের দাগ
নব অনুরাগে হাসি আসিল ফাল্গুন।
দখিণা পবন ঘ্রাণে, নবীন ভুবন প্রাণে,
বসন্ত সান্ত্বনা আনে জীবন্ত দ্বিগুণ॥
সজিনা ফুলের থোবা, শিমুলে আমূল শোভা,
মালঞ্চে প্রফুল্ল জবা করবী বকুল।
এই মাসে তিত মিঠে, নিমেতে হেমের ছিটে,
ভিটের উঠানে ফোটে কৃষ্ণকলি ফুল॥
আমের মুকুল ধরে, ইক্ষুরস বাসে ভরে,
নেবুতে নূতন পাতা, কচি কচি ফল।
শসায় হাসায় ভুঁই, কাঁকুড় কাটিয়া থুই,
নিটোল পটোল ঝোল জিবে আসে জল॥

আঙ্গিনাতে মনোহারী,   সোনার মন্দির সারি,
ধানের মরাইরূপে করে ঝলমল।
গৃহস্থের বাস্তগণ্য,   সঞ্চিত সুখের অন্ন,
লক্ষ্মী-পদতলে যেন স্বর্ণ-শতদল॥'

কেবলমাত্র কতকগুলি নামেই যেন গ্রামের মানুষগুলির রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—

'আঁচলেতে জল-পান মুখে এক থাবা।
পুঁটি লুটি জটি এল হরি হেরো হাবা॥'

নামের দ্বারা অনুপ্রাসসৃষ্টির কৌশল ঈশ্বর গুপ্তের নিকট হইতে লব্ধ।[১৬]

'শ্রীশ্রীষেঠেরা পূজা' ও 'আটকৌড়ি'র বর্ণনা বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও মেয়েলি সংস্কার সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান যে কিরূপ গভীর ছিল তাহা এইসব বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়। শিশুর নাম 'গদাই' হওয়ায় কবির মন্তব্য এই—

'গোকুলে কানাই ছিলে নদেতে নিমাই।
কামারপুকুরে নাম হইল গদাই॥'

গদাইয়ের 'বাল্যখেলা', 'বাল্যশিক্ষা', 'তত্ত্বজ্ঞান' প্রভৃতি কবির সভক্তি বর্ণনায় আন্তরিক রূপ লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিদের মত ভণিতাও মাঝে মাঝে দেখা যায়—

'সৃষ্টি যাঁর পঞ্চভূত,   তাঁরে ধরে কোন্ ভূত
অমৃত অদ্ভুত ভাবি মনে মনে হাসে॥'

এই কাব্যটি অমৃতলালের ধার্মিকতা ও রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার অবিচলিত ভক্তির নিদর্শন। কিন্তু সমাজসচেতন সাহিত্যিক বোধ হয় কোন অবস্থাতেই সমাজের কথা বিস্মৃত হন না। অমৃতলালও তাই কাব্যের একাধিক স্থলে কামারপুকুরের সেই স্বার্থশূন্য আবিলতাহীন জীবনযাত্রার কথা চিন্তা করিয়া একালের কৃত্রিম নাগরিকতাকে বিষণ্ণচিত্তে ধিকার দিয়াছেন ও গ্রামের সহজ জীবন বরণ করিবার আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন—

১৬ ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন—'সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উলকি।
নশী বশী ক্ষেমী বামী রামী শ্যামী গুল্‌কী॥'

'আমার সবুজ গ্রাম ফিরায়ে আবার।
দাও মা আমারে দু'টি শ্রমের খাবার॥

...   .

চাই না ঐশ্বর্য ধন মোগল রাজার।
তোগলার কাঁদে হোক আনন্দবাজার॥'

৫

অমৃতলালের অনেকগুলি কবিতা সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে রূপ ও রসে এই কবিতাগুলিও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিশিষ্টতায় ওতপ্রোত কবিতাগুলিতে বিষয়ের বিভিন্নতা ও কবির মনোভাবের বিচিত্রতা সহজেই লক্ষ্যগোচর হয়। অনুকৃতি, দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে শোক, সমসাময়িব নানাপ্রকার ঘটনায় কবিচিত্তের প্রতিক্রিয়া, ইংরেজের অপশাসনের সমালোচনা বাংলাদেশের অতীত শ্রীসৌভাগ্যের স্মৃতি, বর্তমান দুরবস্থার জন্য আক্ষেপ ইত্যাদি এই সকল কবিতার উপজীব্য। কবিতাবলীর কোন কোনটি তাঁহার 'অমৃত-মদিরা' ও 'কৌতুক-যৌতুকে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কয়েকটি আবার 'অমৃত-মদিরা' হইতে সাময়িকপত্র বা সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।[১৬ক]

সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার যে সকল কবিতার উদ্দেশ মিলিয়াছে সেগুলি রচনাকাল ১৩১০ হইতে ১৩৩৫ সাল।

১৩১০ সালের 'সমালোচনী' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় 'রাতের চৌকিদার নামে তাঁহার একটি ব্যঙ্গকবিতা প্রকাশিত হয়। চৌকিদারের অসাধুত কবির প্রতিপাদ্য—

'ওগো তুমি চৌকিদার
রাতের চৌকিদার।
কোন দারোগার মন যোগাতে
ঘুম কচ্ছো পার॥...'

১৬ক 'নববর্ষ', 'তালের তত্ত্ব', 'নটনীতি' যথাক্রমে ভারতী, ১৩১২, জাহ্নবী, ১৩২১ ও সচিত্র শিশি

কবিতাটি কৌতুকপ্রদ এবং দীর্ঘ। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'চৌর পঞ্চাশিকা'[১৭] কবিতাটি স্মরণ করিয়া এই কবিতা লিখিত।

১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'জাহ্নবী' পত্রিকায় তাঁহার 'গঙ্গাতটে' নামক গঙ্গার প্রশস্তিমূলক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।[১৭ক]

অমৃতলাল অনেক কবিতায় দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত 'স্মৃতির সম্মান' নামক কবিতাটি ১৩১৯ সালের 'নাট্যমন্দিরে' (শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্রকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহার নিদর্শন এই কবিতাটি—

'... নাট্যাকাশ অন্ধকার, কবি নট নাট্যকার
সরস হরষধ্বনি গিরিশ নাহিক আর॥
মদে মত্ত পদ টলে, নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে,
প্রথমে দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার।
ভীমসিংহ পশুপতি, মেঘনাদ রঘুপতি,
দক্ষ দক্ষ প্রজাপতি সুযশ প্রকাশে যাঁর॥
... .
সাথী মিত্র গুরু তুমি, প্রণমি লুটায়ে ভূমি,
চিরশিষ্য তরে স্থান কিছু রাখিও চরণে।
আছে, থাকিবে গিরিশনাম জাতির স্মরণে॥'

রামমোহন রায়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার 'রাধানগর' গ্রামকে স্মরণ করিয়া 'ওগো জাগ রাধানগরী' (মাসিক বসুমতী : বৈশাখ ১৩৩১) কবিতাটি রচিত। রামমোহনের আবির্ভাবের আগে বঙ্গদেশ কিরূপ দুর্বিপাকে পড়িয়াছিল এবং তিনি কিভাবে এই দেশকে দুর্বিপাক হইতে মুক্ত করেন তাহা কবিতাটিতে ব্যক্ত হইয়াছে—

"বেদহীন দীন দ্বিজ গেছল হোয়ে বঙ্গে।
হ'ল তন্ত্র শুধু মন্ত্রগত পঞ্চ 'ম'কার রঙ্গে॥

১৭ 'কল্পনা' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

১৭ক কবিতাটির সম্পূর্ণ রূপ কি ছিল তাহা জানা যায় না। কারণ দুই স্তবক পরেই মুদ্রণপ্রমাদ-হেতু 'রাতের চৌকিদার' কবিতাটি শিরোনামহীন অবস্থায় এই কবিতার সহিত মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে।

আবার, ভাড়াকরা পাদরীপাড়া কোল্লে দাড়ীনাড়া সুরু।
হলেন ইংলিশে সাঁতলান ছেলের তাঁরাই ধর্মগুরু॥

...   .

এই অসময় রামমোহন রায় না এলে হায় বঙ্গে।
সারা দেশটা শেষে যেত ভেসে খৃষ্টানি তরঙ্গে॥
বুঝে আর্যধর্ম বেদমর্ম কোরে ব্রহ্মবোধ সার।
'একমেব অদ্বিতীয়ম্' শুদ্ধ মন্ত্র রাজা করে সুপ্রচার॥

...   .

এই যে অদ্য বাংলা গদ্য-পদ্য-পদ্ম-মধুকর।
কল্লেন সভার শোভায় মনোলোভা এ রাধানগর॥"

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে 'বিজয়া' (বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩১), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে 'হারাধন অন্বেষণ—কীর্তন', (মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩২) ও 'নিত্যজীবী চিত্তরঞ্জন' (ঐ শ্রাবণ ১৩৩২) এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে 'নীরব ভেরীর রব' (ঐ ভাদ্র ১৩৩২) রচিত হয়। 'বিজয়া' কবিতায় কবির শোকাবেগ গভীর-গম্ভীর ছন্দে প্রকাশিত—

'বিনামেঘে বজ্রাঘাত,
অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত,
বিনা বাতে নিবে গেল মঙ্গলপ্রদীপ।
শমন পাইত শঙ্কা,
সম্মুখে শোনাতে ডঙ্কা,
প্রবাসে তস্করবেশে হইল প্রতীপ॥[১৮]
অনিষ্ট-শাসন-পটু শিষ্টের সহায়।
বিদ্যাপীঠে গোষ্ঠীপতি,
একচেষ্ট হৃষ্টমতি,
জয়পত্র লিপ্ত ভালে সর্বত্র সভায়॥...'

'নিত্যজীবী চিত্তরঞ্জন' কবিতায় দেশবন্ধুর মৃত্যুজনিত অসহনীয় শোকে কবি বঙ্গজননীকে সান্ত্বনা দিতেছেন—

---

১৮ বিহারে অবস্থানকালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

'ও কি ! ও মা বঙ্গ, কেন কাঁপে অঙ্গ,
অশ্রুর তরঙ্গ চোখে।
যম জয় ক'রে, ছেলে চলে ঘরে,
কাঁদিয়ে হাসাবে লোকে ॥'

'হারাধন অন্বেষণ (কীর্তন)'-এও 'আঁখি-অঞ্জন চিত্তরঞ্জনে'র জন্য গভীর শোক উচ্ছলিত।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সহিত অমৃতলালের ছিল বিশেষ সৌহার্দ্য। সুরেন্দ্রনাথের জন্য অমৃতলাল নির্বাচনী বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। তথাপি একথা অমৃতলালের অবিদিত ছিল না যে দেশসেবার দুরূহতম ব্রতে দেশবন্ধুর আত্মোৎসর্গের সহিত অন্য কাহারও তুলনা হয় না। তাই দেশবন্ধুর স্মরণে তিনি যে কয়টি কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মর্মস্পর্শী শোক উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।[১৮ক] কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তিনি অত অভিভূত হন নাই। বঙ্গভঙ্গের সময়ে যাঁহার বক্তৃতার ভেরীনিনাদ কার্জনের গর্জনকেও মন্দীভূত করিয়াছিল, তিনিই মন্ত্রী হইয়া 'নেতৃত্বের পিতৃত্বের অধিকার' হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া অমৃতলাল ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন 'নীরব ভেরীর রব' কবিতায়—

'শ্রান্ত হয়ে পরিশ্রমে, অথবা চিত্তের ভ্রমে,
কেন হে সুরেন্দ্রনাথ হলে বিস্মরণ।
কোটি মুকুটের মূল্য নহে লোকপ্রেম তুল্য
ভারত-হৃদয় ছিল তব সিংহাসন ॥
তুচ্ছ চৌকি মন্ত্রিত্বের, রুদ্ধদ্বারে কর্ত্তৃত্বের
নেতৃত্বের পিতৃত্বের অধিকার হতে।
আজ তুমি বেঁচে নাই, মুখে তুলে অন্ন খাই,
গড়াগড়ি দিই নাই প'ড়ে রাজপথে ॥...'[১৮খ]

দেশবন্ধু ও সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশের দুর্দশা ও নেতৃহীন বাঙালীর পরমুখাপেক্ষা অমৃতলালকে অত্যন্ত চিন্তিত করিয়াছিল। এই দুর্বিপাকে একমাত্র সুভাষচন্দ্রই তখন দেশের আশা। কিন্তু 'সপ্তরথী' তাঁহাকেও ঘিরিয়াছে। এই

১৮ক 'আমার পূজা' ও 'Step Aside' প্রবন্ধেও তাঁহার তীব্র শোকের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়।

১৮খ সুরেন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় তাঁহার নেতৃজীবনের অপরূপ বিশ্লেষণ দেখিতে পাই অমৃতলালের 'বিসর্জন' প্রবন্ধে।

ঘটনায় অমৃতলাল রচনা করিলেন 'ব্যূহদ্বারে' (আত্মশক্তি : ২৩এ বৈশাখ ১৩৩৪)। ভীম যেরূপ চক্রব্যূহের দ্বারে জয়দ্রথের নিকট অভিমন্যুর প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, অমৃতলালও সেইরূপ কারাব্যূহের বাহির হইতে ইংরেজের নিকট বন্দী সুভাষচন্দ্রের মুক্তির জন্য মিনতি করিয়াছেন। 'আক্ষেপ' কবিতায়ও (দৈনিক বসুমতী, ? আশ্বিন ১৩৩৫) লিখিয়াছেন, 'হতাশে সুভাষগতি'। বঙ্গদেশের সেই চরম দুর্দশার মুহূর্তে, যখন দলীয় স্বার্থবুদ্ধিতে সকলের মন আচ্ছন্ন তখন গোখ্‌লের বঙ্গদেশ সম্পর্কিত সেই বিখ্যাত উক্তি তাঁহার নিকট পরিহাসের ন্যায় বোধ হইয়াছে—

'বঙ্গে আজি যাহা ধার্য,
সমগ্র ভারত-গ্রাহ্য,
হবে কল্য প্রতিপাল্য বলেছে গোখ্‌লে।
দেশ বলে কাঁদাকাঁদি,
কাজ দল বাঁধাবাঁধি,
কাঁদে পড়ে হা বাংলা কি ঠকান ঠকলে॥'

কতকগুলি কবিতায় ইংরেজের অপশাসন ও আমাদের জাতীয় জীবনে তাহার সর্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। এই শ্রেণীর কবিতার প্রথম নিদর্শন 'প্রোক্লামেশন' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২)। ভারত সুশাসনের এবং ভারতীয়দের সর্ববিধ স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতিপূর্ণ যে 'রাজঘোষণা' (প্রোক্লামেশন) ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ড ইংলণ্ড হইতে প্রেরণ করেন তাহা যে অর্থহীন শব্দাড়ম্বরে পরিপূর্ণ তাহা ইংরেজের রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি হইতে ক্রমশ উপলব্ধ হইতেছিল। এ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করিবার জন্যই এই 'প্রোক্লামেশন' কবিতাটি রচিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন এই প্রোক্লামেশন প্রথম পাঠ করা হয়।[১৯]

১৯ এ বিষয়ে অমৃতলাল তাঁহার 'পুরাতন পঞ্জিকা' নামক জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন— '১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর কলকেতায় এক নতুন কাণ্ড ঘটে গেল। লেফটেনেণ্ট গবর্ণর হীডন সাহেব ঐ ৫৮র ১লা নভেম্বর গবর্মেণ্ট হাউসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটি রাজঘোষণা পাঠ করেন...। শিক্ষিত ভারতবাসী আজ পর্যন্ত এই প্রোক্লামেশনের গর্বে গর্বিত; বলেন, এই প্রোক্লামেশন তাঁদের ম্যাগনাকার্টা, এই প্রোক্লামেশনের বলেই রাজচক্ষুতে ইংরাজ ও আমরা সমভাবে প্রজা।...'

এই প্রোক্লামেশন আমাদের পরাধীন বিড়ম্বিত জীবনে যে কত বড় পরিহাস তাহা পরবর্তীকালে পদে পদে উপলব্ধ হইয়াছিল। অমৃতলাল তাই তিক্ত মনে লিখিয়াছিলেন, 'পরছি গায়ে প্রসাদী মাগ্‌না কোর্তা, বলছি মুখে ম্যাগনা কার্টা।'

'প্রোক্লামেশন' কবিতাটি বঙ্গভঙ্গেরও বহু বৎসর পূর্বে রচিত।[১৯ক] তখন হইতেই কবি প্রোক্লামেশনের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে অবহিত—

"বিনয়ে শুধাও গিয়া সিংহাসন তলে।
মহাসভা সভ্য সেই ইংরাজের দলে॥
প্রথমে বলেন রাণী যে সব বচন।
সম্রাজ্ঞীরূপেতে পরে করান স্মরণ॥
সুপুত্র সম্রাট হয়ে দিয়াছেন রায়।
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায়॥
সেই সব বচনের প্রকৃত কি অর্থ।
হবে কি রক্ষিত তাহা কথনো যথার্থ॥...
কথনো দেবে না হাত ধর্মেতে প্রজার।
এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজার॥...
'ডিফেণ্ডার অব্ দি ফেথ' যাহার উপাধি।
কোন্ লাজে সে হইবে ধর্মেতে বিবাদী॥...
জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদ না করি বিচার।
বিদ্যার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার॥
বহুদিন হ'তে মনে আছে এক ধাঁধা।
এ কথাটি কে কাহারে বলিতেছে দাদা॥...
আরো নানা কথা আছে সেই ঘোষণায়।
তন্ন তন্ন মানে বুঝে এস সমুদায়॥
তাৎপর্যটি একবার হয়ে গেলে ধার্য।
কোন কার্যে ভবিষ্যতে হবে না আশ্চর্য॥..."

ইংরেজের অপশাসনে দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মের নামে যে বিভেদ

১৯ক 'বঙ্গবিভাগের বহুপূর্বে লিখিত ও পরে ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত।' (অমৃত-গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ পৃ ২৯৬)

সৃষ্ট হয় তাহারই বিষময় পরিণাম কলিকাতায় ১৩৩৩ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আতঙ্কিত অমৃতলাল এই দাঙ্গার যে চিত্র 'তেত্রিশের ত্রাস' (মাসিক বসুমতী : বৈশাখ ১৩৩৩) নামক কবিতায় ও 'হামিদের হিম্মৎ' নামক উপন্যাসে (১৩৩৩-১৩৩৪) আঁকিয়াছেন তাহা বিশ বৎসর পরে (১৯৪৬) পুনরনুষ্ঠিত দাঙ্গার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইংরেজের মুসলমান-প্রীতি ও তজ্জনিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় 'চুপি চুপি সারো পূজা' (মাসিক বসুমতী : আশ্বিন ১৩৩৩) কবিতাটি রচিত। ইংরেজের 'রিফরমে'র কল্যাণে আমরা 'হিন্দু' নহি, 'অ-মুসলমান', [১৯খ] অতএব দুর্গাপূজা যদি করিতেই হয়, তবে 'চুপি চুপি সারো পূজা'। তাঁহার আক্ষেপ তীব্র হইয়াছে দশম ও একাদশ স্তবকে—

'যে দেশের প্রিয়পুত্র পূজ্য মুসলমান।
হিন্দু নাম যাঁর পায়ে দিছি বলিদান॥
পরিচিত ধরাতলে,
অ-মুসলমান বলে,
মর্মঘাতী এ রিফরম পেয়েছে কে কোথা।
জাতির উপাধি ভুলে হেন জাতীয়তা॥

এ নহে ভারতবর্ষ, নহে হিন্দুস্থান।
নেশান গড়িতে হবে হয়ে ইণ্ডিয়ান॥
মোসলিমে করিলে তুষ্ট,
স্বদল হইবে পুষ্ট,
বিপক্ষ স্বদেশী দ'লে করিবারে জয়।
কিছুই নীচতা নয় পলিটিক্স কয়॥'

এই কবিতাটি সম্পর্কে 'মানসী ও মর্মবাণী' লিখিয়াছিলেন—

'আর চুপ চুপ নয়, বসুজা মহাশয় ঢাক ঢোল পিটিয়াই হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তাঁর ত আর কাউন্সিল-এসেম্ব্লির বালাই নাই, কাজেই ভোটভাগাড়ের দিকে দৃষ্টি নাই। সুতরাং তিনি হাঁড়ি ভাঙ্গিবেন না ত আর কে ভাঙ্গিবে?'[২০]

১৯খ 'কৌতুক-যৌতুকে'র অন্তর্ভুক্ত 'হিন্দুর নব নামকরণ' প্রবন্ধেও এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

২০ মানসী ও মর্মবাণী : অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

'ফিঙের নাচন' (দৈনিক বসুমতী : ? আশ্বিন ১৩৩৫) কবিতাটিতেও কবির বিদ্রূপ অতি প্রখর —

'কোরে হিন্দুয়ানীর পিণ্ডিদান
হোয়ে গেছি ইণ্ডিয়ান
চণ্ডী ফেলে ব্রাণ্ডি আন্
ন্যাশনালের ফাউণ্ডেশন তাতেই ভাল হয়॥...'

অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে অমৃতলাল চিরদিন অকুণ্ঠিত ছিলেন। মিস্ মেয়ো 'মাদার ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কুৎসার 'ইষ্টকবর্ষণ' করিলে স্পষ্টবাদী অমৃতলাল নিক্ষেপ করিলেন 'পাটকেল' (দৈনিক বসুমতী : ? ১৩৩৩)—

'রেয়োভাটের মেয়ে ওটা মেয়ো বলে নাম।
সে সব দেশের গন্ধ গায়ে অন্ধ যেথা কাম॥

যে বিবেকানন্দে বন্দে খুল্লো অন্ধ চোখের ঠুলি।
তার জননী তার ভগিনী শুনলে এ নাগিনীর বুলি॥'

বৃদ্ধ অমৃতলাল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের অবস্থা দেখিয়া অনেকদিন হইতেই নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা ব্যতীত এ দুর্ভাগ্য আর কেহ মোচন করিতে পারিবে না। কবির ধর্মবুদ্ধি তাই দেবীর নিকট বারবার প্রার্থনা জানাইয়াছে —

'এস গো আনন্দময়ী নিরানন্দ বঙ্গধামে।
অন্তরে সন্তোষ সৃষ্টি হয় যেন মা দুর্গা নামে॥...'
('আগমনী' : মাসিক বসুমতী : আশ্বিন ১৩৩১)

'আশ্বিন-আবাহন' (মা. বসুমতী : আশ্বিন ১৩৩২) কবিতাতেও কবির একই মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

'মাতৃপূজা' (মাসিক বসুমতী : আশ্বিন ১৩৩৩) কবিতায় তিনি দেবীর নিকট ভক্তি ও শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি জানেন কোন অবস্থাতেই দেবীকে ভুলিলে চলিবে না। বাংলাদেশ ও বাঙালীর দুঃখ-দুর্গতির সীমা নাই— 'তবু এস, তবু এস জননী আমার!' ('আগমনী' : মা. বসুমতী : আশ্বিন ১৩৩৫)।

দেশের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া নিরাশ কবিমন অতীতমুখী হইয়া উঠিয়াছে।

'বাল্যের বেসাতি' (মা. বসুমতী : ভাদ্র ১৩৩০) কবিতায় কবি শৈশবের সেই অনাবিল দিনগুলির জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছেন।[২১] অতীতের বাংলাদেশ বারবার তাঁহাকে উন্মনা করিয়াছে। গ্রামবাংলার আড়ম্বরহীন সহজ জীবন ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে ডাক দিয়াছে। 'ফিরে চাও' (বার্ষিক বসুমতী : ১৩৩৩) কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেকালের গ্রামজীবনের নানা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিবার পর কবি একটি অনবদ্য চিত্র আঁকিয়াছেন এই কবিতায়—

'সেকালে বিকাল বেলা,
বসিত মেয়ের মেলা,
অলস ললিত অঙ্গে কলসী কাঁকালে।
তাদেরো রূপের হাট,
আলোকি' পুকুর ঘাট,
আনিত অধরে হাসি জলেতে তাকালে॥'

এই কবিতাটিতেই কবি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার রন্ধনবৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় দিয়াছেন ভাষার সরসতায় তাহা খুব উপভোগ্য হইয়াছে—

'বর্ধমেনে বউ সাধে
কলায়ের দা'ল রাঁধে
কাটোয়ার কাকী করে ডাঁটা চড়্‌চড়ি।
গুগ্‌লি, হুগলীর মেয়ে,
রাঁধে সে আপনি চেয়ে,
মোচা-ঘণ্ট থোড়-বড়ি ভাজে ফুলবড়ি॥

বরিশেলে ঠাকুরঝি,
মসুরে ঢালেন ঘি,
ওতোরপাড়ার পিসী ঝাড়ে অড়রের দাল।
বীরভূমে উমো মাসী,
রেখেছেন ক'রে বাসি,
রুয়ের অম্বল রেঁধে দিয়ে সর্ষে-ঝাল॥

২১ 'আবোল-তাবোল', 'রূপকথা' প্রভৃতি গল্পরচনাতেও কবির এই অতীতপ্রীতি অভিব্যক্ত হইয়াছে।

পাবনার নাতনী নেতো,
বানায়ে বেতের তেতো,
কড়ায়ে চড়ায়ে দেছে ইলিশের ঝোল।
কুঁদুলী আঁদুলে দিদি,
শিল্পকর্মে গুণনিধি,
ডাবাভরা ভাবা দই ঢেলে করে ঘোল॥...'

ব্রত-পার্বণ প্রভৃতি যাহা বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার প্রতি অমৃতলালের অনুরাগ গুপ্তকবিরই অনুরূপ। গুপ্তকবির মত তিনিও 'পৌষপার্বণ' (মা. বসুমতী : পৌষ ১৩৩৫) লিখিয়াছেন। গুপ্তকবি তাঁহার সমকালীন বাংলাদেশের 'পৌষপার্বণ' বর্ণনা করিয়াছেন—

'তাজা তাজা ভাজা পুলি, ভেজে ভেজে তোলে।
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি করে কোলে॥...
আলু তিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি, অশেষ প্রকার॥'

অমৃতলাল এই অতীতের কথা স্মরণ করিয়া এবং বর্তমান কালের সর্বাঙ্গীণ রিক্ততা দেখিয়া আর্তনাদ করিয়াছেন—

'ফিরে দে আমার পিঠে, বাস্তব সস্তার মিঠে,
সে সরুচাকুলি টানা কারিকুরি ছন্দ।
কচি কলাপাতা পেতে নোনতা নরম খেতে
তারে তার মাখা যেন মার করপদ্ম॥'

সমসাময়িক সাহিত্যিকদের অনেকের সহিত অমৃতলালের সদ্ভাব ও সখ্য ছিল। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর সহিত তাঁহার এক বিচিত্র সাহিত্য-সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর শেষ রচনা 'হেমচন্দ্র অস্তাচলে' প্রকাশিত হয় তাঁহার মৃত্যুর পর।[২২] 'মানসী ও মর্মবাণী'তে এই কবিতা পাঠ করিয়া অমৃতলাল ১৩৩১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে লিখিলেন 'আস্তাবোলে অমৃতলাল'। গিরীন্দ্রমোহিনীর ছন্দ অনুসরণ করিলেও এই কবিতাটি প্যারডি নয়। অমৃতলালের সারাজীবনের নাট্যসাধনা ও বর্তমান পরিণাম কৌতুক ও বেদনার সহিত বিবৃত হইয়াছে। নিজের কথা শেষ করিয়া যখন

২২ ১৩৩১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা মানসী ও মর্মবাণী দ্রষ্টব্য।

গিরীন্দ্রমোহিনীকে স্মরণ করিয়াছেন তখন তাঁহার কৌতুক অশ্রুতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে—

"লোকান্তরে গেছ তুমি দত্তকুলবধূ।[২৩]
কবিতা-তরঙ্গে বঙ্গে ঢেলে কত মধু॥
প্রভাতে 'মানসী' পত্রে,
পড়িলাম কয় ছত্রে,
'হেমচন্দ্র অস্তাচলে' অন্তিম রচনা।
চোখে কেন এল জল বল স্ববচনা॥

কোথা সে কিশোর কাল অগ্রজ-বনিতা।
চোখে চোখে দেখা নাই অতি পরিচিতা॥
তুমিও লিখেছ পদ্য,
আমিও গুণেছি চৌদ্দ,
দেবরে বধূতে রঙ্গ কথার কৌশলে।
আজ তুমি স্বর্গে গেলে, আমি আস্তাবোলে॥

পয়ারে পয়ারে হ'ত বিবাদে আলাপ।
মর্ত্য হতে স্বর্গে তাই পাঠাই প্রলাপ॥
অতীতের স্মৃতি স্মরি,
ব্যথায় নয়নে ঝরি,
উত্তর লিখেছে প'ড়ে পদ্য 'অস্তাচলে'।
সেকালের সে অমৃত শুয়ে আস্তাবোলে॥"

৬

'অমৃত-মদিরা' কাব্যের কতকগুলি কবিতা পরবর্তীকালে প্রকাশিত অমৃত-গ্রন্থাবলীতেও স্থান পাইয়াছে, একথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত অন্যান্য কবিতায় কবির শোক, দুঃখ, প্রেম, ভক্তি, রঙ্গ, ব্যঙ্গ নানাভাবে উদ্বেলিত হইয়াছে। গ্রন্থাবলীর চতুর্থভাগে মুদ্রিত 'স্মৃতির

২৩ ইনি ছিলেন বহুবাজারের অক্রূর দত্তের প্রপৌত্র নরেশচন্দ্র দত্তের স্ত্রী।

আদর' শীর্ষক শোক-কবিতাগুচ্ছ অমৃতলাল মিত্র, অর্ধেন্দুশেখর ও প্রমদাসুন্দরীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। অমৃতলালের সুদীর্ঘকালের নাট্যসহচর, স্টার থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী সুঅভিনেতা অমৃত মিত্রের মৃত্যুতে (১৯০৮) রচিত হয় 'মিত্র-স্মৃতি'। শোকাহত কবি মৃত নটের শিব, প্রতাপ, রাবণ, বিল্বমঙ্গল, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ প্রভৃতি বিখ্যাত ভূমিকাগুলি স্মরণ করিয়া শেষ স্তবকে সংশয়াচ্ছন্ন মনে লিখিয়াছেন—

'অমৃত অমৃতভাষী,
তার তরে বঙ্গবাসী,
দুই বিন্দু অশ্রু কি গো ঢালিবে চিতায়।
দেহ-পট সঙ্গে নট সকলি হারায় ॥'

শেষ পংক্তিটি এখন একরূপ প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে।

কয়েকমাস পরে ঐ বৎসরই (১৫.৯.১৯০৮) অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ ও নাট্যগুরু[২৪] অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যু হয়। ইতিপূর্বে আরও কয়েকজন নাট্যসঙ্গীর মৃত্যুতে শোকতপ্ত অমৃতলাল উপলব্ধি করিয়াছিলেন— 'দেহপট মুছে নটে লয়ে যায় কালে।' 'বাল্যসখা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' নামক কবিতাটিতে অর্ধেন্দুর সহিত তাঁহার বাল্যজীবন ও নাট্যজীবনের নিবিড় সখ্যের কথা গভীর সুরে ব্যক্ত হইয়াছে। এই শোকের মধ্যে অর্ধেন্দুর কৌতুকাভিনয়ের স্মৃতিও তাঁহার মনে জাগিয়াছে। অর্ধেন্দু তাঁহার প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণে'র নায়ক—

"নাট্যকার পরিচয়, প্রথমে আমার হয়,
লিখিয়া 'হীরকচূর্ণ' গলি করুণায়।
সাজিয়া বরোদা রায়, নির্বাসনে যবে যায়,
চাহনিতে অশ্রুবিন্দু অর্ধেন্দু ঝরায় ॥"

বাংলাদেশের নাট্যজগতে অর্ধেন্দুশেখরের শূন্য স্থান পূর্ণ হয় নাই। এই কবিতার শেষ পংক্তিতে যে-কথা বলা হইয়াছে— 'অর্ধেন্দু যাইলে আর অর্ধেন্দু না হয়'—তাহা একান্ত সত্য।

তরুবালা, চঞ্চলকুমারী প্রভৃতি ভূমিকাভিনেত্রী প্রমদাসুন্দরীর মৃত্যুতে রচিত কবিতাটি কবিহৃদয়ের স্নেহ ও করুণায় স্নিগ্ধ। তিনি ক্ষোভের সহিত লিখিয়াছেন—

২৪ গিরিশচন্দ্র ছিলেন তাঁহার ধর্মজীবনের গুরু।

'জন্মে ভাগ্য বলিদান সমাজে ছিল না স্থান,
কে দেবে লো তোরে মান গুণগুলি গুণি।
নটী যদি তোর মত, বিলাতে প্রকাশ হ'ত,
মর্মাহত হত দেশ মৃত্যুবার্তা শুনি॥
এদেশে নূতন ঢেউ, লেগেছে রুচির ফেউ,
কহিবে না কেউ ভয়ে কথাটি তোমার।
সদা বুক ধুক ধুক, মরণে দেখালে দুখ,
কামুক ভাবিবে যত বান্ধব উদার॥'

অন্যান্য কবিতার ভাব ও ছন্দে কবির বিভিন্ন মনোভাব ব্যক্ত।

'নভেল-লিখন-প্রণালী' কবিতায় বাংলা উপন্যাসে রোমান্সের আধিক্যকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। এগারটি স্তবকের কবিতা। প্রথম স্তবকটি এইরূপ—

'রূপের বাহার মাধবীলতা,
পিরীতি ভারতী মধুর কথা,
আঁধারে বিজন মন্দির যথা,
সুন্দরী ষোড়শী মদনহতা,
প্রথম অধ্যায় তথায় শেষ।'[২৫]

'নব বন্দেমাতরম্' কবিতায় তাঁহার মনের তীব্র নৈরাশ্য ধ্বনিত হইয়াছে—

'নাহি বিদ্যা, নাহি ধর্ম, নাহি হৃদি, নাহি মর্ম,
কেবল সকল কণ্ঠে কলহ-কল্লোল গাজে।
বাহুতে নাই মা শক্তি, হৃদয়ে কই মা ভক্তি,
প্রাণ ত দেখিনা মা কাহারও শরীরে।'

'পূজার আব্‌দার' কবিতায় আমাদের সমাজজীবনে দুর্গাপূজা উপলক্ষে যে আনন্দের সাড়া জাগে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। বর্ণনা গুপ্তকবিকে স্মরণ করাইয়া দেয়—

২৫ ইহা ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র ছন্দ স্মরণ করাইয়া দেয়—

'মালিনী আনিল ফুলের ভার
আনন্দ নন্দন বনের সার
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার
সহায় হইলা কালিকা।'

'রোদ যেন পুজো পুজো দুর্গামাথা দীপ্তি।
গরমে করমে মরি তবু প্রাণে তৃপ্তি ॥'

'বিজয়া-দশমী' নামে কবিতাদ্বয়ে কবি জগজ্জননীর নিকট সুখ ও শান্তি প্রার্থনা করিয়াছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ দেশের সমস্ত দ্রব্যের মহার্ঘতার কথা ব্যক্ত হইয়াছে 'ট্রাম চলে আর মন বলে' কবিতায়।

প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও আছে কয়েকটি : 'অনুযোগ ও উত্তর', 'শোভাময়ী', 'আদর' ও 'ফাগুন'। 'ফুলশয্যা' কবিতায় তৃতীয় পক্ষের নববধূর প্রতি স্বামীর 'উদভ্রান্ত নিবেদন' শুনিতে পাই—

'নির্দয় হৃদয় দ'লে, ডুবায় দিয়েছি জলে,
দুখানি প্রতিমা মম মণ্ডপের দীপ।
দুই দুইবার বালা, সয়েছি শাপের জ্বালা,
শবের সিঁথিতে দিছি সিঁদুরের টিপ ॥'

'সোহাগের নমুনা'য় পাড়াগেঁয়ে ভট্টাচার্য স্বামী গদাধর ও সহুরে শিক্ষাপ্রাপ্তা স্ত্রী রামমণির উক্তি-প্রত্যুক্তি রসিকতার সহিত বর্ণিত।

কবিশেখর কালিদাস রায় অমৃতলালের কবিতা আলোচনাপ্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা যুক্তিপূর্ণ। তাঁহার মতে—

'[অমৃতলাল] অন্তরের স্বাভাবিক কথাগুলিই বলিয়া গিয়াছেন, কল্পনার সাহায্যে বা কৃত্রিম উপায়ে বক্তব্যের প্রসাধন তাঁহার রচনায় নাই। সেজন্য এক হিসাবে তাঁহার কাব্য ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু আর এক হিসাবে প্রাণবন্ত। কাব্য রচনায় অক্ষুণ্ণ আন্তরিকতার যদি কোন মূল্য থাকে তবে সে মূল্য কবির প্রাপ্য।'[২৬]

২৬ 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' (৩য় খণ্ড) পৃ ১১৫-১৬

গান

নাটকে গান প্রযুক্ত হয় নাট্য তাৎপর্যকেই ব্যক্ত করিবার জন্য। নাটকের গান যদি সার্থক হয়, তাহা চরিত্রবিকাশেরও সহায়তা করে। অনেক সময়ে সংলাপে যাহা অকথিত থাকে গানের দ্বারা তাহা প্রকাশ করা হয়। নাটকীয় পরিস্থিতি পরিস্ফুট করিতেও গানের দান অনেকখানি।

অমৃতলালের নাটকে ও প্রহসনে গান আছে অনেকগুলি। প্রহসনে গানের বাহুল্যই চোখে পড়ে। ইহা ব্যতীত তিনি প্রয়োজনে সমসাময়িক নাট্যকারদের নাটকেও গান রচনা করিয়া দিয়াছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সপ্তম প্রতিমা'র কয়েকটি গান এবং ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুরুঠাকুর' প্রহসনের একটি গান তাঁহারই রচনা। ইহা ভিন্ন অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন গান 'অমৃত-গ্রন্থাবলী'র 'গানের ঝঙ্কার' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।[1] নাট্যরূপের গানগুলি মূল উপন্যাসের বক্তব্য সুপরিস্ফুট করিয়াছে।

অমৃতলালের নাটকের যে স্থলে হাস্যরসসৃষ্টির জন্য গান রচিত হইয়াছে তাঁহার স্বভাবগত বিশিষ্টতা সেখানেই অধিকতর পরিস্ফুট দেখিতে পাই। ভাষার বৈশিষ্ট্যও এই সকল গানে অধিক ব্যক্ত। যেমন, 'বিজয়-বসন্তে' দুর্লতার 'আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা! প্রাণ কেমন কেমন করে বুঝতে পারি না'; 'খাস-দখলে' কলিকামিনীদের 'এই যায় যায় যায়, কলির রাজত্ব বুঝি যায় যায় যায়', গোয়ালিনীদের 'এবার আমরা বিলেত গিয়ে বেচব দই', মোক্ষদার 'আমি যেন ছবিটি' বা 'দেহ অনুমতি, দেহ অনুমতি', বিভাসের 'ওরা একূল ওকূল রাখবে দুকূল মিলে কজনে'; কিংবা 'নব-যৌবনে' অলকার 'কি বিদ্যা শিখেছ বিদ্যা, বুঝি বিদ্যাতে পেট ফাটে', ভজনরামের 'মেয়েটি কিছু মন্দ মন্দ' বা 'যৌবন জোয়ার-জলে তুমুল তুফান, যেন ভাদ্রমাসের ভরাগাঙে সাঁড়াসাঁড়ির বান', অথবা 'ওগো বউ ব'লে কেউ নাইক আমার ঘরে' প্রভৃতি গান নাটকের পরিবেশ অনুযায়ী রঙ্গকৌতুক ও ব্যঙ্গবিদ্রূপে সমুজ্জ্বল।

---

১ ১৮৯৯ সনের পূর্বে লিখিত তাঁহার প্রহসনাদির অনেক গান মন্মথলাল মিশ্র-সংগৃহীত 'থিয়েটার সঙ্গীত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আছে। পরবর্তীকালে রচিত নাটক-প্রহসনাদির কয়েকটি গান অমৃতলাল-সম্পাদিত 'বীণার ঝঙ্কার' গ্রন্থে (৮ম সং, ১৩৩৩) মুদ্রিত আছে।

অমৃতলাল-রচিত হাস্যরসাত্মক গানগুলির জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সপ্তম প্রতিমা' (১৩০৯) নাটকেরও উপভোগ্যতা অনেকাংশে বর্ধিত হইয়াছে।[২] মন্দুরার বণিক পুরুষোত্তমের প্রিয় ভৃত্য গজুয়ার এবং পরিব্রাজক পদ্মনাভের পালিতা কন্যা মায়ার কয়েকটি গান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অমৃতলালের রচনারীতির ছাপ গানগুলিতে সুস্পষ্ট। যেমন গজুয়ার গান—

'খালি ফুর্তি ফুর্তি ফুর্তি আর কিছু না।
খাও দাও নাচ গাও নেহি মাংতা জেনানা॥
(নাচ তারালাল্লা তারালাল্লা তারালাল্লা)
ঘরে না থাকে ভাত,
বন্ধু বাড়ি পাত পাত,
যাত্রা শুনো সারারাত যদি না থাকে বিছানা…'

মায়ার এই গানটিও বিশিষ্টতাপূর্ণ—

'গিয়েছিলুম চাঁদের বাড়ী ডেকেছিল চাঁদ আমার।
সুয্যি দেয়না ধারে তেল, দেখি চাঁদের ঘরে অন্ধকার॥
কবে গেছে বুড়ী ম'রে কাটনাখানা আছে পড়ে,
তারার কুড়ি ছড়িয়ে আছে আকাশ জুড়ে দে বাহার।
সুধা খেতে হ'ল সাধ, বল্লুম একটু দেনা চাঁদ,
বল্লে, চকোরে সব লুটে গেছে, সুধাকরে হাহাকাব।
দেখে চাঁদের কষ্ট, এত পষ্ট, ক্ষুধা তেষ্টা নাইকো আর॥'

কৌতুক-নাট্যরচয়িতা ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুরুঠাকুর' প্রহসনের 'চতুর্থ রঙ্গে' জেলেনীদের গানটিও অমৃতলালের রচনা।[৩] গানটিতে জেলেনীদের যথার্থ মনোভাব সকৌতুক ভঙ্গীতে বর্ণিত—

'চাই চোদ্দ আনা জোড়া।
আদর করে কল্লে দর, দিই সস্তায় ঝোড়া॥…
নইলে, দাম কমালে, মন দমালে, দিই আঁশজলের ছড়া।'

'সপ্তম প্রতিমা' নাটকে গানগুলি সম্পর্কে কোন স্বীকৃতি নাই। তবে নগেন্দ্রনাথ বসু-সংকলিত 'বিশ্বকোষে' (২য় সং, ২য় ভাগ) এই গানগুলির কথা উল্লিখিত হইয়াছে (পৃ ৬৬১)। ক্ষীরোদ-প্রসাদের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত অমৃত-গ্রন্থাবলীর ৪র্থ ভাগে গানগুলি সন্নিবিষ্টও হইয়াছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'গীতটি আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ নটকবি শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় কর্তৃক বিরচিত'। (নাট্যমন্দির, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১৮)

অমৃতলালের প্রহসনসমূহে গান অনেকগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে। যেমন, সংলাপে উক্ত হয় নাই এমন অনেক অনুক্ত বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছে, ব্যঙ্গরসিকের শাসন ও শোধনের ফাঁকে ফাঁকে রঙ্গরসের নির্ঝর উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন প্রদেশের নরনারীর আবির্ভাব ঘটাইয়া কলিকাতার নগর-জীবনের বাস্তবতামণ্ডিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদর্শন করিয়াছে, কখনও কখনও মূল চরিত্রের বিকাশের সহায়ক হইয়াছে, সর্বোপরি এই গানগুলি ভাষার উপর প্রহসনকারের বিস্ময়কর অধিকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। কয়েকটি গানের আংশিক নিদর্শন উদ্ধৃত হইল—

'রাজা' খেতাবলোভী গাণিক্যধনের দেশ হইতে আগত গঙ্গাস্নানার্থী পুর্ববঙ্গীয় স্ত্রী-পুরুষের গান—

'(ওমা) গোঙ্গা তোর রাঙ্গা পায়ে দে জোননী স্থান।
পাপের বরা খালাস কোরে দেহু গো মা পেরাণ ॥
এক হাতে হঙ্ক বাজে, অইন্য হাতে গোণ্টা,
তপ কোরে বগীরথের হুকাইল কোণ্ঠা,
তবে মা তুই মর্ত্যে আলি কর্তি নরে তেরাণ ॥' (রাজা বাহাদুর)

হাতের কাজে অপটু চাকরীসর্বস্ব বাঙালী যখন জীবিকার অভাবে হতোদ্যম, তখন অর্থোপার্জনের জন্য কলিকাতায় আগত মাড়োয়ারী বালকদের গান—

'পাপ্‌পড় বেঁচু ঘিউ বেঁচু বেঁচু কাপড়া শাড়ী,
দালালী কঁরু বগ্‌গী মাঙ্গাউ, বানাউ হাবিলী বাড়ী।' (একাকার)

হুজুগে বাঙালীর ভোটরঙ্গ দেখিয়া উড়িয়া রমণীদের গান—

'আস্তরনাথ কেতো দিন বসা ছাড়ি
রাঁধিবাকু যায় না।
বাবু সব কাবু, বুলি বুলি গলি গলি
ঘর ভাত খায় না ॥' (দ্বন্দ্বে মাতনম্)

নিষিদ্ধ সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে বিধানদাতা পণ্ডিতদের গান—

'ঘন ঘন ঘন ঘন ঘনং
বাবুদের বিলাত গমনং,
... ...
ঋগ্বেদেতে স্পষ্ট উক্তি, চাহ যদি পরা মুক্তি,
ভক্তিভরে পেটং ভোরে মুরগী মারণং।

আকণ্ঠ মটনং খেলে, বৈকুণ্ঠেতে যাবে চ'লে,

অখাদ্য সংযোগে মদ্য সদ্য শোধনং

ইতি শাস্ত্র-শাসনং··· ॥' (কালাপানি)

নাটক-প্রহসন হইতে এইরূপ অনেক গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যেগুলিতে অমৃতলালের রচনাকৌশল, ভাষার উপর আধিপত্য এবং অপ্রত্যাশিত অন্ত্যানুপ্রাসের চমক আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করিবে।

'অমৃত-গ্রন্থাবলী'র 'গানের ঝঙ্কারে' যে সকল গান মুদ্রিত আছে সেগুলির অধিকাংশই আধ্যাত্মিক। কয়েকটি প্রেমের গানে বৈষ্ণবতার ছাপ আছে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে কীর্তন'এ রামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার ধর্মমতের প্রতি অমৃতলালের অপরিসীম আস্থা, 'বিজয়া-সঙ্গীতে' জগজ্জননী দুর্গার কৈলাসে প্রস্থানজনিত বিষাদ এবং 'বিজয়া-দশমী'তে দনুজদলনী দশভুজার নিকট শক্তিলাভের উৎসাহ প্রকাশিত। জগজ্জননীর বন্দনামূলক গানও আছে কয়েকটি। কোনটিতে দেবীর রূপমাধুরীর বর্ণনা, কোনটিতে সাময়িক দৃষ্টিহীনতাজনিত আক্ষেপ, কোনটিতে শাক্ত-পদাবলীর বিজয়া-সঙ্গীতের মত মাতৃমানসের বেদনা পরিস্ফুট। 'ভারতে ধর্মসংঘ' গানটি সংস্কারমুক্ত উদার ধর্মমত ব্যক্ত করিতেছে। কয়েকটি গানে আধ্যাত্মিক তত্ত্বও লাভ করি—

'আমি পাগল পাগল পাগল হলেম রে।

কোরে পর পর পর আপনা খেলেম রে॥'

অথবা,

'তরু তোমার মতন ভক্ত কেবা আর।

তুমি হৃদয়-রসে

ফুটিয়ে কুসুম পূজা কর মার॥'

কিংবা,

'আমার আত্রত্বই কাজ, কি দাও আমসত্ত্ব—

এ রসনায়।

থাক শাস্ত্র-তর্ক আর্কফলায়

ভক্ত-হৃদয় ভক্তি চায়।'

কয়েকটি গান বৈষ্ণব-ভাবুকতায় মণ্ডিত। গানগুলিতে নানাভাবে কৃষ্ণ-প্রেমের ব্যাকুলতা দেখা যায়।

অমৃতলাল যে কয়টি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়াছিলেন সেগুলিতে পরিবেশ

ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেকগুলি সার্থক গানও তিনি যোজনা করিয়াছিলেন। এই গানগুলির মধ্যে 'সরলা' নাটকে ধার্মিকতার ভাণকারী কলেজ-ছাত্রের 'তুমি পরম কারুণিক…', 'চন্দ্রশেখরে' বিরহিনী দলনীর 'আজু কাঁহা মেরি হৃদয়কি রাজা…' ও 'কেন কেন কেন…', 'বিষবৃক্ষে' নেশাগ্রস্ত দেবেন্দ্রের 'তামাকু হে তব তুলনা নাহি বঙ্গে', ও 'রাজসিংহে' রসিকা পানওয়ালীর 'খিলি মিঠি মিঠি, বুলি আউর মিঠি, মিঠি নয়নাবাণ' প্রভৃতি গান অমৃতলালের বিশিষ্ট রচনারীতির পরিচয় বহন করিতেছে।

জেলেপাড়ার সঙের ছড়া ও হাফ্‌-আখড়াই সঙ্গীত

এক সময় কলিকাতায় সঙের দল বাহির হইয়া নানাপ্রকার ছড়া কাটিয়া সমসাময়িক ঘটনাবলীর ব্যঙ্গপূর্ণ সমালোচনা করিত। এই সঙ বাহির হইত চৈত্র সংক্রান্তির দিনে।[১] বাঙ্গালী সঙ সাজিত আর দূর-দূরান্তর হইতে আগত বাঙালী নরনারী সেই সঙ দেখিত, হাসিত, উপভোগ করিত। কলিকাতায় কাঁসারিপাড়ার সঙ ও জেলেপাড়ার সঙের প্রসিদ্ধি ছিল।[২] কাঁসারিপাড়ার সঙ বিলুপ্ত হইবার দীর্ঘদিন পরেও জেলেপাড়ার সঙ লোকরঞ্জন করিয়া টিকিয়া ছিল। তবে এই সঙের প্রকৃতি দিন দিন অবনত হইতেছিল। যাঁহারা ছড়া লিখিতেন তাঁহাদের রুচি ছিল কিছুটা অমার্জিত। এই অবস্থাতেই জেলেপাড়ার সঙ সমাজের নানা ক্রটির প্রতি বিদ্রূপবর্ষণের দায়িত্ব পালন করিতেছিল। ইহার পর যখন কলিকাতায় প্লেগ-ভীতি দেখা দিল[৩] তখন সঙ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এই সময় হইতে দীর্ঘকাল কলিকাতার পথে আর সঙ বাহির হয় নাই।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এই সঙ পরিকল্পনার কারণ, চড়কে শিবের বিবাহ, শিব বিবাহ করিয়া পার্বতীকে লইয়া কৈলাসে যাইতেছেন— সঙ্গে যত ভূত — সেই ভূতরাই সঙ। চৈত্রের শেষে চুঁচুড়ায় যে সঙ বাহির হইত তাহা বন্ধ হইয়া গেলে অন্যত্র অনুরূপ সঙ বাহির হইত। 'সমাচার দর্পণ' (২৫এ চৈত্র ১২৩৪) হইতে জানা যায়—'চুঁচুড়া মোকামে পূর্বাপর যেরূপ সং হইতেছিল তাহা এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে। অতএব সেইরূপ সং কপোলেশ্বর গ্রামে শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানির দ্বারা হইতেছে এবং ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার বাহির হইবেক।'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', (১ম), পৃ ১৩৯ দ্রষ্টব্য। পারিবারিক আনন্দানুষ্ঠানেও প্রমোদের অঙ্গরূপে সঙের রঙ্গ দেখান হইত। 'সমাচার দর্পণ' (৬ই পৌষ ১২৩০) হইতে জানা যায় যে, দ্বারকানাথ ঠাকুর ২৭এ অগ্রহায়ণ ১২৩০ তাঁহার নূতন ভবনে 'গৃহসজ্জার' উপলক্ষে যে-উৎসব করিয়াছিলেন, তাহার শেষে 'ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণপূর্বক ঘাস চর্বণাদি করিল।' (ঐ পৃ ১৩৯)

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র 'কলিকাতার চড়কপার্বণ'-এ 'কাঁসারীদের সঙে'র উল্লেখ আছে।

অমৃতলালের 'গ্রাম্য বিভ্রাট' (১৮৯৭) প্রহসনের একটি গানে এই প্লেগ-ভীতির রঙ্গপূর্ণ ইঙ্গিত আছে—

১৩২২ সালে জেলেপাড়ার মৎস্যব্যবসায়ীরা পুনরায় সঙ বাহির করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে লোকের রুচির পরিবর্তন হইয়াছে। পুরাতন ছড়া ও গান কালোপযোগী হওয়া প্রয়োজন বোধ করিয়া জেলেপাড়ার প্রখ্যাত মৎস্যব্যবসায়ী গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাসের সুশিক্ষিত পুত্র শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস অমৃতলালকে জেলেপাড়ার সঙের জন্য ছড়া ও গান রচনা করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন।[৪]

পুরাতনের প্রতি অনুরাগী ও সর্বপ্রকার অসঙ্গতির সমালোচনায় অক্লান্ত অমৃতলাল উৎসাহিত হইয়া ১৩২২ সালে প্রথম চৈত্র সংক্রান্তির সঙের ছড়া ও গান রচনা করিয়া দিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বৎসরই তিনি জেলেপাড়ার সঙের ছড়া ও গান রচনা করিয়া দিতেন,—অবশ্য সবগুলি নহে। অপরের রচনাও সর্বদা সংশোধন করিয়া দিতেন। তিনি অগ্রসর হইয়া ছড়া রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্তীকালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীকালিদাস রায় ও সজনীকান্ত দাসের ন্যায় অনেক সাহিত্যসেবীই সঙের ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। ক্ষুরধার ব্যঙ্গের অন্তরালে দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণচিন্তা অমৃতলালের এই সকল ছড়ায় সুস্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে।[৫]

জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস* 'অমৃতলাল ও জেলেপাড়ার সং' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

'বম্বেতে কি এল গো, তারে বলে পেলেগো
দেশটাকে যে খেলে গো,
ভ্যাবাচাকা মন আমার।
আমরা আঁচে আঁচে ম'রে আছি,
এমনি ব্যামোর অত্যাচার।'

জ্যোতিশ্চন্দ্রের গুণবত্তা সম্পর্কে অমৃতলালের মত ও মন্তব্য তাঁহার, 'A stroll in the Hogg Market' (1927) প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে। ইনি একজন সাহিত্যসেবী ও সুখ্যাত পাঁচালী-গায়ক। 'পাঁচালী-ভারতী' ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

'অমৃত-গ্রন্থাবলী'র চতুর্থ ভাগে এই কয়টি ছড়া মুদ্রিত আছে—
১। বউটি ঠুঁটো জগন্নাথ। বাগ্‌দী বাম্‌নী রাঁধছে ভাত। ২। ধাপে ধাপে ভিন্ন ভঙ্গী। ব্রাহ্মণবংশে টেঁশ ফিরিঙ্গি। ৩। পর্দা পার্ক ৪। বিদ্যার মন্দিরে সিঁদ ৫। বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব। ৬। দুটো ঘরের কথা। ৭। খোয়াড়ী ও ৮। দিল্লীকা লাড্ডু।
ইনিই অমৃতলাল-লিখিত ছড়া সাধারণত আবৃত্তি করিতেন।

'তিনিই বুঝাইয়াছিলেন, সং ছোট নয়, হীন নয়, অশ্লীল নয়। সকল দেশে সকল সময়ই কোন-না-কোনরূপে সং লোক-সমাজে আত্মপ্রকাশ করে।'[৫ক]

'অমৃত-গ্রন্থাবলী'তে মুদ্রিত ছড়াগুলিতে নানাপ্রকার সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে। একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশ যুগের হাওয়ায় কিভাবে ধাপে ধাপে 'টেঁশ ফিরিঙ্গী' হইয়া গেল তাহা দ্বিতীয় ছড়ার বর্ণনীয়—

প্রথমে প্রপিতামহ, 'সেকেলে বামুন'— যাঁহার—

'শুদ্ধা বিদ্যাদান, সর্বত্র সমান,
বিষয়-বিভব-ঋণ-চিন্তাশূন্য।
হৃদয়ে অমলা, গৃহিণী কমলা,
সংসার তীর্থ, স্বামীসেবা পুণ্য॥'

ইঁহার পুত্র হইলেন 'পুরুত ঠাকুর'—

'কন্যাদানে পড়েন ইনি পিণ্ডিদানের মন্ত্র।
পঞ্চ ম-কার অধিকার ছুঁয়ে শুধু তন্ত্র॥...'

তৃতীয় পুরুষে দেখা গেল, পুরুত ঠাকুরের পুত্র এল. এ. পড়েন—

'ভট্টাচার্যির তেউড় ক্রমে এল.এ. ক'রে পাশ।
বংশের মাঝে হলেন খাড়া বেয়াড়া বেউড় বাঁশ॥'

চতুর্থ পুরুষে চরম পরিণতি। শুদ্ধাচারী বিপ্রের প্রপৌত্র অঙ্গ হইতে বঙ্গচিহ্ন দূর করিয়া ফিরিঙ্গী সাজিয়াছেন—

"ছিলেন প্রপিতাম' অগ্নিহোত্র,
বাপ পোড়ালেন যজ্ঞসূত্র,
ইনি এখন গোত্রহারা হা-ঘরে।
(ইনি) বাংলা বসন, বাংলা অশন
বাংলা আসন, বাংলা ভাষণ, সব ভাসালেন সাগরে॥"

[৫ক] মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬। প্রসঙ্গত এই সঙের অনুরূপ Calypso গানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ত্রিনিদাদে ক্রীতদাসদের মধ্যে এই গানের প্রথম উদ্ভব হয়। 'The songs usually express popular sentiments on subjects of current interest, or they may simply reflect the singer's own philosophy. Clever improvisations of words and rhymes are a well-known feature of Calypso songs...' (Encyclopedia Americana, vol. 5, P. 242)

ইনি 'খাতা খুলে চাঁদা তুলে নিয়ে টাকার রাশ' বিলাতে জমি চাষ শিখিতে গেলেন। তারপর—

'হয়ে পাশ করা চাষা দেশের আশা,
দেশে এসে ফিরে।
ভাবছেন দোক্তা করবেন কচুর পাতে
তক্তা ধানগাছ চিরে ॥

মাথার উপর ধুচনি চাপা, গায়ে Monkey Coat
চুরুট চেপে ধ'রে আছে দুটি ভস্মমাখা ঠোঁট ॥
গলায় দড়ি জোটে নাই তাই নেকটাই আছে এঁটে।
পেটটি ভরান পেলিটিতে পাতের প্রসাদ চেটে ॥
এঁর আবার আছে মেম ঘরোয়ানা ঘরের Miss
Mother Home-এ কাপড় কাচতেন
three pence a piece ॥'

ছড়ার পরে আছে একটি 'গীত'। এই গীতে ছড়াটির মূলকথা ব্যক্ত। এইভাবে সব সময়েই ছড়ার শেষে অমৃতলাল যে-গান রচনা করিয়া দিতেন তাহাতে তাঁহার বক্তব্যের সার কথাগুলি প্রকাশ পাইত।

হিন্দুর সমস্ত পূজাপার্বণ ও ক্রিয়াকলাপে একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস এক সময় দেখা গিয়াছিল। ইহাকেই ব্যঙ্গ করিয়া রচিত 'বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব' ছড়াটি।[৬] এই ছড়াটিতে তলাপাত্র ঠাকুর নামে এক ব্যক্তির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইনি ব্রাহ্মণের ধর্ম ছাড়িয়া কামস্কাটকায় গিয়া 'কুম্ভকারের কর্ম' শিখিয়া আসিয়াছেন। অতঃপর ইনি হইয়াছেন 'Bottompot' সাহেব। নূতন ধরনের প্রতিমা গড়িয়া ইনি 'মর্ত্যলোকে আনলেন আলোক'—সেই আলোকে দেখা গেল—

'পার্বতীর মুখ ভুটিয়া ছাঁচে,
মা দাঁড়িয়ে আছেন আমড়া গাছে,

৬ একই বিষয়ে তাঁহার 'বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব' নামে একটি গদ্য রসরচনা আছে। 'অমৃত-গ্রন্থাবলী'র চতুর্থ ভাগে তাহা মুদ্রিত।

অস্ত্র আইনে বাধে পাছে,
দশ হাতে তাই নূতন হাতিয়ার।

... ...

চশমা পরা চারু চক্ষে,
ভারসিটি গাউন মেডেল বক্ষে,
সরস্বতী দাঁড়িয়ে দক্ষে,
বেঞ্জতে বাজান অপেরায় গান।'

বর্তমানে নির্মিত বিভিন্ন দেবদেবীর বিচিত্র রূপভঙ্গিমার কথা বিবেচনা করিলে অমৃতলালকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিতে হয়।

'ছুটো ঘরের কথা' ছড়াটিতে সেকাল ও একালের তুলনা করা হইয়াছে। একালের কৃত্রিমতায় কবি সর্বদাই মনঃক্ষুন্ন। এই ছড়াটিতেও কবির বেদনা রঙ্গরসের অন্তস্তলে বিচিত্র কারুণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে—

'আগে এই চৈত্র শেষে
আমাদের এই বঙ্গদেশে
সন্ন্যাস মেনে শিবোদ্দেশে
সবাই পার্বণ কত্তো চড়কে।
তখন জ্যান্ত ছিল দেশের লোক,
শরীরে শক্তি মনে রোক,
খেতে পেত যা হোক তা হোক,
হয়নি সব গাঁ উজোড় ম্যালেরিয়া মড়কে॥

... ...

এখন ছেলেরা এক নতুন টাইপ
চোদ্দ না পেরতে পেকে রাইপ
মুখে আগুন ঢুকিয়ে pipe
একমাত্র lifeধারণ wifeএর চরণ কর্তে ধ্যান।
এদের লেখাপড়ায় আছে মন
বইএর বোঝা দু-দশ মণ
চশমাপরা পদ্মলোচন,
কোট পেণ্ট আঁটা ডোণ্ট কেয়ার
গোছ জেণ্টল্‌ম্যান॥...'

বিলাতিশিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনে অবিমিশ্র সুফল আনয়ন করে নাই; বিলাতিশিক্ষার নানা কুফলও আমাদের চরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। একশো বছর বিলাতিশিক্ষার সুরাপানের পর আমাদের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা বর্ণিত হইয়াছে 'খোয়াড়ী'তে—

"একশো বছর সমান টানে,
মাতাল ছিলেম মদ্যপানে,
বিলিতি বোতলে পোরা
গোরার চোলাই করা সে সুরা
নাম তার এডুকেশন।

... ...

পাশের নেশা কেটে দেখি
বিদ্যে সাধ্যি সবই মেকি
ঘরে ধান নেই শুধু ঢেঁকি
গাউন পরা ভেকই মাত্র সার।

... ...

গয়ায় দিয়ে 'রায় বাহাদুর'
ঘরে ফিরে আয় বাহাদুর
দেশ যে আজ চায় বাহাদুর
দেশের জন্যে যে-বাহাদুর করবে রে সন্ন্যাস।
ওরে সত্য সত্য সত্য বলি
দিতে হবে আত্মবলি
(নইলে) খুল্লে খালি গলার নলি,
ভরলে নিজের থলি—
দেশ-উদ্ধার ভূতের উপন্যাস॥"

এই ছড়ারই অন্যত্র দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথের স্যর সুরেন্দ্রনাথে পরিণতিতে অমৃতলালের আক্ষেপ—

'হায় হায় যিনি একদিন ছিলেন টাইট্
বলে রাইট্ রাইট্ রাইট্
কল্লেন যেথায় সেথায় ফাইট্

তিনি আজ নাইট হয়ে লাইট্‌হারা
সাইট্‌ কেবল বেতনে।'[৭]

অমৃতলালের অকৃত্রিম স্বাদেশিকতা এই সকল ছড়ায় এইভাবে অত্যন্ত সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেতাবী শিক্ষার পরিণামশূন্যতা চিত্রিত হইয়াছে 'দিল্লীকা লাড্ডু'তে। সে এক সময় ছিল যখন আমরা 'বিদ্যেলাভের বিষম মৃগয়ায়' বাহির হইয়া বি. এ. পাশ করিয়াই ল পড়িতে যাইতাম—

"ক্রমে আমি পাশ করলুম'ল'
খুসী হলেন father-in-law,
Mother-in-law
নিজের টাকায় কিনে দিলেন সাম্‌লা।
ঘুরলুম এ কোর্ট ও কোর্ট সাত কোর্ট,
বিডন বাগানে দেখালুম বক্তৃতার চোট—
কিন্তু এক brother-in-lawও
আমার কাছে নিয়ে এল না মামলা॥
হব রাসবিহারী কি স্যার আশু,
মন্মথ কি সাণ্ডেল দাসু,
আলিপুরের কৈলেস বসু,
কি হেম মিত্তির এমনি একটা আশা ছিল মনে।
সব আশায় পড়েছে ভস্ম,
বেড়েছে বেজায় পোষ্য,
নস্য হয়ে উড়ে যায় বাবার মাইনে দুধের দাদনে॥"

এই অবস্থায় মনে হইয়াছে—

'শিখতুম যদি হাতের কাজ,
কে আমারে পেতো আজ,
দেড় টাকা রোজ পায় রাজ,
আমি বি. এ. ভুঁয়ে শুই॥'

৭ সুরেন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় 'বিসর্জন' প্রবন্ধে এবং সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে লিখিত 'নীরব ভেরীর রব' কবিতায়ও অমৃতলালের এই একই মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

দেখা যাইতেছে, যে-কারিগরী বিদ্যার উপর আজ আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিতেছি, বহুবর্ষ পূর্বে অমৃতলাল তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আমাদের দৃষ্টি সেদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৮]

খুব সাময়িক (topical) ঘটনাও তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিত। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরি হইয়া যায়।[৯] এই ব্যাপারটি লইয়া অমৃতলাল একটি চাতুর্যপূর্ণ ছড়া লিখিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীর রূপকে এবং শ্লেষ অলংকারের বিস্ময়কর প্রয়োগে ছড়াটি অনন্যকরণীয়, নাম—'বিদ্যার মন্দিরে সিঁদ'। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরে স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ডক্টর ব্রুল রেজিষ্ট্রার ও চন্দ্রভূষণ মৈত্র তাঁহার সহকারী। অমৃতলালের শ্লিষ্ট ভাষার কটাক্ষ ইঁহাদের সকলেরই উপর বর্ষিত হইয়াছিল।[১০] ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীর সহিত পরিচয় ব্যতীত এই ছড়ার শ্লিষ্ট অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। সেকালে বাঙালীমাত্রেই এ কাহিনী জানিত, তাই ছড়ার রসগ্রহণে কোন বাধা হয় নাই।

এই সকল ছড়ায় ও ছড়ার শেষে গানে অমৃতলালের স্বদেশীয়ানা ও সমাজ-চেতনা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। দেশের নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়া তিনি কিরূপ চিন্তা করিতেন তাহাও আমরা ছড়াগুলি হইতে জানিতে পারি। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার ছাপও এই সব ছড়ায় পড়িয়াছে। ১৩৩৫ সালের চৈত্র-সংক্রান্তিতে শেষবারের মত জেলেপাড়ার সঙ বাহির হয়। এই শেষ ছড়া রচনাতেও তিনি সহযোগিতা করিয়াছিলেন।[১১] তাঁহার মৃত্যুর পর, কি কারণে জানি না, জেলেপাড়ার সঙ বিলুপ্ত হয়।

৮ এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'একাকার' প্রহসন ও 'বিশ্বকর্মা পূজা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৯ এই ঘটনা যে-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রসঙ্গে ১৯১৭ সনের ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিলের অমৃতবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

১০ এই বিষয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'সঙ' দ্রষ্টব্য। (পল্লভারতী : চৈত্র ১৩৬৫)

১১ সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন—'১৯২৯ এপ্রিল মাসে অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহযোগিতায় শেষ বৎসরের জেলেপাড়ার সঙ রচনা করি।' ('আত্মস্মৃতি', ২য়, পৃ ৭৫)

বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ অমৃতলালকে একবার হাফ্-আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামেরও সেনাপতিত্ব করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট হইতে তাঁহার আহ্বান আসিত এবং তিনিও যে সাধ্যমত সকলের সহিত সহযোগিতা করিতেন, এই হাফ্-আখড়াইয়ের গান রচনা তাহার আর একটি প্রমাণ। অমৃতলাল জানিতেন, বাংলা দেশের সংস্কৃতিতে কবির লড়াই, পাঁচালী, হাফ্-আখড়াই, বাউলের গান, কৃষ্ণযাত্রা, সঙ প্রভৃতির দান অপরিসীম। কিন্তু বাংলাদেশের বিশিষ্টতাপূর্ণ এই সব প্রাচীন সঙ্গীত যুগরুচি পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অথচ পূর্বে কলিকাতায় হাফ্-আখড়াই গানের খুব প্রচলন ছিল। 'সমাচার দর্পণ' (১৬ই মাঘ ১২৩৮) হইতে জানা যায়—

'গত ৯ মাঘ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন মল্লিকের মেছুয়াবাজারের বাটীতে বাগবাজারনিবাসি শ্রীযুত মোহনচাঁদ বসু এবং যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়দিগের উভয় দলে আখড়া সঙ্গীতের···সংগ্রাম হইয়াছিল।'[১১ক]

'রঙ্গালয়' পত্রে একবার পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় হাফ্-আখড়াই সঙ্গীতের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছিলেন—

'৪০ বৎসর পূর্বেও কলিকাতায় হাফ্ আখড়াই গানের খুব প্রতিপত্তি ছিল। দল ছিল কলিকাতায় অনেকগুলি। বাগবাজার, শ্যামবাজার, সিমলা এবং বউবাজারের দলেরই প্রতিষ্ঠা অধিক ছিল। দুই দুই দলে লড়াই হইত। দুই দলে দুই কবি গান বাঁধিতেন। বাগবাজারের দলে বাঁধিতেন মোহনচাঁদ, সিমলার দলে কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত। গানে গুপ্তকবিই অধিক ব্যক্ত হইতেন; প্রায় তাঁহাদেরই জয় হইত। বউবাজারের দলে রূপচাঁদ পক্ষীর একাধিপত্য ছিল। তিনিও বড় সামান্য কবি ছিলেন না। সতী ও প্রণয়-পরীক্ষার কবি শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসুও হাফ্ আখড়াই দলে গান বাঁধিতেন। হাফ্ আখড়াই গানের শেষাবস্থায় আমাদের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষও গীতরচনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যদিগের মধ্যে রাধামাধব মিত্রের

১১ক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), পৃ ২৮৩

নাম মনে পড়িতেছে। মনে হইতেছে, তাঁহাকেও চোরবাগানের দলে গান বাঁধিতে দেখিয়াছি।'[১২]

অমৃতলাল মনে করিতেন এই সকল সঙ্গীতাদির পুনরাবির্ভাব না ঘটিলে বাঙালীর নিজের বলিয়া গর্ব করিবার কিছু থাকিবে না। এই মনোভাবের বশবর্তী হইয়া পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল সঙ্গীত-সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

১৩২৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ শনিবার শোভাবাজার রাজবাটীর গোপীনাথ-প্রাঙ্গণে দীর্ঘকাল পরে ('বীণার ঝঙ্কার' গ্রন্থে অমৃতলাল লিখিয়াছেন, '৩৩ বৎসর পরে') এই সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।[১৩] সংগ্রামে কাঁসারিপাড়ার দল ছিলেন প্রশ্নকারী এবং জোড়াসাঁকোর দল উত্তরী। অমৃতলাল জোড়াসাঁকোর পক্ষে উত্তর-পরিষদের নেতারূপে কাঁসারিপাডার প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ গানগুলি রচনা করেন। হাফ্-আখডাইয়ের প্রতি বাঙালীর আকর্ষণ কিরূপ প্রবল ছিল তাহা সংগ্রাম-প্রাঙ্গণে জনসমাগম হইতে উপলব্ধ হয়—

'১২টা বাজিবার ৩-৪ ঘণ্টা পূর্ব হইতেই ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, যশোহর, মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি বহুদূর প্রদেশ হইতে আগত শ্রোতারা আসিযা গোপীনাথজিউর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের সুসজ্জিত বিশেষ বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কলিকাতা সহরের, সহরতলীর ও নিকটবর্তী বহু স্থানের বহু শ্রোতারা আসিয়া আসন সংগ্রহ করিলেন।'[১৪]

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিকথা হইতে জানিতে পারি, অনুষ্ঠানের 'উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। .. উত্তর কলিকাতার গৌরবোজ্জ্বল তারকাদের অন্যতম রসরাজ অমৃতলাল বসু এই অনুষ্ঠানেব হোতা।' প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী এবং 'বাংলাদেশের তদানীন্তন স্বনামধন্যদের মধ্যে অনেকেই সেই

১২ রঙ্গালয় : ২২এ কার্তিক ১৩০৮

১৩ প্রথমে স্থির ছিল অগ্রহায়ণের ১৫ই তারিখে সংগ্রাম হইবে এবং সেইমত কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু 'ইহারই মধ্যে গানবচয়িতা রামলালবাবুর মৃত্যু ঘটিল, সুতরাং রচয়িতা নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত দিনের স্থিরতরতা ঘটিল না। এই সময়ে নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় রচয়িতার আসন গ্রহণে সম্মত হইলেন। তখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, ২১এ অগ্রহায়ণ শনিবার রাত্রি ১২টার সময় সঙ্গীত-সংগ্রাম আরম্ভ হইবে।' ('হাফ্ আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস', পৃ ৪৯)

১৪ ঐ ঐ

সভা অলংকৃত করেছিলেন।' অমৃতলালের ন্যায় প্রমথ চৌধুরীও মনে করিতে
যে, এই সব সঙ্গীতাদিতেই বাংলাদেশের 'জাতীয় ঐতিহ্যের জ্ঞান' শিক্ষা হয়
তিনি বলিয়াছিলেন—

'বাংলার অশিক্ষিত পল্লীবাসীর অধিকাংশই একদিন এই সব জানত ও
বুঝত। আজ কাগজে কলমে আমাদের শিক্ষা এগোচ্ছে, কিন্তু জাতী
ঐতিহ্যের জ্ঞান সে শিক্ষায় দেখতে পাইনে তো।'[১৪ক]

শনিবার মধ্যরাত্রি হইতে রবিবার মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল এই
সংগ্রাম চলিয়াছিল। দুইটি সখী-সংবাদ ও একটি বিরহের গানে 'খেঁউড়' প্রশ্নোত্ত
চলে। কাঁসারিপাড়ার দল গাহিয়াছিলেন 'মোহনচাঁদী' (বাগবাজারনিবাসী
মোহনচাঁদ বসু-প্রবর্তিত) সুরে ও জোড়াসাঁকোর দল গাহেন 'রামচাঁদী
(জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়-প্রবর্তিত) সুরে। এই গানগুলি অমৃতলা
সম্পাদিত 'বীণার ঝঙ্কার' গ্রন্থের ৮ম সংস্করণে (১৩৩৩) ৬১৮-২৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত
রহিয়াছে। গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর প্রণীত 'হাফ্ আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামে
ইতিহাস' গ্রন্থেও গানগুলি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থটি হইতে জানিতে
পারি, কাঁসারিগাড়ার দল 'বাঁকা ত্রিভঙ্গ এই কি প্রেমের রীতি?'… ইত্যাদি
গাহিয়া প্রথম 'সখী-সংবাদ' শুনাইলে 'অমৃতবাবু বলিলেন,— উত্তর তবে
বলি শ্রবণ করুন—

প্রথম সখী-সংবাদের উত্তর

চিঃ— বলিছ নিঠুর সখি, মুখে মধুর তাও তোমার।
পঃচিঃ— আমি স্বপক্ষ বিপক্ষ, দু'য়ে দক্ষ করিয়ে সুবিচার।…'[১৫]

কাঁসারিপাড়া দ্বিতীয় সখী-সংবাদে প্রশ্ন করিলেন—

'ব্রজগোপিনী সবে কৃষ্ণপ্রাণা।
পেয়ে অবলা, এ কি ছলা, বল্লনা?…' ইত্যাদি।

'…অমৃতবাবু উত্তরগীতি রচনা করিয়া শুনাইলেন,—

দ্বিতীয় সখী-সংবাদের উত্তর

চিঃ— ভ্রমেতে ভ্রমেতে তুমি ভ্রান্ত বুঝেছি হায় এখন।
পঃচিঃ— তুমি রাধিকাসঙ্গিনী বরাঙ্গিনী নহ লো কদাচন্॥

১৪ক 'চলমান জীবন'— পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১ম পর্ব, পৃ ১৭৯-৮০

১৫ 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস', পৃ ৫৫-৫৬

ফুঃ— কোথা মথুরায় বাঁকা হরি, হেথা রাজসাজে কৈ বাঁশী নাহি ধরি,

(তোরে কই রে-৫) নাহি বাহি তরি,

ভঃ ফুঃ— হইলে প্রেমিকা গোপিকা তুমি, এ তত্ত্ব জান্‌তে হায়,

নহে কৃষ্ণ জার, হায় গোপিকার, আধা অঙ্গ রাধা যে আমার।

মেঃ— মহারাস-রঙ্গ শুধু গোপিকার।

মঃ— বৃথা নিন্দে, জান না গোবিন্দে, মথুরার রূপ তার।…'[১৬]

ইহার পর কাঁসারিপাড়া আরম্ভ করিলেন 'খেঁউড়'—

'অনেক দিনের পর, প্রাণ রে! প্রেমাধিনী হ'লো তোমার পর!…'

'অমৃতলাল উত্তর দিলেন—

'খেঁউড়ের উত্তর

বিরহ।

চিঃ— হইয়ে সুশীলা সতী, ওকি তিরস্কার!…'[১৭] ইত্যাদি

এই সঙ্গীত-সংগ্রাম সম্পর্কে তৎকালীন 'নায়ক', 'বাঙ্গালী', 'হিতবাদী', 'দৈনিক বসুমতী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিস্তৃত আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল। 'নায়ক' মন্তব্য করিয়াছিলেন—

'অমৃতবাবু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। আবার ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার হাফ্‌ আখড়াইয়ে বাঁধনদাররূপে অবতীর্ণ হইলেন। ত্রিশ বৎসর পরে বাঙ্গালীর এই খাঁটি স্বদেশী সঙ্গীতের পুনর্জীবন দেখিয়া আমরা সুখী।'[১৮]

এই সঙ্গীত-সংগ্রামে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় নাই। বিচারকগণ কোন দলকে জয়ী বলিয়া রায় দেন নাই। তাঁহাদের মতে কাঁসারিপাড়ার 'সখী-সংবাদ' ও জোড়াসাঁকোর 'বিরহ' গাওয়া ভাল হইয়াছিল।[১৯]

১৬ 'হাফ্‌ আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস', পৃ ৬৬

১৭ ঐ পৃ ৭৫

১৮ নায়ক: ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

১৯ নাট্যপ্রতিভা, ফাল্গুন ১৩২৫। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'অমৃতলালের শেষ ছড়ার প্রত্যুত্তরে বিপক্ষ দল যথাযথ জবাব দিতে না পারায় সেইখানেই পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।' ('চলমান জীবন', ১ম, পৃ ১৮১)

নক্‌শা ও গল্প

রঙ্গালয়-পরিচালনা, নাটক-প্রহসন রচনা কিংবা অভিনয়কার্যের অবসরক্ষণেও অমৃতলাল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ৭৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর পূর্বমাসেও তাহার 'যুবক-জীবন' উপন্যাসের ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদটি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে সকল গল্প ও সামাজিক নক্‌শা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকগুলিই সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কয়েকটি মাত্র 'কৌতুক-যৌতুকে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সকল গল্প ও নক্‌শায় সুসংবদ্ধ কাহিনীসঞ্জাত গল্পরস অপেক্ষা অঙ্কিত চরিত্রাবলীর হাস্যকর কার্যকলাপই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অধিকাংশ গল্পেরই কোন কেন্দ্র নাই। তবে 'মাতৃভক্তি', 'ষষ্ঠীর প্রভাত', 'রূপকথা', 'গজুর ভজন', 'ব্যারণ এ্যাণ্ড পিপলাই কোং', 'টুনটুনী' প্রভৃতিতে গল্পের আকর্ষণ ও গল্পবর্ণিত পাত্রপাত্রীর আচরণ, দুই-ই সমান গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রহসনে যেমন তিনি কাহিনীর দিকে গুরুত্ব আরোপ না করিয়া কতকগুলি চরিত্র ও খণ্ডদৃশ্যের সমন্বয়ে শেষ পর্যন্ত একটা বক্তব্যে উপনীত হইয়াছেন, গল্প-উপন্যাসেও সেইরূপ আগে কতকগুলি বিশিষ্ট ধরনের চরিত্রের চিন্তা করিয়া পরে সেই চরিত্রগুলিকে বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার মধ্যে স্থাপন করিয়া জীবনের এক একটা অনাবিষ্কৃত দিক সহসা উন্মুক্ত ও হাস্যোজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নাটক-প্রহসনের অজস্র চরিত্রের সমাবেশের মধ্যে যাহাদের স্থান হয় নাই, সেই সকল চরিত্র তাঁহার গল্প-উপন্যাসে আশ্রয় লইয়াছে।

আলোচিত গল্পগুলির পূর্বসীমায় রহিয়াছে নিমাইচাঁদ (১২৯৬) এবং শেষ সীমায় 'টুনটুনী' (১৩৩৫)। ইহাদের মধ্যে রচিত হইয়াছে অনেকগুলি গল্প ও নক্‌শা। এই সকল গল্পে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহিত আমাদের পরিচয় হয়— প্রফেসার গিরিধারীলাল হইতে গাঁটকাটাদের সর্দার তারক ওস্তাদ, সঞ্চয়শীলা রায়গৃহিণী হইতে ম্যাজিস্ট্রেট রাণীকুমারী প্রতিভাসুন্দরী, আদর্শবাদী রাজচন্দ্র হইতে বাক্‌চতুর কুদরৎউল্লা, ডিগ্রীহীন নিঃস্বার্থ পতিত ডাক্তার হইতে লোভী ও প্রতারক নীরদবরণ ; এমনই আরও অনেক চরিত্র রহিয়াছে যাহারা সমাজের কোন-না-কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। ইহাদের মুখের ভাষা ও মনের ভাব যথাযথ। গাঁটকাটার ভাষা, ডাক্তারের ভাষা, চাষীর ভাষা,

অভিনেতার ভাষা, মন্তপের ভাষা, অবাঙালী মুসলমানের ভাষা, স্বল্পশিক্ষিতের ভাষা, অন্তঃসারশূন্য সম্পাদকের ভাষা, মজলিসেব ভাষা—সবই অমৃতলালের আয়ত্ত ছিল। সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহিত তাঁহার আন্তরিক পরিচয় ছিল বলিয়াই এত বিভিন্নধর্মী চরিত্রের অবতারণা করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী ছিল বলিয়া এই সকল অতিপরিচিত মানুষের মর্মগত স্বরূপ তিনি সহজে দেখিয়াছেন ও আমাদের দেখাইয়াছেন। তাঁহাব অঙ্কিত চরিত্রসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইতে পারে। সেই অতিরঞ্জনও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অতিরঞ্জনের সহায়তায় তিনি চরিত্রগুলির স্বভাবধর্ম উদ্ঘাটিত করিতে সফল হইয়াছেন। তাঁহার গল্প-উপন্যাসে অতিরঞ্জন সত্ত্বেও কখনো মনে হয় না কোন চরিত্র অবাস্তব। কারণ প্রত্যক্ষদৃষ্ট চরিত্র লইয়াই ব্যঙ্গরসিককে শরক্ষেপ করিতে হয়। অমৃতলালের সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা, আপন সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সহজাত হাস্যরসাত্মক মনোভাব তাঁহার গল্প-উপন্যাস ও নকশাগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে। সমাজের বিচিত্র বেশধারী মানুষের অন্তর্নিহিত ভণ্ডামি প্রকাশ কবিবার ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করিবার এই দৃষ্টিভঙ্গী ডিকেন্সের নিকট হইতে লব্ধ। ডিকেন্স ছিলেন তাঁহার অন্যতম প্রিয় লেখক এবং একটি ইংরেজী প্রবন্ধে তিনি ডিকেন্সের চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে মন্তব্যও করিয়াছিলেন একথা পূর্বে (পৃ ২২৯) উল্লিখিত হইয়াছে। তবে চবিত্রচিত্রণ বা অতিরঞ্জন একান্তভাবেই তাঁহার আপন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মণ্ডিত। ডিকেন্স সম্পর্কে চেস্টারটন্ লিখিয়াছিলেন—'Dickens did exaggerate; but his exaggeration was purely Dickensian.'[১] একথা অমৃতলাল সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এক 'বিরাট বৃহস্পতি' ব্যতীত তাঁহার কোন গল্প বা নকশায় ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। সেইজন্য তাঁহার বর্ণনায় ও চরিত্রচিত্রণে যে অতিরঞ্জন আছে তাহা তাঁহার সমবয়স্ক ও সমধর্মী ব্যঙ্গলেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর রচনার ন্যায় কোথাও তিক্ত বিদ্বেষে পরিণত হয় নাই।[২] তবে মানুষ যেখানে অসৎ,

---

১ Encyclopaedia Britannica (Vol. 7) P. 335

২ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের অতিরঞ্জন সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন—'স্থানে স্থানে অতিরঞ্জনের মাত্রা অতিরিক্ত চড়িয়া সুরুচি ও সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।' ('বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পৃ.৩০৮)। অমৃতলালের গল্প-উপন্যাস ও গদ্য নকশা সম্পর্কে একথা বলা চলে না।

ভণ্ড এবং স্বার্থপর সেখানে তাঁহার বিদ্রূপ সুতীক্ষ্ণ এবং অনিবার্য। মলিয়েরের *The Misanthrope* নাটকের Philinte বলিয়াছিল, '...my mind is no more shocked at seeing a man a rogue, unjust or selfish than at seeing vultures eager for prey, mischievous apes, or fury-lashed wolves.' এই উক্তি কেবল মলিয়েরের মনোধর্মের নহে, ব্যঙ্গরসিক অমৃতলালেরও মনোভাবের দ্যোতক।

২

অমৃতলালের 'নিমাইচাঁদ' নক্শাটি ১৮৮৯ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ক্ষুদ্র রচনা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪। রচনাটি পরে অমৃত-গ্রন্থাবলীর ৪র্থ ভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। নিমাইয়ের সুখস্বপ্ন ও বাস্তব সমস্যার আঘাতে সেই স্বপ্নের বিপর্যয় প্রদর্শিত হইয়াছে রচনাটিতে। সেই সঙ্গে নিজেকে নভেলের নায়িকা মনে করিলে সংসারে কিরূপ বিপত্তির সৃষ্টি হয় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে নিমাইচাঁদের স্ত্রী অনিলকুমারীর কার্যকলাপে। লেখক নেপথ্য হইতে অত্যন্ত ঘরোয়া ভঙ্গীতে বিভিন্ন চরিত্র ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় নিমাই ও অনিলকুমারী অত্যন্ত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইভাবে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ঘটনা বর্ণনা করায় 'নিমাইচাঁদ' একটি অভিনব রচনা হইয়া উঠিয়াছে।[৩] ষোল বৎসর পরে রচিত 'বৌমা' প্রহসনের বাবুরাম ও কিশোরীর মধ্যে নিমাই ও অনিলকুমারীর ছায়াপাত হইয়াছে। অনিলকুমারীর ঘাড় হইতে সাহিত্যের ভূত নামানোর ব্যাপারটি বেশ হাস্যোদ্দীপক। রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও গিরিশচন্দ্রের সম্পর্কে ঈষৎ টিপ্পনীও আছে। বীণাপাণির 'গিরিশী ছন্দে'র আশীর্বাদ লাভ করিয়া নিমাইয়ের 'খোঁড়া-ব্রহ্ম প্রেস' হইতে 'জগৎকান্তি' কাগজ-সম্পাদনা বেশ কৌতুকপ্রদ।

অমৃত-গ্রন্থাবলীর ৪র্থ ভাগে 'বিরাট বৃহস্পতি', 'বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব' ও 'রসের টুক্‌রা' নামে কয়েকটি নক্শা ও রসরচনা আছে।

'বিরাট বৃহস্পতি' সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত একটি বিদ্রূপাত্মক নক্শা। বিদ্রূপের লক্ষ্য তৎকালীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, খ্যাতনামা মহেশ ন্যায়রত্ন।

৩ ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন— "'নিমাইচাঁদ' বাঙ্গালায় 'ভাণ' নাট্যের একটি ভাল নিদর্শন।" —'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড (৫ম সং) পৃ ৩৬০

ন্যায়রত্নের প্রস্তাবে ১৮৯০ সনে গভর্ণমেণ্ট হিন্দুর পূজাপার্বণ উপলক্ষে ছুটি কমাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নক্‌শাটি লিখিত হয়। লেখক প্রথমে ন্যায়রত্নের উদ্দেশে অনেক বিদ্রূপোক্তি বর্ষণ করিয়া শেষে তাঁহাকে 'বিরাট বৃহস্পতি' আখ্যা দিয়াছেন। নক্‌শাটির দুইটি অংশ—ভূমিকা ও বিলাতে দুর্গাপূজা। ভূমিকার বাক্যগুলি অন্ত্যানুপ্রাসে পূর্ণ। ছন্দোবদ্ধ ভাষার বিদ্রূপ যেন প্রতি মুহূর্তে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় ন্যায়রত্নের উদ্দেশে উৎক্ষিপ্ত।

বিধানদাতা বিরাট বৃহস্পতি বিলাতে গিয়া দুর্গাপূজা করিবার সময় কিরূপ নাকাল হইলেন ও বিচিত্র ইংরেজীতে পুলিশকে অনুনয় করিয়া শেষে শুভ সপ্তমীর দিন মা জগদম্বাকে নিজ স্কন্ধ হইতে নামাইয়া টেমস্-গর্ভসাৎ করিলেন তাহার বিবরণ বেশ হাস্যজনক।[8]

তথাকথিত বিজ্ঞানচর্চাকে ব্যঙ্গ করিয়া 'বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব' নামক নক্‌শাটি রচিত। ধনীর কাণ্ডজ্ঞানহীন পুত্র দুর্গাপূজায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রয়োগ করিতে গিয়া দুর্গোৎসবকেও যখন 'এসোটেরিক ও সায়েণ্টিফিক' করিয়া তোলে তখন যে সব অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহাতে অষ্টমীর দিনেই প্রতিমাকে মাটি খুঁড়িয়া কবরিত করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকে না। এই একই বিষয় ও চরিত্র লইয়া অমৃতলাল 'বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব' নামে একটি সঙের ছড়াও রচনা করিয়াছিলেন।* মন্মথবাবুর সাহেব-ভক্তি, তাঁহার পুত্র হেমেন্দ্রের বিজ্ঞানালোচনা, যজ্ঞোপবীতধারী মানিক পদ্মরাজের বিচিত্র ব্যাখ্যা ও বিধান, বটম্‌পট্‌ সাহেবের 'নবভুজা' দুর্গাপ্রতিমা, দেবীর দশম ভুজের পরিবর্তে গণেশের শুঁড়, কলাবউয়ের পরিবর্তে মোটর গাড়িতে করিয়া পার্শী শাটী পরিহিতা তালবধূর স্নানযাত্রা, টাউন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাল বিদ্যালঙ্কারের পূজকের পদে অধিষ্ঠান, সন্ধিপূজার সময় নির্ণয়ের জন্য পূজক কর্তৃক ভাগিনেয়ের বগলে থার্মোমিটার প্রদান, ইলেক্ট্রোকিউশনে পাঁঠাবলি প্রভৃতি বহু উদ্ভট ব্যাপার কৌতুকের তীব্রতায় আমাদের মুহুর্মুহু আন্দোলিত করে। পূজার তিনদিন আমোদের ব্যবস্থাও বড় অভিনব—

"এবার আর মতি রায়, মথুর শা'র যাত্রা নয়;— সপ্তমীর রাত্রে বড় বড়

৪ দুই বৎসর পরে রচিত 'কালাপানি' প্রহসনের বিধানদাতা পণ্ডিতজীর চরিত্রটি ন্যায়রত্নকে কল্পনা করিয়াই সৃষ্ট।

* পৃ ৩৩৫ দ্রষ্টব্য।

নেতাগণের আমেচিওর ডিগবাজী। অষ্টমীর রাত্রে একটি অষ্টমবর্ষীয় দেশ হিতৈষী শিশু বাগ্‌বীর স্থরেনবাবু, বিপিনবাবু প্রভৃতিকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে 'ভারত ও ভারতের 'পার্থক্য' বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, এবং নবমীর দিন 'বজ্র-গর্জনে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত তাইরে-নারে-না শর্মা মহাশয় দুন্দুভিগর্জনে বক্তৃতা করিবেন এবং সানুগ্রহে সমগ্র ভারতের রাজ-টিন-মুকুট শিরোদেশে গ্রহণ করিবেন।"

অষ্টমবর্ষীয় দেশহিতৈষী শিশু কচীন্দ্রের বক্তৃতায় স্থরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাগ্মীদের অনুপ্রাসবহুল বক্তৃতাকে শ্লেষ করা হইয়াছে। হেমেন্দ্রের নব-দুর্গোৎসবে তাহার পত্নীর হর্ষ ও পিতার বিস্ময় সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সুন্দর ফুটিয়াছে। যখন স্বামীর কীর্তিতে পঞ্চদশী পতিপ্রাণা কনককিরীটিনীর 'কোমল কঠোর উজ্জ্বল শ্যামল বক্ষ হর্ষের তুফান' তোলে, তখন পুত্রের কাণ্ডে বিস্ময়ে মন্মথবাবুর 'ঠোঁটের হাসি গোঁফে মিশিয়া' যায়।

গ্রন্থাবলীর 'রসের টুকরা' বিভাগে আছে 'সন্ন্যাসীর বৈঠকখানা', 'পর্দার পশ্চাতের পত্র', 'বিলাত ফেরত এন্ সরকার' ও 'চুটকী'। 'মহিলা শিল্প-মেলা'* সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে 'পর্দার পশ্চাতের পত্রে'। 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনের নন্দলালের কৌতুকপ্রদ পরিণতি প্রকাশ পাইয়াছে 'বিলাত ফেরত এন্ সরকারে'। পিতাকে সে যে সকল হাস্যকর প্রশ্ন করিয়াছে তাহাতেই তাহার ব্যারিস্টারি বুদ্ধি লেখক আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। 'চুটকী'তে 'ভারত-উদ্ধারক, দেশ-সংস্কারক, সম্পাদক, ভদ্রবংশ-জাতক' এক ব্যক্তির চারিত্রিক অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে।

৩

১৩১২ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় 'ঘরের কথা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ষোড়শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হইবার পর 'ক্রমশঃ' থাকিলেও 'ঘরের কথা' আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অসমাপ্ত নক্‌শাটিতে কাহিনীর কোন কেন্দ্র নাই, তিনটি উপকাহিনী ক্ষীণসূত্রে পরস্পর সংলগ্ন। প্রথম কাহিনী রাজচন্দ্র ও তাহার আফিসের সহকর্মীদের ক্রিয়াকলাপ লইয়া জল্পিত; দ্বিতীয়টি রাজচন্দ্রের প্রতিবেশিনী রায়গৃহিণীর সঞ্চয়শীলতা ও পরচর্চা-প্রবণতা লইয়া কল্পিত; এবং

* ঠাকুরবাড়িতে স্বর্ণকুমারী দেবী-প্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয়টিতে রাজচন্দ্রের আফিসের নতুন সাহেব জো ব্যারেগা ও তাহার স্ত্রী সোফির আচার-আচরণ বর্ণিত।

আয়তনে কিছুটা দীর্ঘ হইলেও 'ঘরের কথা' উপন্যাস নয়। কারণ এখানে কাহিনীগত ঐক্য বা ঘটনার সংহত রূপ নাই। লেখক অনেকগুলি বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। কাজেই ইহাকে নক্‌শা বা চরিত্র-চিত্র বলাই সঙ্গত। প্রত্যেকটি চরিত্রকেই দোষগুণসহ এমন বিস্তারিত সরস ভঙ্গীতে বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং তাহাদের উদ্ভট কার্যকলাপ এমনই কৌতুকপ্রদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রায় প্রতিটি পংক্তিই হাস্যরসের আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখক জীবনের অধিকাংশ সময় নাটকীয় সংলাপ রচনায় ব্যয় করিলেও বর্ণনামূলক গদ্যরচনাতেও যে তাঁহাব অসামান্য পারদর্শিতা ছিল তাহার অনেক নিদর্শন 'ঘরের কথা' হইতে মিলিতেছে। লেখকের রঙ্গব্যঙ্গমণ্ডিত বর্ণনা ও বহুদর্শী অভিজ্ঞতা হইতে সৃষ্ট বাঙালী-অবাঙালী অনেকগুলি চরিত্রের সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের বৈষম্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বভাবের স্বরূপ দেখিয়া আমরা অনেক শিক্ষাও লাভ করি।

ভণ্ড, পরশ্রীকাতর ও স্বার্থপর বাঙালীসমাজের মধ্যে লেখক রাজচন্দ্র দাস দে নামে এমন একটি সৎ ও দৃঢ়চরিত্রের ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, যে সহজেই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। রাজুর আশেপাশে খোসামোদপ্রিয় বড়বাবু, ঈর্ষাপরায়ণ সহকর্মীরা, স্পষ্টবাদী ম্যাজ সাহেব, মদ্যপায়ী গোপালেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বিভিন্নধর্মী অনেক মানুষের মিছিল দেখিতে পাই। সেই সঙ্গে আমরা সঞ্চয়শীলা রায়গৃহিণী, পরচর্চাপটীয়সী বিমল-মাসী, রায়গৃহিণীর সংবাদ-সরবরাহকারিণী বোনপো-বৌ, 'পাঁচপুরুষে ভঙ্গ' দেশী সাহেব জো ব্যারেগা, 'সুরাসাহসোন্মত্ত' কাফ্রি সিজার, জো-র সুশ্রী স্ত্রী সোফি, বিদ্যাভারাক্রান্ত ননীন্দ্রবাবু প্রভৃতির সান্নিধ্যলাভ করি।

রাজুর সর্বজনপ্রিয় হইবার কারণ কয়েকটি মাত্র পংক্তিতে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে লেখক আমাদের নিকট স্পষ্টরূপে চিত্রিত করিয়াছেন—

'রবিবারের অবকাশ উপেক্ষা করিয়া, যেমন উল্লাসের সহিত সাহেবের ঘোড়ার শুকনো ঘাস কিনিবার জন্য রাজচন্দ্র বাগবাজারে ছুটিত, তেমনি উল্লাসের সহিত একটা কুলীর মায়ের হাঁপানির ঔষধ আনিতে মালপাড়ায় দৌড়িত,— বরং শেষ কার্যের জন্য সেরূপ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] নিজের গাঁট হইতে দিত।'

আবার গোপালেন্দ্রবাবুর স্থায় কর্মবিমুখ ভ্রষ্টচরিত্রের লোক লেখকের শ্লেষকটাক্ষ হইতে মুক্তি পায় নাই।

দুর্গাপূজার ছুটি চারদিন। কিন্তু—

'গোপালেন্দ্রবাবু নবমীর রাত্রে ভক্তির উচ্ছ্বাসে গরাণহাটার মোড়ে কাদা-মাটী করায় দশমীর দিন তাঁহাকে সংযম করিয়া লালবাজারে থাকিতে হয়, সেদিন মোটেই কাজে আসিতে পারেন নাই; একাদশীর দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দক্ষিণান্ত করিয়া শান্তিজল গ্রহণের পর বেলা একটা বাজাইয়া আফিসে প্রবেশ করায় সাহেব তাহাকে কর্মচ্যুত করিলেন। তিনমাস চেষ্টার পর নূতন চাকরীর জোগাড় করিতে না পারিয়া অমিততেজা গোপালেন্দ্র পরামাণিক ইংরাজের দাসত্ব আর করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশহিতৈষী হইলেন।'

রাজচন্দ্রের প্রতিবেশিনী রায়গৃহিণী সম্পর্কে লেখকের সকৌতুক মন্তব্য এই যে, 'এই রায়-সংসাররূপ নেপালে যদিও রাজমুকুটখানি রায় মহাশয়ের মস্তকে ছিল, তথাপি গৃহিণীই প্রকৃত জংবাহাদুর ছিলেন।' রায়গৃহিণীর রূপগুণের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাও প্রভূত হাস্যরস সৃষ্টি করে। সঞ্চয়শীলা রায়গৃহিণীর গৃহের ঘড়িটা পর্যন্ত লেখকের বর্ণনার গুণে একটি 'চরিত্র' হইয়া উঠিয়াছে—

'একটি বিপুল-বপু ঘড়ী, তাহার দুইটা কাঁটা ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ হইয়া একসঙ্গেই চলে, এবং রায়-গিন্নির দাদাশ্বশুর মহাশয় এক সময় আট আনা খরচ করিয়া তৈলের দ্বারা উহার ষট্‌চক্র ভেদ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে একবার বাজিতে আরম্ভ করিলে আর সহজে ক্ষান্ত হয় না।··· আবার সে বাদ্যের বোল কি শ্রবণরঞ্জন! টুং টাং ঠিং ডিং ডিং কি ঢং ঢং নয়, একেবারে পুরা খাম্বাজের গিটকিরিভরা—ধন্‌ ধরর্‌ রর্‌রর্‌।··· রায়-গিন্নির প্র-দাদাশ্বশুর মহাশয় এক মার্কিন হাউসে মুচ্ছুদ্দি ছিলেন; সাহেব বিলাত (আমেরিকা) যাইবার সময় এই ঘড়ীটি তাঁহাকে খেলাৎ দিয়া যান।'

রায়গৃহিণীর ছিল বন্ধকী কারবার। তাঁহার 'নখিন্দরের বাসর-ঘরে' এই সকল বন্ধকী দ্রব্যপূর্ণ অনেকগুলি সিন্ধুক ছিল। ইহা ব্যতীত কক্ষটি ঠাসা ছিল অগণিত হাঁড়িতে। এই হাঁড়িগুলির বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক রায়গৃহিণীর সঞ্চয়শীলতাকে ক্রমশ এমন অতিশয়িত করিয়াছেন যে আমাদের স্মিতহাস্য এক সময় অট্টহাস্যে পরিণত হয়—

'এই হাঁড়ীর কাঁড়ীর মধ্যে কোনটিতে চালভাজার নাড়ু— গৃহিণীর শাশুড়ী জীবিতকালে স্বহস্তে উহা পাক করিয়াছিলেন; কোনটিতে দাদখানি চাউল— তাঁহার শ্বশুরের অতিশয় পীড়ার সময় ক্রয় করা হয়; কোনটিতে তাঁহার নিজের বিবাহান্তে মেলানি ভারের ফেনী বাতাসা; তাঁহার দিদি-শাশুড়ী কাশী হইতে নৌকাপথে পেঁড়া আনিয়াছিলেন, তাহার গুটি চারপাঁচ কোন হাঁড়ীতে আছে; কোনটিতে কর্তার প্রথম ষষ্ঠীবাটার ক্ষীরের ছাঁচ ও চন্দ্রপুলি, বয়স পরিপক্ক হওয়ায় উভয়েরই বর্ণ গাঢ় হরিৎ ও গাত্রে শুভ্র লোমাবলি বাহির হইয়াছে; কোনটিতে পুত্রের ফুলশয্যার চিনির মুড়কী, ছাতুবাবুর পুত্রের বিবাহের সামাজিকের ওলা কোন হাঁড়ীতে। বিবাহের জল গায়ে লাগিয়াই কর্তার একবার জ্বর হইয়াছিল। সে সময় সাবুদানা আসে, তাহার একমুঠাও এক হাঁড়ীর তলায় পড়িয়া আছে। এইরূপ রলার খিরপুলি, অভয়চরণ মিত্রের বাড়ীর মেঠাই, রাধাকান্ত দেবের শ্রাদ্ধের খাজা, খেলাৎ ঘোষের জন্মতিথি পূজার গজা, বিশ-বছুরে খেজুর, পঁচিশ-বছুরে নারিকেল নাড়ু, ঝড়ের বছরের বেদানা, ৬০ সালের পেস্তা, ৭২ সনের খাস্তার কচুরি ইত্যাদি বহুবিধ দেবদুর্লভ দ্রব্যে হাঁড়ীগুলি পরিপূর্ণ; একটি বড় হাঁড়ায় গুটিকয়েক কমলালেবু ও আম গৃহিণী একদিন যৌবনকালে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, ইঁদুরমাটীর সাহায্যে তাহা হইতে ২।৪টী গাছ বাহির হইয়াছিল।'

এই কক্ষের ইঁদুরের ভয়ে বিড়াল প্রবেশ করে না।—

'গৃহিণী কয়েকবার কল পাতিয়াছিলেন; কিন্তু সাত আটটি কল ভগ্ন হইবার পর হইতে তিনি মৃগয়ায় ক্ষান্ত দিয়াছেন।'

রায়গৃহিণীর পরচর্চার আসরে বিমল-মাসীর কাশির বর্ণনাও উল্লেখ করিবার মত—

'বিমল-মাসীর বুকের ভিতরে শত কবুতর একেবারে ডাকিয়া উঠিল, মুখখানি পুঁই-মিটুলীর রং ধারণ করিল, জলভারাক্রান্ত চক্ষুর গোলক দুইটি খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।'

তৎকালীন নাট্যসমালোচক ও তাঁহাদের সমালোচনার ভাষাকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিবার জন্য লেখক কাঁচড়াপাড়ার কারখানার কাক্রী-পোটার সিজারের একটি উদ্ভট কাণ্ড কল্পনা করিয়াছেন। কাক্রীটি একদিন 'সুরাসাহলোন্মত্ত' হইয়া একটি চলমান ইঞ্জিনকে আক্রমণ করিতে গিয়া নিহত হইল।

'একটি উদ্যমশীল রঙ্গ-সম্প্রদায় ঐ ঘটনাটিকে নাট্যগৌরবে মণ্ডিত বোধে' 'রেলে রক্ত' নাম দিয়া প্রহসন রচনা করিয়া অভিনয় করে'। ইহার পর অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

"এই প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া 'বঙ্গ-বক' লিখিয়াছিলেন যে, 'এতদিনে বাঙ্গালা ভাষায় আমরা একখানি যথার্থ নাটক দেখিলাম। এই কুৎসা-কলঙ্ক-কালিমা-কুজ্ঝটিকার কোকনদময় দুর্দিনে, এই ধর্মনাশ, ভাষা-হ্রাস, বিজাতীয় ভাষ, ইংরাজি চাস, গ্যালারি ঠাস, 'পিটে' পাশ প্রভৃতির প্রচেতাপূর্ণ কালে দেখিলাম একখানি নাটক; 'রেলে রক্ত'— যথার্থ ভক্তের আদরের ধন; প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া শূন্য-উদর, বিবেক-বিমুক্ত দর্শক-সমূহ উচ্চরবে হাস্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু আমাদের ন্যায় পূর্ণ-গর্ভ নিরেট সাধুজন মর্মে মর্মে কাঁদিয়াছেন।... কবির... লেখনীতে স্বর্ণ বর্ষণ হউক, মস্যাধারে হীরকের শিলাপাত হউক, কাগজে মণিমুক্তার ঝঞ্ঝাবাত হউক, আর তাঁহার কল্পনায় বজ্রাঘাত হউক।"[৫]

'ঘরের কথা' রচিত হইবার বিশ বৎসর পরে অমৃতলাল বিভিন্ন প্রবন্ধে কেতাবী বিদ্যার গুরুভার কিভাবে বাঙালী যুবকের দেহমনের স্বাস্থ্যহরণ করিতেছে তাহা আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধের বক্তব্য বিশ বৎসর পূর্বেই ননীন্দ্রবাবুর প্রসঙ্গে ব্যক্ত হইয়াছিল—

'ননীন্দ্রবাবুকে দেখিলেই যেমন বুঝা যায় যে, তাঁহার পাণ্ডুর মস্তিষ্কটি বিশৃঙ্খল ব্যবহৃত ব্লটিং কাগজের ন্যায় এলজেব্রা, ট্রিগণমেট্রি, মিল, মেকলে, হক্স্‌লি, স্পেন্সার প্রভৃতির মুদ্রিত পৃষ্ঠারাশির অস্পষ্ট প্রতিলিপিতে পরিপূর্ণ...।'

দেখা যাইতেছে, ব্যঙ্গরসিক অমৃতলাল কোন অবস্থাতেই আপন উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন নাই; গল্প বলিতে গিয়াও তিনি প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া জীবনের নানা অসঙ্গতিকে কশাঘাত করিয়াছেন।[৬]

সমালোচকদের অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বরকে পরশুরামও এইভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, 'এই লেখার কেমন একটা ঔদরিক ঔদার্য, যেন একটা হৃষ্ট হ্রেষা— ভারি অবাক লাগে কিন্তু।' ('রাতারাতি')

'ব্যঙ্গরচনা প্রচ্ছন্ন কর্মস্পৃহা, সে শিল্পজগতের বৃহন্নলা। নাচ শেখায় বটে কিন্তু আসল উদ্দেশ্য কখনো বিস্মৃত হয় না, এমন কি উত্তর-গোগৃহের রণক্ষেত্রে সারথি মাত্র হইয়াও সে রথীর কাজ করিতে থাকে।' (কালীপ্রসন্ন সিংহ: 'চিত্র ও চরিত্র'— প্রমথনাথ বিশী, পৃ ৯১)

'গোকুল তুই ক্ষান্ত দে' নামক চিত্রটি 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩১৮) প্রকাশিত হয়।[৭] দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারের চিত্রটি তিক্ত ব্যঙ্গের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। কেহ কিছু বলিলেই তাহার প্রতিধ্বনি করিবার যে-অভ্যাস বাঙালী জনতার চিরকালের তাহাও পরিস্ফুট হইয়াছে। জনতা-মধ্যস্থ 'ভারতসন্তান'দের সহিত 'ভারতমহিলা'রা আসিয়া যোগ দিলে যে অবস্থা হইল তাহা এইরূপ—

'এবার কঠোরে মধুর মিশিল, পাঁঠার মাংসে ঘি পড়িল, নাগরা জুতায় তেল, চালতার অম্বলে গুড়, সানের মেঝেয় শীতলপাটী, পাহারাওয়ালার মুখে রসগোল্লা পড়িল, ঢাকের সহিত কাঁসী বাজিল···।'

'শিরোমণির তীর্থযাত্রা' নামক উপাদেয় নকৃশাটির কিয়দংশ 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইবার পর ১৩২৩ সালের 'মানসী ও মর্মবাণী'র আষাঢ় সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবার প্রতিশ্রুতিসহ[৭ক] প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সবেমাত্র কাহিনীর সূত্রপাত করিয়া এবং শিরোমণি ও তদীয় ব্রাহ্মণী গোবিন্দসুন্দরীর চরিত্র অতিশয় উপভোগ্যতার সহিত উপস্থাপিত করিয়া লেখক অসুস্থ হইয়া পড়েন। আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই সংখ্যার পরে 'শিরোমণির তীর্থযাত্রা' আর প্রকাশিত হয় নাই।[৮]

প্রথমে 'পূর্বকথা'। এখানে বাঙালী-চরিত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্যের দিকে লেখক তির্যক দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তাহাদের একটি হইল ইংরেজ ও ইংরেজীর প্রতি অন্ধ আনুগত্য। এই প্রসঙ্গে অমৃতলালের মত—

'কলিতে প্রাণ অন্নগত, সেই অন্ন আবার ইংরাজের হস্তগত। আমরা ব্যবসা করি ইংরাজের মাল কিনিয়া বাজারে বেচিবার জন্য অথবা বাজারের মাল কিনিয়া ইংরাজকে বেচিবার জন্য।. আমরা লেখাপড়া শিখি ইংরাজের

৭ কোন একগুঁয়ে ব্যক্তিকে নিরস্ত করিবার জন্য সম্ভবত সেকালে কলিকাতায় 'গোকুল তুই ক্ষান্ত দে' বলিয়া অনুনয় করা হইত। 'একাকার' প্রহসনেও দেখি, উমাচরণ অসহিষ্ণু যাদবকে বলিতেছে, 'ক্ষমা দে গোকুল'।

৭ক "এই প্রবন্ধের কিয়দংশ 'বসুমতী' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে।"

৮ ভাদ্র সংখ্যা 'মানসী ও মর্মবাণী' হইতে জানিতে পারি— 'নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের শরীর মাসখানেক হইতে কিছু কিছু অসুস্থ হইয়াছিল। সেই কারণে এ সংখ্যা 'মানসী ও মর্মবাণী'তে তাঁহার শিরোমণির দর্শন পাওয়া গেল না।'

আদালতে ওকালতী করিবার জন্য, ইংরাজী ঔষধের প্রেসক্রপশন লিখিবার জন্য, ইংরাজী মালে ইংরাজী ফ্যাসানের ইমারত গড়িবার জন্য, ইংরাজী স্কুলে ইংরাজী পড়াইবার জন্য, আর ইংরাজের দ্বারে জজিয়তী হইতে বেলিফগিরি, বড়বাবু হইতে সরকারী পর্যন্ত চাকরী বা চাকরীর উমেদারী করিবার জন্য।'

ভ্রমণ-বিলাসী বাঙালীর আর একটি চরিত্র-লক্ষণ রেলের 'পাসের' জন্য লোলুপতা। 'তুতো' ভাইরা পাস চাহিয়া রেলবাবুদের সময়টা কেমন করিয়া 'তিতো' করিয়া দেয় তাহাও লেখক ব্যঙ্গ-ভ্রূভঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছেন। এই নকশার কেন্দ্রীয় চরিত্র 'রামবিহঙ্গ শিরোমণি মহাশয় এইরূপ পাসকে উপাসনার চক্ষে দেখেন।'

শিরোমণি মহাশয়ের নিবাস, তাঁহার উপাধি এবং তাঁহার বংশের সকলের নামের ইতিহাস লেখকের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় বর্ণিত হইয়াছে—

'বঙ্গদেশ শেষ হইতেছে, উড়িষ্যা আরম্ভ হইতেছে, এই দুয়ের সন্ধিস্থলে একটি সরল রেখার উপর কুলগুঁটী গ্রাম, সেই গ্রামে শিরোমণি মহাশয়ের বাস। বঙ্গবাসীরা ঐ সরলরেখার অধিবাসীগণকে বাঙালী বলেন না, উড়িষ্যা-বাসীরাও উড়িয়া বলিয়া স্বীকার করেন না।... কোন্ টোলে কানায়ে ঠেলে রামবিহঙ্গ ঠাকুর শিরোমণি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা কেহ বিদিত নয়। ইহাদের বংশের সকলেরই আদ্যনাম রাম; রামদাস, রামচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া লাল, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, সেবক, লোচন, ভদ্রাদি সংযোগ করিতে করিতে শিরোমণি মহাশয় ও তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র, দুই বর্তমান বংশ-বর্তিকার নাম হইয়াছে— রামবিহঙ্গ ও রামপতঙ্গ।'

শিরোমণি মহাশয়ের বিড়ালতপস্বী রূপ, ও নাম ভাঁড়াইয়া শিষ্যের পাস লইয়া তীর্থযাত্রার লোভ বেশ সুন্দর ফুটিয়াছে—

'প্রত্যহ খিড়কীর ডোবার জলে গঙ্গাস্নান করিয়াই শিরোমণি মহাশয় স্বীয় বিস্তীর্ণ ললাটদেশে পঙ্কের কাজ করিয়া তাহাতে পীতাভ মৃত্তিকার দ্বারা তিন চারিটী রেখা অঙ্কিত করেন; তাহার পর লম্বকর্ণ, সলোম বাহু এবং বক্ষবনও চিত্রাবলী বিভূষিত হয়।'

অথচ 'ব্রাহ্মণত্বের অভিমান ও গর্ব রামবিহঙ্গ ঠাকুরকে সুরাসেবী অপেক্ষা অধিক মাতাল করিয়া রাখিয়াছে।'

কিন্তু পাস লইয়া তীর্থযাত্রা করিবার লোভে 'গুরুদেবও স্বীয় শিরোমণিত্ব সরাইয়া রাখিয়া আপনাকে প্রাণবন্ধু প্রামাণিক বা শীতলকৃষ্ণ সাহা বলিয়া

পরিচিত করিতে অকুতোভয়।' পাস দিতে গিয়া শিষ্যেরা মা ঠাকরুণকে ব্রজবল্লভ শ্যামহরি কি প্রাণবন্ধুর পরিবার বলিয়া পরিচিত করিতে আপত্তি করিলে শিরোমণি বঙ্গ-উড়িষ্যার প্রান্তীয় উপভাষায় ব্রাহ্মণীর নিকট যে প্রস্তাব করিলেন ও তদুত্তরে ব্রাহ্মণী যে-কথাগুলি বলিলেন তাহাও বেশ উপভোগ্য হইয়া হঠিয়াছে—

"'হেদ্দেখ বাখড়ার বউ, এবারটে আমি একাই যাওয়া করি, এই রেইলের মম্মটা আর কাশীখণ্ড যাগাটা একবার চক্ষে দেখে বুঝা করে আসি, তখন গে—'

'তোমার ছরাদ ভাল করেই হবেক।' স্বামীর বচনের পাদপূরণার্থ গোবিন্দ বামনী ঝড়বেগে উক্ত কয়েকটি কথা নিষ্ঠীবনের ন্যায় ত্যাগ করিয়াই মাতৃমহ্যাদি-সঙ্কলিত স্বামীস্তোত্রমালা স্মরণ করিয়া স্বীয় পতির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন…।"

স্বামী তাঁহার তীর্থযাত্রায় বাদ সাধিতেছেন দেখিয়া গোবিন্দসুন্দরী—'হাঁড়িচাঁচা, পানকৌটী, বায়স, গৃধিনী, কুক্কুটাদি, বিবিধ বিহঙ্গ-রবের একতান তুলিয়া রোদনতালে ভবন ভাসাইতে লাগিলেন এবং ললাটে, বক্ষে ও বসুমতীতে যুগল করপল্লবের চপেটাঘাতে ঐ বাজখাঁই আওয়াজের সঙ্গে যেন পাখোয়াজ বাজাইতে লাগিলেন।'

'গজুর ভজন' নামক নক্শাটি ১৩৩২ সালের 'মাসিক বসুমতী'র কার্তিক সংখ্যা হইতে চারিটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। অমৃতলালের অন্য অনেক রচনার মত কাহিনী অপেক্ষা চরিত্রই এখানে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। কয়েকটি বিচিত্রচরিত্র ব্যক্তি তাহাদের কার্যে ও কথায় হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। তবে অহেতুক হাস্যরসসৃষ্টি লেখকের উদ্দেশ্য নয়; অপরিণতমনা অপদার্থ যুবক লভেলী প্রণয়ের কুহকে মজিয়া হিতাহিতজ্ঞান বিসর্জন দিলে তাহার জীবনে কিরূপ বিপর্যয় আসে তাহা প্রদর্শনই লেখকের অভিপ্রেত।

গজেন্দ্রজীবন হাইত ওরফে গজু ইংরেজের উপর রাগিয়া থার্ডক্লাসে উঠিয়া স্কুল ছাড়িয়া, দেড় বৎসর কলিকাতা আর্ট স্কুলে দাঁড়ি টানিয়া, বিলাতী চলচ্চিত্র হইতে আলিঙ্গনের মাধুর্য ও চুম্বনের চাতুর্য শিক্ষা করিয়া, মামাত বোন বদ্দিকে (বদরিকা) উচ্চশিক্ষিতা মহিলা করিবার ভার লইল। গজুর নিকট হইতে 'ললিত বেশবিন্যাসের' শিক্ষা ও 'চলিত প্রেমের উপন্যাস' পাঠের দীক্ষা লইতে লইতে এক সময় 'ভ্রাতা-ভগ্নীর স্নেহ-দুগ্ধ' 'প্রেমের গাঢ় রাবড়ী'তে পরিণত

হইল। বদিকে বিবাহ করিয়া তথাকথিত সম্ভ্রান্ত জীবন যাপন করিতে গিয়া গজু অর্থাভাবে কিরূপ নাকাল হইল ও শেষ পর্যন্ত নবদ্বীপে গিয়া 'মাদারের ব্রাদারের আপনার শিষ্টার' কুঞ্জতারিণী বৈষ্ণবীর আশ্রয়ে শান্তিলাভ করিল, বদরিকাই বা কিরূপে স্বামীর অনুপস্থিতিতে পাওনাদারদেব অভাবিত তাগাদায় ও বেতন-না-পাওয়া ঠাকুর-চাকরদের অতর্কিত বিদ্রোহে বিভ্রান্ত হইয়া সারাদিন উপবাসের পর পিসতুত ভাইয়ের সহিত পরিণয়ের পরিণাম ও তাৎপর্য ঝিয়ের নিকট শিক্ষা করিল ও এক ব্রাহ্মগৃহিণীর সহায়তায় ব্রাহ্ম হইয়া ধাত্রীকার্যে নিযুক্ত হইল তাহাই কোথাও সরস, কোথাও সজল, আবার কোথাও বা ব্যঙ্গ-বক্রোক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল চরিত্রের পাশাপাশি কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র পাইতেছি। ইহারা সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে আসিয়াছে— যাত্রাদলের ছোকরা, ঠিকে-ঝি, আভিজাত্য-গর্বিতা কৃত্রিম সমাজসেবিকা, রিহার্স্যালপাগল অভিনেতা প্রভৃতি। ইহাদের ব্যবহার ও কথাবার্তা জীবনের আলো-অন্ধকাবময় কয়েকটি অভিজ্ঞতার অকৃত্রিম স্বাদ দিয়াছে। 'প্র্যাকটিক্যাল জোকার' চারু চক্রবর্তীর কৌতুকপ্রদ আচরণ, 'ফুল্কোমুখী' (কখনও 'নিমমুখী') ঝিয়ের স্বতোৎসাবিত স্নেহ, বদির দুই সমাজ-সেবিকা বান্ধবী অরু ও নিপুব হৃদয়হীন আচবণ, কিংবা মেঘনাদের ভূমিকাভি-নেতা ড্রাগন থিয়েটারের রাখালের বিচিত্র রিহার্স্যাল আমাদের কখনও প্রসন্ন, কখনও বিষণ্ন, কখনও স্তম্ভিত করিয়া দেয়; আবার কখনও বা আমরা উতরোল হাস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি।

লেখক তাঁহার অনন্যকরণীয় ভাষায় একটিমাত্র বাক্যে গজেন্দ্রকে আমাদের নিকট স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন—

'গজেন্দ্র জাতিতে বাঙ্গালী, পরিচ্ছদে ফিরিঙ্গী, পূজাপার্বণে হিন্দু, প্রণামী দেবার দায়ে ব্রাহ্ম, আহারে ক্রিশ্চান, ধনলিপ্সায় জৈন, মুষ্টিযুদ্ধের সম্মুখে বৌদ্ধ, আর পবিত্র প্রণয়ের মাহাত্ম্যে মামাত ভগ্নীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করবার সময় দিন আষ্টেকের জন্যে আর্যসমাজী হয়েছিলেন।'

গজু ও বদির বিবাহের প্রসঙ্গে আর্যসমাজীদের প্রতি লেখকের ব্যঙ্গ* তাঁহার তিক্ত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে—

* 'হামিদের:হিম্মৎ' (১৩৩৩) উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদেও আর্যসমাজের ক্রিয়াকলাপের প্রতি লেখকের কটাক্ষ আছে।

'বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, উড়ে কোন বামুনই যখন এ বিবাহে মন্ত্র পড়াতে স্বীকৃত হলেন না, তখন কি ভয়ে যে পাত্রটি পাত্রীটিকে নিয়ে মসজিদের দ্বারে উপস্থিত না হয়ে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে ও পরে এক এক করে ছুটি গির্জাঘরে গিয়ে আশীর্বাদলাভে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শেষ আর্যসমাজী হরজন দাসের দয়ায় ভ্রাতা-ভগ্নী ভর্তা-ভার্যায় রূপান্তরিত হয়, তা যিনি সোঁয়াপোকাকে প্রজাপতিতে পরিণত করতে পারেন, তিনিই জানেন।'

বদ্দির সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য এই যে, সে 'প্রণয়ে চৌর্য ও পরিণয়ে আর্যবৃত্তি অবলম্বন করলেও নিতে-থুতে একেবারে বনিয়াদি হিন্দু।' সুতরাং বিবাহের পর প্রথম পূজা উপলক্ষে গজুকে সে যে লম্বা ফর্দ দিয়াছে তাহা পাইয়া সঙ্গতিহীন গজু বিষম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া হেদোয় গিয়া বসিয়াছে। এই অবস্থায় গজু কিভাবে প্রকৃতিকে দেখিতেছে তাহাও লেখকের সকৌতুক বর্ণনায় অনন্যসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে—

"১৫ দিন ক্ষয়রোগে ভুগে চন্দ্রদেবের কাল গঙ্গালাভ হয়েছে; আকাশেরও শারীরিক অবস্থা ভাল নয়, গায়ের আগাগোড়া বসন্ত সব ডবডবে হয়ে পেকে উঠেছে। সাধারণ লোকের চক্ষুতে যা নক্ষত্ররাজি, গজেন্দ্রের দৃষ্টিতে আজ তা 'মা-র অনুগ্রহ', কেননা তিনি কবি এবং তাঁর মন আজ দুশ্চিন্তায় বিষাক্ত।"

কথোপকথনে গজু অজস্র ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে। তাহার অকুণ্ঠিত ইংরেজীতে 'কো-একসিডেন্স', 'হ্যাপিনেশ হলাম', 'রেলওয়ে পোষ্টার' (পোর্টারকে), 'ডিক্রেশ (ডিপ্রেস্‌ড) ক্লাস' প্রভৃতি অনর্গল উচ্চারিত হয়। নবদ্বীপ গজুর অপরিচিত বলিয়া চারু যখন তাহাকে কয়েকদিনের জন্য তাহার বাড়ীতে আতিথ্য লইতে বলিল তখন কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে গজু বলিয়া উঠিল—

'তুমি আমার ব্রাদার—ব্রাদার কি, ব্রাদার্স ফাদার—মাই ফাদার। তোমার বাড়ী অবশ্য আমি ঘোষ্ট হব।'[১০]

ঝিয়ের চরিত্রটি খুব জীবন্ত। 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র ঝিয়ের সহিত তাহার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। নকশায় আর্যসমাজীদের প্রতি, কৃত্রিম সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি,

১০ কয়েক মাস পরে রচিত 'ব্যাপিকা-বিদায়' প্রহসনের (১৩৩৩) মিসেস পাকড়াশী ও ঘনশ্যামের ইংরেজীও এইরূপ।

নকল সাহেবদের প্রতি যেমন কটাক্ষ আছে, তেমনই আবার আছে ঝি ও চন্নন বোষ্টুমীর সহৃদয়তার প্রতি লেখকের সপ্রশংস দৃষ্টিপাত। গজু কিভাবে 'বৃন্দাবন মেড পেটেন্ট্‌ বৈষ্ণব' হইয়া রীতিমত ভজন আরম্ভ করিল তাহার মধ্যে কৌতুক ও কারুণ্য সমভাবে মিশ্রিত। মনে হয়, অপরিণতমনা ও অপরিণামদর্শী গজুব পরিণতি চিত্রিত করিতে গিয়া তাহার প্রতি লেখকেব কিছুটা করুণার উদ্রেক হইয়াছিল। তবে হাস্যরসিক অতিপ্রকাশ্যভাবে করুণা বা সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার মনোভাব আমাদেব অনুমান করিয়া লইতে হয়।[১১]

'গজুর ভজন' প্রকাশকালেই 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সমালোচনা বিভাগে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়—

"নটরাজ অমৃতলালের লেখনীপ্রসূত অপূর্ব গল্পেব ধারাবাহিক প্রকাশ। নবচরিত্রের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর অংশের এমন সুপবিস্ফুট চিত্রণ আজকাল অতি কমই দৃষ্ট হয়। পড়িতে আবম্ভ করিলে চট করিয়া ফুরাইয়া যায়। ...রসরাজ অমৃতলালের রসময়ী লেখনীর প্রসাদে আমরা এই অপূর্ব চিত্র দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার লেখা পড়িবার জন্য অনেকেই 'শীষ পা' করিয়া থাকে। এরূপ গল্প বঙ্গসাহিত্যের শ্রী, অলংকার; আর যে পত্রিকায় বাহির হয় তাহারও গৌরব।..."[১২]

৪

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 'পতিত ডাক্তার', 'কৌলিক দুর্গোৎসব', 'যোদ্‌-দা', 'মাতৃভক্তি', 'ষষ্ঠীব প্রভাত', 'নলের নবকলেবর' ও 'থিয়েটাবে পিসু' এই সাতটি নক্‌শা ও গল্প 'কৌতুক-যৌতুক' গ্রন্থে (১৩৩৩) সংকলিত হয়। বর্ণনায় ও বক্তব্যে সাতটি রচনাই স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। গল্প জমাইয়া তুলিবার দুর্লভ গুণের পরিচয় সর্বত্র মেলে। মজলিসী গল্পের মতো গল্প বলিতে বলিতে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আবার মূল গল্পে ফিরিয়া যাওয়ার ধরন কয়েকটি গল্পে লক্ষ্য

১১ 'হাস্যরসিকের সহানুভূতি অতি সচেতন. কবির ভাবপ্রবণতা ইহাতে নাই, কারণ ইহাও তাঁহার কাছে হাস্যকর।' ('দীনবন্ধু মিত্র'— ডঃ সুশীলকুমার দে, পৃ ৫৯)

১২ বঙ্গবাণী : ফাল্গুন ১৩৩১

করা যায়। তবে গল্প অপেক্ষা চরিত্রসৃষ্টির দিকেই লেখকের আগ্রহ বেশী। পতিত, যোদ্-দা, ভদ্রনাথ, রত্নময়ী, কুদরৎউল্লা, তাজু ও ফকির মামার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। কিন্তু অহেতুক কৌতুক-সৃষ্টির জন্য লেখক লেখনী ধরেন নাই; পতিতের বিচিত্র ডাক্তারি, রায়েদের অত্যধিক কারণ-সেবনের পরিণতি, যোদ্-দার ভাবভঙ্গী ও অদ্ভুত ইংরেজী আমাদের মনে শুধু হাস্যরসই সৃষ্টি করেনা, সমাজ হইতে বিলীয়মান এই সব মানুষের জন্য আমাদের দীর্ঘশ্বাসও পড়ে। জীবনের কোন গভীর অপ্রত্যক্ষ দিক অথবা অসঙ্গত আতিশয্য, তথাকথিত শিক্ষার কুফল, নাটক ও নাট্যশালার অধোগতি ইত্যাদি নানা বিষয় এই সব আপাত হাস্যরসাত্মক রচনাবলীর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে।

'পতিত ডাক্তার' নামক নক্‌শাটিতে লেখক পতিতের ডাক্তারি ও তাহার মনুষ্যত্বের বিচিত্র পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা না থাকায় পতিত মেটিরিয়া-মেডিকা পড়িয়া, খাতায় প্রেস্কৃপশন লিখিয়া, রোগীর পরিচর্যা করিয়া কিংবা নেলার সাহেবের ডাক্তারখানায় গিয়া দেখিয়া শিখিয়া ডাক্তাব হইবার কিরূপ উদ্যম করিয়াছিল এবং তাহার ডাক্তারির বিধিপদ্ধতিই বা কত অদ্ভুত ছিল তাহাই এখানে বর্ণিত হইয়াছে। আরম্ভের প্রথম বাক্যটিই পতিতের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে—

> 'পতিত গুপ্ত যে জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, একথা অবশ্যই গুপ্ত ছিল না; কিন্তু তাঁহার ধাতের ভিতর যে বৈদ্যবিদ্যাও গুপ্ত ছিল একথা তাঁহার মন ফিসফিস করিয়া তাঁহাকে ছেলেবেলা হইতেই শুনাইত।'

রোগনির্ণয়ে ও রোগের নামকরণে পতিত বিস্ময়কর মৌলিকতার পরিচয় দিত—

> "একটা বাঙলা শব্দের এক ইংরাজী অর্থ সে প্রায় দুবার ব্যবহার করিত না, সকালে যদি কাহাকে ঢেঁকুর উঠছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া 'pomping হচ্ছে কেমন' বলিত, বৈকালে তাহাকেই আবার জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত 'fountain হয়েছে কতবার?'"

রোগ ও ঔষধের নামগুলিও সে বিচিত্র ধরনের দিত। বাগীকে বলিত 'টাইগ্রেস'। কুইন ও আইন মিলাইয়া কুইনাইনের নাম দিয়াছিল 'রেজিনা লিগালিয়া'। শ্রীকান্ত নন্দনের রোগ নির্ণয় করিয়াছিল—'লিভারিস্ ফিভারিস্ রেমিট্যান্‌স্'!

অথচ এই পতিত ডাক্তারই দুঃস্থ রোগীর ঔষধের পুরা দাম চুকাইয়া সাবু মিছরিও কিনিয়া দিত; রোগীর মৃত্যু হইলে বাড়ীর ছেলের মত খাট ধরিয়া শ্মশানে ছুটিত। যে উদ্দেশ্যে লেখক এই 'মূর্খ' ডাক্তার-চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন তাহা সফল হইয়াছে, সকল হাস্যকরত্ব অতিক্রম করিয়া মহৎ মানুষ-রূপেই সে আমাদের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

গল্পের ঢঙটি মজলিসী। সেইজন্য লেখক পতিতের শৈশবের বর্ণনা দিতে গিয়া সেকালের কলিকাতার অনেক খণ্ড চিত্র আঁকিয়াছেন। মুৎসুদ্দি-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন, পুরাতন রীতির ডাক্তারি, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জীবনধারা ইত্যাদি একই সঙ্গে সাহিত্য ও ইতিহাস হইয়া উঠিয়াছে।

'কৌলিক দুর্গোৎসব' নামক নক্‌শাটিতে পাবনা জেলার 'বামাচারী কৌল' রায়েদের ৭০ বছরের জঁাকজমকপূর্ণ প্রতিমাপূজা শেষ পর্যন্ত কিভাবে ঘটপূজায় পরিণত হইল তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সেকালের দুর্গোৎসবের আনন্দ কিভাবে সর্বস্তরের বাঙালীর প্রাণে সঞ্চারিত হইত তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক রায়েদের বাড়ীতে 'আনন্দের চোটে কত রকম মজার রং' ঘটিয়াছিল সে গল্প আমাদের শুনাইয়াছেন। বর্ণনার গুণে রায়েদের দুর্গোৎসব জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা জানিতে পারি, রায়েদের বড় বাড়ীর পূজায় দুই মণ চাউলের নৈবেদ্য ছয় জন জোয়ান বেহারাকে বহিতে হইত, পঞ্চান্নটি ছাগ ও পাঁচটি মহিষ বলি হইত, কারণের ঢেউ উঠিত, সদর হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ পঞ্চাশখানা গ্রাম পর্যন্ত নিমন্ত্রণ হইত, সদর হইতে জজ, কালেক্টর, ডাক্তার-সাহেব, পুলিশ-সাহেব, প্রভৃতি আসিয়া তিন দিন যাত্রা শুনিতেন; নবমীপূজার দিন ছাগমহিষরক্তে প্লাবিত অঙ্গনে গড়াগড়ি দিয়া সকলে কাদামাটি করিত। সত্তর বৎসর ধরিয়া এইভাবে পূজা অনুষ্ঠিত হইবার পর একবার সারারাত্রি কারণ পান করিয়া প্রতিমা আনিতে গিয়া রায়েরা 'ষষ্ঠীতে দশমী' ভ্রমে প্রতিমার বিজয়া করিয়া গৃহে ফিরিলেন! সেই হইতে রায়েদের বাড়ী প্রতিমা-পূজা বন্ধ হইয়া গেল।

অমৃতলাল ছিলেন নিপুণ গল্পকথক। সেইজন্য মূলকাহিনীর অঙ্গীভূত অতি তুচ্ছ প্রসঙ্গও তিনি আশ্চর্য উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন— নৈবেদ্যের শিরোভাগের আগ্‌মণ্ডাটির ওজন কত, ছেলেমেয়েরা কখন কারণপাত্রে আঙুল ডুবাইয়া জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিত, প্রতিমাকারের জন্য কি কি সিধা দেওয়া হইত ইত্যাদি অনেক বিষয়ই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কালেক্টর সাহেবের

অনুরোধক্রমে 'নল-দময়ন্তী' পালায় হনুমানকে আনিবার পর যে 'ডিমক্র্যাটিক যাত্রা' শুরু হইল তাহার অতি হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা দিতেও লেখক কুণ্ঠিত হন নাই—

'পঞ্চাশ-পঞ্চান্নটা হনু লাফাইতেছে, হাতে হ্যাট তুলিয়া সাহেবরা লাফাইতে-ছেন, শাম্‌লা মাথায় ডেপুটি লাফাইতেছে, ভুঁড়ি ফুলাইয়া সদরালা লাফাইতেছে, হাসিবার চেষ্টা করিয়া মুন্সেফ লাফাইতেছে, সেরেস্তাদার, পেস্কার, নাজীর, মহাফেজ, পেয়াদা, আর্দালী, বাড়ীর কর্তা, বাবুরা, পা'ক, সর্দার, খানসামা সবাই লাফাইতেছে, আর ঢুলী-ঢাকীরা বাজাইতে বাজাইতে উচ্চলম্ফে নৃত্য করিতেছে।'

'যোদ্-দা' একটি স্মৃতিচিত্র। লেখকের প্রথম যৌবনের আড্ডার সঙ্গী (বয়সে আট-দশ বছরের বড়) যোদ্-দা ওরফে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্য দিয়া একটি দুর্লভ মানুষের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। ব্যবসা করিতে গিয়া সকলকে বিশ্বাস করিয়া সর্বস্বান্ত যোদ্-দার বিমূঢ় বিপর্যস্ত অবস্থা, চাকরি না পাইয়া তাঁহার চুরির 'লাইসেন্স' পাইবার আকুলতা, আবার স্বর, চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং-র অংশীদার যোদ্-দার নির্মল আনন্দোচ্ছ্বাস আমাদের মনকে নানাভাবে আন্দোলিত করে। প্রারম্ভের সরসতা রচনার শেষে গিয়া রীতিমত গভীর ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যোদ্-দার বিচিত্র উক্তি ও অনন্য চরিত্রবৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনারীতির নিদর্শন অনেক স্থলেই মেলে। যেমন, 'অভাবের সংসারে সদ্ভাবেরও অভাব। সেখানে উনুন ছাড়া সকল জায়গাতেই দিনরাত আগুন জ্বলতে থাকে।' অথবা, 'গৃহিণীর কলেক্টরীতে এমিউজমেন্ট্‌ ট্যাক্‌স জমা না দিলে কর্তার হাসবার হুকুম নেই' ; কিংবা 'নিমাই শুধরে গেছে, নিজের পরিবার ছাড়া অন্য পুরুষের মুখ দেখে না।'

'মাতৃভক্তি' গল্পটিতে অমৃতলালের মনের একটি অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস ব্যঙ্গ-বক্রোক্তিসহ পুনরায় উপস্থাপিত হইয়াছে। জাতিগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাঙালীকে চাকরির লালসায় আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে দেখিয়া অমৃতলাল চিরকালই পীড়িত ছিলেন। 'একাকার' প্রহসনে (১৩০১) বাঙালীর এই মনোবৃত্তিকে তিনি যথেষ্ট ধিক্কার দিয়াছিলেন ; একটি গানে লিখিয়াছিলেন, 'নোকরী করকে বাবুগিরি থুক্ থুক্ থুক্ থুক্ থু—'। যে বাঙালীজাতি শ্রমজীবীকে 'অভদ্র' উপাধি দিয়া 'আলস্য ও দাস্যকে ভদ্রতাভাস্ত' করিয়াছে

তাহাকে সচেতন করিবার জন্য রচনা করিয়াছিলেন 'বিশ্বকর্মাপূজা' (১৩২৯) প্রবন্ধ। 'মাতৃভক্তি' গল্পের ভদ্রনাথের আচার-আচরণে এই মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া শেষ পর্যন্ত কিরূপ কৌতুক-করুণ রূপ লাভ করিল তাহাই লেখক গল্পচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন।

ভদ্রনাথ পাঁজা তাহার কৃষক পিতার ইচ্ছানুযায়ী ভদ্রভাবে গড়িয়া উঠিল এবং কৃষিকর্ম না করিয়া শিক্ষকতা গ্রহণ করিল। তাহার হেড-পণ্ডিত হইবার লোভ এবং শিক্ষাদানের নামে যথেচ্ছাচার উঠিল প্রকট হইয়া। ছাত্রদের সে যখন 'মাতৃভক্তি' সম্বন্ধে রচনা লিখিতে দেয়, তখন তাহার নিজের মন মাতা অপেক্ষা পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য অধিক উৎসুক থাকে! শেষ পর্যন্ত ভদ্রতারক্ষার দায়ে শ্বশুরালয়ে গিয়া সে কিরূপ উপেক্ষিত হইল তাহারই বর্ণনায় গল্পটি সমাপ্ত হইয়াছে। ভদ্রনাথের ভদ্রতার প্রতি লেখকের কটাক্ষ এইরূপ : 'বরটি নিতান্ত ভদ্র। জন্ম ভাদ্রমাসে, নিবাস ভদ্রেশ্বরের নিকট, নাম ভদ্রনাথ।' স্বামীকে লেখা রত্নময়ীর পত্রটিও খুব কৌতুকপ্রদ। মাঝে মাঝে বাক্য বা বাক্যাংশে লেখকের সহজাত রসিকতার আভাস মেলে— 'অর্থপুস্তকের সরল প্রবেশিকা', 'হৃদয়-কটাহে মুগ্ধকরী আশার দুগ্ধধারা,' 'সতীত্বের সহিত রতিত্বের অপূর্ব মিলন' ইত্যাদি। গল্পের শেষে ভদ্রনাথের আত্মবিলাপ ও রামপ্রসাদী সুরে গান বেশ উপভোগ্য। অমৃতলালের গল্প ও নক্শাগুলির মধ্যে 'মাতৃভক্তি'ই সব চেয়ে বেশি প্রচারিত।[১৩]

'ষষ্ঠীর প্রভাত'-এ দুইটি গল্প আছে—'প্রতাপের গল্প ও উমাকান্তের গল্প।' লেখক ও তাঁহার তিন বন্ধু পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইতেছেন। স্টিমারের ডেকে চার বন্ধুর কথোপকথনে মজলিসী আমেজ বেশ ফুটিয়াছে। সময় কাটাইবার জন্য প্রতাপ ও উমাকান্ত যে দুইটি গল্প বলিয়াছে তাহা 'রসনাযন্ত্রে মুদ্রিত ও স্টিমার-ডেকে প্রকাশিত হইয়া' 'বিনামূল্যে বিতরিত' হইয়াছে!

সংসারে 'মতের দ্বন্দ্ব ও জিতের জিদ' কিভাবে স্নেহের সম্পর্ককে বিষাইয়া

১৩ অমৃতলালের জীবিতকালে 'শরতের ফুল' (১৩৩২) নামক গল্প-সংগ্রহে ও সাম্প্রতিক কালে সাগরময় ঘোষ-সম্পাদিত 'শতবর্ষের শতগল্প' (১৩৬৮) নামক সংকলনে গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হইয়া অধিক সংখ্যক পাঠকের নিকট পৌঁছিয়াছে। গল্পের শেষে নাকাল ভদ্রনাথের মুখে রামপ্রসাদী 'তারা এই কি তোমার বিচার বটে' গানের প্যারডি বেশ হাস্যোদ্দীপক। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে ভক্তপ্রসাদ নাকাল ও প্রহৃত হইবার পর বাচস্পতি মূল গানটি গাহিয়াছিল।

তোলে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে 'প্রতাপের গল্পে'। আমতাড়া গ্রামের নদে বদে দুই ভাই জাতে তাঁতী। সুখ আর সন্তোষে পরিপূর্ণ তাহাদের সংসার— 'যেন মা লক্ষ্মীর পদ্মকুটীর'। তাহাদের 'কুঁড়ের মধ্যে কুড়েমো নেই, লাগালাগি ভাঙাভাঙি নেই, হিংসে নেই।' কিন্তু একদিন হাট হইতে ফিরিবার পথে তুচ্ছ তর্ক হইতে বচসা এবং বচসার অন্তে দুই ভাই কিভাবে পৃথগন্ন হইল তাহাই এ গল্পে বর্ণিত। অমৃতলাল তাঁহার অননুকরণীয় বিশিষ্ট গদ্যে গল্পটি শেষ করিয়াছেন এইভাবে—

'সুখের বাসা ভেঙে গেল— আনন্দকুটীরে আগুন লাগল। ভায়ে-ভায়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল, জায়ে-জায়ে ভালবাসার ভাসান হল ;··· সাঁজের বেলায় আর সেই গোপীযন্ত্র বাজে না, সঙ্কীর্তনের সে আখড়া আর বসে না! তাঁতীদের মন থেকে মানুষের প্রেমও পালাল— হরিপ্রেমও পালাল। রইল কেবল একটা বিদ্বেষের ঘা, একটা বিষাদের আঁধার!'

এই অতি সাধারণ গল্পটিতে গ্রামের মানুষের চরিত্র ও তাহাদের সংসারের চিত্র বর্ণনার গুণে অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে।

'উমাকান্তের গল্প' সম্পূর্ণ ভিন্ন রসাশ্রয়ী। জবরগঞ্জের দরিদ্রতম মুসলমান কুদরৎউল্লা কেমন করিয়া কেতা-দোরস্ত আদব-কায়দা ও বাক্‌চাতুর্যের বলে নবাব সারফ্‌রাজ শার চক্ষে একজন রইস তালুকদার হইয়া উঠিল এবং নবাবেরই প্রসাদে সরদার বাহাদুর কুদরৎউদ্দিন রূপে মছলিবাগে বসিয়া নবাবী বরাদ্দ দৌলত দুই হাতে খয়রাৎ করিতে লাগিল তাহারই অতি হাস্যোদ্দীপক কাহিনী এই গল্পে পাই।

কুদরৎউল্লা ও তাহার ভৃত্য তাজুর চরিত্রচিত্রণে অমৃতলাল বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অনায়াস কৌতুকে বর্ণনা করিয়াছেন কুদরৎউল্লা কখন হইত মুন্সী কুদরৎ মামুদ,আর কখনই বা মৌলবী মহম্মদ কুদরৎউদ্দীন সাহেব। নিজের নামের অনুরূপ তাঁহার কুঁড়েরও এক এক অংশের বেশ অভিজাত নাম — 'কুঁড়েটুকু তাঁর দৌলতখানা, বসবার চালাটুকু দেওয়ানখানা, রান্নার পরচালা বাবুর্চিখানা, তাজুর ঘর তোষাখানা, ঘরের পেছনের ছাতিমতলা সাফাখানা, পেয়ারাতলা গোসলখানা ইত্যাদি ইত্যাদি।' ঝুলনের রাত্রে মায়ফেলের সময় নবাবের নাচমহলে মৌলবী সাহেবের 'ক্যা তোফা!' 'ক্যা সহদ্‌ কা তরে আওয়াজ!' 'ক্যা গন্ধার লাগায়া!' প্রভৃতি মজলিসী বুলি; পরদিন জশমের পূর্বে শেষ রাত্রে তাহার 'একটি পুরাতন বিদ্রীর বদনা নিয়ে ছাতিমতলায় ওজু করতে

বসে গুণ গুণ স্বরে গত নিশায় শ্রুত একটি লক্ষ্ণৌ ঠুংরির আস্তাইয়ের' পুনরাবৃত্তি, তাহার 'কুঁচে মৃগয়া' ও কুঁচের দোপেঁয়াজিতে 'বেহেতর খানা' বানাইবার নির্দেশ কৌতুকজনক। তাজুও প্রভুর যোগ্য ভৃত্য— 'ক্ষিদে পেলে তাজু— বাবুর্চি, তেষ্টায় আবদার, বাসন মাজতে মসাল্‌চি, ফুর্সি এগিয়ে দিতে হুক্কাবর্দার আর ফাইফরমাস খাটতে বান্দা।' আবার 'মালিকের অনুপস্থিতিতে তাজু একেবারে নায়েব-মালিক তামিজ খাঁ; ইনটারোগেশন তাজু একেবারে খাড়া ইন্‌টার-জেক্‌শন!' বিড়াল কুঁচে মুখে করিয়া পলাইলে বিপন্ন তাজু নবাবের গানের মজলিসে উপস্থিত হইয়া মালিককে আমিরী সাঁটে যেভাবে কুচমহল লুঠের হাল আরজ করিল, এবং প্রভু-ভৃত্যে 'কোড্‌ওয়ার্ডে' যে প্রশ্নোত্তর চলিল তাহা প্রভূত হাস্যরস সৃষ্টি করে।

শুধু যে বাংলা শব্দভাণ্ডারেরই উপর অমৃতলালের অসাধারণ অধিকার ছিল এমন নহে, উর্দু ও আরবী-ফারসী শব্দপ্রয়োগে এবং সংলাপ রচনায় তাঁহার ক্ষমতা যে অসামান্য ছিল তাহার রসোজ্জ্বল নিদর্শনও এই গল্পের ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে।

'নলের নবকলেবর' লেখকের কৌতুক-কল্পনার উজ্জ্বল নিদর্শন। লেখক পৌরাণিক নল-দময়ন্তী ও হংসদূতটিকে একেবারে আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাদের সংলাপেও ইংরেজী-বাংলার উদ্ভট মিশ্রণ! পরবর্তীকালে পরশুরাম তাঁহার অনেক গল্পে পৌরাণিক চরিত্রকে উদ্ভট রূপ দান করিয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। 'নলের নবকলেবর' গল্পে নিষধরাজ নলকে 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পরমপণ্ডিত' এক গবেষক যুবকরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। তিনি বাগানের ফোয়ারায় উপবিষ্ট হাঁসটিকে রোস্ট্‌ করিবার লোভে ধরিয়া ফেলিলেন। প্রাণের ভয়ে হাঁস প্রথমে নলের বিবাহের প্রস্তাব ও পরে দময়ন্তীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল এবং নলের নিকট দময়ন্তীর রূপগুণের এইরূপ বর্ণনা দিল—

"চুলে কেরলী, চোখে বাঙালী, নাকে গ্রীক, ঠোঁঠে মারাট্টা, রঙে কাশ্মীরী, কটি অবধি কৌরিঙ্গী, তার নীচে উড়েনী, একেবারে 'হল অফ্‌ নেশান্‌স্‌'। সর্বাঙ্গ সুন্দরী। তার উপর সংস্কৃতে ভট্টাচার্যি, পালীতে ফুঙ্গী, ফ্রেঞ্চে—"

দময়ন্তীর গুণের আরও পরিচয় দিলে নল বলিয়া উঠিলেন—

'হংসরাজ, so fatal was never so sweet! তুমি এই বিবাহ ঘটিয়ে দাও, আমি ঘটোৎকচস্বরূপ তোমাকে এক টিন গোয়ালিনী মার্কা দুগ্ধ খাইয়ে দেব।'

হাঁস যখন বিদর্ভে গেল তখন— 'কমকান্তি দময়ন্তী সখিগণের সঙ্গে ফুটবল খেলছেন।' অনেক কথাবার্তার পর নলের প্রসঙ্গ জানাইবার পূর্বে হাঁস জিজ্ঞাসা করিল— 'আপনার মতন অমূল্য রত্নলাভের আশায় কোনও ভাগ্যবান যুবক কি—?' দময়ন্তী উত্তর দিলেন— 'Oh nonsense—I am only a child !'

শেষ পর্যন্ত হংসের দৌত্য সফল হইল। দময়ন্তী নলের গলায় বরমাল্য দিতে স্বীকৃত হইলেন—

'ব'লো হবে স্বয়ম্বর ;
প্রথম নম্বর সীট করুন দখল
সকাল সকাল আসি……'

ইহার পর লেখক বিদর্ভ নগরের স্বয়ম্বরের ইঙ্গিত দিয়া কাহিনী শেষ করিয়াছেন। শেষে এই পাদটীকা—

'স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিয়াই লেখনীকে বিরাম দিলাম। আশা করি কোন তরুণ স্নেহাস্পদ নল-দময়ন্তীর গল্পটি এই নূতন ধাঁজের সঙ্গে খাপ্ খাওয়াইয়া পরিসমাপ্তির দ্বারা আমাকে পুলকিত করিবেন। লেখক।'

অমৃতলালের সহজাত রঙ্গরসিকতা অনেক উক্তিকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। যেমন, 'দূত যেমন অবধ্য, ঘটকও তেমনি অখাদ্য' কিংবা 'মুকুলিতা-প্রেম-ধৃতবানসি-বক্ষ অরক্ষণীয়া অবিবাহিতা বালিকা…।'

'থিয়েটারে পিনু' নামক ব্যঙ্গরচনাটি উত্তমপুরুষে লিখিত। থিয়েটারে ঐতিহাসিক নাটক-অভিনয়ের নামে যে অতিনাটকীয় অবাস্তবতার অবতারণা করা হইত, এই রচনাটিতে তাহার প্রতি কটাক্ষ আছে। রচনাটির প্রথমাংশে পিনু হ্যারিসন রোডে কাকার বাড়ীতে অবস্থানকালে যে সকল বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছিল তাহার সরস বর্ণনা এবং শেষাংশে থিয়েটার দেখিতে গিয়া পিনুর যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহার চিত্র। তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটকের প্রতি লেখকের বিরূপতা চিরকালীন। ১৮৮১ সনে, ২৮ বৎসর বয়সে, 'তিল-তর্পণ' প্রহসনে তিনি ইতিহাস লইয়া যথেচ্ছাচারকে কিরূপ ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

তখন তাঁহার সম্মুখে মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হরলাল রায়, উমেশচন্দ্র গুপ্ত, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতির ঐতিহাসিক নাটকগুলি ছিল। রাজপুতানার রাজাদের লইয়া নাট্যকারেরা যে 'নকড়া-ছকড়া' করেন ইহা তাঁহার জানা ছিল।

নাট্যকারদের উদ্ভট কল্পনাকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যেই অমৃতলাল 'তিল-তর্পণ' প্রহসনে বাপ্পারাওয়ের কন্যাকে আলিবর্দির সভায় হাজির করিয়াছিলেন। 'তিল-তর্পণ' রচিত হইবার পরবর্তী চল্লিশ বৎসর ধরিয়া অনেক ঐতিহাসিক নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল নাটকেও ইতিহাসের বিকার কম নাই। ১৩৩১ সালে রচিত 'থিয়েটারে পিনু' নামক নকশায় অমৃতলাল ১৯১৯ সনের থিয়েটারের অবস্থা পিনুর চোখ দিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন। এই সময়েও ঐতিহাসিক চরিত্রের ছদ্মবেশে কতকগুলি কল্পিত চরিত্র রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া অসংগত প্রলাপোক্তি করিত। ১৯১৯এর মহাষ্টমীর রাত্রে পিনু যে-থিয়েটার দেখিয়াছে সে 'নাটকের ঘটনাস্থল মাড়োয়ার প্রদেশ, কিন্তু কবি তাঁর কাব্যকে ফুটিয়ে তুলতে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে লাইসেন্‌সী নিয়ে উজ্জয়িনী হতে শিপ্রানদী মাড়োয়ারের মরুভূমিতে চালান করেছেন।'

বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ ড্রপসিনটিতে যে চিত্র আঁকা, লেখক তাহাকে ব্যঙ্গভরে 'সম্পূর্ণ সাহিত্যসঙ্গত' বলিয়াছেন! দর্শক-মনোরঞ্জনের জন্য সম্ভব-অসম্ভব সকল বিষয়ই যে তখনও নাটকের অঙ্গীভূত হইতেছে তাহা লেখক দেখাইয়াছেন। স্টেজে সৈনিকদের অর্থহীন প্রগল্‌ভতা (ইহার নাম 'আর্ট ও সিরিও-কমিকে হারমোনিয়াস হরিফিকেশন'), অদ্ভুত ভাষা ও ছন্দের সংলাপ, দূতের বিচিত্র বাগ ভঙ্গী, মন্ত্রীর মিহি স্বর, সেনাপতির চক্ষুর ঘূর্ণন লীলা, রাজার 'গম্ভীর কর্কশ তীব্র ছাদস্পর্শী স্বর', আলুলায়িতা পককেশী বৃদ্ধার সতীত্বহরণ, পরিচারিকার অসিকরে মল্লনৃত্য, 'আট বছর থেকে আরম্ভ করে বলতে নেই অবধি বয়স পর্যন্ত' দুই ডজন সখীর নাচ, মন্ত্রীপুত্রের আত্মবিশ্লেষণ, মন্ত্রীপুত্রবধূর রণসজ্জা ও বীরত্ব, 'রসায়নশাস্ত্রমতে' মন্ত্রীপুত্রের হলাহল পান ও পতন ইত্যাদি। ইহার সহিত দর্শকমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়া—শিস্‌ ও হাততালি এবং থিয়েটারের ঝিয়ের 'ঝামাঘসা বামাকণ্ঠ'ও শোনা যায়। সংলাপের মধ্যে 'বন্দেমাতরম্‌' ও 'মেঘনাদ বধ-কাব্যে'র অংশবিশেষের প্যারডিও আছে। কিন্তু নাটক দেখিয়া দর্শকদের মধ্যে শুরু হইল 'পলাশীর যুদ্ধ'— 'ঘন ঘন করতালি ছাপাইয়া, রঙ্গস্থল কাঁপাইয়া, মাতৃক্রোড়স্থ শিশুগণকে কাঁদাইয়া ফোঁপাইয়া' নাট্যকলার এই বিকাশ সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দিল।

নকশাটির প্রথমাংশে পিনুর কাকার বাড়ির অভিজ্ঞতা বেশ সরসতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। স্বদেশহিতৈষী কাকার বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক বাড়ির ('মিনিয়েচর ইণ্ডিয়া') বর্ণনা, 'দেহভারে গম্ভীরা গম্ভীরা স্থাবর ও স্থবিরা'

কাকিমা, ফকির মামার 'উড়িয়া ইউনিয়নের সেকেণ্ড এ্যানিভার্সারি'—প্রভৃতি বেশ হাস্যোদ্রেক করে। মাঝে মাঝে লেখকের অনুপ্রাসপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন—

'জানালা পথে আমড়া গাছের চামড়া-জ্বালানো সমীরণ' বা 'আর্টের সাড়া প্রাণে নাড়া দেয়'।

'কৌতুক যৌতুকের' সমালোচনাপ্রসঙ্গে 'প্রবাসী' লিখিয়াছিলেন—

"অমৃতলাল বসু এই বৃদ্ধ বয়সেও যে এই কথা ব্যথা ও কাব্যসাহিত্যের নিদারুণ পাথারের বুকে 'কৌতুক-যৌতুকে'র ভেলা ভাসাইয়াছেন এইজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"

'পতিত ডাক্তার', 'নলের নবকলেবর', 'থিয়েটারে পিনু' ইত্যাদি রচনা 'প্রবাসী'র মতে 'উৎকৃষ্ট রসিকতার পরিচয় দেয়'। তাঁহারা 'এই বইখানির বিস্তৃত প্রচার বাঞ্ছা' করিয়াছিলেন।[১৪]

৫

১৩৩২ সালের 'বার্ষিক বসুমতী'তে প্রকাশিত '১৯৭৫' নামক ব্যঙ্গাশ্রয়ী রচনাটিতে অমৃতলাল পঞ্চাশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৭৫ সনে কলিকাতার যে-চিত্র কল্পনা করিয়াছেন আজ তাহা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব সত্য। এই রচনাটিতে যে সকৌতুক বাগ্‌ভঙ্গী, চরিত্রগুলির নামের যে বিচিত্রতা, কল্পনার যে উদ্দাম আতিশয্য লক্ষ্য করা যায় তাহার ছাপ এক পরশুরামের লেখায় দেখা যায়।[১৫] 'অন্যমনস্ক পাঠকপটল', 'তৃণবীজের তন্তুতে মনুবংশ ধ্বংসকারী রোগাণু', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্তোরাঁয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিশ্ব-কপে বিশ্ব-চা পান' প্রভৃতি অনন্য বাগ্‌ভঙ্গী এই রচনাটিতে অনেক ছড়াইয়া আছে। ১৯৭৫ সনে চাউলের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি লইয়া হাস্যকর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত, 'জনতন্ত্রের নেতৃগণে'র যথেচ্ছ উপাধি বিতরণ, উদ্ভট আবিষ্কার, খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের আতিশয্য, কলিকাতা-সম্প্রসারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়বৃদ্ধি, তৎসম শব্দবর্জিত উন্নত বাংলা ভাষা, 'খেলনার বদলে চকচকে বাঁধান উপন্যাস' প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার দুর্লভ দূরদৃষ্টির আভাস মিলিতেছে।

---

১৪ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৪

১৫ ১৩৩২ সালে পরশুরামের প্রথম গ্রন্থ 'গড্ডলিকা' প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ প্রভৃতি উপাধি বিতরিত হইতেছে ; ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা অমৃতলাল এইরূপ উপাধি বিতরণের আভাস দিয়াছিলেন এইভাবে—

'রায় সাহেব, রায় বাহাদুর প্রভৃতি টাইটেল এখন আর বড় বাজারে চলন নেই, গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করে জনতন্ত্রের নেতৃগণ আপনারাই টাইটেল সৃষ্টি করে আপনা-আপনির মধ্যে বিতরণ করেছেন। গ্রাম-গ্রহ, নগর-নক্ষত্র, বঙ্গ-বদন, কারাভূষণ, হাজজীবন··· প্রভৃতি টাইটেলের জ্যোতি রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতির রশ্মিকে ম্লান করে দিয়েছে।' ১৯৭৫-এর কলিকাতা—

'৫০ বৎসর পূর্বে কলকাতা বললে যে অল্প স্থানটিকে বোঝাত, এখন আর তা নেই, একদিকে নৈহাটী, অপরদিকে ডায়মণ্ডহারবার, আর একদিকে তারকেশ্বর ও অন্য আর একদিকে টাকী— সবই 'কলকাতা।'

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কে লেখকের উপভোগ্য কটাক্ষ পরশুরামকে স্মরণ করাইয়া দেয়—

"স্বর্গগত জগদীশচন্দ্র বসু 'তরুলতাদির চৈতন্য ও অনুভবশক্তি আছে', এই মাত্র আবিষ্কার করে গেছেন, কিন্তু মর্ত্যে স্থিত বিধুবদন চাকী Ph.D. এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যা কানে লাগালে নটেগাছের সঙ্গে চালতা-গাছের যে বোট্যানিক্যাল আলাপ হয়, তা স্পষ্ট শোনা যায়।"

অমৃতলাল একটি 'রূপকথা'[১৬] রচনা করিয়াছিলেন। মা ছেলেকে রূপকথা বলিতেছেন ; মায়ের মুখের ভাষা রচনাটিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজবাড়ীর ফটক, কেল্লা, রাজার সাজপোশাক, রাজসভা প্রভৃতি উজ্জ্বলরেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। সুয়োরাণী চঞ্চলা, দুয়োরাণী গোবিন্দমণি, রাজবদ্যি বিশ্বম্ভর, কবিরাজের বেশী বয়সের সন্তান নিশিকান্ত, উদ্ধব গয়লা, নর্সিং সেনের সেনাপতি কালু নাগ প্রভৃতি সকল চরিত্রই তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যে রূপকথার ঘটনাবলীকে বেশ আস্বাদ্য করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বম্ভর বদ্যির হাতযশ, তাহার দেড়শো বছরের আমানী বা রাম-রাবণের কালের গুড়ের গুণ, নিশিকান্ত ওরফে কোকনবাবুর হরীতকীর দ্বারা চিকিৎসা প্রভৃতি অনেক বিষয়ই রূপকথার অন্তর্ভুক্ত। কোকনবাবুর চিকিৎসায় কিভাবে এক পোয়া হরীতকী খাইয়া উদ্ধব গয়লা তাহার হারানো গরু পাইল, রাজার সেপাইরা আধ সের করিয়া

১৬ মাসিক বসুমতী : চৈত্র ১৩৩২— জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

হরীতকী খাইয়া সুয়োরাণীর অপহৃত অলংকার কেমন করিয়া উদ্ধার করিল, দুয়োরাণী তিন পোয়া হরীতকী খাইয়া ভেদবমির চূড়ান্ত করিয়াও রাজার পাটরাণী হইল কিভাবে, অথবা রাজার ভোজপুরী সৈন্যরা পাঁচমণ হরীতকী খাওয়ায় রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া পাশের রাজ্যের সৈন্যদল কেনই বা পলায়ন করিল, তাহার অতি হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা এই রূপকথায় মিলিতেছে। তবে গল্পের শেষে সকল লঘুতারল্য গভীরের স্পর্শ লাভ করিয়াছে। মা যখন ছেলেকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বাপের উপর অবিচল বিশ্বাসের জন্যই কোকন-বাবুর হরীতকীর দ্বারা সকল চিকিৎসা সফল হইয়াছে, তখন ছেলে বলিতেছে—

"'তাই নাকি? তবে আমিও বাবাকে খুব বিশ্বেস করবো,— কেমন? যদি বাবার কথা কখনও না শুনি, তুই আমার কান মলে দিস্ ত মা; অত আদর করিস নে।'

মা দুই হাতে ছেলেটিকে আঁকড়ে বুকের ওপর চেপে জড়িয়ে ধরলেন।

তখন সেই খড়ের চালা সোনায় মুড়ে গেল, গরাণের খুঁটি থেকে চন্দনের গন্ধ বেরুল, কাঠির মাদুর হাতীর দাঁতের শীতলপাটি হয়ে গেল, মায়ে পোয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে, ঘণ্টা বাজছে, কাঁসর বাজছে, শাঁখ বাজছে। আলোয় আলোয় মালা গেঁথে গেছে। সারা বাংলা জুড়ে মা দুর্গার আরতি হচ্ছে।"

কৌতুক-কল্পনার চূড়ান্ত হইয়াছে 'শুভদিন' নামক নক্শাটিতে। ১৩৩৩ সালের 'শারদীয়া বসুমতী'তে 'শুভদিন' প্রকাশিত হয়। ইহা কতকগুলি চিত্রের সমষ্টি। 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনের ন্যায় এখানেও পত্নীরা জীবিকার্জন করিতেছে এবং পতিরা অন্তঃপুরে পতিধর্ম পালন করিতেছে।[১৭] নিস্তার ও তাহার স্বামী ফুলকুমার এবং শ্রীকান্ত ও তাহার ব্যারিস্টার স্ত্রী সুহাসিনীর দাম্পত্যজীবন, সুহাসিনীর উকীল-পিসী মাতঙ্গিনী পাল ও তাহার দুর্গোৎসব, ম্যাজিস্ট্রেট রাণীকুমারী প্রতিভাসুন্দরীর বিচার 'শুভদিনে'র পাঁচটি অধ্যায়ের উপজীব্য। চরিত্রে ও সংলাপে কৌতুক যথেষ্ট স্ফূর্ত হইয়াছে।

কাহিনী এখানে ক্ষীণ, চরিত্রই প্রধান। লেখকের বাধাহীন কল্পনার প্রশ্রয়ে

১৭ স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর-কটাক্ষ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাঁচুঠাকুরে'ও আছে। সেখানে কামিনী-সুন্দরীর দ্বিতীয়পক্ষের 'পরিবারের নাম ভৈরব দাস, কিন্তু কামিনীসুন্দরী আদর করিয়া তাঁহাকে ভগ্নী বলিয়া ডাকেন।' ('স্ত্রী স্বাধীনতা')

কত চরিত্রই যে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। নিস্তারের গর্ভধারিণী রামী মোক্তার; ঘেসো কামিনী; নিস্তারের প্রথম পতি অভিমানী সুরেশ, দ্বিতীয় পতি চোদ্দবছরের ছোকরা ফুলকুমার; আফিসের বড়গিন্নী সৌদামিনী শীল; বাসন-মাজার লোক গুবরীর বাপ; নিস্তারের তিন বন্ধু— রাই ঠানদি, গোলাপী বিশ্বাস, ক্ষীরি হালদার; ফুলকুমারের বন্ধু শ্রীকান্ত শ্রীমানী ও তাহার ব্যারিস্টার-পত্নী সুহাসিনী শ্রীমানী; জেলাকোর্টের উকীল আমতাড়া গ্রামের মাতঙ্গিনী পাল; হেড মুহুরিণী হরিমতি পাঁজা; গুণ্ডীচাঁদ ফাটকারাম, রাঙ্গী ঢুলিনী আর ছিমতী ঢাকী; পুরোহিত পদী ভট্টচাজ; তন্ত্রধার রাধারাণী পাঠক; প্রধান চণ্ডীপাঠক বিধুমুখী তর্কবাগীশ; বালক বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণীর ছাত্র কুড়োরাম; ক্ষান্ত কামারণী, তুতিয়া বাই, নন্দ বাইজী; স্বদেশ সংস্কারিণী সভার সভ্যাগণ; কেশিয়ার কুসমী ঘোষ; ম্যাজিস্ট্রেট রাণীকুমারী প্রতিভাসুন্দরী; পুলিশের উকিল মনোমোহিনী; খোরপোষের 'নালিশওয়ালা' বিপিন; বিপিনের স্ত্রী গৌরবিনী ও বিপিনের মা পটোলমণি প্রভৃতি অজস্র চরিত্র এই অভিনব নক্শাটিকে হাস্যোচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে।

কখন কখন কোন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এক একটি ইঙ্গিতেই ফুটিয়াছে। যেমন, দপ্তরী কুদরৎউল্লার 'রসুনঘষা দাঁত', নিস্তারের 'বেতো গতর আর তেতো মন,' ব্যারিস্টার সুহাসিনীর 'ব্রিফের অভাবে গ্রীফ', মেষবলিতে 'ক্ষান্ত কামারনীর হাতের কৌশল', হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ফুলকুমারের 'শুয়ে শুয়ে চিৎ করে ফেলা কাঁকড়ার মত দাঁড়া নাড়ান' ইত্যাদি। সতী পতিকে নিস্তারের 'একশিশি গুম্ফলীন তৈল' ও 'কলায় পুরুষ্ট ও নীতিগরবে গরিষ্ঠ সাহিত্যরত্ন' উপহার প্রদানও বেশ কৌতুককর।

মাঝে মাঝে এক একটি বাক্য অর্থগৌরবে পূর্ণ হইয়া হাস্যরসের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। যেমন, 'সোনার 'স' আর সুখের 'স' এই দুটো অক্ষর এক ছাঁচে ঢালা নয়' কিংবা 'অভাবে অবজ্ঞা ও প্রাচুর্যের পূজাই কর্মজগতের ধর্মনীতি।'

'শুভদিনে' যেমন অমৃতলালের অতিশয়িত কল্পনার উদ্দাম নিদর্শন পাই, 'ব্যারণ এণ্ড পিপলাই কোম্পানী' ('বার্ষিক বসুমতী', ১৩৩৪) গল্পে তেমনই তাঁহার সমাজসচেতন মনের অভ্রান্ত প্রকাশ দেখি। সমাজের সর্বস্তরে যে প্রতারণা ও ভণ্ডামি চলিতেছে তাহারই এক বাস্তব চিত্রশালার দুয়ার যেন লেখক এখানে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ভদ্রবেশধারী শিক্ষিত

প্রতারকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিতে গিয়া লেখকের ক্ষোভ, শ্লেষ ও বিদ্রূপ যেন মাত্রাতিরিক্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। অথচ পেশাদার গাঁটকাটাদের ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তা বর্ণনায় তিনি কেবল কৌতুকরসই সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। গল্পটিতে লেখকের সংলাপযোজনার দক্ষতায়ও বিস্মিত হইতে হয়। গাঁটকাটাদের ভাষা, দারোগার ভাষা, মুসলমান জমাদারের ভাষা, সাহিত্যিকের ভাষা, কপট ব্যবসায়ীর ভাষা, ভণ্ড সাধুর ভাষা প্রভৃতি অবিকল এবং যথাযথ। মানবচরিত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে এরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্রসৃষ্টি সম্ভব হইত না।

গল্প শুরু হইয়াছে হর্ষবর্ধনের গলির 'প্রশাখার মধ্যে' অবস্থিত 'ব্যাচিলার রেফিউজে'। ইহা গাঁটকাটাদের আড্ডা— গাঁটকাটাদের সর্দার 'ব্যপপত্নীক' তারক ওস্তাদের আস্তানা। এখানে ওস্তাদজীর পুরাতন মিত্র ও কর্মসহযোগী নকুড়, ফকির, হাবুল ও পুঁটেকে পাইতেছি। 'সেকেলে হস্তসিদ্ধ বিদ্যার উপর বৈজ্ঞানিক হাত পড়ায়' সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ইহাদের কথোপকথন ও বর্ণনার মধ্য দিয়া লেখক প্রাচীন কলিকাতার গাঁটকাটা-সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র আমাদের উপহার দিয়াছেন। আমরা জানিতে পারি যে, চিৎপুর-গরাণহাটা অঞ্চলের 'প্রাচীন সারস্বত কুঞ্জ ও পুস্তকপুঞ্জের আশেপাশে' ছিল ইহাদের বাস। ইহাদের 'দেহধামের প্রধান আসবাব ছিল ঘাড়কামানো চুলে বেহদ্দ বাহারের টেরি'। গাঁটকাটাদের সহিত পুলিশের যোগসাজস যে চিরকালীন, সে বিষয়েও ইঙ্গিত করিতে লেখক ভুলেন নাই। তাই এই আখড়ায় দারোগা মেহেরপুরের করালীকান্ত নস্কর এবং জমাদার জালালুদ্দিন ওরফে জালিয়াৎ মিয়ারও আবির্ভাব হয়। চুরিবিদ্যার সিদ্ধসাধকদের সম্পর্কে জমাদারের প্রশংসাবাক্য উদ্ধার করিবার মত—

'খোদ আশমানের প্যাগম্বর, কেরামৎ দেখাতে দু রোজের জন্যে ওঁরা মাঝে মাঝে দুনিয়ার মাটিতে কদম ঠেকাতে আসেন।'

গাঁজার কলিকায় টান দিতে গিয়া তারকের আকস্মিক মৃত্যুর বর্ণনাও অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক—'তারকের অন্তঃকরণ গাঁজার একজামিন দিতে গিয়ে ফেল হয়।' তারকের মৃত্যুর পর লেখক অশিক্ষিত গাঁটকাটাদের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া শিক্ষিত এবং ভদ্রবেশধারী গাঁটকাটাদের প্রসঙ্গে আসিয়াছেন। আমরা তারকের দৌহিত্র অজিতকে পাইতেছি। তাহার জীবনে মাতামহ এবং করালী দারোগার 'সদুপদেশের বীজ ইংরাজী শিক্ষার সারে পরিপুষ্ট হয়ে শিকায়

আকর্ষণকারী প্রেততরুতে' কিভাবে পরিণত হইল তাহার ভয়াবহ চিত্র দেখিয়া আমরা শিহরিত হই। 'অনুকরণ বিদ্যার সিদ্ধসাধক' এল. এ. ফেল নীরদবরণের সহিত অজিত 'ব্যারণ এণ্ড পিপলাই কোং' নামে এক প্রতারণা-প্রতিষ্ঠান খুলিয়া বসিল। নীরদ-চরিত্র লেখকের বিশিষ্ট সৃষ্টি। তাহার 'দন্তৌষ্ঠোচ্চারিত ইংরাজী' তাহার 'বৃটিশ স্পিরিট দিয়ে ডিয়ার কাণ্ট্রীজ ইণ্টারেস্টকে ধুয়ে পরিষ্কার' করার মনোভাব, তাহার 'বাণ দিয়া চাঁদ বিঁধিবার উচ্চাশা' নিপুণভাবে বর্ণিত। লুব্ধ মানুষের মনস্তত্ত্বও কত ভাবে এবং কত গভীরতায় অভিব্যক্ত হইয়াছে! বাঁকুড়ার অজয়চন্দ্রের সাহিত্যসেবার হাস্যকর লোভ, এবং দিগ্বিজয়ী সম্পাদক হইতে গিয়া অজিত ও নীরদের কৌশলে তাহার সর্বস্বান্ত হওয়া; অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা 'কলির জনক-ঋষি'র প্রতারণার ব্যবসা এবং অতিলোভে 'ব্যারণ এণ্ড পিপলাই কোম্পানী'র নিকট তাঁহার ও তাঁহার পিসশ্বশুরের সর্বস্ব খোয়াইবার বিবরণ আমাদের বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে।

এই গল্পে লেখকের বক্তব্য এই যে, সমাজে কোনদিনই প্রতারকের অভাব হইবে না; শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শুধু প্রতারণার রীতিপদ্ধতিরই রূপান্তর ঘটিবে। একটি মাত্র শ্লেষবাক্যেই তিনি তাঁহার প্রতিপাদ্য বুঝাইয়া দিয়াছেন—

'দেশকে জাঁকালো করে তুলতে হলে প্রথম ও প্রধান দুটি উপায় হচ্ছে সাহিত্যে কলা ফলানো আর বাণিজ্যে কলা দেখানো…।'

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটি পত্রে (১৭. ১১. ১৯২৭) এই গল্পটির বিশেষ উল্লেখ করিয়া লেখেন—

'আশ্চর্য অমৃতবাবুর ক্ষমতা। পঁচাত্তর বৎসর বয়স হইল এখনও রস ফুরায় না।… সেদিন বসুমতীর বার্ষিকীতে একটি গল্প লিখিয়াছেন, তাহাতে গাঁজায় দমটি দিয়াই এক বুড় বদমায়েস মরিয়া গেল। রস আর কাহাকে বলে!'[১৮]

৬

'ছুটির বৈঠক' নামক মজলিসী গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছিল জামসেদপুরের 'উড়ো খৈ' পত্রে (পৌষ-মাঘ ১৩৩৪)। গল্প-কথক— খুড়োমশাই প্যারীবাবু;

১৮ মজঃফরপুরের অতুলানন্দ সেনকে লিখিত।-পঞ্চপুষ্প: শ্রাবণ ১৩৩৬ দ্রঃ।

শ্রোতৃমণ্ডলীতে আছে অঘোর, ধনুর্ধর, রাজা-বাহাদুর, বন্ধিনাথ, অমিয়, শৈলেন, দ্বিজেন প্রভৃতি। 'পৃথিবীতে সবার চেয়ে আশ্চর্য মানুষের মনের গতি'— ইহাই এ গল্পের বর্ণনীয় বিষয়। মতিহারীতে 'মুনসুফী' করিবার সময় সেরেস্তাদার লালা বিষণচাঁদের কাছে শোনা গল্পটি বেশ মজলিসী ঢঙেই প্যারীবাবু শুনাইয়াছেন। মাঝে মাঝে শ্রোতাদের টিপ্পনীতে গল্পটি আরও জমিয়াছে। বর্ষণা গাঁওয়ের দরিদ্র মিশির ও মিশিরাইনের চরিত্র সুন্দর ফুটিয়াছে। তাহাদের নিদারুণ অনটনের চিত্রও বর্ণনার গুণে মর্মস্পর্শী হইয়াছে—

'একখানা উপসী মুখ আর একখানা উপসী মুখের দিকে চাইতে চাইতে যখন বুক বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে তখন সে বুঝতে পারে কষ্ট কথাটার পষ্ট মানে।'

ঠাকুর ঘরের 'শাঁখ ভগবান' যখন তাহাদের সকল প্রার্থনা পূরণের আশ্বাস দিলেন এক সর্তে যে তাহাদের যাহা দিবেন, গ্রামের সকলকে তাহার দ্বিগুণ দিবেন, তখন রোষান্ধ ব্রাহ্মণের কুটিল মনোভাব আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সংসারের অধিকাংশ মানুষই এমন। ব্রাহ্মণী একবাক্যে শঙ্খরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলে গ্রামের লোকেরও দ্বিগুণ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে—

'ব্রাহ্মণীর হাতে যেদিন বাজু বাউড়ী উঠল আর কানে ঝুমকো ঝুললো, সেদিন গাঁ শুদ্ধ সব ছোট বড় কুমারী সধবা সব মেয়েরই হাতে দু জোড়া করে বাউড়ী, দু জোড়া করে বাজু, আর দু জোড়া করে ঝুমকো ঝুললো।'

ব্রাহ্মণীর 'নির্বুদ্ধিতায়' এবং গ্রামের সকলের দ্বিগুণ শ্রীবৃদ্ধিতে—

'...রাগান্ধ, রিষে জরজর মিশির ঢুকলেন শাঁখের ধরে; গর্জন ক'রে ডাকলেন, শাঁখ!—

শঙ্খ— হুঁম্!

মিশির— শাঁখ, বেশ ঠাণ্ডা হোয়ে জবাব দিলে ত!

শঙ্খ— জলজ জীব, দিবারাত্রি ঠাণ্ডাই আছি।

মিশির— তোমার লজ্জা করে না?

শঙ্খ— অতল সলিলতলে বাস, বসনে কি প্রয়োজন?

মিশির— তুমি এমন নেমকহারাম!

শঙ্খ— লবণ-সিন্ধুর প্রজা আমি, ও নিন্দে আমার কেউ কত্তে পারবে না।

মিশির— না হয় তোমারই হোল; তোমায় মানুষ করেছি তো আমি।

শঙ্খ— মানুষ কোথায় করেছ বাপু? তা হলে কি হাত তুলে কাকেও কিছু দিতে পারতুম!

মিশির— দিচ্ছি তোমায় ঐ ডোবায় ফেলে।

শঙ্খ— দূর সম্পর্ক হোলেও জ্ঞাতির ঘর তো বটে, বেশী কষ্ট আর কি?

মিশির— এ যে কিছুতেই রাগে না দেখতে পাই!

শঙ্খ— স্বভাব! তবে সূর্যদেব অস্ত গেলে আর মেদিনী কেঁপে উঠলে একবার করে হুঙ্কার দিয়ে থাকি।

মিশির— বামনীর প্রার্থনা ত যথেষ্ট মঞ্জুর করেছ, এখন আমি যদি কিছু চাই ত দেবে?

শঙ্খ— নিশ্চয়। তবে মনে থাকে যেন আরও সবাইকে দুনো করে দেবো।

মিশির— তা দিও, আমিও তাই চাই।

শঙ্খ— বল কি চাও?

মিশির— আমার একটা চোখ কানা করে দাও।

শঙ্খ— তথাস্তু।'

মিশিরজি এইভাবে যখন নিজের এক চক্ষু কানা করিয়া গ্রামের সকলের দুই চক্ষু অন্ধ করিয়া দিলেন তখন লেখকের শেষ মন্তব্যে সকল কৌতুক অতি তিক্ত শ্লেষে পরিণত হইল—

'গ্রাম শুদ্ধ ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ সব অন্ধ, সব অন্ধ! কি আনন্দ! কি আনন্দ! আজ অন্ধ আত্মীয়-কুটুম্ব-প্রতিবেশীদের দুর্গতি দেখে এক-চক্ষুহারা মিশিরের মানবমনে দুর্গোৎসবের বলিদানের বাজনা বেজে উঠেছে। হিংসার পূজায় একসঙ্গে এত চক্ষুভোগ কোন রাজা-রাজড়ায় আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি।'

৭

'টুনটুনী' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালের 'মাসিক বসুমতী'র আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায়। ইহাই অমৃতলালের শেষ গল্প। এই গল্পে লেখক আমাদের কয়েকটি বিচিত্র ও মধুর চরিত্রের মানুষের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। সংসারের 'বাজেলোক' মামাবাবু ও তাঁহার উদ্ভট ব্যবসাগুলি বেশ কৌতুকরসের যোগান দিয়াছে। বার বার ঠকিয়াও চরিত্রগত সরলতা তিনি হারান নাই।

এক সর্বজ্ঞ বন্ধুর পরামর্শমতো ছানার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ভাবিলেন ছানার ঝোড়ায় কেঁচো রাখিলে দুই বছরেও ছানা পচিবে না—

'বন্ধুকে দিব্যি গালিয়ে নিলেন, গুপ্তবিদ্যা আর কাকেও শেখাবেন না ; পরে তারকেশ্বর অঞ্চল থেকে ভাদ্রমাসের গোড়ায় আঠারো টাকা মণ দরে পঞ্চাশ মণ ছানা কিনে জোড়াসাঁকোর ভিতর একটা ঘর ভাড়া কোরে সেখানে স্টোর কল্লেন, কেঁচোর জন্যও গোটা সাতেক টাকা খরচ হয়েছিল। দিন কুড়ি বাদে পাড়ার লোকের দরখাস্তে পুলিশ দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখে যে, খুনী লাস-টাস নয়, ছানা পচে এমন বিটকেল গন্ধ বেরিয়েছে ; বাতাস দূষিত করার অপরাধে টাউন হলেও পঞ্চাশ টাকা প্রণামী দিয়ে আসতে হয়।'

বালবিধবা মঙ্গলা-ঝিয়ের সম্পর্কে লেখকের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য—

'ভায়ের সংসারে মঙ্গলা দিনরাত এত খাটুনী খাটত যে চরিত্র হারাবার অবসর সে মোটেই পায়নি।'

বাড়ীর কর্তা প্রফেসর গিরিধারীলালকে লেখক একটি 'অপ্রয়োজনীয় অত্যাজ্য' চরিত্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। 'গৃহ সেনানিবাসের রসদ' সংগ্রহ করিয়া পৌছাইয়া দেওয়াই তাঁহার কাজ। ছোট্ট টুনটুনীর ধীরে ধীরে বড় হইয়া ওঠার স্তরগুলিও লেখকের বর্ণনাগুণে সুখপাঠ্য হইয়াছে।

অমৃতলালের অন্যান্য গল্পের মতো এখানেও সুসংবদ্ধ কাহিনীবিন্যাস অপেক্ষা চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার আগ্রহ স্পষ্ট। মামাবাবু ও মঙ্গলার মধ্যে লেখক একটি আশ্চর্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। 'মন্ত্রবন্ধনে অনাবদ্ধ, স্পর্শের স্পন্দনে অসিদ্ধ' এই দম্পতি সম্পর্কে তিনি তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় লিখিয়াছেন—

"মামাবাবু এখন আর দু' খানা পাথর পার হোলেই সত্তরের মাইলস্টোনে গিয়ে পৌছবেন। আর মঙ্গলা যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে পেছন ফিরে দেখে, চল্লিশ, আর সামনে চেয়ে দেখে পঞ্চাশ, সে ঠিক মাঝখানে ; সুতরাং মঙ্গলা এখন আর লজ্জার ধার ধারে না। সবার সামনেই মামা-বাবুকে লক্ষ্য কোরে বলে, 'হ্যাঁ, উনি তো আমার সোয়ামীই বটে। আর জন্মে বিয়ে হয়েছিল, তোমরা জান না।' "

'স্বপ্নলব্ধা'-প্রসঙ্গে

১৩১৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত 'স্বপ্নলব্ধা' নামক স্মৃতি-চিত্রটির রচয়িতার নাম অমৃতলাল বসু।[১] রচনাটির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী এমনই বিশেষত্ববর্জিত, কোন কোন ক্ষেত্রে হাস্যরসসৃষ্টির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এমনই হাস্যরসশূন্য ও বর্ণহীন যে রচনাটি অপর কোন অমৃতলাল বসুর— 'চঞ্চলা' বা 'অবলাবালা' জাতীয় উপন্যাসের লেখক অমৃতলাল বসুর— (দ্রষ্টব্য পৃ ৩৯৯) কিংবা সমনামধারী অপর কোন ব্যক্তির লিখিত মনে করা যাইতে পারে।

রচনাটি নেহাৎ ক্ষুদ্র নহে। 'জন্মভূমি' পত্রিকার পূরা ছয় পৃষ্ঠা ধরিয়া লেখক তাঁহার একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি বাক্যই সরল ও সংক্ষিপ্ত। 'নাট্যকার' অমৃতলালের বিশিষ্ট গদ্যের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। বাক্য বা বাক্যাঙ্গের সরসতা, শব্দালঙ্কারের চারুত্ব বা আতিশয্য, অতীত অভিজ্ঞতা হইতে কোন কোন প্রসঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত বা ঘটনা অনুযায়ী মন্তব্য ইত্যাদি যে সকল বৈশিষ্ট্য তাঁহার গদ্যকে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে তাহার কোন আভাসই এই রচনায় নাই।[২]

অমৃতলাল রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্যারডি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কবিতা বা গানের সহায়তায় আপন বক্তব্য ব্যক্ত করেন নাই। 'স্বপ্নলব্ধা'য় রবীন্দ্রনাথের 'আমার পরাণ লয়ে কী খেলা খেলাবে' গানটি অংশত উদ্ধৃত করিয়া পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা রসরাজের রীতিই নহে।

১ 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'য় (৬৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই রচনাটি রসরাজ অমৃতলাল বসুর রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

২ 'স্বপ্নলব্ধা'র ভাষার নিদর্শন— "বাল্যকাল হইতেই জলে ডুবিয়া থাকিতে অভ্যস্ত ছিলাম। ডুবিয়া অল্পক্ষণ অন্বেষণের পর একখানা হাত পাইলাম। সেখানা ধরিয়া টানিতেই জলের ভিতর হইতে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরীর দেহ ভাসিয়া উঠিল। দেখিলাম বালিকা সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্যা, তখনও আমরা 'রাণা' হইতে চল্লিশ হাত তফাতে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেখিতে পাইয়া দুই তিন খানা নৌকা খুলিয়া আসিল ও একখানা আমাদের তুলিয়া লইল।" 'স্বপ্নলব্ধার' রচনাকাল ১৩১৬। ইহার পূর্বে প্রকাশিত অমৃতলালের 'ঘরের কথা' বা পরে রচিত 'শিরোমণির তীর্থযাত্রা'র ভাষা ও রচনারীতির সহিত ইহার প্রভেদ গুরুতর।

ইহা ব্যতীত আরও একটি কারণে 'স্বপ্নলব্ধা'কে রসরাজ অমৃতলালের রচনা মনে করা যায় না। 'জন্মভূমি' পত্রিকার সূচীপত্রে লেখকবর্গের নাম উপাধি-সমেত মুদ্রিত হইত। যেমন, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত, পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী ইত্যাদি। 'স্বপ্নলব্ধা' যদি নাট্যজগতের অমৃতলালের রচনা হইত তাহা হইলে তাঁহারও নামের পূর্বে নাট্যকার, নাট্যাচার্য বা রসরাজ প্রযুক্ত হইত বলিয়াই মনে হয়, বিশেষ করিয়া ১৩১৬ সালে তিনি যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অমৃতলালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৩৬) তাঁহার বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতেও 'স্বপ্নলব্ধা'র উল্লেখ নাই।

অমৃতলালের সমকালে অপর একজন গ্রন্থকার— অমৃতলাল বসু—জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচিত কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির জীবনী ১৮৮৪ সনে 'জীবনী সংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাস

মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে চুয়াত্তর বৎসর বয়সে বিশেষ উদ্দেশ্যবশত অমৃতলাল দুইটি উপন্যাস রচনা করেন, তন্মধ্যে একটি অসমাপ্ত।[১] উপন্যাস দুইটির নাম 'হামিদের হিম্মৎ' ও 'যুবক-জীবন'। জীবনে তিনি কখনও উদ্দেশ্যহীনভাবে লেখনী চালনা করেন নাই। এই উপন্যাস দুইটিতেও তাঁহার শোধন ও সংস্কারের অভিপ্রায় স্পষ্ট।

১৩৩৩ সালের প্রারম্ভে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানে যে-দাঙ্গা হয় তাহারই প্রতিক্রিয়ায় 'হামিদের হিম্মৎ' রচিত। নানাদিক দিয়া সমস্যার ভয়াবহতা প্রদর্শন করিয়া মানুষের শুভবুদ্ধি উদ্বোধনের উদ্দেশ্যেই এ উপন্যাসের অবতারণা।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস 'যুবক-জীবন'-এ লেখকের সুদীর্ঘ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার নিদর্শন দেখিতে পাই। পূর্বে তিনি প্রহসনে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় নানাভাবে এবং নানাস্থলে জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত বাঙালীর কথা, তাহার কেতাবী বিদ্যার অসারতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এবার বাঙালীর জীবন-মরণের এই অতি প্রত্যক্ষ সমস্যাটিকে তিনি উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থাপন করিলেন। দুইটি উপন্যাসই 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইহাদের কোনটিই গ্রন্থবদ্ধ হয় নাই।

'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' (৬৭) গ্রন্থে 'অবলাবল' ও 'চঞ্চলা'নামে আরও দুইটি উপন্যাস (১৮৯৭) অমৃতলালের পুস্তকাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই উপন্যাস দুইটি (দুইটিই ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস) নাট্যকার অমৃতলাল বসুর রচনা নহে। প্রথমোক্ত উপন্যাসের নামেও ভুল আছে। 'অবলাবল' নহে, 'অবলাবালা' (Avalávála: Appendix to the Calcutta Gazette, 30.3.1898 দ্রষ্টব্য)। 'জীবনী সংগ্রহ' অথবা 'স্বপ্নলব্ধা'-প্রণেতা অপর কোন অমৃতলাল বসুই এই ডিটেকটিভ্‌ উপন্যাসদ্বয়ের রচয়িতা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অমৃতলালের মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জীতে (পঞ্চপুষ্প: শ্রাবণ ১৩৩৬) এই দুইটি উপন্যাসের উল্লেখ নাই। তদ্ভিন্ন ঠিক ডিটেক্‌টিভ্‌ কাহিনী রচনা করিবার প্রবণতা তাঁহার মধ্যে আবিষ্কার করা দুরূহ। ১৮৯৭ সনে তিনি নট নাট্যকার ও অধ্যক্ষরূপে স্টার থিয়েটারের সহিত এমনভাবে জড়িত যে সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গের সহজাত ও অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া রোমাঞ্চ কাহিনীর ভিন্নপথ অবলম্বনের অবসর তাঁহার খুব কমই ছিল।

উপন্যাসদ্বয়ে অমৃতলাল বাঙালীর জীবনকে নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়া সেই জীবনের বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট করিয়াছেন। কাহিনীতে তাই সংহতি অপেক্ষা ব্যাপ্তিই অধিক লক্ষ্যগোচর হয়। মূল কাহিনীর সহিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক উপকাহিনী সংলগ্ন। অগণিত চরিত্রের আচার-আচরণে সেই সব খণ্ডকাহিনী উজ্জ্বল। এত ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা সত্ত্বেও লেখকের মূল প্রতিপাদ্য কোথাও আচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট হয় নাই। উপরন্তু এত চরিত্র ও তাহাদের মনোভাববৈচিত্র্য দেখিয়া সমাজের সকল স্তরের মানবমনে লেখকের কিরূপ অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হই। সমাজে ভদ্রবেশধারী কত যে ভণ্ড আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে তাহা আমরা জানিতেও পারি না। অমৃতলালের শ্লেষতীক্ষ্ণ লেখনী তাহাদের মুখোসের অন্তরালবর্তী উপহাস্য স্বরূপ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার পূর্ববর্তী অথবা সমকালীন বাঙালী ব্যঙ্গরসিক লেখকবৃন্দের সহিত দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্য অথবা মনোভাবের সাম্য থাকিলেও চরিত্রচিত্রণে ডিকেন্সই তাঁহার দীক্ষাগুরু। 'হামিদের হিম্মৎ' ও 'যুবক-জীবনে' এত চরিত্রের বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অমৃতলাল সম্পর্কেও আমাদের মনে হয়—

> 'He draws reels and reels of highly coloured caricature out of an ordinary person, as dazzling as a conjurer draws reels and reels of highly coloured paper out of an ordinary hat.'[২]

২

পঁচিশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত 'হামিদের হিম্মৎ' ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা হইতে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়। কয়েকমাস পূর্বে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক বিরোধ অমৃতলালকে বিশেষ চিন্তিত করে।[৩] কিন্তু তিনি তত্ত্বদর্শী দার্শনিক কিংবা যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিকের ভূমিকা না লইয়া এই জ্বলন্ত সমস্যাটিকে এবার উপন্যাসে জীবন্ত রূপ দিলেন। উপন্যাসটির মূল কাহিনী এইরূপ:

২ ডিকেন্স্ সম্পর্কে চেস্টারটনের মন্তব্য (Encyclopaedia Britannica, Vol.7)

৩ এই চিন্তার পরিচয় তাঁহার এই সময়কার 'তেত্রিশের ত্রাস' কবিতাটিতেও প্রকাশ পাইয়াছে।

দর্জিপাড়ার চেলাকাঠওয়ালা সোনাউল্লার নাতি হামিদ আশৈশব তাহার হিন্দু প্রতিবেশী-বন্ধুদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বড় হইল। বন্ধুদের কাছে সে হামিদ নয়, 'হেম'। ফুটফুটে মেয়ে নসীবন বা নসীর ('নিশি'-র) সহিত তাহার বিবাহ হইল। যথাকালে হামিদ বি.এ. পাশ করিয়া বি.এল. ডিগ্রী লইয়া ওকালতি সুরু করিল। এই সময় কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিল। এক হিন্দুবিদ্বেষী ভণ্ড পীরের প্ররোচনায় হামিদও ধর্মান্ধ হইয়া গেল— হিন্দুদের ঘৃণা করিতে শিখিল। নসীবন স্বামীর এই রূপান্তরে ভীত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। সে আগের মতই হামিদের বাল্যবন্ধু লালুদের বাড়ী যাতায়াত করে। একদিন রোষান্ধ হামিদ নসীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহার হিন্দুপ্রীতির জন্য প্রবল ভৎর্সনা করিল। এই অভাবিত পীড়নে নসী অসুস্থ হইয়া পড়িল। ক্রমে তাহার অঙ্গে বসন্তের গুটি দেখা দিল। এই সংবাদে লালুদের বাড়ীর শুদ্ধাচারিণী পিসীমা পালকির অভাবে 'রোকশোধ' (রিক্সা) চড়িয়া নসীকে দেখিয়া গেলেন ও এ রোগের বিধিবিধান বলিয়া দিলেন। হামিদের চিত্তে আলোড়ন উপস্থিত হইল। তাহার শুভবুদ্ধি তাহাকে ধর্মান্ধতা হইতে রক্ষা করিল। নসী সুস্থ হইলে তাহাকে লইয়া হামিদ শিলং গেল। সেখানে আফতাফ নামে এক মহৎপ্রাণ মুসলমান জমিদার ও তাহার পত্নী সেলিমার সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটিল। আফতাফের গ্রামের বাড়ীতে তাহারা অতিথি হইল। সেই গ্রামেও আরম্ভ হইল সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব— লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, নারীহরণ কিছুই বাদ গেল না। আফতাফ বিপন্নদের যথাসাধ্য সহায়তা করিল। মণ্ডলদের অপহৃতা অপাপস্পৃষ্টা বধূকে উদ্ধার করিয়া এবং সমাজ-শিরোমণিদের সন্তুষ্ট করিয়া তাহাকে সংসারে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। শেষে নসীর অনুরোধে হামিদ তাহাদের বর্ধমানের বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া বৃদ্ধ পিতামহের সহিত মিলিত হইল।

মূল কাহিনীটি পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে অনেকগুলি চরিত্রের কার্যকলাপে ও নানাপ্রকার ঘটনায়। তবে সকল চরিত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্রের সহিত কোন না কোনরূপে সংযুক্ত। হামিদের সহপাঠী 'রায়কুমার' ব্রজসুন্দর পালের হাস্যোদ্দীপক কার্যাবলী ; নসীর মাতামহ ও মাতামহী আসাদ দপ্তরী ও মক্কাবুড়ীর ইতিবৃত্ত ; সোনাগাছির 'মুস্কিল আসান' পাগলাপীরের হিন্দুবিদ্বেষ ; ছিদেম দাস, চন্দুরী ও টেরিটিবাজারের জুতোওয়ালার কাহিনী ; সোনাগাছির বিরাজ-মা ও অন্যান্য 'ভক্তিমতী উপবাসিনী অসতী'দের পীরপ্রীতি ; ফিরিঙ্গী রেলকর্মী ও কাফ্রী ফায়ারম্যানের হাতে ব্রজসুন্দরের লাঞ্ছনা ; 'রবিবাবুর পরেই উদীয়মান জগদ্বিখ্যাত

কবি' গীরহাটির মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়ের পঞ্চম মানের ছাত্রের কবিতাপাঠ; 'বন্ধ্যাবন্ধুবটিকা'-আবিষ্কারক সাবাজপুরের মাণিকধন বিশাইয়ের নির্বাচনী কৌশল প্রভৃতি কত প্রসঙ্গই যে আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই! প্রতিটি ঘটনাই অত্যন্ত আন্তরিক সরসভঙ্গীতে বর্ণিত। সমাজের সকল স্তরের মানুষের বিভিন্ন-মুখী মনোবৃত্তি পরিস্ফুট করিবার জন্য লেখক আরও অনেক চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। 'আগু বাড়হো ঝড়াঝ্‌ঝড় কোং লিমিটেডে'র ডাইরেক্টর, 'সহর তোলপাড়' কাগজের সর্বজনবিদিত রিপোর্টার গুজবগোবিন্দ গড়াই, 'উকিল-কুল-কোকিল' নিখিলবাবু, পাগলাপীরের দুই সাঙাৎ পীতাম্বর ও আব্বাস, লাহিড়ীবাড়ির ঝি গণেশের মা, আফিম-গাঁজা-দোয়াস্তা-খোর মহেশ চক্রবর্তী, হিন্দুবিদ্বেষী মিঃ কাসেম, বাঁকুড়ার উকিল মিঞা বেচসম, গোলাম খয়ের খাঁ এম. এল. সি., 'তসলিমাৎ মুসলিম মজলিস'-সম্পাদক কুদ্রুৎউল্লা ছাহেব, রংমিস্ত্রী খাঁদা, টিকেওয়ালা ঘুগী, সবরু গাড়োয়ান, আফতাফ ও সেলিমা, নাগা সন্ন্যাসী, ফুলী পাগলী, দেদার সর্দার, হানিফ গাজীর ভেয়ের বেটা, 'শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্না স্মার্ত-ভট্টাচার্যিনী' উজ্জ্বলা বোষ্টুমী, চণ্ডীগ্রামের 'মনু-যাজ্ঞবল্ক্য' ভৈরব ঘোষাল ও ছিরু ডোম, চাঁদপুরের ইন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্রই তাহাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বতন্ত্র রূপ লাভ করিয়াছে।[৪]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত এই উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষের ভণ্ডামির উপর লেখকের ব্যঙ্গ বর্ষিত হইয়াছে। তাই আমরা ভণ্ড স্বাদেশিকদের প্রতি শ্লেষ, মুসলমান 'ভ্রাতৃত্বের'র প্রতি কটাক্ষ, লাঞ্ছিত ব্রজসুন্দরের 'স্বদেশী' হইবার সঙ্কল্পে বিদ্রূপ দেখিতে পাই।

হামিদের সহপাঠী এম.এ. এবং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট 'রায়কুমার' ব্রজসুন্দরের 'স্বদেশী' হইবার কাহিনীটি লেখক উল্লেখযোগ্য শ্লেষে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রজ পশ্চিমে বেড়াইতে গেলে আলিগড় স্টেশনে তাহার সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় চারিটি ফিরিঙ্গী ও একটি কাফ্রী রেল-কর্মচারী উঠিয়া পড়িল। ফায়ারম্যান

৪ সমাজের এত বিচিত্রপ্রকৃতির নরনারীর সমাবেশ ডিকেন্সের প্রভাবজাত। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী লিখিয়াছেন, 'ডিকেন্সের উপন্যাসে বহুতর শঠ, খল, ভণ্ড ও পাষণ্ড আছে। তাহারাই যেন উপন্যাসের প্রাণাবেগকে চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে।'—'বাংলা সাহিত্যের নরনারী', পৃ ১৮। অমৃতলালের উপন্যাস দুইটিও অসংখ্য পার্শ্বচরিত্রের আবির্ভাবেই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কাক্রীটি ব্রজর জলের কুঁজো ফেলিয়া দিল এবং টিকিট কালেক্টর টিল্‌টন ঘুমন্ত ব্রজর বুকের উপর বসিল। তখন—

"ব্রজসুন্দর ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই ব'লে উঠল—'বেগ ইওর পার্ডন।' তারপর বললে, 'Why did you sit on my chest?' 'বেগ ইওর পার্ডন'টা রায়কুমার অভ্যাসবশতঃ এটিকেট্ রক্ষার জন্য ব'লে ফেলেছিলেন। সাহেবগুলি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, 'অল্ রাইট্—অল্ রাইট্—চুপ্‌সে বইঠ্ রহ।'

ব্রজসুন্দর বললে—'Do you know I am a graduate of the Calcutta University, an M. A.?'

সাহেব একজন বল্লেন—'Then go and find a third class compartment for you.'"

ব্রজ আরও তর্ক করায় জ্যাক্ তাহার ঘাড় ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহার পদসেবা করিতে ব্রজকে বাধ্য করিল। পরের স্টেশনে তাহারা নামিয়া গেলে এবং গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে ব্রজসুন্দর বলিয়া উঠিল—

"'I shall write all about this in the Calcutta papers, you have insulted a gentleman—'

'And he is going to advertise it—Hoory!' বলে সাহেবদ্বয় হো হো করে হেসে উঠল।"

আত্মগ্লানিতে ব্রজসুন্দর স্থির করিল—'বাড়ী ফিরে আমি স্বদেশী হব—স্বদেশী হব, এতে অনারারী চাকরী থাক আর যাক।'

তৎকালীন কলিকাতার যথার্থ প্রতিচ্ছবি ফুটিয়াছে অনেক স্থলে। মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন-প্রহসন, বিচিত্র ভাষাগ্রহী পোস্টার, আর্যসমাজীদের কীর্তিকলাপ, 'নারদীয় মন্ত্রে দীক্ষিত' পশ্চিমী মৌলবীদের আচরণ, 'বাজনা-বারণ-সমিতি', কাসেম সাহেবের কুঠিতে সান্ধ্য মজলিসে সাম্প্রদায়িক কূটচক্র প্রভৃতি কোথাও বর্ণনায়, কোথাও সংলাপে প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উজ্জ্বল হাস্যরসেরও প্রভূত নিদর্শন এই উপন্যাসে রহিয়াছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিতে গেলে 'কাঞ্চনকৌলীন্য ও বংশগরিমা' দুইয়েরই প্রয়োজন বলিয়া ব্রজসুন্দর মিউনিসিপ্যালিটির ড্র্যাফট্‌সম্যান মৌলানাজাদা মামুদ ফকিরুদ্দিন সাহেবের সাহায্যে হামিদের যে বিচিত্র বংশতালিকা প্রস্তুত করাইয়াছে তাহা রীতিমত হাস্যোদ্রেককারী—

'বহুপূর্বে হামিদের পূর্বপুরুষদিগের বাস ছিল খাস খোরাসানে; লড়াই ফতে করতে করতে তাঁদের আদিপুরুষ মহম্মদ বেন আবদাল্লা বেন আবদুল মুতালিব পাশা বাহাদুর ইরাণে এসে বাস করেন; সেখান থেকে বংশের এক শাখা আফগানিস্থান দখল ক'রে আমিরী করেন; পরে যখন বাবর বাদশা কাবুলে যান, তখন হামিদের অষ্টতম ঊর্দ্ধপুরুষ মালিকে উলমুলক ফতেজান ডার্ডেনেলিস খাঁ বাহাদুরকে বন্দী ক'রে দিল্লীতে আনেন এবং তাঁর বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ নিজের একজন সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন। ডার্ডেনেলিস খাঁ রাজা আদিশূরের শ্বশুর নবীন নিয়োগী মহাশয়কে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে যশোহর-বিভাগ জ্বালিয়ে দিয়ে সেখানে সুঁদরি গাছ রোপণ করিয়ে দেন; ডার্ডেনেলিস-বিজিত সেই সহরের নাম এখন হয়েছে সুন্দরবন। পূর্বগৌরব স্মরণ ক'রে এখন সাধারণের কাছে এঁরা সামান্য জমীদার ব'লে পরিচয় দেন না, অতি সামান্য সংক্ষিপ্ত নামেই সন্তুষ্ট; যথা, পিতামহ— পিতামহ হাজী মামুদ সোণোয়ারউদ্দীন আলিউল্লা খাঁ; পিতা— পিতা মৌলভী গাজী কুদরৎ বসহরউদ্দীন খাঁ সাহেব; পুত্র — পুত্র মিষ্টার নবাবজান মামুদ হামিদ সা।'

মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসনের চিত্রও বড় রঙ্গপূর্ণ—

'কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসনের তিন-সনা গাজন আরম্ভ হয়ে গেছে। জীবমাত্রেই শিব জ্ঞান করে ক্যানভাসাররা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নিজ নিজ মূল সন্ন্যাসীর জন্য ফুল পাড়াবার তরে প্রত্যেক ভোটারের দরজায় মাথা চালতে আরম্ভ করেছিল।'

পোস্টারের ভাষাও রঙ্গরসোজ্জ্বল—

" 'উকিল-কুল-কোকিল নিখিল বাবুকে ভোট দিয়া জাতিকুল রক্ষা করুন।' 'ব্রজবাবুকে ভোট না দিলে মাদ্রাজে বজ্রাঘাত হইবে।'...কিন্তু সব প্লাকার্ড, সব পোস্টার, সব বিল-বিজ্ঞাপনকে রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় ম্লান ক'রে জলজল করছে আমাদের [সাবাজপুরের] মাণিকধন বিশাইয়ের রংবেরঙের প্রাচীর-পট, 'বোরোক্রেসী-বধ-কশাই— খড়দায় মা-গোঁসাই— ঢাকুরের মনীষি-মুকুর মিঃ বিশাই এবার দাঁড়িয়েছেন, মনে রাখবেন দাঁড়িয়েছেন।... আর মনে রাখবেন রাণা প্রতাপ— ভুলবেন না শিবাজীর সঙ্গে সাবাজপুরের একটা জাতীয় একতা আছে।...প্রাচীন বাঙ্গালায় বিশ্বকর্মাকেই বিশাই বলত।' "

কিন্তু সকল হাস্যরসের অন্তরাল হইতে লেখকের মনের গভীর বেদনা ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের অতীত সম্প্রীতির কথা স্মরণ করিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন এবং বর্তমান 'ইউনিটি'ও অন্তঃসারশূন্য 'প্যাক্‌ট' সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন। অনুরূপ মনোভাব লইয়া কবি নজরুল ইসলামও তাঁহার 'প্যাক্‌ট'[৫] নামক ব্যঙ্গসঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন।

অঙ্কিত চরিত্রাবলীর মধ্যে পাগলাপীরের চরিত্রটিতে লেখক একটা বীভৎস বিস্তার দিয়াছেন। এই মনুষ্যত্বহীন ঘৃণ্য চরিত্রটির তুল্য চরিত্র বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্যগোচর হয়না। তাহার যে বর্ণনা লেখক দিয়াছেন, তাহাতে শিহরিয়া উঠিতে হয়—

'চক্ষুগোলকে শার্দূল, ওষ্ঠাধরে রুষ্ট বিষধর, কপোলযুগলে বুদ্ধিভ্রংশের আত্মম্ভরিতা।'

৩

১৩৩৪ সালের 'মাসিক বসুমতী'র আশ্বিন সংখ্যায় 'হামিদের হিম্মৎ' শেষ করিয়া অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতেই অমৃতলাল 'যুবক-জীবন' উপন্যাসের সূত্রপাত করেন। মোট তেইশটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় তিনিও তাঁহার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায় বাঙালী যুবকের জীবনের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ সমস্যাটি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যার উপর নিতান্ত নির্ভরশীল হওয়ায় বাঙালী যুবক কিভাবে জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত হইতেছে তাহাই এ উপন্যাসের প্রধান প্রতিপাদ্য। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি পূর্বে এই কথা বারংবার ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র কেতাবী বিদ্যার উপর নির্ভর না করিয়া আমরা যদি করদক্ষ বিদ্যাও কিছুটা আয়ত্ত করি তাহা হইলে আমাদের জীবিকার্জনের পথ প্রশস্ত হইবে। এ উপন্যাসের নায়ক শ্যামাপদ অনেক বিলম্বে ঠেকিয়া শিখিয়া মাকে বলিয়াছিল—

'আমি যেভাবে লেখাপড়া যতটুকু শিখেছি, তাতে চাকরীর বাজারে আমার দু'একখানা চিঠিপত্র লেখা ছাড়া আর কোনও কাজকর্ম করবার যোগ্যতা নেই।'

---

৫ 'চন্দ্রবিন্দু' দ্রষ্টব্য।

লেখকের বক্তব্যবিষয় পল্লবিত হইয়াছে বহু ঘটনা ও পরিস্থিতিতে। মূল চরিত্রগুলির সহিত বহু অপ্রধান চরিত্রেরও অবতারণা হইয়াছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অন্তরে লেখক তাঁহার তির্যক দৃষ্টি ফেলিয়াছেন। ফলে লেখকের মোহহীন শ্লেষশাণিত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বাঙালী-সমাজের একটি পূর্ণচিত্র আমরাও দেখিতে পাই। লেখকের সহজাত এবং স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকতরল বর্ণনা কাহিনীর মধ্যে ওতপ্রোত। সেই সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘজীবনের দর্শন ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিস্বরূপ অনেক চিন্তাগম্ভীর প্রসঙ্গেরও ইঙ্গিত লাভ করিতেছি। মাঝে মাঝে এক একটি বাক্য প্রবাদবাক্যের মতো জ্বলজ্বল করিতেছে।

'যুবক-জীবনে'র মূল কাহিনী 'যুবক' শ্যামাপদর 'জীবন' লইয়া। 'অধ্যবসায়-শক্তির আধারের উজ্জ্বল আদর্শ' শ্যামাপদ এই উপন্যাসের নায়ক। চতুর্থবার আই. এস. সি. ফেল করিয়া 'পঞ্চম কিস্তির ফি ইউনিভার্সিটির খাজনাখানায়' জমা না দিয়া সে ক্রমে একজন নামজাদা 'রিসাইটার' হইয়া উঠিল এবং বায়রণের 'ওশান্' ও রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের 'প্রেমচন্দন-রসসিক্ত কুসুমহারে বিভূষিত' হইল। তাহার যশের আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত করিয়া তুলিল 'হরমোহন ড্রামাটিক ক্লাব'। কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ছাড়া অপরের নাটক লইয়া ক্লাবের উদ্বোধন হইতে পারে না বলিয়া 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনীত হইল। শ্যামাপদর সেলিউকসের ভূমিকা দেখিয়া কলিকাতার 'রঙ্গ-রসকরা' ভূয়সী প্রশংসা করিল। মহিম মৈত্রের কন্যা সুন্দরী বিভাবতীর সহিত শ্যামাপদর বিবাহ হইবার কারণও তাহার সুন্দর আবৃত্তি। 'হরমোহন ড্রামাটিক ক্লাবে'র প্রতিষ্ঠাতা ব্রজমোহন ঘূর্ণীতে টিউবওয়েল করিয়া দিয়া 'রায়সাহেব' উপাধি পান; কৃষ্ণনগর 'বার' এই উপলক্ষে যে 'টি পার্টি'র আয়োজন করে তাহাতে বিভার পিসেমশাই সাব্‌জজ জানকীনাথ সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। এখানে শ্যামাপদ আবৃত্তি করিল 'পুরাতন ভৃত্য'—

> " 'পুরাতন ভৃত্যে'র চিরপরিচিত অঙ্গ হ'তে সেই দিন এমন এক অনাঘ্রাত-পূর্ব কলাকুসুমের সৌরভ ছুটেছিল যে, একটি রঙ্গিন পাতলা প্রজাপতি কোথা হতে উড়ে এসে তার মাথার উপর ঘুরতে লাগল। পিসীমা মনে করলেন, এই পুরাতন ভৃত্যটিকে বিভার সেবায় নিযুক্ত করলে মন্দ হয় না।"

শ্যামাপদর সহিত বিভাবতীর বিবাহের পর শ্যামাপদর বাবা উমাপদ লাহিড়ী পুত্রের মাথায় ঋণের বোঝা চাপাইয়া পরলোকে গমন করেন। শ্যামাপদ কলিকাতায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথাও কর্মসংস্থান করিতে পারে না—

'কলিকাতা মহানগরীর বিচিত্র বিপুল জনতাপূর্ণ প্রকাশ্য পথে ঘুরিতে ঘুরিতে মনুষ্যত্ববিচারের এই জ্ঞান তাহার চোখে স্পষ্টতরভাবে প্রকটিত হইতে লাগিল। সে দেখে বিষাদের বিরক্তি— হতাশার কালোছায়া কেবল অধিকাংশ ভদ্রবেশধারী জনগণের মধ্যে। দর্পণের সমক্ষে না দাঁড়াইয়াও তাহার নিজের মুখচোখের ছবি যে এখন কিরূপ তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। আর সেই মুখের প্রতিরূপ ব্যথিত স্কন্ধে বহন করিয়া কত শিক্ষিত যুবক পথে পথে ফিরিতেছে, তাহা দেখিয়া আতঙ্কে তাহার বুক ধ্বসিয়া যায়।'

একদিন ঘটনাচক্রে কলিকাতার পথে এক সাহেব তাহাকে পদাঘাত করে। 'হঠকারী শ্বেত প্রেতের বলদর্প মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ' করিয়া শ্যামাপদ হাজতে গেল। এই ব্যাপারটি লইয়া মামলা সুরু হইল এবং যখন দুই পক্ষের উকিলের মধ্যে বাক্‌চাতুর্য ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সওয়াল চলিতেছে তখনই অমৃতলালের আকস্মিক মৃত্যু এই কাহিনীতে যবনিকা টানিয়া দেয়।

'হামিদের হিম্মতে'র ন্যায় এখানেও লেখক মূল কাহিনীর চতুর্দিকে বহু ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। নাট্যকারের বিশিষ্ট নৈর্ব্যক্তিক মন লইয়া এই চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া সকল চরিত্রই অভাবিতপূর্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ রূপ লাভ করিয়াছে। উকীল ব্রজমোহনের ধাপে ধাপে উন্নতির স্তরগুলি তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কৌতুক যতটা, শ্লেষ তাহার চেয়ে অনেক বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। সে কিরূপে দোতলার শোবার ঘরের ছাদে টব সাজাইয়া 'গার্ডেন পার্টি' করিয়া পিতামহের নাম চিরস্মরণীয় করিল, বাগ্‌বিস্তারে জজকে খুশি করিয়া স্বদেশী কাজে যোগদানের অনুমতি আদায় করিল, 'খদ্দরের পোষাকী আটপৌরে সুট' পরিয়া কংগ্রেসে ঢুকিল, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হইবার জন্য কত কূট কৌশল অবলম্বন করিল এবং শেষ পর্যন্ত দেশের নিকট হইতে 'জেলা অলোজ্জ্বল' উপাধি লাভ করিল তাহার খণ্ড খণ্ড কাহিনী অত্যন্ত বাস্তবধর্মিতার সহিত বর্ণিত। বর্তমানকালের অধিকাংশ 'দেশপ্রেমী'ই যেভাবে ব্রজমোহনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে লেখকের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকা

যায় না। জানকীনাথের মধ্য দিয়া শ্রেণীগতভাবে সেই সব মুন্সেফদের চরিত্র ফুটিয়াছে যাহাদের 'হৃদয় বিবর্ণ ও রসশূন্য' এবং 'মন-মেজাজে ধনুষ্টঙ্কার'! ইহাদের সম্পর্কে লেখকের মন্তব্যে যথেষ্ট তিক্ততা লক্ষ্য করা যায়—

'জাল জুচ্চুরী ও মিথ্যা হলফের গোলোকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে প্রায়ই নরবিদ্বেষের বিষটা প্রকৃতিগত মাধুর্যকে হত্যা করে ফেলে।'

এই সঙ্গে এমন চরিত্রও অনেক সৃষ্ট হইয়াছে যাহাদের পরিচয় লাভ করিয়া আমাদের মন প্রসন্ন হইয়া উঠে এবং মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া উঠিবার মুহূর্তে আমরা রক্ষা পাই। 'সেকেলে উকীলদের মধ্যে শেষ একজিবিট্' গোকুল গাঙ্গুলী এমনই একটি চরিত্র যাহার জীবনের ইতিবৃত্ত হাসি ও অশ্রুর সমবায়ে উপাদেয় 'হিউমার' সৃষ্টি করিয়াছে। দেশী-বিলাতি হাকিমদের 'চড়াপড়া মনে' গোকুলের 'করুণার জোয়ারজল' টানিয়া তুলিবার ক্ষমতা কিংবা তাহার 'চোখের খাঁটি জলে' পেনাল কোডের পাতা ধুইয়া দিবার কাহিনী আমাদের লাভক্ষতি-নির্ণায়ক মনকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ করিয়া রাখে। এস. ডি. ও.-পত্নী তৃপ্তিলতাও এমনই আর একটি চরিত্র। তাহার 'তৃপ্তি নামের মধুর দীপ্তিতে' আমাদের মনও আলোকিত হয়। পিসীমার চরিত্রটির তুল্য চরিত্র বাংলাসাহিত্যে বিরল। 'স্বামীর সামাজিক জীবনে জলুশ' দিয়া 'হাইলাইফের আসর' সাজাইবার তাঁহার ধারাবাহিক প্রয়াস আমাদের বিস্মিত করে—

"পিসীমা সেই শ্রেণীর হিন্দু কুলবধূ, যাঁরা স্বামীর সামাজিক জীবনে জলুশ দেবার জন্য দু কান চেপে ফুলো ফুলো এলো খোঁপা বাঁধেন···। এঁরা বিলিতী আসবাবে ঘর সাজান, ভাসুরের সঙ্গে কথা কন, স্বামীর টেব্‌লে মুর্গী পরিবেশন ক'রে সেই রাত্রে স্নান ক'রে তবে নিজে আহারে বসেন। এঁদের মুখে 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি যেতে ভাই অনেকদিন সময়াভাবে', অথচ প্রাণের ভেতর 'ওলো'ও আছে, 'ষেটের কোলে ষাট'ও আছে, 'নারায়ণের ইচ্ছে'ও আছে, আর আছে সীঁথির সৌন্দর্য, সিঁদুরের গৌরব ও হ্যামিলটনের কোলে লোহার আদর!"

অনেক চরিত্র লেখকের স্বল্পতম ইঙ্গিতেই সুস্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। যেমন, বিভা— অনলস কর্মপটুতা যাহাকে 'মাংসপিণ্ডে বা বংশদণ্ডে' পরিণত করে নাই। বিভার বাবা মহিম মৈত্র— 'ইষ্টকের মাৎসর্য অপেক্ষা পল্লীর সহজ সৌন্দর্যে' যিনি আকৃষ্ট। রাণাঘাটের এস. ডি. ও. মিঃ সোম— 'প্রকৃতি ও গৃহাদর্শ' যাহার 'সামাজিক শিষ্টাচারে মিষ্টতার সৃষ্টি' করিয়াছিল।

আরও অনেক চরিত্র মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়া উপন্যাসের স্বাদবৈচিত্র্য অনেকখানি বর্ধিত করিয়াছে। যেমন, 'অভিধান-বধ' নাটকের নাট্যকার ব্রজমোহনের পিতা রাধামোহন; ড্রামাটিক ক্লাবের উদ্যোক্তা 'মহামনা' বিজয়; 'কর্মীপুরুষ' সীতানাথ এটর্ণী; 'হাটখোলার তরুণ অরুণ'; আপার প্রাইমারী পাশ করা—কাছারীর মাণিক ভুঁইমালী; প্রবীণ প্রথম মুন্সেফ জয়লালবাবু; 'বধির কবি' মহিলামোহন; কবি শৈবাল—যাহার মুখচোখ 'বালবিধবা প্রতিম' এবং 'বিধবা হইলেও আধ-আয়তির চিহ্ন রিষ্ট্‌ওয়াচরূপে যাহার বামপ্রকোষ্ঠে বিজড়িত'; আল-পরিবারের সহিত দূর সম্পর্কের গৌরবে গর্বিত জজ সেলবোরন্; 'আসল খুরজা কা চিজ' বিক্রেতা হুণ্ডিরাম মারোয়াড়ী; 'আলজাবড়া' ও 'জিরেমরিচট্রি' (অ্যালজেব্রা ও জিওমেট্রি) উচ্চারণকারী রামজয় ঠাকুর; মনোহরপুকুরের 'আনাড়পাড়ার' সরুগলির উজ্জ্বলা বষ্টুমী; ত্র্যম্বক্‌রের দেশনায়িকা মিসেস সঙ্কটা বাই; দেশী চাটনীর জোগানদার দেদার বক্স; তিন মণ্ডপ জুয়াচোর 'বেন্ধা-বিষ্টু-মাইশ্বর'; বটতলার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থকার শ্রীমহেশচন্দ্র সরকার বিদ্যাভৈরব প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের রূপ ও স্বরূপ অশেষ নৈপুণ্যে উদ্ঘাটিত। লেখকের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়শালায় কত বিচিত্রমূর্তি মানুষই যে আছে! ইতর ও মহৎ সকল প্রকার চরিত্র সৃষ্টি করিয়া লেখক সংসারের ভাল-মন্দর ভিতর একটা ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছেন। বেকার শ্যামাপদ কলিকাতার পথে পথে এমনই অনেক মানুষের পরিচয় লাভ করিয়াছিল। রামজয় ঠাকুরের 'একদা দেশোদ্ধারকারী' পুত্র রঘুনাথ পেল্‌গ্রেভ কোম্পানীর বড়বাবুরূপে এমন নির্মম ইতর মনুষ্যত্বহীন কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়াছে যাহা শ্যামাপদকে মানবচরিত্র সম্পর্কে অভাবিত শিক্ষা দিয়াছে। রঘুনাথের মুখের উপমা দিতে গিয়া লেখকও তাঁহার ব্যঙ্গের চরম নিদর্শন দেখাইয়াছেন—'একেবারে উড়ে বামুনের পানদোক্তা রাখা বেটুয়ার মুখের আকৃতি'। ইহারই বিপরীত চরিত্ররূপে হাজতের কয়েকটি দুর্বৃত্তকে পাই, যাহাদের মর্মগত মহত্ত্বে শ্যামাপদ অভিভূত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে লেখক যে-মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। এই মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারি যে, লেখকের দৃষ্টি কেবল ব্যঙ্গে বক্র নহে, সহানুভূতিতেও স্নিগ্ধ। লিখিয়াছেন—

"জাতি ধুতি ও পুঁথির অভিমানে মত্ত হইয়া আমরা যে শ্রেণীর লোককে 'ছোটলোক' বলিয়া অন্তর্নিহিত ইতরতার নির্লজ্জ পরিচয় দিই, তাদের

মধ্যে যে দেবদত্ত মহত্ব কতটা সহজভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা আমরা তখনই বুঝিতে পারি, যখন করুণাময়ের কৃপায় ঘোর বিপন্ন অবস্থায় অনন্যসহায় হয়ে তাদের নিকট হ'তে অযাচিত, অপ্রত্যাশিত, সহানুভূতির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রাণতুচ্ছকারী সেবায়, কলঙ্কগ্রহণকারী ক্ষমায় ও সঞ্চিত সমর্পণকারী দানে প্রাপ্ত হই। আমি এ নীতিশাস্ত্রের বচন রচনা করিতেছি না, ভুগিয়া বুঝিয়াছি, চোখে দেখিয়াছি, অতি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তবে কালিকলমে লিখিতে সাহসী হইয়াছি। উপন্যাসের 'শ্যামা দাসী', কবির 'পুরাতন ভৃত্য' কল্পনা নয়; আমার এ হাজতের কাহিনীর বীজও সত্যের নার্সারী হইতে সংগৃহীত।"

সংলাপসৃষ্টিতেও তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। যেমন চরিত্র, তাহার মুখের ভাষাও তদ্রূপ। উকীল, এটর্ণী, মুন্সেফ, সুশিক্ষিতা নারী, অশিক্ষিতা নারী, জুয়াচোর, মদ্যপ, হতাশ বেকার প্রভৃতি সকলেরই ভাষা যথাযথ। উকীলদের সওয়ালও বাস্তবতাপূর্ণ। সকল সংলাপেই বক্তার মনস্তত্ত্বের সহিত লেখকের ভূয়োদর্শন ও রসবোধ মিশ্রিত। একটি উক্তি উদ্ধৃত করি। প্রবীণ প্রথম মুন্সেফ জয়লালবাবু (ইঁহারা 'মুন্সেফ' নাম বদলাইয়া 'সাব এসিষ্টেন্ট জজ' রাখার পক্ষপাতী) 'সাতাশ বছর সার্ভিসের' পর বলিতেছেন—

'আমাদের পালা শেষ হয়েছে, সাতাশ বছর সার্ভিসের অনেক পাওনা-গণ্ডাই বুঝে পেয়েছি, রংপুর থেকে বর্ণ, জলপাইগুড়ির ভুঁড়ি, চাটগাঁর দদ্রু, মুর্শিদাবাদী ডায়েবেটিশ, সবই অঙ্গের ভূষণ হয়েছে।...এখন জানকী টানকীর মত বৃটিশ বাইণ্ডিং লাইব্রেরী এডিশন ছোকরারা সার্ভিসে ঢুকেছে, পিয়ার্শ সোপের ভ্যানিলা গন্ধে মুন্সেফ নাম আপনা আপনি লোপ পাবে।'

তথাকথিত 'সাইকোলজিক্যাল' উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের বিদ্রূপ বড় তীব্র: 'যে বই পড়লে সাইকেল চড়তে শেখা যায় তার নাম সাইকোলজি।' যে সকল কবিযশঃপ্রার্থী 'সাইকেলের সাহায্যে' সাহিত্যে 'বঙ্কিম পথ' পরিত্যাগ করিতেছে তাহাদের লেখক সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন জানকীনাথের 'বেণীমুন্সী' উপন্যাসটিকে উপলক্ষ করিয়া। 'বঙ্কিম পথ' এই শ্লিষ্ট প্রয়োগে সাহিত্যে কোন্ পথ গ্রহণীয় তাহা তিনি সার্থকভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আর্টের নামে তৎকালে যাহা চলিত ছিল তাহারও প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে। কায়স্থদের পৈতাগ্রহণ আন্দোলনে যে তাঁহার সমর্থন নাই তাহাও ব্যঙ্গোক্তিতে প্রকাশিত।

অনেক উক্তি প্রবাদবাক্যের ন্যায় তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, 'লোভের আসল নাম উন্নতিবরণ গঙ্গোপাধ্যায়'; 'মেয়েদের জন্ম সবস্বতী গোত্রে, পাত্রস্থা হন লক্ষ্মী পরিচয়ে'; 'হোমকুণ্ডে (অর্থাৎ Home-কুণ্ডে) ঘৃত ঢালিয়া অমৃতফল লাভ' প্রভৃতি।

'যাজ্ঞবল্ক্যের বল্কল খুলে গুপ্তসূত্রের গূঢ় অনুসন্ধান'; 'মুন্সেফী বিজ্ঞতার সঙ্গে মৌসুমী বাগ্মিতার কুটুম্বিতা'; 'ভগ্নীপতির এংগ্লোলোকপ্রাপ্তি'; 'রবীন্দ্র-হৃদয়ানন্দ-দায়িনী পদ্মার তরঙ্গ'; 'পতিপ্রাণা উচক্কার আমেরিকান সতীত্ব'; 'উপন্যাসে সাইকোলজির সঙ্গে ক্রাইমনোলজির বৈজ্ঞানিক রস মিশ্রিত প্রণয়পূর্ণ বিবাহিত জীবন'; ধর্মান্ধ কশাইয়ের 'কামমন্ত্র প্রয়োগ'; 'যশোরের আমদানী সেকেলে হেড কনেষ্টবলের মত চেহারা', রেজোলিউশনিত ও অনুমোদিত' প্রভৃতি বাক্যে ও বাক্যাঙ্গে কৌতুকের ছটা যথেষ্ট।

মাঝে মাঝে অনেক উদ্ভট শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন 'ব্যাসিলিয়া লুসিডিয়া কম্‌শৃম্প্‌' অর্থাৎ পুঁইশাক দিয়া কুচোচিংড়ি, কিংবা 'ফোরজিফিলাস্‌ ব্যাক্‌টিরিয়া' অর্থাৎ জাল জীবাণু!

প্রবন্ধ

বাঙালীর স্মৃতিতে অমৃতলাল নাট্যকার ও প্রহসন রচয়িতারূপেই চিহ্নিত। কিন্তু তিনি যে অর্ধশতাধিক বিচিত্র ভাবরসাশ্রয়ী প্রবন্ধ-নিবন্ধেরও রচয়িতা, সে পরিচয় বর্তমানে একরূপ বিস্মৃত। বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্রের 'ত্বরিত ভঙ্গুর পৃষ্ঠায়' তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলির কয়েকটি মাত্র তাঁহার 'কৌতুক-যৌতুক' (১৩৩৩) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য সকল রচনাই বিক্ষিপ্ত, কিছু বা লুপ্ত।

অমৃতলালের অধিকাংশ প্রবন্ধই বস্তুমুখ্য, সুতরাং তথ্যপ্রধান। তাঁহার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষদর্শনের নিদর্শনহেতু এই প্রবন্ধসমূহের মূল্য অপরিসীম। প্রভূত পর্যবেক্ষণ সম্ভূত বলিয়া ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট। কতকগুলি প্রবন্ধে, যেখানে তিনি বরণীয় ব্যক্তিদের স্মৃতিপূজা অথবা চরিত্র-চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন কিংবা আত্মস্মৃতি বা নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধীয় পুরাতন কথা বিবৃত করিয়াছেন, সেখানে বক্তব্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়কে উত্তীর্ণ হইয়া অন্তরানুভূতিপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই জাতীয় রচনার কোন কোন অংশে তাঁহার তথ্যনিষ্ঠ মনও ভাবোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। দেশবন্ধুর তিরোধানে 'আমার পূজা', সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়ে 'বিসর্জন', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে 'সেকালের কথা' প্রভৃতি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে প্রবন্ধ রচনায় ক্ষেত্রে তিনি বাঁধা মত বা বিশেষ পথ অবলম্বন করেন নাই বলিয়া সকল প্রবন্ধেই তাঁহার স্বকীয় মনোভঙ্গী ও রচনাকৌশলের অনন্যতা লক্ষ্যগোচর হয়। এই সকল প্রবন্ধে তাঁহার মনোভাব কোথাও চিন্তাগম্ভীর, কোথাও কৌতুক-প্রসন্ন, কোথাও শ্লেষশাণিত, কোথাও ক্ষোভক্ষিপ্ত, আবার কোথাও বা আত্ম-সমাহিত ও শ্রদ্ধান্বিত। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁহার সকল রচনায় স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি ওতপ্রোত। তাঁহার রাজনৈতিক ও সমাজচিন্তামূলক প্রবন্ধগুলির সহিত বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধগুলির তুলনা করা চলে। আত্মচেতনাহীন বিমূঢ় বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ করিবার প্রচেষ্টায় এবং বাংলাদেশের সমাজজীবনের প্রতি অচঞ্চল আনুগত্যের রক্ষণশীলতায় তিনি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবর্তী

যোগসূত্র। তাঁহার আত্যন্তিক বাঙালীয়ানা মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনের সমস্যা ও সংগ্রামের কথা ব্যক্ত করিতে যেখানে তাঁহাকে বারবার প্রণোদিত করিয়াছে সেখানে বক্তব্যের আন্তরিকতায় তাঁহার সহিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মনোভাব-সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

মোহিতলাল মজুমদার প্রাবন্ধিক অমৃতলালের রচনাবলী সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন—

'ইঁহার শেষ বয়সের এই রচনাগুলি বর্তমান বাঙালীজীবনের অতিশয় বাস্তব সমস্যার আলোচনা হিসাবে বড়ই মূল্যবান। গভীর স্বজাতিপ্রীতি, বহুদর্শিতা ও স্বাভাবিক মননশীলতার সহিত এই সকল রচনায় যে খাঁটি বাঙালী-সুলভ হাস্যরস যুক্ত হইয়া থাকে, তাহার জন্য এগুলির সাহিত্যিক মূল্যও অল্প নহে।'[১]

অমৃতলালের প্রবন্ধাবলীর ভাষা ও রচনারীতিতে পূর্ববর্তী কোন প্রবন্ধ-লেখকের স্পষ্ট প্রভাব নাই। ভাষা ও রীতি লেখকের আপন ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যের ছাপ বহন করিতেছে। সাধু ও কথ্য উভয় রীতির গদ্যরচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেও অমৃতলাল পুরাতন সরল রীতিরই পক্ষপাতী। ফলে তাঁহার গদ্যের রীতি অতি সাধু ও অতি কথ্যের মধ্যপথ ধরিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যমণ্ডিত গদ্যের অনুরূপ গদ্যরচনায় তিনি কখনও কখনও সচেষ্ট হইয়াছেন।[১ক] ১৩২১ সালে লিখিত তাঁহার 'সৌন্দর্য' নামক রচনা হইতে এইরূপ গদ্যের নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি—

'একবার এসো দেখি, আমরা একখানি রূপ দেখি, নবীন সজ্জায় সজ্জিতা নবীন সৌন্দর্যের একখানি ছবি দেখি। চন্দনচর্চিত গাত্রে বসন্ত ঊনবিংশতি-বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া মল্লিক-কুমারী বেলার অঙ্গে ফুলের বীজন ডুলাইয়া গিয়াছে, লঘুকায়া বেলা কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়তন শ্যামাঙ্গী, যেন কুসুম-ভার ভূষিতা মাধবীলতা; ভাদ্রমাসের ভরানদীর ন্যায় যৌবনের জোয়ার যেন নিজের পূর্ণতায় দুকূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে, ভ্রমরকৃষ্ণ ঈষৎ তরঙ্গায়িত

১ বঙ্গদর্শন॰: অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

১ক বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে যে নীতি ও আদর্শের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, সে সম্পর্কে অমৃতলালের সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার সমকালে যে সকল সাহিত্যিক আধুনিকতা ও 'সাইকোলজি'র অজুহাতে 'বঙ্কিম পথ পরিত্যাগ পূর্বক' সরলপথে লজ্জার সীমা অতিক্রম করিতেছিলেন তাঁহাদের তিনি ব্যঙ্গের বাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন 'যুবক-জীবন' (১৩৩৪) উপন্যাসে (৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কেশদাম শিথিল কবরীতে আবদ্ধ হইয়া গ্রীবার মরালভঙ্গিতে মাধুর্য মাখাইয়া দিয়াছে।··· আর সেই কেশরাশি কি কোমল, কি উৎফুল্ল, কি মসৃণ, কি চিক্কণ, কি সুখ-স্পর্শ; কি মদির গন্ধে কুন্তলদল ইন্দ্রিয় সকল অবশ করিয়া দেয়···!'[২]

১৩৩৪ সালে লিখিত 'বাঙ্গালার কথা' হইতে কথ্যরীতির গদ্যে তাঁহার অনায়াস সাবলীলতার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল—

'যে যমুনা-পুলিনে সাজাহানের প্রেম তাজমহলের সৃষ্টি করেছিল, সেই যমুনা-পুলিনেই বাঙ্গালীর প্রেম বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা করেছে। এত প্রেম যে বাঙ্গালীর প্রাণে— সে বাঙ্গালী নিজের জন্মভূমিকে যে ভালবাসতে শেখেনি এ কথা কি বিশ্বাস হয়? বাঙ্গালী দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না, বিদেশীর মুখে এটা আজকাল আমাদের গালাগাল হোয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন যেতে চায় না জান? সে জন্মভূমিকে মায়ের মত ভালবাসে, কিন্তু পরের ঘরে ডাকাতি কোরে এনে সেই মায়ের গায়ে গহনা পরাতে চায় না।'[৩]

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় অমৃতলালের প্রবন্ধের মূল্য ও বিশিষ্টতা এইভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন—

'অর্থ-গৌরবের জন্য এইগুলির মূল্যবত্তা নয়, বাগ্‌ভঙ্গীর চাতুর্য, সরসতা ও সৌষ্ঠবের জন্যই এইগুলি উপাদেয়। প্রমথ চৌধুরীর নিবন্ধগুলির মত এই-গুলি প্রবন্ধসাহিত্যের গণ্ডীতে গড়ে। কিন্তু এইগুলিতে রসসৃষ্টির জন্য কৃত্রিম প্রচেষ্টা নাই, রচনাভঙ্গীর স্বাভাবিক মাধুর্য, সারল্য ও তারল্যে এইগুলিতে রসসৃষ্টি হইয়াছে।'[৪]

বিষয়বস্তু অনুসারে অমৃতলালের প্রবন্ধগুলিকে এই কয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়— (ক) নাটক ও নাট্যশালা সংক্রান্ত (খ) আত্মস্মৃতি (গ) স্মৃতিপূজা ও চরিত্র-চিত্র (ঘ) রাজনৈতিক (ঙ) সমাজচিন্তামূলক ও অর্থনৈতিক (চ) সমসাময়িক ঘটনাভিত্তিক এবং (ছ) সাহিত্য-সম্মেলনের অভিভাষণ।

২ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সৌন্দর্য' নামক সংকলন দ্রষ্টব্য।

৩ বাঙ্গালার কথা: বুধবার ৫ই পৌষ ১৩৩৪

৪ 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (৩য় খণ্ড): 'অমৃতলাল' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

২

নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে অমৃতলাল তাঁহার অভিমত নানা স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন।[৫] কিন্তু এই সকল রচনাদির মধ্যে নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে ঠিক ধারাবাহিক ও বিস্তৃত ইতিহাস নাই। প্রসঙ্গক্রমে নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য এই সকল বক্তৃতা, বিবৃতি ও রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। ১৩০৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গ-নাট্যশালার সাম্বৎসরিক উৎসব-সভায় অমৃতলাল যে বক্তৃতা করেন, নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত তাহাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন ব্যাপক ইতিহাস। বক্তৃতাটি তৎকালীন 'রঙ্গভূমি' পত্রিকায় কয়েকটি সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই বক্তৃতা হইতে আমরা বঙ্গীয় নাট্যশালা সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য পাই। যেমন, যাত্রা-পাঁচালীর সঙ্গীতের আধিপত্যের যুগে সাধারণ রঙ্গালয়ে 'নীলদর্পণে'র অভিনয় দর্শকের রুচিকে সঙ্গীত-শ্রবণ-স্পৃহা হইতে অভিনয়-দর্শন-আগ্রহের দিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল; কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহুপূর্বে 'হিন্দুমেলা'য় 'ভারত-মাতা'র অভিনয়ই দেশবাসীর মনে জাতীয় ভাবের প্রবর্তন করে এবং এই জাতীয় ভাব হইতেই ইতিহাসের দিকে, ঐতিহাসিক নাটকের দিকে দর্শকচিত্ত আকৃষ্ট হয়; যখন বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্সগুলি ততটা জনপ্রিয় হয় নাই, তখন বেঙ্গল থিয়েটারই 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে জনসাধারণের অধিকতর নিকটবর্তী করিয়া তোলে। অমৃতলাল বলিয়াছেন—

> 'থিয়েটার হতে জাতীয় ভাবের একটা স্ফূর্তি হয়েছে। যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা আজ সাহিত্যগুরু বলে থাকি, থিয়েটারই তাঁকে সাধারণের চোখের সামনে ফুটিয়ে দিয়েছে।...বঙ্গদর্শনে তখন বঙ্কিমবাবুর জগদ্বিভাসিনী প্রতিভার নবোন্মেষ। বঙ্গদর্শনে তাঁর উপন্যাসগুলি অল্পে অল্পে বেরোচ্চে। বঙ্গদর্শন শেষে যতটা পসার প্রতিপত্তি করে তুলেছিল, গোড়ায় ত আর ততটা ছিল না। কাজেই বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ তখন বড়

---

৫ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে স্টেটসম্যান পত্রিকায় অমৃতলাল 'The Bengali Stage: Its past, present and future' সম্পর্কে তাহার মতামত ব্যক্ত করেন। বিপিনবিহারী গুপ্ত সংকলিত 'পুরাতন প্রসঙ্গে' (দ্বিতীয় পর্যায়ে) তাঁহার নাট্যজীবনের সূত্রপাত হইতে কিঞ্চিদধিক এক বর্ষকালের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। 'পুরাতন পঞ্জিকার'ও কোন কোন স্থলে বিচ্ছিন্নভাবে নাট্যজীবনের ঘটনাবিশেষ লিখিত আছে।

বেশী লোকের ভাগ্যে পড়া ঘট্‌তো না। বেঙ্গল থিয়েটার সর্বপ্রথম দুর্গেশনন্দিনী নাটকাকারে পরিবর্তিত করে বঙ্কিমবাবুকে সাধারণের সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।'[৬]

বেঙ্গল থিয়েটার সর্বপ্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করায় জনসাধারণ কিরূপ কটূক্তি করিয়াছিলেন তাহার একটি মর্মান্তিক দৃষ্টান্তও এই বক্তৃতায় মেলে। অমৃতলাল তাঁহার বক্তৃতায় ঐতিহাসিক নাটকের পর পৌরাণিক নাটকের যুগ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করেন—

"এই যুগে দর্শক দীনবন্ধু-মাইকেলের স্বভাব-সরল পুস্তকাবলীর সহজ অভিনয়ের কথা ভুললে—সব ভুলে পাকাটীর তীরধনুক নিয়ে রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রার পালায় মেতে গেল। এই যুগে অভিনয়েরও প্রথা পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই যুগেই নাটকে অপেক্ষাকৃত গান-নাচের পরিমাণ বেড়ে গেল; তারপর হরিনামের যুগ। এরও আরম্ভ বেঙ্গলে— প্রহ্লাদ-চরিত্রের অভিনয়ে। এই যুগে হরিনামের এমন আদর হল যে অন্য কোন প্রকার পুস্তকের অভিনয়ের পরও হ্যাণ্ডবিলে লিখে দিতে হত, 'তৎপরে মধুর হরি-সংকীর্তন'।"[৭]

পৌরাণিক নাটকের পর সামাজিক নাটকের সূত্রপাত হয়—

'এই যুগের আরম্ভ ষ্টার থিয়েটারের সরলার অভিনয় হতে। সরলার সরল ছবি সব ভুলিয়ে দিলে। লোকে ক্রমশঃ গার্হস্থ্য চিত্রযুক্ত নাটকের পক্ষপাতী হয়ে উঠলো। সরলার পর প্রফুল্ল, হারানিধি প্রভৃতি কথানি নাটক ষ্টারে হয়। বেঙ্গলেও কয়েকখানি হয়েছিল। এমারেল্ডে এই সময়ে আবার বঙ্কিমের গল্প-নাটকের পুনরনুষ্ঠান করা হয়। এ যুগে দর্শকের রুচি ক্রমশঃ একটু উচ্চাদর্শের দিকে উঠছিল।'

অমৃতলালের মতে ইহার পরই 'melodrama'র যুগ। দর্শকবৃন্দ এই ধরনের নাটকের প্রতি অত্যন্ত বেশী আকৃষ্ট হইলেন—

'গিরিশ পূর্ণচন্দ্র এবং বিবাদে উচ্চাঙ্গের নাটকের গাম্ভীর্য, গীতিনাট্যের গান-নাচের প্রাচুর্য আর প্রহসনের উপযুক্ত হাসিঠাট্টা মিশিয়ে নাটক

৬ রঙ্গভূমি : মাঘ, ১৩০৭

৭ ঐ ঐ । এই প্রসঙ্গে অমৃতলাল মন্তব্য করিয়াছেন, 'গানের বাহুল্য হওয়া অবধি থিয়েটারে অর্থাগম সুলভ হয়েছে।'

লিখতে আরম্ভ করলেন…। ক্রমে সকল থিয়েটারে ঐরূপ নাটকের প্রভাব বেড়ে গেল। আপনাদের রুচির খোরাক যোগাবার জন্য গিরিশবাবু, কুঞ্জবাবু, অতুলবাবু, আমি ইত্যাদি আমরা সব গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম…।'[৮]

তাঁহাদের ন্যায় রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা কেন নাট্যকার হইয়া উঠিলেন তাহার হেতু এইরূপ—

'আপনাদের আব্দারের রুচির মত বই লিখতে গিয়ে থিয়েটারের ম্যানেজারেরা Play-writer হয়ে পড়ল— আর বাহিরের লেখক আসবার পথ রইল না— আসে কিরূপে বলুন, আপনারা যেমন খোঁজেন তেমন দিতে না পারলে আপনারা দেখবেন কেন? প্রহসনের মধ্যে বিবাহ-বিভ্রাট যে দিকে গিয়েছিল, বেল্লিক-বাজার সে দিকে গেল না। সুর ফিরে গেল, কাজেই এখন প্রহসন, পঞ্চরং আপনারা যেমনটা চান, তেমনটা করে করতে হয়।'[৯]

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ রঙ্গালয়ের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হয়। এই দিনটি নাট্যানুরাগীদের স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য অমৃতলাল 'বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদিন' নামক যে ক্ষুদ্র নিবন্ধ[১০] লেখেন তাহার উল্লেখ পূর্বে (পৃ ১৫৩) করিয়াছি।

'পত্রিকা ও নাট্যশালা'[১১] প্রবন্ধে অমৃতলাল তাঁহাদের নাট্যসাধনার প্রাথমিক পর্বে সংবাদপত্রসমূহের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়াছেন। শিশিরকুমার ঘোষ, মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, রিহার্সালে আসিতেন, নানাবিধ সুপরামর্শ দিতেন। 'ইংলিশম্যানে'র মত ইংরেজের কাগজও অনেক সাহায্য করিত। থিয়েটারের

৮ রঙ্গভূমি: মাঘ ১৩০৭

৯ ঐ ঐ। কয়েক বৎসর পূর্বে (১৩০২) এই কথাগুলিই তিনি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে একটি পত্রে জানাইয়াছিলেন—'কলিকাতার দর্শকের নিকট নাটকের গুণাগুণ এইরূপে বিচার হইয়া থাকে—কচুরি কচুরির মত ও রসগোল্লা রসগোল্লার মত সুস্বাদু হইলে হইবে না। কচুরির পর রসগোল্লা আহার করিলে রসগোল্লার লবণত্বের অভাবের অভিযোগ হইবে এবং ঐরূপ রসগোল্লার পর কচুরি দিলে কচুরির ভিতর শার্করা রস নাই বলিয়া ভোক্তা মুখ বিকৃত করিবেন।—'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' (৬৭ গ্রঃ)

১০ মজলিস: ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩২৯

১১ সচিত্র শিশির--বড়দিন সংখ্যা ১৯২৪

কথা লিখিতে লিখিতে তাঁহারা কিভাবে ইংরেজের থিয়েটারের নকল করিয়া 'জাতীয় নাট্যশালা' স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারও তথ্যপূর্ণ বিবরণ পাই। গিরিশচন্দ্রের অভিনীত কোন কোন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করিতে গিয়া অমৃতলাল যে গিরিশকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, সেকথাও একস্থলে অকপটে স্বীকার করিয়াছেন।

জনসাধারণের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিবার কাজে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও হ্যাণ্ডবিল একদা কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিদর্শনও অমৃতলাল দিয়া গিয়াছেন। 'পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা'[১২] নামক রচনায় অভিনয়-বিজ্ঞাপন-পত্র সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—

'সুশিক্ষিত দর্শক বাঙ্গালা থিয়েটারে চিরদিনই ছিলেন, কিন্তু আজি কালিকার যুবকেরা নাটক এবং অভিনয়কলা বুঝিবার জন্য যেরূপ অধিক আগ্রহে পরিশ্রম এবং চিন্তাশক্তি পরিচালনা করেন, তখনকার দর্শকগণ অধিকাংশ তাহা করিতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর অভিনয়-বিজ্ঞাপন-পত্র প্রভৃতির লেখায় প্রতি একটু মনোযোগপূর্বক লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বিষয় বিশেষের দিকে দর্শকমন আকর্ষণ করিবার জন্য ম্যানেজারকে অনেক সময়ে অভিনীত নাটকের বিশিষ্টতা বা পট-পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্যের প্রতিও একটু স্পষ্ট ইঙ্গিত বিজ্ঞাপিত কবিতে হইত।'

ইহার পর অমৃতলাল 'নীলদর্পণ' ও 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র অভিনয়-বিজ্ঞাপনের 'নমুনা' দিয়াছেন। নিদর্শন-স্বরূপ 'নীলদর্পণে'র বিজ্ঞাপনটি[১৩] উদ্ধৃত হইল—

'নীলদর্পণ

নীলদর্পণ কি করিয়াছে?…বাঙ্গালীর মূর্ছাগত মনকে প্রথমে একটু মনুষ্যত্বের তেজে উদ্দীপ্ত জাগরিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যে বাঙ্গালী দেশের দুঃখে কাঁদিতেছে, ভারত ভারত বলিযা একটু হাত পা নাড়িতেছে, নীলদর্পণ অভিনয়ের পূর্বে এই অবস্থার কতটুকু অস্তিত্ব ছিল? কই— ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বরের পূর্বের খাতাপত্র দেখিলে এ হিসাবে তো

১২ রূপ ও রঙ্গ: ১ম সংখ্যা: ১৮ই আশ্বিন ১৩৩১

১৩ বিজ্ঞাপনের ভাষা অমৃতলালের।

তত বেশী জমা দেখা যায় না, যেটুকুও দেখা যায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে নাটকাকারে নীলদর্পণ গ্রন্থের প্রচারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।...'

'পুরাতন ফাইলের পাতা'[১৪] নামক রচনায় (অপর একটি সংখ্যায়) অমৃতলাল '১৩২০ সালের মিনার্ভা থিয়েটার[১৫] হইতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন-পত্রের সম্ভাষণ চতুষ্টয়' প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সম্ভাষণের ভাষা যে অমৃতলালের তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এই সম্ভাষণ চতুষ্টয় হইল—(১) মহালয়া (২) আনন্দময়ীর আগমনে (৩) বিজয়া সম্মিলন ও (৪) কোজাগর-পূর্ণিমা। বাংলাদেশের অভিনয়-দর্শক সমাজকে তাঁহারা যে কিরূপ আত্মীয়তুল্য জ্ঞান করিতেন তাহা এই সম্ভাষণগুলি হইতে জানা যায়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এই—

"বিজয়া সম্মিলন !!

আসুন—আসুন—আপনাদিগকে প্রণাম করি!—আসুন নমস্ত—আপনাকে প্রণাম করি। এস প্রীতিভাজন—প্রাণ তোমার প্রাণকে আলিঙ্গন করুক। এস আমাদের মা লক্ষ্মীগণ, পূজা-অবসানে বিজয়ার উৎসবে একবার যবনিকার অন্তরালে বসিয়া সন্তানের 'মা—মা' রব শুনিয়া যাও। সম্বৎসর ধরিয়া আমাদের প্রদত্ত আমোদের পসরা যাঁহারা ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা এই মঙ্গলময় দিনে একবার নাট্যশালায় বসিয়া আমাদের মঙ্গলকামনা করিয়া যান।"

দীর্ঘকাল নানাভাবে রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অমৃতলাল দর্শক-চরিত্র সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এক শ্রেণীর দর্শক কিভাবে অভিনেতৃবর্গকে বিব্রত করিতেন তাহার বাস্তব নিদর্শন রহিয়াছে 'লাউভারের কথা', 'এন্‌কোর তত্ত্ব' ও 'শীষ রহস্য' নামক রচনাত্রয়ে।[১৬] অভিনেতার কথা

১৪ রূপ ও রঙ্গ ৮ই কার্তিক ১৩৩১

১৫ অমৃতলাল তখন মিনার্ভা থিয়েটারের নাট্যাচার্য ছিলেন।

১৬ নাট্য-মন্দির : ভাদ্র, ১৩২১। 'শীষ-রহস্যে' তিনি যে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, দশ বৎসর পরে রচিত 'থিয়েটারে পিলু' নামক নক্‌শার একস্থলেও বাঙালী দর্শকের সেই মনোবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

শুনিতে না পাইলেই 'লাউডার— লাউডার' বলিয়া অনেক দর্শকই 'শান্তি ও রসভঙ্গ' করিতেন—

'এই লাউডার—লাউডারের ফল দাঁড়াইতেছে যে, এখনকার অনেক অভিনেতা স্বরবৈচিত্র্য অভিনয় করিবার জন্য অভ্যাস করেন না, কেবল কণ্ঠকে কর্কশ হইতে কর্কশতর করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করেন। এই লাউডারের আমদানির কমতি না হইলে, আর দর্শকসমাজ নীরবে অভিনয় দেখিতে অভ্যস্থ না হইলে, দেখিতেছি দিন কয়েক পরে বাঙ্গালী স্টেজের অভিনেতা ও বাহাদুরী কাঠ-ঠেলা খালাসীতে বিশেষ প্রভেদ থাকিবে না।'

এইরূপ 'এন্‌কোর' কথাটির যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া অনেকেই দর্শকের আসন হইতে ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন। অমৃতলাল আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

" 'এন্‌কোর' কথাটা ফ্রান্সের আমদানি, উচ্চারণ— 'আংকোর'। কোন গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতবিশেষে দর্শকসমাজ অধিকতর প্রীত ও বিমোহিত হইলে তাঁহারা যেন আত্মহারা হইয়া 'এন্‌কোর' রবে ঐ গীতটি আবার গাহিবার জন্য অনুরোধ করেন, গায়ক বা গায়িকা অনেক সময়ই সেই অনুরোধ রক্ষা করেন। এই অনুরোধ রক্ষা তাঁহার ভদ্রতা বা শিষ্টাচার, নচেৎ পুনর্বার গান করা তাঁহার কর্তব্যের মধ্যে গণ্যও নয় এবং তিনি বাধ্যও নহেন। এই জন্য 'এন্‌কোরের' অনুরোধ রক্ষিত হইলে দর্শকগণ প্রশংসাব্যঞ্জক করতালি দ্বারা গায়ক বা গায়িকাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন··· কিন্তু আমাদের দেশীয় রঙ্গালয়ের অধিকাংশ দর্শক 'এন্‌কোর' শব্দটি শিক্ষা করিয়া তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন।··· অনেকে এটাকে গাওনার ফাউ বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ বা শিষ্টাচার সঙ্গত অনুরোধের সুর ছাড়াইয়া হুকুমের সুর ব্যবহার করেন,··· আবার ইদানীং একটা প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে যে, জনকতক 'এন্‌কোর' বলিলেই যেন আর জনকতককে 'No more' বলিতেই হইবে।"

অমৃতলাল শেষে মন্তব্য করেন—

'দেশীয় রঙ্গভূমিকে দেশের গৌরবের সামগ্রী করিয়া তুলিতে হইলে, ভদ্রসমাগমের উপযুক্ত স্থান করিয়া তুলিতে হইলে, কলাবিদ্যার পবিত্র মন্দিরে পরিণত করিতে হইলে, অভিনেতা প্রভৃতিগণের যেমন কর্তব্য আছে, যেমন

শিক্ষার প্রয়োজন আছে, আমাদের বোধ হয়, তেমনই অপর দিকে শ্রোতৃবর্গেরও সেইরূপ একটা কর্তব্য আছে, একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে।'

১৩৩৪ সালের ২৫এ বৈশাখ গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ভুবনমোহন নিয়োগীর মৃত্যু হইলে অমৃতলাল জ্যৈষ্ঠের 'মাসিক বসুমতী'তে 'ভুবনমোহন নিয়োগী' নামে যে স্মৃতিচিত্র রচনা করেন তাহাতে আদি সাধারণ রঙ্গালয়গুলি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত হইয়াছে।

'সপ্তমীর রাত' নামক অপর একটি স্মৃতিকথায় (নাচঘর : ২৬এ আশ্বিন ১৩৩৫) অমৃতলাল সেই দিনগুলির কথা 'স্মরণ করিয়াছেন' 'যখন বঙ্গের অভিনেতৃবর্গের নতুন রং-করা জীবনপূজার মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত ছিল এক একটি আনন্দপূর্ণ মঙ্গলঘট।'

৩

অমৃতলাল একাধিক প্রবন্ধে তাঁহার জীবনের কোন কোন ঘটনার আভাস দিলেও পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী তিনি কখনও রচনা করেন নাই। অমৃতলালের কোন কোন কবিতায় কিংবা ইংরেজী রচনায় আমরা তাঁহার জীবনের বিশেষ কয়েকটি ঘটনার সহিত পরিচিত হই মাত্র, জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাসূত্র আমাদের অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'চরকা', 'পত্রিকা ও নাট্যশালা', 'পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা', 'ভুবনমোহন নিয়োগী', 'বসিরহাট—ধান্যকুড়িয়া' ইত্যাদি বাংলা রচনা এবং 'Looking Backward', 'Calcutta as I knew it once : Tales of a Grandfather' বা Oriental Seminary-র Centenary Volume (1929)-এ প্রকাশিত ছাত্রজীবন সংক্রান্ত ইংরেজী রচনার উল্লেখ করা যায়। 'অমৃত মদিরা'র অনেক কবিতায় জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনার আভাস দিয়াছেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গেও অনেক সময় জীবনের কোন কোন ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন।

অমৃতলাল তাঁহার জীবনকথা ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করেন ১৩২২-২৩ সালে বিপিনবিহারী গুপ্তের নিকট। 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় উহা প্রথমে প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৩৩০ সালে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (দ্বিতীয় পর্যায়) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই জীবনকাহিনী আংশিক হইলেও উহাতে আমরা অমৃতলালের

নিজ বিবৃতি অনুসারে তাঁহার জন্ম হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর অভিনয় পর্যন্ত একটি পারম্পর্যযুক্ত আত্মকথা পাইতেছি।

অমৃতলাল বেশ মজলিসী ঢঙে তাঁহার জীবনের এই অংশটুকু বিবৃত করিয়াছেন। বর্ণনার কোথাও আতিশয্য নাই, আত্মপ্রচার নাই। বহুদিন পরে অতীতের ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া সর্বত্র নির্লিপ্ত অথচ আন্তরিক মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে। বিবৃত আত্মকথায় গদ্যের যে নিদর্শন মিলিয়াছে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'কাশীতে অবস্থানকালে দুইটি ভদ্রলোকের সংস্রবে আসিয়াছিলাম, উপেন্দ্রনাথ দাস[১৭] তাঁহাদের অন্যতম। নানা কারণে তিনি তখন তাঁহার পিতা শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া লোকনাথবাবুর বাসায় আসিলেন।··· আর একজনের নাম আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি,— রাজচন্দ্র সান্যাল। ইনি তখন কুইন্স কলেজের লাইব্রেরিয়ান। ··· রাজচন্দ্রবাবু লাইব্রেরী হইতে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার সুযোগ করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। ইংরাজি পড়ার নেশা আমার খুব জমিয়া উঠিল। আজ শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সান্যাল মহাশয়ের কথা স্মরণ করিতেছি। জীবনে যদি আমি কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকি, তজ্জন্য সান্যাল মহাশয়ের নিকটে আমি অনেক অংশে ঋণী।'[১৮]

'পুরাতন পঞ্জিকা' নামে অমৃতলাল যে স্মৃতিকথা ইহার কয়েক বৎসর পরে রচনা করেন, ১৩৩০-৩১ সালের মাসিক বসুমতীতে অনিয়মিতভাবে তাহার কয়েক কিস্তি (তেইশটি পরিচ্ছেদ) প্রকাশিত হয়। এই স্মৃতিকথাও অসম্পূর্ণ এবং ইহাতে ঘটনার ধারাবাহিকতা নাই। তবে তাঁহার শৈশব-যৌবনের কলিকাতার সমাজ ও জীবনযাত্রার অনেক উজ্জ্বল চিত্র আছে। তাঁহার নিজের জীবনের ঘটনারও সবিস্তার ও সরস বর্ণনা এখানে মিলিতেছে।

কলিকাতা বন্দরে যখন পালতোলা জাহাজের বেশী আমদানী হইত, সেই ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে মাতাল সেলারদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ ও দৌরাত্ম্য ; অগ্নিকাণ্ডের

১৭ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন।

১৮ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ৮০-৮১

সময় তাহাদের 'অকুতোভয় সাহস'; প্রাতে গঙ্গাস্নানার্থিনীদের পরচর্চা ও পরনিন্দার 'মহিম্নস্তব'; কুয়োর ঘটিতোলার ডাক; বাড়ির মেয়েদের সহজ চিকিৎসা; সাহেবের পালকী; মেয়েদের গন্ধকের দেশলাই তৈরী; রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করায় স্যর সেসিল বিডন কর্তৃক প্রোক্লামেশন পাঠের ঘটনা; প্রোক্লামেশনের অন্তঃসারসারশূন্য আশ্বাস সম্পর্কে মন্তব্য; প্রোক্লামেশনের দিন কলিকাতায় উৎসব ও আলোকসজ্জা; কালীপ্রসন্ন সিংহের স্পষ্টবাদিতা; তাঁহার নিজবাড়ীর দুর্গোৎসবের ঐশ্বর্য, আয়োজন ও ভূরিভোজনের নিকট শ' বাজার রাজবাড়ীর পরাজয়; কলিকাতায় প্রথম বিলাতী জিমন্যাস্টিক এবং তাহা দেখিয়া 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামের আখড়া স্থাপন; চৈত্রমেলায় বাঙালী বালকের বিলাতী জিমন্যাস্টিক প্রদর্শন; স্ত্রী-স্বাধীনতার হুজুগ, রাণী রাসমণির তেজ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শ্যামবাজার অঞ্চলে গোরা সেপাই-পল্টনের বাজনা ও কামানের কুচ; সেকালের পাঠশালা, পাঠ্য, গুরু মহাশয় এবং গভর্ণমেণ্ট-প্রবর্তিত জনশিক্ষার প্রতি কটাক্ষ; সেকালের ছেলেদের প্রাণবন্ত ক্রীড়াকৌশল; বিবাহের বাজারে 'পাশকরা' ছেলের উচ্চমূল্য; কলিকাতায় কোন্ বিবাহে প্রথম গ্যাস ব্যবহার; সেকালের বিবাহের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-পদ্ধতি ও উৎসবাদির বিস্তৃত পরিচয় প্রভৃতি 'পঞ্জিকা'র পাতায় পাতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। অমৃতলালের আত্মজীবনীর যে খণ্ডাংশ এখানে মিলিতেছে তাহা শৈশব হইতে বিবাহ পর্যন্ত বিস্তৃত।

'পুরাতন পঞ্জিকা'র সকল ঘটনাই সুদূর অতীতের। তথাপি অতীত বর্ণনায় অমৃতলালের দৃষ্টি কোথাও স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া বক্তব্যের মধ্যে কল্পনাকুহেলীর সৃষ্টি করে নাই। সতর্ক মনে, ঘটনার সত্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উজ্জ্বল পরিহাসের মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া অমৃতলাল এই 'পঞ্জিকা' রচনা করিয়াছেন। বর্ণনায় ধারাবাহিকতা নাই এবং ঘটনাও অসংলগ্ন বলিয়া অমৃতলাল একটি সরস কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—

> "একে পুরাতন পঞ্জিকা, তায় বোধহয়, 'বসুমতী' আফিসের দপ্তরী সাহেবের নানা মিয়ার হাতের বাঁধাই, কোথাকার পাতা কোথায় যে গেছে, তার ঠিক নেই, সুতরাং পূজো থেকে আশ্বিনে ঝড়, ঝড় থেকে সেলারের উৎপাত, কোথায় কালীসিঙ্গীর কথা, কোথায় টেকচাঁদ ঠাকুরের কথা, কোথায় বাই নাচ, কোথায় জিম্ন্যাস্টিক, কোথায় নৈবিদ্যি, কোথায় মেঠাই-মতিচুর, কোথায় চৈত্র-মেলা, কোথায় ন্যাশানাল থিয়েটার কি যে গোলমাল

হচ্ছে কিছুরই ঠিক নেই, তবে নদেরচাঁদের কথায় বলি, আসলে কম না পড়লেই হল।"

'পুরাতন পঞ্জিকা'র সূত্রপাতে অমৃতলাল লিখিয়াছিলেন—

'অগ্রেই সাবধান করিয়া দিতেছি যে, পঞ্জিকাখানি নীরস হইবে, কেননা ইহাতে সত্য প্রত্যক্ষ ঘটনামাত্রই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব।'

কিন্তু অমৃতলালের এই সাবধানবাণী সত্ত্বেও পঞ্জিকাখানি যে পাঠকের নিকট নীরস বোধ হয় নাই তাহা তৎকালীন 'মানসী ও মর্মবাণী'র নিম্নোক্ত অভিমত হইতে উপলব্ধি করা যায়—

"রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের 'পুরাতন পঞ্জিকা' বেশ চলিতেছে। সেকালের নিখুঁত অনেক চিত্রের সমাবেশ ইহাতে আছে। রস-রচনা বাঙ্গালাদেশ হইতে এক রকম উঠিয়া যাইতেছে বলিলেই হয়। পুরাতন এই রচনার ধারাকে যাঁহারা এখনও বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, অমৃতলাল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অভাব-দুঃখক্লিষ্ট বাঙ্গালীর অন্তরে হাসির লহর ছুটাইয়া তিনি বাঙ্গালীকে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও আনন্দ দান করেন ও তাহার দুঃখশোকের কথা ভুলাইয়া দেন। ভগবান 'শিবরাত্রির সলিতা' আমাদের রসরাজকে আরও কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখুন।"[১৯]

৪

অমৃতলাল গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সমকালীন যে সকল ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া তিনি তাঁহাদের চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই মৃত্যুতে শোকাভিভূত হইয়া তিনি কিছু কিছু স্বতঃস্ফূর্ত প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে একটি প্রাচীন বাঙালীর বিষণ্ণ চিত্ত হইতে উৎসারিত শোক সজল স্নিগ্ধ ভাষায় অকৃত্রিম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই শ্রেণীর রচনাবলীর প্রত্যেকটিই অপর রচনা হইতে স্বতন্ত্র এবং অমৃতলালের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। মৃত ব্যক্তিদের চরিত্রের আলেখ্য অঙ্কন করিতে গিয়া তিনি স্বল্প রেখায় তাঁহাদের যে চিত্র ফুটাইয়াছেন তাহা অন্য কাহারও রচনারীতির সদৃশ নহে। তাঁহার

১৯ মানসী ও মর্মবাণী: বৈশাখ ১৩৩২

উপলব্ধির রূপ ও গদ্য রচনার বিশিষ্ট রীতি বক্তব্যের সহিত অভিন্নভাবে মিশিয়া গিয়াছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভুবনমোহন নিয়োগী প্রভৃতির মৃত্যুতে তিনি যে সকল শোকপ্রশস্তি রচনা করেন সেগুলির ভাব, ভাষা, রূপ ও রীতি একটি অপরটি হইতে পৃথক।

১৩৩০ সালের ২৯এ কার্তিক সাহিত্যসেবক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। আজীবন দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামশীল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত অমৃতলাল একটি বিচিত্র মধুর আত্মীয়সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। পাঁচকড়ি ছিলেন 'জামাই'— তিনি ছিলেন 'শ্বশুর'। 'জামাই' পাঁচকড়ির মৃত্যুতে তিনি 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়' নামে যে শোক-নিবন্ধটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্তিগত অনুভবের নিবিড়তা হইতে সৃষ্ট প্রীতিস্নিগ্ধ আত্মনিষ্ঠ রচনা। এই ক্ষুদ্র রচনাটিতে পাঁচকড়ির চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব, তাঁহার সম্পাদকীয় কৃতিত্ব প্রভৃতি স্মিত বক্তব্যে উজ্জ্বল রূপ লাভ করিয়াছে। নট, নাট্যকার ও রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ অমৃতলালের নিকট পাঁচকড়ির মৃত্যু একটি নাটকীয় চরিত্রের চিরপ্রস্থানের ন্যায় অনুভূত হইয়াছে—

> 'গত ৩০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গের সাধারণ জীবন-নাট্যশালার সাহিত্য রঙ্গ-মঞ্চে যে নাটক-অভিনয় চলিতেছে, তাহার মধ্যে যে সকল নট-নক্ষত্র প্রবেশ-প্রস্থান করিয়াছে, তাহার মধ্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মৌলিক চরিত্রের ভূমিকা লইয়া বঙ্গজনরূপ দর্শকসমাজকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া শিখাইয়া মোহিত করিয়া রাখিয়া এই পুণ্য অগ্রহায়ণেই নিজ জীবনেব তৃতীয়াঙ্কেই ভূমিকা শেষ করিয়া নেপথ্যাচার-গৃহে গমন করতঃ দেহপরিচ্ছেদ ত্যাগপূর্বক স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন।'[২০]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃখ-দারিদ্র্যসমাকীর্ণ ও সংগ্রাম-পরিপূর্ণ জীবনের যে-চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, পাঁচকড়ির অন্যান্য জীবনচরিতে ঠিক সেইরূপ জীবনচিত্র মেলে না। অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

> 'পাঁচু ছিল একে সম্পাদক, তাহার উপর সবে মাত্র পাঁচকড়ি। প্রাচীন পিতামাতা জীবিত, পুত্র-কলত্রও ছিল, সুতরাং পাঁচকড়ি থেকে সাতকড়ি বা ন-কড়ি হইবার চেষ্টা বেচারাকে অহোরাত্র করিতে হইত; এ অবস্থায় পায়ের পেশী খুব শক্ত না হইলে বরাবর সোজা খাড়া থাকা সব সময়

২০ 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়' : মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০

তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।...বিধাতারূপ যে স্যাকরা সোনার পাঁচকড়িকে গড়িয়া তাহার গলায় প্রাচীন-প্রাচীনা তরুণ-তরুণী শিশু গাঁথিয়া একছড়া মালা পরাইতে দিয়াছিলেন, তিনি সোনার পুতুলকে বেশী শক্ত করিবার জন্য তামার ভাগও বেশ একটু মিশাইয়া দিয়াছিলেন। পাঁচকড়ির সোনার সঙ্গে যা খাদ ছিল, তাহা রাং সীসা প্রভৃতি কোন নীচ ধাতু নহে, যে ধাতুতে দেবপূজার তৈজস প্রস্তুত করিতে হয়, সেই পবিত্র তাম্র।'

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় দক্ষতা, লেখনী-ক্ষিপ্রতা, রচনায় রসমাধুর্য, সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলা জ্ঞান, ঔপন্যাসিক প্রতিভা, মজলিসী আলাপ প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়া অমৃতলাল এই নিবন্ধটি যখন শেষ করিয়াছেন, তখন আত্মনিষ্ঠ রচনার অতল গভীরতায় ও জীবনদর্শনের ব্যাপক উপলব্ধিতে ইহা দুর্লভ মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—

'এ সমাজ-জীবন-নাটকে যবনিকা পতন নাই, অভিনয় চলিতেছে, কিন্তু প্রোগ্রাম খুলিয়া দেখিতেছি, পাঁচকড়ি এই যে প্রস্থান করিল, এই তাহার শেষ প্রস্থান, আর তাহার প্রবেশ নাই, সে আর আসিবে না, আর তাহার উদ্দীপ্ত বাণী আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিবে না, আর তাহার শেষভাষে আমরা হাসিয়া ঢলিয়া পড়িব না, আর তাহার জ্ঞানগর্ভ কথা আমরা মস্তিষ্কে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে পাইব না,— সে মাঝে মাঝে পাঠ ভুলিয়া যাক্, মাঝে মাঝে অবান্তর কথা (gag) প্রবেশ করাইয়া দিক, তাহার ভূমিকাগত সকল কথা আমাদের মনের মত হউক বা না হউক, অমনই মনে হইতেছে, আমাদের আনন্দ-তটিনী হইতে একটি নৃত্যশীল তরঙ্গ চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল।'[২১]

'আমার পূজা' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে লিখিত হয়। দেশবন্ধুর স্বার্থশূন্য দেশসেবা, সর্বস্বত্যাগের দীপ্ত মহিমা তাঁহার প্রতি অমৃতলালকে শ্রদ্ধান্বিত

২১ অমৃতলাল যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন তাহা পাঁচকড়ির অজ্ঞাত ছিল না। তাই বেঙ্গলী পত্রে অমৃতলাল একবার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে পতিতালয়গুলি উঠাইয়া দিবার জন্য একটি প্রস্তাব দিলে উহা Social Evil in Cornwallis Street' নামে প্রকাশিত হয়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গালয় পত্রে তাহার প্রতিবাদ করিয়া লেখেন যে, ইহা 'বুজরুকী'—'Humbuggism' (দ্রষ্টব্য The Bengali: 15. 3. 1903 এবং রঙ্গালয়: ১লা চৈত্র ১৩০৯)। এই ঘটনার পরই পাঁচকড়ি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং ২৫এ মার্চ ১৯০৩ অমৃতলালকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি অন্যত্র (পৃ ৪৭৫) উদ্ধৃত হইয়াছে।

করিয়া তুলিয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে লিখিত একাধিক কবিতায় ও ইংরেজী শোকনিবন্ধে এই শ্রদ্ধার প্রকাশ লক্ষিত হয়।

'আমার পূজা' পড়িলে মনে হয় ইহা 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অনুরূপ ভঙ্গীতে রচিত। কমলাকান্তের সেই আত্মনিষ্ঠ বিষণ্ণতা যেন অমৃতলালের রচনায়ও সঞ্চারিত হইয়াছে। আত্মাভিমানহীন দেশবন্ধুর কথা বলিতে গিয়া অমৃতলাল ব্যাজস্তুতিতে আমাদের আত্মম্ভরিতাকে ব্যঙ্গ করিয়া প্রথমে আত্ম-সমালোচনা করিয়াছেন। কমলাকান্ত বলিয়াছিলেন, 'মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে', অমৃতলালও লিখিয়াছেন যে, আত্মম্ভরিতার 'মায়া-স্ফটিক নির্মিত উপনেত্র' যদি না থাকিত তাহা হইলে—

'আমার দেহে যে এত সৌন্দর্য, আমাব স্বভাবে যে এত মাধুর্য, আমার চরিত্রে যে এত পবিত্রতা, আমার জ্ঞানের যে পৃথ্বী-জয়ী পরিধি—তাহা আমি কিছুই দেখিতে পাইতাম না।'[২২]

সকলে চিত্তরঞ্জনকে যেজন্য শ্রদ্ধা করেন সেজন্য অমৃতলাল তাঁহাকে স্মরণ করিতে চাহেন না। তিনি বিদ্যাবুদ্ধি দূরে সরাইয়া দীনের ন্যায় একান্তে 'ভাবের পূজা' করিতে চাহেন।

'আমার দুর্গোৎসবে' কমলাকান্ত যেরূপ সংশয়-বিভ্রান্ত মনে ভাবিয়াছিলেন, 'আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখনও দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম!' অমৃতলালের মনেও সেইরূপ সংশয় ও শেষে সংশয় হইতে মুক্তি—

'তবে আমি কেন পূজা করিতেছি? কিসের পূজা দিতেছি? কিসের জন্য পূজা করিতেছি? আমি পূজা করিতেছি আমার ভাবের। সকল লোকই ভাবের পূজা করে, বস্তুর পূজা কেহই করে না। আমার অন্তরের মধ্যে যে-একটি দেশবন্ধু-ভাব আছে— সেই ভাব আমি আধারবিশেষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাত্র পূজায় বসিয়াছি।'

এই শোক-নিবন্ধের শেষে দেশবন্ধুর নিকট তিনি যে-প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার অকৃত্রিম দেশপ্রেম ব্যক্ত হইয়াছে—

'হে আমার অর্চিত, হে আমার পূজিত! হে আমার অমর, অবিনশ্বর, চিরভাস্বর দেশবন্ধু! আমার জন্মভূমি হইতে চিরদাস্যের ঔদাস্য দূর কর, ঋষির আবাস এই মৃত্তিকাস্তরের উপর কর্মযোগের হিমালয় উন্নত কর;

২২ 'আমার পূজা': মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩২। ১৫ই আষাঢ় স্টার রঙ্গমঞ্চে দেশবন্ধুর স্মৃতিপূজায় অমৃতলাল 'স্মৃতির পাদপীঠে বিনীত অভিবাদন জানান'।

ক্ষাত্রনেত্রপাতে পবিত্রক্ষেত্রে দেশপ্রীতির জাহ্নবী প্রবাহিত কর, সর্বস্বত্যাগের মন্ত্রে স্বাতন্ত্র্য[২৩] দান করিয়া ভারতবাসীকে মানবসমাজে রাজরাজেশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত কর।'

'বঙ্গের অশ্রুজল' নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিতর্পণ। বঙ্গীয় নাট্যশালার পঞ্চাশৎ বাৎসরিক উৎসবে (১৩২৯) জগদিন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে অমৃতলালকে সংবর্ধিত করিয়াছিলেন। জগদিন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ২১এ পৌষ ১৩৩২। মাঘ মাসের 'মানসী ও মর্মবাণী'তে উক্ত রচনাটি প্রকাশিত হয়। জগদিন্দ্রনাথ সম্পর্কে অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

'জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন রাজার সমাজে রাজা, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পণ্ডিত, কলাগোষ্ঠীর অধিষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ, গৃহস্থের সুখ-দুঃখে পরমাত্মীয়, দেশ-হিতব্রতে স্বার্থবিস্মৃত আদৃত অগ্রণী।'

'সেকালের কথা' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ৪ঠা মাঘ ১৩৩২ দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। চৈত্র মাসের 'ভারতী'তে এই অতুলনীয় রচনাটি প্রকাশিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা বলিতে গিয়া অমৃতলালের মন অতীতমুখী হইয়া গিয়াছে। তাই সেকালের এমন অনেক কথা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যাহার সহিত একদা দ্বিজেন্দ্রনাথের যোগ ছিল নিতান্ত নিবিড়। রচনাটি কথ্যরীতিতে ও পরিচ্ছন্ন গদ্যে লেখা। সেকালে যাঁহারা বাংলা গদ্যে চল্‌তি রীতি প্রবর্তনের আন্দোলন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই অপেক্ষা যে প্রাচীন অমৃতলাল উত্তম গদ্য লিখিতে পারিতেন এই রচনাটি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কথ্যরীতির মধ্যে তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহারেও বাক্যগুলি ভারসাম্য হারাইয়া ফেলে নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথকে তিনি যে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহাও এখানে সুস্পষ্ট—

'দ্বিজেন্দ্রনাথ চ'লে গেলেন।

উত্তরায়ণ আরম্ভে সৌরমকরে শুভ মাঘমাসের চতুর্থ দিনে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বর্ষীয়ান, বিদ্যাবান, পুণ্যপূর্ণ প্রাণ, সংযমীশ্রেষ্ঠ, বঙ্গদেশের সত্যব্রত ভীষ্মসম দ্বিজেন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করেছেন।

ভীষ্মের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু ইচ্ছামৃত্যু বলে অনুমান হয়; নইলে সরস্বতী পূজার দিনে এ অঘটন ঘটবে কেন? যিনি আজীবন সরস্বতীর সেবা

২৩ অমৃতলাল Independence-এর অর্থ করিয়াছিলেন 'স্বাতন্ত্র্য' (দ্রঃ 'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধ)।

করেছেন, সেই সারস্বত-ব্রতধারী মহাপুরুষের জন্য সারস্বতোৎসবের দিন ভিন্ন বিষ্ণুলোক হ'তে পুষ্পরথ আর কোন দিন আসবে?

পার্বণপ্রিয় সত্যেন্দ্রনাথ গেছেন পৌষে, সর্বসুন্দর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গেছেন ফাল্গুনে, আর বাক্যাত্মিক দ্বিজেন্দ্রনাথ গেলেন মাঘে।'[২৪]

সকলে দ্বিজেন্দ্রনাথকে ফিলজফার বা দার্শনিক বলিত। অমৃতলালের মতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন ঋষি। প্রাচীন যুগে 'দর্শন' শব্দটি আত্মদর্শন শব্দে প্রযুক্ত হইত, আর দ্বিজেন্দ্রনাথ আত্মদর্শনশক্তির গভীরতায় ঋষি অভিধারই যোগ্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী এবং ঠাকুরবাড়ীর গুণান্বিত অনেকেই রহিলেন বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের স্থানটি চিরকালের জন্য শূন্য হইয়া গেল। এই রচনার শেষ বাক্যে অমৃতলাল একটি বিষণ্ন সত্যের সম্মুখীন হইয়াছেন—

'ঠাকুরবাড়ীতে রবির আলো, বহুবিজলীর দীপ্তি, স্বর্ণপ্রদীপের শান্তশোভা, সবই রইল বটে, কিন্তু ঠাকুরঘরের ঘৃতসিক্ত মঙ্গলদীপটি নিবে গেল।'

অমৃতলালের প্রথম জীবনের নাট্যসঙ্গী ও সুহৃদ ভুবনমোহন নিয়োগীর জীবদ্দশায় বঙ্গনাট্যশালার আদিপর্বে তাঁহার দানের কথা কৃতজ্ঞ অমৃতলাল স্বীকার করিয়াছিলেন 'অমৃত-মদিরা'য়। ১৩৩৪ সালের ২৫এ বৈশাখ ভুবনমোহনের মৃত্যু হইলে শোকাহত অমৃতলাল জ্যৈষ্ঠের 'মাসিক বসুমতী'তে 'ভুবনমোহন নিয়োগী' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে অতীতের 'আংটিপরা' ভুবন ও বর্তমানের 'নেংটিপরা' ভুবনের কথা লিখিতে বসিয়া অমৃতলাল তাঁহাদের নাট্যসাধনার প্রাথমিক পর্বের বিস্তৃত এবং প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ভুবনমোহনের শেষজীবনের দৈন্যদুর্গতির কারণ স্বরূপ তিনি রঙ্গালয়ের নেপথ্যে যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল তাহার ইঙ্গিতমাত্র দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন—

'কিন্তু আর এক মজাও দেখলাম, ভুবনমোহন নিয়োগী গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়েও নিজের থিয়েটারে নিজে ঢুকতে পায়না। যে সকল কৌশলে ভুবনের কাছ থেকে থিয়েটার লিজ নিয়ে তা হস্তান্তরের পর হস্তান্তর ক'রে ভুবনকে ভুঁইকম্পে দুলিয়ে উল্‌টে ফেলে দেওয়া হয় শোনা গেল, তার বর্ণনায় আমি অনেক বিবেচনা ক'রে ধামাচাপা দিলাম।'[২৫]

২৪ 'সেকালের কথা' : ভারতী, চৈত্র ১৩৩২

২৫ 'ভুবনমোহন নিয়োগী' : মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

অমৃতলালের মৃত্যুর পর ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে 'বরণীয় বাঙ্গালী-জীবন' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহাতেও তাঁহার গুণগ্রাহিতার উজ্জ্বল পরিচয় নিহিত আছে। এই প্রবন্ধটি দিনাজপুরের 'রাজশ্রী-শোভিত বৈরাগ্যবান পুরুষ' রাধাগোবিন্দ রায়ের বরণীয় জীবনের আলেখ্য।

কবি মধুসূদন দত্তের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে অমৃতলাল দুইটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। 'সারস্বত ব্রতকথা— মধুস্থদন' ও 'মধুমঙ্গল'। 'সারস্বত ব্রতকথা— মধুস্থদন' প্রকাশিত হয় ১৩৩১ সালের মাঘ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে এবং 'মধুমঙ্গল' প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালের ফাল্গুনের 'বঙ্গবাণী'তে। অমৃতলাল আশৈশব মধুস্থদনের সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কবিতা ('ভাস্করে' প্রকাশিত) 'রেখো মা দাসেরে মনে'র ছন্দে গ্রথিত; পাড়ার যাত্রার দলের জন্য রচিত 'একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা' মধুস্থদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে কল্পিত হইয়াছিল। আলোচ্য প্রবন্ধ দুইটিতে মধুস্থদনের স্মৃতিপূজা করিয়াছেন তিনি। মধুস্থদনের ব্যক্তিত্ব, মানসিক প্রবণতা, সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, তাঁহার উপর যুগ-প্রভাব, ধর্মের প্রভাব, পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রভৃতি সব কথাই স্বল্পপরিসরে সুন্দরভাবে আত্মনিষ্ঠ শিল্পরীতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

"সারস্বত ব্রতকথা' প্রবন্ধটি ১৩৩১ সালের সরস্বতী পূজার দিন খিদিরপুর 'মধু-মিলনে' পঠিত হয়। অমৃতলাল আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মধুস্থদনের নাটক-প্রহসন খুবই জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু 'মেঘনাদ-বধ' লইয়া গোল বাধে। কারণ—

> 'একে ত পদের অন্তে মিল নাই, তাহার উপর আবার ভয়ানক ভয়ানক অপ্রচলিত সংস্কৃত এবং গ্রাম্য শব্দ মিশ্রিত। যদিও সে সময়ে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য সংস্কৃতবহুল ছিল, তথাপি 'হা হতোঽস্মি' 'হা দীর্ঘোঽস্মি' 'তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী' প্রভৃতি বাণভট্ট-ব্যবহৃত খাস সংস্কৃত শব্দ সকল তারাশঙ্করের বাঙ্গালা কাদম্বরীর মধ্যে থাকিলেও 'মলম্ব অম্বর' 'দ্রুত ইরম্মদ' 'দম্ভোলি-নিক্ষেপি' প্রভৃতি পুঁইডাঁটা-চর্বণপটুমাত্র-দন্তভঙ্গকারী শব্দসমূহ এবং 'রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাত্মজ'-গোছ দীর্ঘসমাস 'মেঘনাদে'ই প্রথম প্রকাশ।"

লেখকের দৃঢ় অভিমত, 'মেঘনাদ-বধ' জনপ্রিয় হয় থিয়েটারের প্রসাদে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে 'মেঘনাদ-বধ' প্রথম অভিনীত হওয়ার

পর নগরের গলিতে গলিতে বালকেরাও বীরদর্পে 'মেঘনাদে'র অংশবিশেষ আবৃত্তি করিত।

অমৃতলাল লিখিয়াছেন, মধুসূদনের 'পৌরাণিক প্রাণ' ছিল : তিনি বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের উদ্দেশে বারংবার প্রণতি জানাইয়াছেন ; সপ্তপুত্রঘাতী শত্রু রামচন্দ্রের উল্লেখে রাবণের মুখ দিয়া ফুলের উপমা দেওয়াইয়াছেন ; অশোকবন-বাসিনী সীতার সহিত তুলসীর উপমা এক মধুসূদনই দিয়াছেন। অমৃতলালের মতে, কালিদাস ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে এ উপমার কল্পনা সম্ভব ছিল না।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ও গিরিশচন্দ্রের 'চৌদ্দতে অনাবদ্ধ' ছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে অমৃতলালের মত নিম্নরূপ—

'এই উভয় কবির পদাবলীর মধ্যে ছন্দের পর ছন্দ যেন আনন্দের আন্দোলনে তরঙ্গ তুলিয়া ঢুলিতেছে, শব্দঘটা, আদ্যযমক, মধ্যযমক, অন্ত্যযমকের ঝাঁকে পদ্যসুন্দরী যেন কাঞ্চনকলেবরে বারাণসী শাড়ী জড়াইয়া চরণে পঞ্চম পাঁজর বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছেন।'

মধুসূদনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার আত্মায় বাসনার উন্মাদ আবেগ অতিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। গ্রন্থগত শিক্ষা যথেষ্টরও অধিক লাভ করিলেও দৃষ্টান্তগত শিক্ষা তাঁহার একেবারেই হয় নাই। তাই আত্মসংযম শিক্ষা মধুসূদন কখনও করিতে পারেন নাই। অমৃতলাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত পিতা যদি মধুসূদনের থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার জীবন-চরিত অন্যভাবে লিখিত হইত।

'মধুমঙ্গল' প্রবন্ধেও অমৃতলাল মধুসূদনের 'সীমাশূন্য উচ্চাভিলাষ, আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভের অদম্য তৃষ্ণা, অপরিমেয় মূল্যে নিজের অন্তর্নিহিত প্রতিভাশক্তির পণনির্ধারণ, গগনস্পর্শী উচ্চচূড়াযুক্ত যশোমন্দির নির্মাণের ইচ্ছা' প্রভৃতির আভাস দিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় কাব্য লিখিয়া তিনি 'হোরেস ভার্জিল ওভিড প্রভৃতির দ্বিতীয় অবতার' হইতে চাহিয়াছিলেন।

অমৃতলাল অনুপ্রাস ও শ্লেষালঙ্কারে মণ্ডিত একটি অনুচ্ছেদে মধুসূদনের ধর্মান্তর গ্রহণের মর্মগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

'চর্মান্তর গ্রহণে অক্ষম হইয়া মধুসূদন প্রথম যৌবনে কেবল যে ধর্মান্তরমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, সুন্দরবনের চক্রসঞ্চিত মধুতে পাছে আভিজাত্যের সৌরভ না পায় এই ভয়ে নামান্তর গ্রহণ করিয়া মাইকেল হইয়াছিলেন।'

এই সঙ্গে অমৃতলাল এ কথাও লিখিয়াছেন যে, 'আত্মপ্রেমের ঔজ্জ্বল্যাতিশয্যের মধ্যেও তাঁহার হৃদয়মন্দিরে স্বদেশপ্রেমের ও স্বজাতিপ্রেমের মঙ্গল মৃৎপ্রদীপ শিখাবিশিষ্ট ছিল…।' সেইজন্য —

'জাতির পার্বণ, জাতির উৎসব, জাতির স্মরণীয় নাম, জাতির বরণীয় ধাম, সূতিকাগারের স্মৃতি, কপোতাক্ষীর প্রীতি তাঁহাকে বারবার উল্লসিত উচ্ছ্বসিত বিষাদিত পুলকিত করিয়াছে।'

অমৃতলাল শুধু যে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিপূজা করিয়াছেন এমন নহে, ব্যক্তিবিশেষের জীবদ্দশায় তাঁহাদের দোষগুণ লইয়াও এক একটি চরিত্র-চিত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যে এরূপ জীবিত এবং জীবন্ত চরিত্র প্রচুর। তাঁহার এইরূপ চরিত্র-সমালোচনামূলক একটি প্রবন্ধের নাম 'বিসর্জন'। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় তাঁহার কৃতকর্মের পর্যালোচনা করিয়া অমৃতলাল এই অসাধারণ প্রবন্ধটি রচনা করেন। অমৃতলালের ভাব ও যুক্তি, আন্তরিকতা ও সহানুভূতি, সত্যানুসন্ধান ও স্পষ্টবাদিতার বিচিত্র মিশ্রণে এই রচনাটি অতি উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগত প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছে।

১৩৩০ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ (৩০এ নভেম্বর ১৯২৩) কর্পোরেশন-নির্বাচনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট সুরেন্দ্রনাথের পরাজয় অমৃতলালকে গভীরভাবে চিন্তিত করিয়াছিল। এই চিন্তার ফল ১৩৩০ সালের 'মাসিক বসুমতী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিসর্জন' প্রবন্ধ।

সুরেন্দ্রনাথের জনচিত্ত-আলোড়নকারী প্রথম আবির্ভাব— যখন তাঁহার Awake! Awake! ধ্বনিতে বাঙালীচিত্ত সম্মোহিত, বিস্মিত, উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যোতিও ম্লান, সেই সময় হইতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জনচিত্তমন্দির হইতে সুরেন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' পর্যন্ত তাঁহার 'স্বভাবে'র ঐতিহাসিক পরিবর্তনের রূপচিত্র বিষণ্ণ রেখায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন অমৃতলাল। সুরেন্দ্রনাথের পূর্বাপর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও বঙ্গদেশে তাহার ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করিয়া অমৃতলাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সুরেন্দ্রনাথের পরাজয় 'ব্যক্তি'র নিকট নহে— 'ভাবের' নিকট।

এই প্রবন্ধে তাঁহার গদ্যের রীতিও অভিনব। সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়ের ঘটনাটি তাঁহার বিশিষ্ট ভাষা ও ভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে—

'বিগত নভেম্বর মাসের সংক্রান্তি দিবসে ১৩৩০ সাল ১৪ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার সপ্তমী তিথি অশ্লেষা নক্ষত্রে বঙ্গের রাজনীতিক বারোয়ারীর বিরাট

প্রতিমা সুরেন্দ্রনাথের প্রায় অর্ধশতাব্দীর পূজাগ্রহণান্তে বিজয়া হইয়া গিয়াছে।'

অমৃতলাল সুরেন্দ্র-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দেশপূজ্য নেতা জনপ্রতিনিধিরূপে 'ছোটলাট-বড়লাটের কাউন্সিলে' প্রবেশ করিয়া ক্ষমতার স্বাদ পাইলেন এবং ক্রমে 'যেন লোকের কাছ হইতে একটু তফাতে তফাতে যাইতে লাগিলেন।'

অমৃতলালের মতে সুরেন্দ্রনাথের কার্যকলাপের এই অসঙ্গতির বীজ তাঁহার চরিত্রেই নিহিত ছিল। তাই—

'১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের সুরেন্দ্রে আর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সুরেন্দ্রে আমি ত বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিনা, তাই আমি যখন তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি, তখন বিদ্রূপও[২৬] করিয়াছি...।'

এই বিদ্রূপ সত্ত্বেও উভয়ের বন্ধুত্বে ভাঙন ধরে নাই। এই নির্বাচনে তাঁহার পক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ অমৃতলালকে অনুরোধ করিয়া যে-পত্র লেখেন, তাহা অন্যত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণ সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এতই বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে অমৃতলাল যাহারই নিকট সুরেন্দ্রনাথের কথা তুলিয়াছেন তিনিই সুরেন্দ্রের 'বিনাশের জন্য নিজের চক্ষু দুইটাও উপড়াইয়া ফেলিতে প্রস্তুত' হইয়াছেন!

প্রবন্ধের শেষ অংশটি আত্মসমীক্ষা ও জীবনদর্শনের গভীরতায় এবং মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার অসার উদ্যমের উপলব্ধিতে অত্যন্ত বেদনার্দ্র হইয়া উঠিয়াছে—

"হে বঙ্গের বহুদিনের আরাধ্য সুরেন্দ্রনাথ! জনপ্রিয়তা কি জিনিস তাহা আমিও একটু জানি; খুব অভিনয় চলিতেছে, বাহবা বাহবা বাহবা! তালির উপর তালি! এমন সময় হঠাৎ একটা বিষম লাগিল, আর অমনই 'দুয়ো দুয়ো' হাসির টিটকারী। যখন ৭১ সালের আশ্বিনে ঝড় হয় তখন আমার বয়স একাদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু ঝড়ের পরদিন পল্লীস্থ একটি অতি পুরাতন বটবৃক্ষকে পথশায়ী দেখিয়া আমাব বালচক্ষুতে জল আসিয়াছিল। মহতের পতনে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যায়। বহুদিন পূর্বে লোক তোমায় যখন জয় জয় করিয়াছে, আমি লীলাচ্ছলে তোমায় ব্যঙ্গ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে দুইজনেই পরপারের নিকটবর্তী; কল্পনায় তোমার উৎসাহপূর্ণ

২৬ 'বাবু' (১৮৯৪)

মুখে হতাশার ছায়া দেখিতেছি, আর চোখের পাতা জলে ভিজিয়া যাইতেছে।"[২৬ক]

৫

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনও অমৃতলালের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করিত। দেশকল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেন। তাঁহার 'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধে আমাদের স্বরাজ আন্দোলনের সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ মিলিতেছে। এই সময়োপযোগী দীর্ঘ প্রবন্ধটি 'মাসিক বসুমতী'তে ১৩২৯এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'স্বরাজ' কথাটি কংগ্রেসে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইবার পর দীর্ঘ ষোল বৎসর ধরিয়া স্বরাজ-সাধনার নানা পন্থা রাষ্ট্রনেতারা দেখাইয়াছেন বটে, তবে একটি নির্দিষ্ট মতবাদ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারেন নাই। সুতরাং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে 'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধের রচনাকাল পর্যন্ত আমাদের জাতীয় আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। স্বরাজলাভের উপায় ও আন্দোলনের পদ্ধতি লইয়া যে অসন্তোষ ও মতভেদ ক্রমশ তীব্রতর হইতেছিল তাহাই চূড়ান্ত হইয়া কংগ্রেসে ভাঙন সৃষ্টি করিল 'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হইবার পর। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গয়া কংগ্রেসে মতবিরোধ তীব্রতম হইয়া ওঠায় সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আন্দোলনে পুরাতন পন্থা ত্যাগ করিয়া নবীন পন্থা গ্রহণের জন্য 'স্বরাজ্য দল' গঠন করিলেন। 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহৃত হইবার পর হইতে 'স্বরাজ্য দল' গঠন পর্যন্ত আমাদের স্বদেশী আন্দোলনে এই বিরোধ-বিসম্বাদের পটভূমিটি জানা না থাকিলে অমৃতলালের 'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধের মূল্য ও তাৎপর্য সঠিক উপলব্ধি করা যাইবে না।

'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধের সূত্রপাতে অমৃতলাল স্বরাজের অর্থ লইয়া নেতৃ-বৃন্দের কিরূপ মতভেদ ছিল তাহার আভাস দিয়াছেন—

"যখন কলিকাতায় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে পূজ্যপুরুষ স্বর্গীয় দাদাভাই

২৬ ক 'বিসর্জন': মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০

নাওরাজী মহাশয় শেষবারের জন্য সভাপতির আসনে অধিরূঢ় হইয়া 'স্বরাজ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, তখন হইতেই ঐ শব্দটি ভারতবাসীর রসনায় আশ্রয়লাভ করিয়াছে এবং বিবিধ মস্তিষ্ক কর্তৃক স্বরাজের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ অনুভূত হইয়া জনসমাজে উহা ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে। কেহ বলেন, স্বরাজ অর্থে সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর সংস্রববিরহিত ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতা; কেহ বলেন, ইংরাজের সহিত সমান অধিকার লাভ করিয়া উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া ভারতের শাসনকার্য পর্যালোচনা; কেহ বা বলেন, বিরাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া ঔপনিবেশিক প্রথা অনুসারে স্বদেশবাসীর দ্বারা ভারতের শাসনযন্ত্র গঠন।"

দাদাভাই নাওরোজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'স্বরাজ' কথাটি উচ্চারণ করেন দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন অত্যন্ত উত্তপ্ত। অল্প কিছুকাল পূর্বে ভারতসচিব কার্জনের বঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন (২০ জুলাই ১৯০৫) এবং ১৬ই অক্টোবর বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সরকারীভাবে কার্যকর হইয়াছে।[২৭] ভারতসচিবের বঙ্গচ্ছেদ অনুমোদনের পরই 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ১লা আগস্ট 'বয়কট' বা বিলাতি বস্ত্রবর্জনের প্রস্তাব করিলেন এবং ৭ই আগস্ট টাউনহলের জনসভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়া দেশময় বয়কট আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হইল।[২৮] রাষ্ট্রনেতারা যখন আলোচনায় ও বক্তৃতায় এই বয়কট আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন সাহিত্যসেবীরা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'য় ('বঙ্গদর্শন', পৌষ ১৩১২) লিখিলেন, 'মোটা বসন অঙ্গে নেব, মোটা ভূষণ আভরণ করব।' রজনীকান্ত সেন লিখিলেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটির শেষে লিখিলেন, 'আমি পরের ঘরে কিনবো না আর, মা, তোর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি'। অমৃতলালও এই বয়কট ও স্বদেশী-আন্দোলন উপলক্ষে শুধু যে 'সাবাস বাঙ্গালী' লিখিলেন তাহাই নহে, 'ওরা জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান' গানটিও রচনা করিলেন—

২৭ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গচ্ছেদ-রদ ঘোষণা করেন।

২৮ অমৃতলাল এই বয়কটনীতিতে আন্তরিক বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার 'সাবাস বাঙ্গালী' নাটিকায় বিলাতি-বর্জনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে।

'ওরা জোর ক'রে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান।
আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ॥
আমরা জাত বাঙ্গালী প্রেম কাঙ্গালী—
ভাবচিস তোরা মন ভাঙ্গালি,
তা নয়, জ্বালিয়ে আগুন ক'রে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান।
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে,
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে,
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি, চাইনে তোদের লবণ-দান॥···
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক;
নাই বা দেখাই সাজের জাঁক,
তোদের ওই চকচকান মধুর চাকে করবো না আর বিষপান।
তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
ফেলবো ভেঙ্গে মেরে তুড়ি,
ক'রে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী শাঁখার আবার রাখবে মান॥
তোদের শাপে হ'ল আশীর্ব্বাদ
দৃঢ় হ'ল মনের বাঁধ,
এই বিসংবাদে বঙ্গভেদে, আমরা হলুম আবার তেজীয়ান।
পেয়ে মর্মে আঘাত, কর্মে হাত বাকি্য ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান॥'

শুধু সাহিত্যের মধ্য দিয়াই নহে, জনসভায় বক্তৃতা করিয়াও রাজশাসনের সেই প্রখর মধ্যাহ্নে তিনি ইংরেজের অপশাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আলোমবাজারে এইরূপ এক জনসভায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন সুসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি 'অমৃতাস্বাদ' নামক স্মৃতিকথায় সেকথা লিখিয়াছেন।[২১]

ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে স্বদেশীর সমর্থন করিলেও বিলাতী-বর্জনে আন্তরিক অনুমোদন জানাইতে পারেন নাই। ফলে 'বয়কট' সম্পর্কে কোন প্রস্তাবই গৃহীত হইল না। তবে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও লালা লাজপৎ রায় বিলাতী-বর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইয়া বঙ্গদেশের স্বদেশী-আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানান।

২১ মাসিক বসুমতী: ভাদ্র ১৩৩৬

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয় বরিশালে। অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন এই সম্মেলনের আহ্বায়ক। প্রকাশ্যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা ইতিপূর্বেই বে-আইনি ঘোষিত হইয়াছিল।[৩০] সুতরাং প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনাকালে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিত হয় নাই। কিন্তু কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ 'বন্দে মাতরম্' ব্যাজ ধারণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভাযাত্রা করিলে পুলিশ আসিয়া আক্রমণ করে। সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন এবং তাঁহার দুইশত টাকা জরিমানা হয়।

বরিশালের এই ঘটনায় সমগ্র বঙ্গদেশ নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কেহ কেহ উপলব্ধি করিলেন যে আবেদন-নিবেদনে দেশের মুক্তি আসিবে না। তাঁহারা রুদ্র পথের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।[৩১] ইহার পরই আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য মহারাষ্ট্রের অনুসরণে বঙ্গদেশেও 'শিবাজী-উৎসব' প্রবর্তিত হইল।[৩২]

এই সময়ে 'যুগান্তর' (মার্চ ১৯০৬) ও 'বন্দে মাতরম্' (আগস্ট ১৯০৬) পত্রিকা স্বদেশী-আন্দোলনকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। ইতিপূর্বে বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা জনচিত্তে যথেষ্ট উদ্দীপনা সঞ্চারিত কবিতেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের স্বদেশী-আন্দোলন ও বাঙালীর রাজনীতিক ভাবধারা ভারতের সর্বত্র পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ইংরেজী সাপ্তাহিক 'বন্দে মাতরম্'-এর পরিকল্পনা করিলেন চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার 'New India' নামক সাপ্তাহিকে 'India for Indians'—এই আদর্শ প্রচার করিতেন। 'বন্দে মাতরম্' এই কথাটিই তাঁহাদের মন্ত্র হিসাবে গৃহীত হয়। এই পত্রিকাতেই অরবিন্দ আরও স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজের সম্পর্কবিমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা—'absolute autonomy free from British control'-এর বাণী শুনাইলেন। রাজশক্তি এই পত্রিকাটির উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দেশের নরমপন্থী নেতারাও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন।

৩০ 'সাবাস বাঙ্গালী' নাটিকায় অমৃতলাল ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। জমিদার শ্রীচরণরঞ্জনবাবু বলিতেছে—'ও বাবারা সবাই, আমি তোমাদের হাতে ধোরে মিনতি করছি, 'বন্দে মাতরম্' বলো না, আমার সব যাবে।'

৩১ 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ৯৭

৩২ ইহার কিছুকাল পূর্বে (ভাদ্র, ১৩১১) রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজি-উৎসব' কবিতাটি রচিত হয়। বালগঙ্গাধর তিলক ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎসবের প্রবর্তন করেন মহারাষ্ট্রে।

তাঁহাদের সহিত নবীনদের মতভেদ স্পষ্ট আকার ধারণ করিল। এই মতভেদ সুতীব্র হইয়া উঠিল কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের (১৯০৬) সভাপতি-নির্বাচনে। নবীনরা লোকমান্য তিলককে সভাপতিরূপে চাহিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত পুরাতনদের ইচ্ছানুযায়ী দাদাভাই নাওরোজীকে সভাপতি করা হয়। তিনি তাঁহার অভিভাষণে 'স্বরাজ' কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, আমাদের কাম্য ও লক্ষ্য হইতেছে 'স্বরাজ'। অতঃপর দেশের রাষ্ট্রনেতারা 'স্বরাজ' শব্দের নানা অর্থ করিয়া স্বরাজ-সাধনায় রত হইলেন। কিন্তু দীর্ঘ ষোল বৎসরের সাধনা ও আন্দোলনের পরেও 'স্বরাজ-সাধনা'র একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও পরিকল্পনা দেশবাসীর লক্ষ্যগোচর হইল না দেখিয়া, অমৃতলাল তাঁহার 'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধে আত্মসমীক্ষা ও আত্মসমালোচনার সহিত স্বরাজের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি রচিত হইবার অল্প কিছুকাল পূর্ব হইতে স্বরাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য লইয়া নানাপ্রকার মতবাদ জনসাধারণের চিত্তে কিছুটা বিভ্রম সৃষ্টি করিতেছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেসে সভাপতি বিজয় রাঘবাচার্য বলিয়াছিলেন, অসহযোগের উদ্দেশ্যই হইল 'স্বরাজ' লাভ। এই মত সমর্থন করিয়া গান্ধীজী বলিলেন— 'The object of the Congress is the attainment of Swaraj by the people of India by all legitimate and peaceful means'। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আহমেদাবাদ কংগ্রেসের সময় সভাপতি চিত্তরঞ্জন ও অন্য অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা কারারুদ্ধ ছিলেন। এই সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জ যে বাণী প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি (মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কারপ্রসঙ্গে) 'স্বরাজ' শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ করেন,'…to-day you have the beginnings of Swaraj within my empire…'। কিন্তু সম্রাটের এই উক্তিতেও জনচিত্ত আশ্বস্ত হইল না। কারণ তখনও জনচিত্ত হইতে রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই। গান্ধীজী তখন স্বরাজলাভের নানা উপায় চিন্তা করিতেছিলেন ও জনসাধারণকে তাহা বুঝাইতেছিলেন। দেশের তৎকালীন অবস্থা নিম্নরূপ—

"The atmosphere was tense. 'Swaraj inside a year' was the thought uppermost in every man's mind. Gandhi had promised Swaraj inside a year if his programme was adhered to and carried out. The year was about to

close and everybody was looking up to the political firmament to see some miracle bringing Swaraj down to his feet."[৩৩]

মৌলানা হসরৎ মোহানী (যিনি সেবার মুসলীম লীগ অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন) কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে কংগ্রেসের 'ক্রীড্' বা মূলনীতি অর্থাৎ 'স্বরাজ' কথাটি পরিবর্তিত করিয়া সর্ববিধ বিদেশী কর্তৃত্বমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা—'complete independence free from all foreign control'—এই নীতি গ্রহণের প্রস্তাব দেন।[৩৪] কিন্তু গান্ধীজীর অসম্মতিতে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ গান্ধীজী ধৃত হইলেন। এই সময় দেশবন্ধু প্রমুখ চরমপন্থীরা কাউন্সিল-বয়কটের পরিবর্তে কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া আন্দোলন পরিচালনার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। ৭, ৮ ও ৯ই জুন কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কাউন্সিল-প্রবেশ লইয়া প্রবল মতবিরোধ দেখা দিল। কাউন্সিল-প্রবেশের অনুকূলে মত দিলেন মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল প্রভৃতি। বিরোধিতা করিলেন রাজাগোপাল আচারী, কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার প্রভৃতি। মীমাংসার জন্য ২০-২৪শে নভেম্বর পুনরায় কলিকাতায় অধিবেশন হইল। এইবার কাউন্সিল-প্রবেশ লইয়া মতভেদ তীব্রতর হইয়া ওঠে। ফলে কমিটির সকল সিদ্ধান্তই পরবর্তী গয়া কংগ্রেস পর্যন্ত স্থগিত থাকে।[৩৫]

নভেম্বর মাসে কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের বিবাদপূর্ণ অধিবেশন চলিতেছে, তখনই অমৃতলালেব 'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় (অগ্রহায়ণ ১৩২৯)। মতবিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে আমাদের স্বরাজ-সাধনা কোন্ পথে চলিতেছে, প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া 'তটস্থ' পর্যবেক্ষকের ন্যায় অমৃতলাল তাহারই সমীক্ষা করিয়াছেন। স্বদেশের কল্যাণচিন্তা অহরহ

৩৩ 'The History of the Congress' by B. Pattabhi Sitaramayya, p. 223

৩৪ 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'—যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ ৩১৭। এই কথাই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন।

৩৫ ডিসেম্বর মাসে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে গয়া কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এইবার বিরোধ চূড়ান্ত আকার ধারণ করিল। ফলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে চিত্তরঞ্জন 'স্বরাজ্য দল' গঠন করিয়া মতিলাল নেহরুর সহিত নেতৃত্বভার লইলেন। এই বৎসরই নির্বাচনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট পরাজিত হন।

করিতেন বলিয়াই রাজনীতির বহ্বারম্ভ তিনি পছন্দ করিতেন না ও প্রহসনে-প্রবন্ধে নানাস্থলে তাঁহার স্পষ্ট স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। দেহে-মনে আমরা যে তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার উপযুক্ত হইয়াছি একথা মনে করিবার মত ভাবসর্বস্ব আত্মপ্রসাদ তাঁহার ছিল না। আবার ইংরেজের অপশাসন ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতেও তাঁহার কোন কুণ্ঠা ছিল না। বাইশ বৎসর বয়সে রচিত প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণে' (১৮৭৫) সমসাময়িক ঘটনা ও তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ইংরেজের বিচার-ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে 'নবজীবন' (স্টার: ১.১.১৯০২) নাটিকায় দেশমাতৃকার আন্তরিক বন্দনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধেও দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্রবে না থাকিয়াও সমকালীন ঘটনাবলীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তিনি কিরূপ একাগ্র আন্তরিকতায় উপলব্ধি করিতেন। অমৃতলাল যে আমাদের স্বরাজ-সাধনা সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হইয়াছিলেন তাহার কারণ তখনও নেতৃবৃন্দ এ সম্পর্কে জনসাধারণকে সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিতে পারেন নাই। এই ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দেই বিপিনচন্দ্র পাল 'স্বরাজ' সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেছেন ও তাঁহার বক্তব্য, 'Swaraj, the goal and the way' অথবা 'Swaraj, what is it ? And how to attain it ?' প্রভৃতি পুস্তিকায় প্রকাশিত হইতেছে। এই সময়েই নগেন্দ্রকুমার গুহরায় বাংলাদেশের স্বরাজ-সাধকদিগের জীবনী রচনা করিয়া ও তাঁহাদের অভিমত লইয়া দেখিয়াছেন যে, স্বরাজ সম্পর্কে, গান্ধীজীর অসহযোগ সম্পর্কে কিংবা তাঁহার অহিংসনীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে সকলে একমত নহেন।[৩৬]

আমাদের স্বরাজ-সাধনা সম্পর্কে অমৃতলালের মনে যে সংশয় ছিল তাহাই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন 'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধে। তাঁহার বক্তব্য এই, যে-স্বরাজ লইয়া এত আন্দোলন চলিতেছে উহা মূলে হুবহু বিলাতির অনুকরণ। আমাদের দেহে-মনে-চরিত্রে শক্তি-সংযম-দৃঢ়তার যে ভয়াবহ অভাব আছে তাহাতে স্বরাজলাভের ও তাহা রক্ষা করিবার উপযুক্ততা আমাদের কতখানি সে সম্পর্কেও লেখকের গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। 'স্বরাজ' কথাটির অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধ না হইলে বাহ্যিক 'স্বরাজ' লাভ করিলেও

৩৬ 'স্বরাজ-সাধনায় বাঙ্গালী' (১৯২২)—নগেন্দ্রকুমার গুহরায়

আমরা যে 'বন্ধনীর বেদনার অনুভূতি' হইতে মুক্ত হইব না, ইহাই তাঁহার অভিমত। তিনি লিখিয়াছেন—

'এখন দেখা যাউক, বাস্তবিকই রাজকার্যের সমস্ত অধিকার স্বদেশীয়ের হস্তে আসিলেই কি মানবের স্বরাজলাভ হয়? কাল যদি আমাদের মায়া কাটাইয়া এবং পরোপকার-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া ইংরাজ এদেশ হইতে চলিয়া যান, আর আমরা ভারতবাসী স্বদেশীয়গণকে লইয়া নিজের পার্লামেণ্ট রচনা করি; কাল যদি নিযুক্ত হয় পার্শী প্রাইমিনিষ্টার, গুজরাটী গভর্ণর, পঞ্জাবী কমাণ্ডার, ফরাক্কাবাদী ফরেন মিনিষ্টার, আলাহাবাদী লর্ড চ্যান্সেলর, কানপুরী কণ্ট্রোলার, মাদ্রাজী ট্রেজারী লাট, পাটনেয়ে এটর্ণী জেনারেল, বাঙ্গালী গোলন্দাজ আর আসামী এড্‌মিরাল, তাহা হইলেই কি আমরা সুখ-শান্তির চরম সীমায় উপনীত হইব,—বন্ধনীর বেদনার অনুভূতি হইতে মুক্তি পাইব?'

দীর্ঘকাল পূর্বে আমরা মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বায়ত্তশাসন লাভ করি। এই 'স্বায়ত্তশাসনরূপ আকাশের চাঁদ' হাতে পাইয়া আমরা কিরূপ স্বাধীন হইয়াছি, তাহারও ব্যঙ্গোজ্জ্বলরূপ অমৃতলাল আঁকিয়াছেন। নির্বাচন যে একপ্রকার প্রহসন তাহাও তিনি সঠিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন—

'প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর হইল মিউনিসিপ্যালিটীতে এই নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে, সে অবধি তিন বৎসর অন্তর আমরা একদিন স্বাধীন সিটিজন হইতেছি, মাথা হইতে ভোটের মোট নামাইয়া গা ঝাড়া দিতেছি। ভাগ্যক্রমে আমি একজন ভোটার, তাই সেই ইলেকসনের দিন কি ইলেসন্!'

এই দিন ভোটার-বন্দনা করিবার জন্য 'দন্তাবতার জমিদারপুত্র', 'কুসীদজীবী ধনকুবের', 'মক্কেল নাকাল করা বড় বড় উকীল', 'সদ্য ধোপদেওয়া সাদা প্রাণ রায় বাহাদুর' প্রভৃতির ব্যগ্রতার উগ্র দৃষ্টান্তও তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দিয়াছেন।[৩৭] এই 'অর্চনা-উপাসনা'র যে পরিণাম তিনি চিত্রিত করিয়াছেন তাহা আজিকার দিনেও পূর্ণমাত্রায় সত্য—

'এই যে এত অর্চনা-উপাসনা, খাটাখাটি, হাঁটাহাঁটি, এ কেবল আমাদের

৩৭ এই অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষরূপ তিনি দিয়াছিলেন 'বন্দে মাতরম্' প্রহসনে (ষ্টার: ১০. ১১. ১৯২৩)।

উপকারের জন্য; তাঁদের কোনই লাভ নাই; ইংরাজের সহবাসে থেকে থেকে তাঁদের ন্যায় এঁরাও পরোপকার মন্ত্রে পূর্ণমাত্রায় দীক্ষিত হয়েছেন; এই যে আজ ষোড়শোপচারে ভোটারপূজা কল্লেন, এর শোধ নেবেন তিন বছর ধরে আগা-পান্তলা উপকার ক'রে।'

ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষা ও রীতিনীতির প্রভাব আমাদের মনে এরূপ গভীর-ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে স্বরাজ লাভ করিলেও আমরা সর্ববিষয়ে ইংরেজেরই নকল করিব। এ সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে আজ তাহা ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া বোধ হয়—

'আজ যদি ভারতবাসীদিগের হস্তে রাজ্যচালনার সম্পূর্ণ অধিকার আসিয়া পড়ে, তবে পার্লামেণ্ট কাউন্সিল কমিটি ভোট গভর্ণর মিনিষ্টার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার পুলিস জজ প্রভৃতির যে সকল পাশ্চাত্ত্য পুত্তলি আমাদের মস্তিষ্কে ক্ষোদিত হইয়া রহিয়াছে, সেইগুলিরই মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া ও অঙ্গে চাপকান আচকান বা পাঞ্জাবী পিরাণ পরাইয়া যথাযথ স্থানে বসাইয়া দিব...।'

যথোপযুক্ত আত্মসংযমের শিক্ষা আমাদের হয় নাই বলিয়া ক্ষমতা হস্তে আসিলে আমরা যে অসংযত হইয়া পড়িব এ আশঙ্কাও লেখকের ছিল—

'ক্ষমতার বোতল যে আসবে পরিপূর্ণ থাকে, সে সুরা হুইস্কি হইতে উগ্রতর। যেমন সুরাপান করিলেই পা টলিবে, মাতাল হইতে হইবেই, তদ্রূপ হস্তে ক্ষমতা আসিলেই এ পঞ্চেন্দ্রিয়শাসনাধীন মন নিশ্চয়ই মাতাল হইবে—আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিবে।'

আত্মসংযমের দ্বারাই আত্মশক্তির উদ্বোধন হয় এ কথা বুঝাইতে গিয়া তিনি আমাদের তৎকালীন বাক্‌সর্বস্ব দেশহিতৈষণার ও ইংরেজ-ভীত এক বাগ্মীবীরের চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইয়াছেন যে অনুরূপ অবস্থায় নবদ্বীপের বীর গৌরাঙ্গ কেমনভাবে অকুতোভয়ে কাজীর নিষেধ উপেক্ষা করিয়া কীর্তনের বন্যায় নবদ্বীপ ভাসাইয়া দিলেন। লেখকের মতে 'সংযম ভিন্ন শক্তিসঞ্চয় হয় না' এবং 'মহাত্মা গান্ধীর Non-violent Non-co-operation-এর (অহিংস অসহ-যোগ) অর্থ ও উদ্দেশ্য বোধ হয় এই শক্তি সঞ্চয় করা।' রামায়ণ-মহাভারতে এই সংযমেরই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। রামচন্দ্রের জীবনব্যাপী আচরণে সংযমেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় নিহিত আছে। এবং—

'ভগবদ্ভক্তিতে চরিত্রের চারুতায় ইন্দ্রিয়সংযমে ধর্মবুদ্ধিতে কষ্টসহিষ্ণুতায়

প্রমে কর্মকুশলতায় আদর্শ মানবরূপে গঠিত করিবার জন্য কবি পঞ্চপাণ্ডবের ভূমিষ্ঠ হইবার স্থান নির্দিষ্ট করিলেন মহাবন।'

মহাত্মা গান্ধীর আচরিত ও প্রচারিত আদর্শ যে যথার্থভাবে আমরা গ্রহণ করি নাই তাহাও লেখক লক্ষ্য করিয়াছিলেন—

'মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, সকলে চরকা কাট আর খদ্দর পর, অর্থাৎ সহজ গ্রাম্যভাবে আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহ কর। অনেক ধনগর্বী যেমন সোনার রুদ্রাক্ষমালা গলদেশে বিলম্বিত করেন, সেইরূপ কি তিনি বলিয়াছেন যে, তোমরা কুশান চেয়ারে বসিয়া মার্বেলের টিপয়ের উপর মেহগিনির চরকা ঘুরাইয়া দীর্ঘসূত্রতার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কর? আর খদ্দব পরিয়া বিলিয়ার্ড খেল, কি মোটরে পার্কে বেড়াইতে বাহির হও?'

দুঃখের বিষয় অমৃতলাল এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করেন নাই। সেইজন্য তাঁহার চিন্তা ও বক্তব্যেব সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয় নাই। 'মাসিক বসুমতী'তে মোট পাঁচটি কিস্তি প্রকাশিত হয়।[৩৮] শেষ কিস্তিতে তিনি যে কথাগুলি লিখিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার বক্তব্য আবও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

'স্বরাজ কি একটা জমিদারী যে, পাট্টা কবুলতী লিখাইয়া রেজেষ্টারী করিয়া লইবে, না লাঠির আগায় বিবাদী চর দখল করিয়া তাহাতে বাঁশগাড়ি করিবে? ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন স্বাধীন হইবে তখন দেশও আপনা আপনি স্বাধীন হইয়া যাইবে।'

অমৃতলাল আরও লিখিয়াছেন যে, আমাদের আর্যরক্তের সহিত যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মিশ্রিত, তাহাব নাম 'মুক্তি'। ত্যাগের দ্বারাই এই মুক্তি লভ্য। ইংরেজের রাজনীতি 'স্বার্থ অর্থ ভোগ বিলাসে'র সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু—

'এই রাজনীতি— এ দেশের নয়। ইংরাজই হউন, মুসলমানই হউন, হিন্দুই হউন— মহাভারতের রাজত্বে যিনি এই নীতিকে চালাইবার চেষ্টা করিবেন, তিনিই বিফল-যত্ন হইবেন।'

'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধে ইহাই অমৃতলালের শেষ কথা। মোহিতলাল মজুমদার এই প্রবন্ধটিকে 'অতি উপাদেয় প্রবন্ধ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে

৩৮ ১৩২৯ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও ফাল্গুন এবং ১৩৩০ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধগুলির সহিত এই প্রবন্ধের সুনিবিড় ভাবসাদৃশ্য আছে। ইহারা সকলেই 'যেমন জাতীয়তাবাদ, তেমনই ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির খাঁটি রূপ—এই দুইয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়াছিলেন।'[৩৯]

৬

কতকগুলি প্রবন্ধে আমাদের দেশে ইংরেজ জাতির ক্রিয়াকলাপ ও তাহার ফলাফল এবং ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে আমাদের নিন্দনীয় পরিবর্তনসমূহের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনার অনেক স্থলেই আমাদের ও ইংরেজের চরিত্রের নিপুণ বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়।

ইংরেজরা আমাদের দেশে আসিয়া উপকারের নামে কিরূপ অপকার করিয়াছে এবং আমরাও তাহাদের নিকট শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিবার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া কিভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছি, তাহাই 'আত্মসমর্পণ' নামক রচনায় কিছুটা বর্ণনায় ও কিছুটা সংলাপে ব্যক্ত হইয়াছে। ইংরেজ-প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষায় আমরা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি 'আমি'কে হারাইয়া—

> 'হারিয়েছি সেই আমি,—যে আমি আমাকে একটা মানুষ বলে চিনিয়ে দেয়, যে আমি আমার একটা শক্তি আছে বলে জাগিয়ে দেয়, যে আমি আমার আপনার জনকে ভালবাসতে, আপনার জনের ভাল করতে, আপনার জনের সঙ্গে এক পাতে ভাত মেখে ভাগ ক'রে খেতে প্রবৃত্তি দেয়।'[৪০]

এই প্রবন্ধে আমাদের 'পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী' সাহেবের সহিত নারদের রূপের এবং বুদ্ধির সাদৃশ্যও শ্লেষাঢ্য রসিকতায় বর্ণিত।

'চোখ গেল'[৪১] প্রবন্ধটি সমসাময়িক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় রচিত। বাঙালী বাড়ীওয়ালারা অধিক ভাড়া লইতেছে এই অজুহাত সৃষ্টি করিয়া সাহেবরা 'রেণ্ট্ এ্যাক্ট' প্রবর্তনের প্রস্তাব করায় অমৃতলাল ইংরেজের মতিগতি ও অভিসন্ধি

৩৯ বঙ্গদর্শন : ফাল্গুন ১৩৫৪

৪০ মাসিক বসুমতী : আশ্বিন ১৩২৯

৪১ ঐ : মাঘ ১৩৩০

ব্যক্ত করিয়া এই প্রবন্ধে তাঁহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। অনেক বাঙালীও এই ব্যাপারে সাহেবদের মত সমর্থন করায় লেখক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

ইংরেজ-চরিত্র বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে লেখক 'পেট্রিয়টিজম্' ও 'ন্যাশানালিটি' শব্দ দুইটির অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পেট্রিয়টিজম্ শব্দটি জোড়কলম। বাংলার পেট ও ইংরাজীর 'রাইয়ট' (riot) যুক্ত হইয়াই পেট্রিয়ট্ কথার উৎপত্তি। পেটে রায়ট হইলেই লোক পেট্রিয়ট্ হয়। ক্ষুধার তাড়নায় ইংরেজও পেট্রিয়ট্ হইয়াছে। ন্যাশান্যালিটির অর্থ 'নেশা নোলাটির'। ইংরেজও নোলার নেশায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পৃথিবী পর্যটন করিয়া ক্ষুধার খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে।

দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা ও ইংরেজ-চরিত্র অনুশীলনের পর অমৃতলালের মনে হইয়াছে 'বিলাতী বীজমন্ত্র' হইল এই—

'দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল ভালবাসা.* রাজতন্ত্রে, জাতিতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, অনেক সময়ে গার্হস্থ্যতন্ত্রেও এইটি বিলাতী বীজমন্ত্র।'

সর্বক্ষেত্রে ইংরেজের এইরূপ চক্ষুলজ্জাহীনতাকেই কটাক্ষ করিয়া অমৃতলাল প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন 'চোখ গেল'।

আর একটি ব্যাজস্তুতিপূর্ণ রচনা 'হেল্ অর্ডিন্যান্স'। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ অক্টোবর—বড়লাট লর্ড রেডিং সহসা এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া বহু লোককে গ্রেপ্তার করায় 'হেল্ অর্ডিন্যান্স' রচিত। অর্ডিন্যান্সের কারণটি এই—১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন যে, দেশে বিপ্লবপন্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সরকার দেশের লোককে স্বায়ত্তশাসন না দিলে ইহার অবসান হইবেনা। ২৫এ অক্টোবর পুলিশ কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান একজিকিউটিভ অফিসার ও স্বরাজ্য দলের বিশিষ্ট কর্মী সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। ঐ দিনই লর্ড রেডিং একটি নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করেন। উহার ১৮ ধারা অনুযায়ী আরও বহুলোক গ্রেপ্তার হন। এই অর্ডিন্যান্সে বিনা ওয়ারেণ্টে যে কোন ব্যক্তিকে (সন্দেহ হইলেই) গ্রেপ্তারের অধিকার পুলিশকে দেওয়া হইয়াছিল।

বৃদ্ধ অমৃতলাল তীব্র ব্যাজস্তুতিতে এই অর্ডিন্যান্সকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে তাঁহার বাইশ বৎসর বয়সে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'

* গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী'তে আছে—'দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেমপিপাসা।'

অভিনয়ের সময়ে লর্ড লিটনের অর্ডিন্যান্স ও পুলিসী অত্যাচারের স্মৃতিও তাঁহার এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়াছে। অর্ডিন্যান্সকে সম্বোধন করিয়া তিনি তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এইভাবে—

'তুমি এতকাল পরে এলে, আর সবাই কিনা দোকানপাট, কাজকর্ম, পড়াশুনা সব বন্ধ করে ঘরে দোর দিয়ে চুপ করে বসে রইল, সহরটা যেন একেবারে সমস্ত দিন মরে গিয়েছিল! আহা! আজ যদি আমার সেই ২২ বছর বয়স থাকৃত, তা হলে তোমায় যে আমি কত ভালবাসি, ভক্তিশ্রদ্ধা করি, তা একবার দেখিয়ে দিতুম। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যেদিন কোম্পানীর হাত থেকে ভিক্টোরিয়া মা ভারতের রাজদণ্ড নিজের হাতে নেন, আমায় জীবনে প্রথম সেইদিন কলকেতা আলো হতে দেখেছিলাম; আর আজ সেই কুইনের পৌত্রের রাজত্বের সময় তোমার মতন বন্ধুকে পেয়ে আমরা যে কত খুসী হয়েছি, আমার্দের জ্ঞানচক্ষু তোমার পুলিশ-পালিশ মূর্তির স্ফূর্তি দেখে কতটা যে বিস্ফারিত হয়েছে, পৃথিবী শুদ্ধ লোককে তা জানাবার জন্যে আজ এই কলকেতা সহর আলোয় আলোয় কুরখুট্টি ক'রে দিতুম; তেলের পয়সা যার না জুটতো সে আপনার বুক জ্বালিয়ে তোমার মুখ আলো করতো!!!'[৪২]

'ফলার ফিলজফি'[৪৩] প্রবন্ধে ইংরেজদের বার্ষিক 'সেন্ট্‌ এণ্ডরুভোজে'র উদ্দেশ্য এবং এই ভোজে 'ভোজের সঙ্গে স্কচ হুইস্কির ডোজ' গ্রহণ করিবার জন্য যে কয়জন 'পৈতার্ধারী বাঙালী কায়েতের' নিমন্ত্রণ হয়, তাহাদের মনোবৃত্তি শ্লেষপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইংরেজের 'ল এণ্ড অর্ডার' আমরা কিরূপ নিষ্ঠাভরে মানিতেছি তাহারও বিদ্রূপাত্মক উদাহরণ এই রচনায় মিলিতেছে।

'আবোল তাবোল' আত্মসমালোচনামূলক রচনা। ইংরেজের প্রভাবে এবং A B C বিদ্যার প্রসাদে আমরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া শহরে বাস করিয়া সভ্য হইয়াছি, বংশগত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া 'বাবু' হইয়াছি, কৃষিকর্ম পরিত্যাগ করিয়া 'Your most obedient servant' বলিয়া এবং হাতে হাতে টাকা পাইয়া 'রজতের ইজ্জত' বুঝিতে শিখিয়াছি! কিন্তু ক্রমেই যখন অন্নসংস্থান করা আমাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিতে লাগিল, আমরাও ইংরেজের উপর বিশ্বাস

৪২ মাসিক বসুমতী : পৌষ ১৩৩১
৪৩ ঐ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

হারাইতে লাগিলাম। অথচ বৈষ্ণব আমরা, মজ্জাগত কৃষ্ণপ্রেম লইয়াই 'সাহেব-কৃষ্ণের' সহিত একদিন প্রেমলীলায় মাতিয়াছিলাম।* কিন্তু আমাদের আশা-ভঙ্গের বেদনা ও অবরুদ্ধ অভিমান আমাদের শেষে বলিতে বাধ্য করিয়াছে—

"তুমি 'সাহেব-কৃষ্ণ', কেন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাও, কুব্জাকে রাণী করে বামে বসাও? আগে আমাদের কুল মজালে, লাজ মজালে, ঘুচিয়ে দিলে আমাদের উলুর চালা, ধানের গোলা, ভেঙ্গে দিলে তাঁতের হাত, ভুলিয়ে দিলে হাতুড়ীর আঘাত! মাস মাইনের চাকুরীর প্রেমে পড়ে আমরা কলঙ্কিনী হলুম। ব্রজের গোপীরা নানা বেশে কৃষ্ণসেবা করেছেন, নবনারী-কুঞ্জর সেজে মদনমোহনকে বহন করেছেন, তিনি বস্ত্রহরণ করেছেন, তাতেও তাঁরা কথা কননি, শুধু একটু লজ্জায় মাথা হেঁট করেছিলেন, আর কিছু নয়। তুমি বংশীবদন আমাদের বস্ত্রহরণ করেছ, আমরা চুপটি করে থেকেছি, ডেপুটি সেজে তোমাদের কালেক্টরকে ঘাড়ে করে বয়েছি, সবজজ সেজে কত বিদ্যাদিগ্‌গজ জজসাহেবের পদরজে মোহনবেণী লুটিয়েছি, কেরাণীরূপে তোমাব কুঞ্জ সাজিয়েছি, শ্রীদাম স্থবল হয়ে তোমার গরুবাছুর তাড়িয়েছি, আর আজ 'সাহেব', চারটে পাশের রাসলীলাতেও নেচে আমরা পাইনে পেটের অন্ন—হইনে লোকের মাঝে গণ্য।"[৪৪]

দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া ইংরেজের উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া-কলাপ এবং আমাদের আন্দোলন ও প্রত্যাশার পরিণতি কি—সে সম্পর্কে গভীর চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধ 'বৃটিশ-বিদায়'।[৪৫] ইংরেজ কেন ভারতবর্ষ ছাড়িবে না, আমাদের দেশে পরস্পর-বিরোধী আন্দোলনের অবসান নাই কেন, বৃটিশ বিদায় লইলেও আমরা কেন স্বাধীন হইব না, এই সকল বিষয়েই অমৃতলাল তাঁহার সুচিন্তিত মতামত দিয়াছেন।

সাইমন কমিশনের উপর কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, আমাদের রাজনৈতিক 'রাই-মন' বার বার মানে বসিয়াছে, আর কত সাইমন বাঁশী বাজাইয়া গিয়াছে। লীলায়ও যেমন অবসান নাই, দেশে আন্দোলনেরও তেমনই অন্ত নাই। একদল ঔপনিবেশিক স্বত্ব চাহিলে, অপর দল চাহেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

---

* 'কালাপানি'র (১৮৯৩) সেই বিদ্রূপাত্মক গানের পংক্তিটি—'সাহেব-কেষ্ট, সাহেব-বিষ্টু, ব্যোম্ ভোলানাথ বিলাতী'—স্মরণীয়।

৪৪ মাসিক বসুমতী : অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

৪৫ দৈনিক বসুমতী : ৪ঠা মাঘ ১৩৩৫

এই সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় অমৃতলাল ঘোরতর সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। সংশয়ের কারণ— ইংরেজের বিজয়পতাকা আমাদের 'মনের জমির উপর' প্রোথিত বলিয়া। সর্বপ্রকারে ইংরেজের নকল করিতে আমরা এতটা অভ্যস্ত হইয়াছি যে তাহারা বিদায় লইলেও 'সম্পূর্ণ স্বাধীন' হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। বৃটিশকে বিদায় দিতে চাই, কিন্তু বৃটিশ-মন বৃটিশ-ভাব যাইবে কোথায়? অমৃতলালের মতে, 'এই যে রাজনীতির ধুম, এও বিলাতী রান্নাঘরের চিম্‌নির ধুম।' তাঁহার সর্বাধিক আক্ষেপের কারণ—

> 'ইংরাজের উদ্যোগ, উৎসাহ, তাহার অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতি গুণগ্রামের এতটুকু মাত্র আদায় করিয়া লইতে পারি নাই; অথচ তাহার অর্থলিপ্সা, আত্মসুখেচ্ছা, ঔদ্ধত্য, স্পর্ধা, বেয়াদবিগুলি পর্যন্ত যাবতীয় উপসর্গ দ্বারা মনকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছি।'

৭

অমৃতলালের সমাজচিন্তামূলক প্রবন্ধগুলি 'মাসিক বসুমতী', 'দৈনিক বসুমতী,' 'বঙ্গবাণী', 'মজলিস', 'সোনার বাংলা', 'বাংলার কথা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। বাঙালীসমাজের অর্থনৈতিক দুর্দশার ভয়াবহতাও প্রসঙ্গক্রমে এই সকল প্রবন্ধে উত্থাপিত হইয়াছে। মুদ্রিত প্রবন্ধের কয়েকটি 'কৌতুক-যৌতুক' (১৩৩৩) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধে অমৃতলাল যে সকল সমস্যা ও চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা হইল, নির্বাচন-দ্বন্দ্বে আত্মকলহের মধ্য দিয়া সর্দার হইবার উচ্চাশা; কেতাবী বিদ্যার অসারতা ও করদক্ষ-বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা; হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বিঘ্ন ও ইংরেজের মুসলমানপ্রীতি ইত্যাদি। সমসাময়িক এই সকল সমস্যায় লেখক যে কতখানি উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন তাহার অকপট প্রকাশ দেখা যায় প্রবন্ধগুলিতে।

'বিদ্যা অমূল্য ধন' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) প্রবন্ধের সূত্রপাতে লেখক 'চারুপাঠে'র একটি বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহার বক্তব্যবিষয় স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'বিদ্যাশিক্ষা করিলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান জন্মে'— 'চারুপাঠে'র এই নীতিবাক্যের তাৎপর্য বর্তমানকালের লব্ধবিদ্যায় একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমরা যেভাবে শিক্ষিত হইয়াছি ও শিক্ষা দিতেছি তাহার হিতকারিতা সম্বন্ধে লেখকের মনে গভীর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আর পাঁচজনের

হিত কাড়িয়া লইয়া আমরা প্রাণপণে শুধু 'উত্তমপুরুষের' হিতসাধন করিতেছি। বিদ্যার্জন করিয়া পদে প্রতাপে সম্ভ্রমে মর্যাদায় ঐশ্বর্যে মাৎসর্যে ভোগে রোগে আমরা প্রতিনিয়ত আপনাকে প্রতিবেশী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতেছি। আবিষ্কৃত কলকারখানা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে কাঙাল-কাঙালিনী করিতেছে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মারণ-উচাটনে প্রবৃত্তি দিতেছে। ক্রমে যখন পুরানো বিদ্যার কল বদলাইয়া 'বিশ্ববিদ্যালয়রূপ রোলার মিল' হইল তখন ইংরেজী শিখিয়া অহং হইল 'সাত হাত লম্বা'। তোতাপাখীর মত বুলি বলায় অভ্যস্ত হইলাম—সমাজে আমাদের নূতন নাম হইল 'বাবু (ব্যাবু)'।

মুখস্থ বিদ্যার প্রসাদে ডিগ্রীধারী 'দেশী মস্তিষ্ক' ব্লটিং কাগজে ছাপা বিচিত্র হরফের মত বিবিধ বিদ্যার আকর হইল। এই বিদ্যাকে লেখক বলিয়াছেন, 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বিদ্যা'—

> 'ডিগ্রীধারী দেশী মস্তিষ্ক উদ্ঘাটন করিয়া তাহার স্মৃতিকক্ষায় যদি কেহ যোগদৃষ্টি নিপতিত করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বিদ্যার কি বিচিত্র সম্ভাবই সেখানে স্তূপীকৃত রহিয়াছে! একটা ঠ্যাংভাঙ্গা সাহিত্যের উপর একটি ঘাড়ভাঙ্গা সায়েন্স, আড়কাটায় টাঙ্গানো খানিকটা ধুলাপড়া লজিক, এক কোণে একখানা অঙ্কের কঙ্কাল, আরও কত কি কত কি— ব্লটিংছাপার উপর সব হরফ কি বুঝা যায়!'[৪৬]

এই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বিদ্যার অসারত্ব ও নিরর্থকতা সকলেই বুঝিতেছেন। জীবনসংগ্রামে নাস্তানাবুদ ও অন্নসংস্থানে অসমর্থ হওয়ায় দেশে কমার্শিয়াল, ভোকেশনাল, টেকনিক্যাল এডুকেশনের কলেজের জন্য ধুয়া উঠিল। কলেজের কমার্শিয়াল ডিগ্রীতেই লেখকের আপত্তি ও সংশয়। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, ক্লাইভ স্ট্রীটের কয়জন ছোটসাহেব কলেজের কমার্শিয়াল ডিগ্রী পাইয়া 'কুবেরকে কবরে পাঠাইয়া যক্ষরাজের রত্নাসন কোন্ গ্রন্থগত বিদ্যার দক্ষতায় স্বীয় আয়ত্তে আনিতেছেন?'

লেখক যে সমস্যার ভয়াবহতায় বিভ্রান্ত হইয়া নীরব ছিলেন এমন নহে। কয়েক মাস পরে প্রকাশিত 'বিশ্বকর্মা পূজা' প্রবন্ধে (আশ্বিন ১৩২৯) তিনি সমাধানেরও পথনির্দেশ করিয়াছেন। শ্রমশীল করদক্ষতাকে অবহেলা করিয়া

৪৬· 'কৌতুক-যৌতুক' পৃ ৯০। মোহিতলাল মজুমদার বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৫৪) প্রবন্ধটি 'পর-বিদ্যা' নামে পুনঃপ্রকাশ করেন।

চেয়ারে বসিয়া নগদ উপার্জনের নেশায় অধিকাংশ বাঙালীই জাতিগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন ; ইহারই ফলে কেতাবী বিদ্যায় পরিপূর্ণ 'কলেজী নলেজ' আমাদের ক্রমশ ব্যবহারিক জগতের পক্ষে অনুপযুক্ত করিয়া বাজারে নিতান্ত মূল্যহীন করিয়া ছাড়িতেছে। অমৃতলাল লিখিয়াছেন যে, 'বিলাতী বাগ্‌বাদিনীর বদান্যতায়' এই যে দুরবস্থা, ইহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বাঙালীকেই সমবেতভাবে বিশ্বকর্মা পূজার আয়োজন করিতে হইবে। লেখক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আমাদের 'গ্রাডুয়েট আণ্ডার গ্রাডুয়েটরা' ভাবেন টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন লইয়া কলেজলব্ধ বিদ্যার সাহায্যে তাঁহারা কারিগর খাটাইবেন, 'সুপারভাইজিং ওয়ার্ক' করিবেন— কিন্তু ইহা তাঁহাদের পণ্ডশ্রমই হইবে। এই সংকট হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে—

'খাট্‌তে হবে— খাট্‌তে হবে— খাট্‌তে হবে ; আগে খাট্‌তে শেখ, খালি পায়ে চলতে শেখ, শ্রমকে সম্মান দাও, তবে টেক্‌নিকাল এডুকেশনের কথা ভেব।'[৪৭]

এই প্রবন্ধটি 'বাঙালীর শিক্ষা ও জীবিকা' নামে পুনরায় প্রকাশ করিয়া মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেন—

'বিষয়টি যেমন গুরুতর, তেমনই তাহার আলোচনা শুধুই চিন্তাপূর্ণ নয়— স্বসমাজের সহিত লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও তাহার প্রতি গভীর মমত্ব-বোধের জন্য ইহাতে একপ্রকার সাহিত্য-রসও যুক্ত হইয়াছে। এ ধরণের রচনা একালে দুর্লভ।'[৪৭ক]

১৩২৯ সালে মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্তিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে ব্যবস্থাপক সভায় ও মিউনিসিপ্যালিটিতে মহিলাদের ভোটাধিকার লইয়া কয়েক জন মহিলা আন্দোলন করিতেছিলেন। ইঁহাদের সমিতির সভানেত্রী ছিলেন কবি কামিনী রায় ও সম্পাদিকা ছিলেন 'সুপ্রভাত' পত্রের কুমুদিনী বসু। মহিলারা কর্পোরেশনের নির্বাচনে ভোট দিবেন ও কমিশনার হইবেন ইহাতে সম্ভবত অমৃতলালের আন্তরিক সমর্থন ছিল না। তাই ২রা ভাদ্র ১৩২৯এর 'মজলিস' পত্রে তাঁহার শ্লেষাশ্রিত কৌতুকরচনা 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' প্রকাশিত হয়।[৪৮]

---

৪৭ 'কৌতুক-যৌতুক' পৃ ১৩২-৩৩

৪৭ক বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩৫৪

৪৮ ১৩২৯ সালের ৭ই ফাল্গুন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংস্কারবিধি আলোচিত হয়। মহিলাদিগকে ভোট দিবার ও কমিশনার হইবার অধিকার-

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও বিভেদের পটভূমিকায় তিনটি প্রবন্ধ রচিত হয়—'গো-গোলযোগ' (ফাল্গুন ১৩২৯) 'হিন্দুর নব নামকরণ' (কার্তিক ১৩৩০) ও 'বিষম সমস্যা' (পৌষ ১৩৩০)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা 'মিউনিসিপ্যাল আইনের ঠোঁটের (Bill-এর)' মধ্যে অমূল্যধন আঢ্য একটি নূতন ধারা প্রবেশ করাইয়া গাভী ও বৎসহত্যা বন্ধ করার চেষ্টা করায় দেশের মুসলমান-সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করিয়া অমৃতলাল শঙ্কিত মনে এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'আঢ্য লোকে মান্য কর' এই উপদেশবাণীটি দীর্ঘকাল পালন করিয়া আসিলেও অমূল্যধন আঢ্যের কার্যে তিনি চিন্তিত হইয়াছেন এবং 'আঢ্য' মহাশয়কে যতটা মান্য করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু 'ডিসকাউণ্ট' কাটিয়া লইতেও ইচ্ছা করিয়াছেন! অমূল্যধন আঢ্যের নিকট তাঁহার প্রশ্ন—'এই হিন্দু-মুসলমানের একতার দিনে মুসলমানের কোন ভাবে আঘাত করা কি হিন্দুর উচিত?' গো-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেও দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা চিন্তা করিয়া অমূল্যধন আঢ্যের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন এই প্রবন্ধে। তাঁহার মতে—

'মুসলমান ভ্রাতাদের বিগড়াইতে গেলে বুদ্ধিমানের কার্য হইবে না··· একতার প্রভাবে ক্রমে তাঁহারা যেরূপ সব আলাদা আলাদা চাহিতেছেন, কোন্ দিন না কর্পোরেশনে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন যে, মুসলমানদের চলিবার জন্য একটা একটা আলাদা ফুটপাত রাস্তায় রাস্তায় প্রস্তুত হউক।'[৪৯]

রিফরমের প্রসাদে আমাদের 'হিন্দু' নাম ঘুচিয়া 'অ-মুসলমান' এই নব নামকরণে অমৃতলালের অন্তরের ক্ষোভ ও যন্ত্রণা প্রকাশ পাইয়াছে 'হিন্দুর নব নামকরণ' প্রবন্ধে। লিখিয়াছেন—

"···গোল বাধ্‌লো রিফরমে স্বরাজের কিস্তিবন্দী হয়ে। সাদা 'সাহেব'রা বললেন, আমরা য়ুরোপীয়ান, ইণ্ডিয়ান নাম কেন নেব? কালো 'সাহেব'রা বললেন, য়ুরোপীয়ান যখন বলবে না তখন ইণ্ডিয়ান্ বটে, কিন্তু তাতে একটা বাঁট না দিলে, আমরা মুঠো করে ধরবো না, সুতরাং তাঁদের বলতে

প্রদান প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হইয়াছিল। শেষে ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মিঃ কটনের ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

৪৯ শেষ পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (২৩ ফাল্গুন ১৩২৯) গাভী ও গোবৎস-বধ বন্ধের ধারা পরিত্যক্ত হইয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল পাশ হয়।

হল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান; মুসলমানরা বললেন যে, আমাদের ধর্ম আগে তারপর ত ইণ্ডিয়া; মহাম্যাডিয়ান আছি এবং মহাম্যাডিয়ান থাকবই। এবার মুস্কিল হল আমাদের নিয়ে,…আসল সাবেক জমিদার আমরাই, আমাদেরই নিরুপায়, আমাদের আর্য দলিল হারিয়ে গেছে, হিন্দু দলিল পোকায় কেটেছে, ইণ্ডিয়ান বলেও নতুন দলিল হবার যো নেই…তবে উপায়?

পাঁজি খুলে 'সাহেব' পুরোহিতরা আমাদের নতুন নাম করবার চেষ্টা করলেন; দেখলেন, আমরা মেষরাশি, আগুক্ষর অ, সুতরাং আমাদের নতুন নামকরণ হল—

অ—মুসলমান!"[৫০]

প্রবন্ধের শেষে লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে—

'জাতিকুল ভাঁড়াইয়া, কুলুজি ইতিহাস পায়ে মাড়াইয়া বি-নামা নামে পরিচয় দিয়া এমন দেশ-উদ্ধার যে কেহ কখন করে নাই তাহা নিশ্চয়।'

'বিষম সমস্যা' প্রবন্ধে অমৃতলাল লিখিয়াছেন, 'রাজনৈতিক ভারতবর্ষের বিষম সমস্যা হিন্দু-মুসলমানে ইউনিটি বা একতা।' এই সমস্যার নানা দিক লইয়া অত্যন্ত স্পষ্টবাদিতার সহিত লেখক আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের আপাত সৌহার্দ্যের অন্তরালে যে অপ্রতিরোধ্য ভাঙন রহিয়াছে তাহা তীক্ষ্ণদর্শী অমৃতলালের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। দীর্ঘকাল পূর্বে এ দেশীয় মুসলমানদিগের যে মনোবৃত্তি তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন আজিকার দিনেও তাহা অতি বাস্তব সত্য—

'ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণের স্বর্গীয় স্বপ্ন এই যে, সমগ্র জগৎ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া মনুষ্যের মধ্যে এক বিরাট ভ্রাতৃভাবের সৃষ্টি করিবে। আজ সি. আর. দাশ মহাশয় কল্‌মা পড়িয়া শের দানিস খাঁ নাম গ্রহণ করুন, দেখিবেন ভারতবর্ষের কোটি কোটি মুসলমান বাহু তাঁহাকে সত্য সত্য ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য সস্নেহে বিস্তারিত হইবে; এখন

৫০ 'কৌতুক-যৌতুক' পৃ ১৪৩-৪৪। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার ভয়াবহতা তৎকালীন অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল। মাসিক বসুমতীতে অমৃতলালের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবার দুই মাস পরে (পৌষ ১৩৩০) ঐ পত্রিকাতেই প্রমথ চৌধুরীর 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

আমরা মুসলমান ভাই-ই বলি, আর মুসলমানরা হিন্দু ভাই-ই বলুন, সবই ইংরাজীর মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড।'[৫১]

এই প্রবন্ধের সহিত প্রমথ চৌধুরীর 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' প্রবন্ধের বক্তব্যের ভাব সাদৃশ্য যথেষ্ট।[৫২]

'অকাল বোধন' প্রবন্ধে নির্বাচন দ্বন্দ্ব, আত্মকলহ, সর্দার হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিকে কটাক্ষ করা হইয়াছে।[৫৩]

৮

বৃদ্ধ বয়সেও অমৃতলালের মন কিরূপ সক্রিয় ছিল তাহার পরিচয় তাঁহার শেষ জীবনের প্রবন্ধাবলী হইতে বিশেষভাবেই মিলিতেছে। যে সমাজ-সচেতনতা তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যের সহিত ওতপ্রোত, তাহারও আশ্চর্য নিদর্শন তিনি রাখিয়া গিয়াছেন মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে লিখিত 'প্রজানীতি' (১৩৩৫) নামক সময়োচিত দীর্ঘ প্রবন্ধে। ১৩৩৫ সালে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানে এই প্রবন্ধটির অস্তিত্ব লুপ্ত এবং অনেকেরই নিকট প্রবন্ধটি অজ্ঞাত।[৫৪]

এই দীর্ঘ প্রবন্ধের মোট ৩২টি কিস্তির সন্ধান মিলিয়াছে। অমৃতলাল এইভাবে সেগুলির শিরোনাম দিয়াছেন :

১ম হইতে ৯ম কিস্তি—'প্রজানীতি'। পরবর্তী কিস্তিগুলির শিরোনাম এইরূপ :

'কবে বাঙ্গালী ভীরু' (১০) 'বাঙ্গালী ভীরু কবে' (১১)
'বাঙ্গালীই মানুষ হয়' (১২) 'বাঙ্গালী পাঠশালে মানুষ' (১৩)
'বাঙ্গালী নারীর ব্যায়াম শিক্ষা' (১৪) 'কৃষকের উপর মানুষ কে ?' (১৫)

৫১ 'কৌতুক-যৌতুক' পৃ ২১১

৫২ মাসিক বসুমতী : পৌষ ১৩৩০

৫৩ সোনার বাংলা : ১৯এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০

৫৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'র (৬৭) অমৃতলালের যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 'পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত' রচনাবলীর মধ্যে এই প্রবন্ধটির উল্লেখ নাই। 'বসুমতী' কার্যালয়েও ১৩৩৫ সালের 'দৈনিক বসুমতী' সংরক্ষিত নাই বলিয়া তাঁহারা বর্তমান লেখককে জানাইয়াছেন।

'কৃষকের কীর্তি' (১৬) 'বিজাতীয় ভাব' (১৭)
'স্বাধীনতা' (১৮) 'নিরধীনতা' (১৯)
'বাঙ্গালীর অপবাদ' (২০) 'ইঙ্গ-বঙ্গ সম্বন্ধ' (২১)
'ইংরাজী ভাবের প্রভুত্ব' (২২) 'বর্তমান অবস্থা' (২৩)
'সুপরামর্শ' (২৪) 'ইংরাজের জাতিগর্ব' (২৫)
'ইংরাজ-ব্রাহ্মণ' (২৬) 'ভালই বলছি সাহেব' (২৭)
'ভালই বলছি সাহেব' (২৮) 'স্বাধীনতা-পল্লীগ্রামে' (২৯)
'যুবক-আবাহন' (৩০) 'পল্লী-কথা' (৩১)
'পল্লী-কথা' (৩২)

এই প্রবন্ধের প্রতিটি ছত্রে তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেম অক্ষুণ্ণ অকৃত্রিমতায় প্রকাশলাভ করিয়াছে। বুদ্ধিবিবেচনাহীন অপরিণামদর্শী বাঙালী জাতির ক্রমবর্ধমান মূঢ়তায় তিনি যে কতটা বেদনার্ত ছিলেন, তাহাও আমরা এই প্রবন্ধ হইতে উপলব্ধি করি। দেশে যখন 'রাজনীতির' প্রবল প্রবাহ বহিতেছে তখন তিনি আমাদের আত্মস্থ হইয়া 'প্রজানীতি' নির্ধারণের নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার ফলে প্রকৃত ও কৃত্রিমের প্রভেদ তিনি সহজেই বুঝিতেন। তাই যাহাতে নকলনবিসি করিয়া আমরা আর নাকাল না হই তাহারই জন্য তিনি আমাদের তৎকালীন অবস্থা ও সংকট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন প্রভূত যুক্তি ও উদাহরণের সহায়তায়। এই প্রবন্ধ রচনাকালে অর্থাৎ ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালেও তিনি কিরূপ অন্তর্দৃষ্টির সহিত গভীরভাবে স্বদেশের কল্যাণচিন্তা করিতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের অতিবাস্তব সমস্যাবলী সম্পর্কে উদাসীন থাকিয়া আমরা যে নির্বোধ আত্মসন্তুষ্টিতে মগ্ন রহিয়াছি, ইহা তাঁহাকে নিতান্ত পীড়িত করিত। একদিকে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের শূন্যগর্ভ বহ্বারম্ভ, অপরদিকে ইংরেজের বিজাতীয় ভাব ও শিক্ষার অনুকরণ আমাদের ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে যে সুদূরপ্রসারী সর্বনাশ সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা তাঁহাকে অতিশয় উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এই দুই ভয়াবহ ক্ষতি হইতে আমরা যাহাতে রক্ষা পাই সেই উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের অবহিত করিতে চাহিয়াছেন এই প্রবন্ধে। তাঁহার উদ্দেশ্য তিনি নিজেই স্পষ্টত ব্যক্ত করিয়াছেন এক স্থলে—

"এই 'প্রজানীতি' প্রবন্ধ আমি লিখতে আরম্ভ করেছি এই মনে করে যে, আমার দেশবাসীকে এই দীন-মনের ভাবটা বুঝিতে দেব যে, ইংরাজের

প্রজানীতি

(১)

[রসরাজ শ্রীযুত অমৃতলাল বসু লিখিত]

কিঞ্চিদধিক ৬০ বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ বঙ্গ কতিপয় প্রধান পুরুষের ব্যবস্থায় ও নবগোপাল মিত্রের পৌরোহিত্যে ন্যাশনাল বা জাতীয়তা নামে রাজনীতি-পূজার যে ঘটস্থাপনা করা হইয়াছিল এবং যে পূজার জন্য দশকের-থাকে-স্থিত আমরা কয়েকটি কিশোর—পুষ্পচয়নে চন্দনঘর্ষণে ধূপ দীপাদি প্রজ্বলন কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেই ঘট-পূজা ক্রমে প্রতিমা হইতে প্রতিমান্তরে পরিণত হইতে হইতে কংগ্রেসের দুর্গোৎসব সমারোহে দেশকে উৎসব-রবে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। আজ কালকার রাজনৈতিক ক্রিয়াকে অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞের সংজ্ঞায় সম্বর্দ্ধিত করিলেও অলঙ্কার-দোষ হয় না।

সকল যুগে সকল দেশেই সমগ্র প্রজাশক্তির যোগ ফল রাজশক্তি নামে রাজত্বের খাতায় জমা পড়িয়া থাকে। এ দেশের শাসন-পালনের কল যে প্রজা-শক্তির বলে চলিতেছে, তাহার পাওয়ার হাউস গ্রেট বৃটেনে। এ দেশে আমরা ঠিক প্রজা বা সাবজেক্ট (subject) নই; প্রজা রাজার জাতি, রাজার জ্ঞাতি, রাজার স্বসমাজভুক্ত আত্মীয়; অপরিচিত, অপ্রত্যক্ষীভূত হইলেও আত্মীয়,—দূর-অতি দূর—তবু আত্মীয়, জ্ঞাতি, 'রাজা-গোষ্ঠের সংবাদ পাইলেই প্রজামাত্রকেই অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়, সেক্টভুক্ত রাজাজ্ঞার কেউ অপেক্ষা করে না। আমরা "সাবজেক্ট" নই, "সাবজুগেটেড" অর্থাৎ দমিত জাত। পাওয়ার হাউসের জন্য তেল কয়লা কুলী প্রভৃতি সরবরাহ করার ভার আমাদের উপর মাত্র।

কিন্তু তথাপি স্বাধীন দেশের প্রজার ন্যায় এ দেশের প্রজারও উদরনীতির চর্চা প্রতিদিনই করিতে হয়। এ দেশের প্রজা-শক্তির উপর রাজশক্তি নির্ভর করে না পূর্ব্বে বলিয়াছি বটে, কিন্তু শেষোক্ত শক্তি ভোগাধিক্যে অবসন্ন হইয়া আসিলে প্রজা-রক্তের চালনার প্রয়োজন হয়। ইহাকে Logic of transfusion বা চলনী-ন্যায় বলে। এই চালনী-ন্যায়ের তর্কযুক্ত এই পোনে দুই শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসার পর এখন প্রজা-শরীরের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে রোগীর কথা দূরে থাক—ভোগীও ভয় পাইয়াছেন। বৃটেনের এ পাড়ার টানটুকু আমাদের গামছার খোঁটে হাটে যাবার সওদা কয়েক কড়ি বাঁধিয়া দিবার জন্য; সুতরাং দাদার কড়ি দিদিকে দিয়ে তাঁদের চুড়ী খড়ি খড়কে ছড়কো কাপড়-জুতো ছাতা যাতে আমরা ক্রয় করতে পারি, তার সাশ্রয় করবার জন্য একটু চিন্তিত হয়েছেন

দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'প্রজানীতি' নামক প্রবন্ধমালার প্রথম কিস্তির একাংশ

সংস্রব হতে যতদূর সম্ভব দূরে থেকে ব্যক্তি ও সমাজগত স্বাধীনতা রক্ষা করে জীবনযাত্রার পথনির্ণয় করাতেই আমাদের মুক্তি! আমি নিজে এই হরতাল, প্রসেশান্-এ সব ভালবাসি না।"[৫৫]

'প্রজানীতি' প্রবন্ধের বিভিন্ন অধ্যায়ে মুখ্যত এই বিষয়গুলি লেখকের আলোচ্য—

(ক) বাঙালীর তৎকালীন সংকট : সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও চারিত্রিক ; (খ) ইংরেজের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ক্রিয়াকলাপ ; (গ) শ্রমের মর্যাদা, কৃষকের মহত্ত্ব ও পল্লীজীবনের বরণীয়তা ; এবং (ঘ) সর্বাঙ্গীণ সংকটের সম্মুখে আত্মবিস্মৃত বাঙালীর কর্তব্য।

বাঙালীর স্বভাবগত ত্রুটিবিচ্যুতি ও নানাপ্রকার অধঃপতন সম্পর্কে তাহাকে সচেতন করিবার উদ্দেশ্যে অমৃতলাল দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার প্রহসনসমূহে ব্যঙ্গবাণবিদ্ধ অনেকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সমকালীন অনেক জীবিত ব্যক্তির উপহাস্য আচরণও তাঁহার ক্ষমা লাভ করে নাই। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধের কোথাও শ্লেষাত্মক বক্রোক্তির পরিচয় নাই ; বরং বাঙালী জাতির বিমূঢ় কার্যকলাপ তিনি বিষণ্ণচিত্তেই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের সম্মুখে কতকগুলি অতিপ্রত্যক্ষ মর্মান্তিক সত্যচিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন—কেতাবী বিদ্যা ক্রমশঃ আমাদের ব্যবহারিক জগৎ হইতে সরাইয়া লইয়া অন্নসংস্থানে অসমর্থ করিয়া তুলিতেছে ; 'টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন' তুলিয়া দিয়া আমরা ইংরেজী শিক্ষা দিতেছি ব্যর্থ আশায় এবং ইংরেজও স্কুল-কলেজ সৃষ্টি করিয়া এই জীবন্ত সমাজকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে ; পল্লীগ্রামের অনাবিল জীবন পরিত্যাগ করিয়া শহরগতপ্রাণ হইয়া 'আলস্যে ঔদাস্যে' ক্রমেই আমরা দেহের প্রতিরোধক শক্তি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রভৃতির লোপসাধন করিতেছি এবং গ্রামে বাস করিবার সাহসও হারাইতেছি। 'শ্লথপ্রাণ দুর্বল' বাঙালীর অবস্থাটি তিনি করুণ অথচ হাস্যকররূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

'ফাউণ্টেন পেনের ন্যায় ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার যাঁদের অঙ্গভূষণ, ইউক্যালিপটিসের শিশি পকেটে না নিয়ে যাঁরা বেলেঘাটার পুল পার

৫৫ 'প্রজানীতি' (২৫) : 'ইংরাজের জাতিগর্ব'। অন্য একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—'কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধের ষোড়শ সাজাইয়া বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বের জাতিগত চরিত্র-চিত্র আমি পাঠকের নয়নদর্পণে প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস পাইলাম।' ('প্রজানীতি' ১৭ : 'বিজাতীয়ভাব')

হতেও সঙ্কুচিত হন, মাতামহীর মৃত্যুতে ত্রিরাত্রিমাত্র নগ্নপদে এঘর ওঘর করার ক্লেশকে যাঁরা জেলের যন্ত্রণা অপেক্ষা ভয় করেন, উপনয়নের পূর্বেই যাঁদের চোখে পরকোলা পরাইতে হয়, একটা গ্যাসের ম্যাণ্টল্ নষ্ট হলে যাঁদের দশ কদম হাতড়ে রাস্তা চলতে হয়, নিজের চালা নিজের হাতে মেরামতের জন্য বাঁকারি ছোলা দূরে থাক, একটা সীসের পেন্সিল চেঁচে নেবার দক্ষতাও যাঁদের অঙ্গুলী-অগ্রে নাই, তাঁরা কি সাহসে গ্রামে গিয়ে বাস করবেন।'[৫৬]

বাঙালীর দীনহীন অবস্থা বিচার করিয়া তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই দীনদশা ইংরেজেরই সৃষ্টি। ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরও দীনহীন বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। অথচ পূর্বে গৃহে মাতা ও মাতৃস্থানীয়াদের যত্নে এবং পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের শিক্ষায় আমরা যথার্থ মানুষ হইয়া উঠিতাম, ঘরে বাহিরে ব্যায়াম করিয়া কর্মঠও হইতাম। কিন্তু 'পণ্যের পসরা মাথায় এই পাশ্চাত্য বেনিয়া জাতি' বাঙালীকে 'আমি ভীরু' এই মন্ত্র জপ করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। কিন্তু বাঙালী যে কোন দিনই ভীরু ছিলনা একথা অমৃতলাল দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন, 'কবে বাঙ্গালী ভীরু', 'বাঙ্গালী ভীরু কবে', 'বাঙ্গালীই মানুষ হয়', 'বাঙ্গালী পাঠশালে মানুষ', 'বাঙ্গালী নারীর ব্যায়ামশিক্ষা' প্রভৃতি অধ্যায়ে। বাঙালী বীরত্বেরই সাধনা করিত বলিয়া দশপ্রহরণধারিণী জননীর সমক্ষে 'জয়ং দেহি' 'জয়ং দেহি' বলিয়া বিজয় কামনা করিত। কিন্তু আজ 'কর্মনাশা বিলাতি বিদ্যা'র প্রভাবে—

'বীরজাতির যোগ্য এই প্রার্থনা অর্থহীন ও ব্যর্থ করিয়াছে আমাদের চাকরীর দরখাস্ত ও অধিকারলাভের আবেদনপত্র।'[৫৭]

বাঙালীর রাজনীতিচর্চায় রীতি-বৈশিষ্ট্য দেখিয়া লেখক হতাশ হইয়াছেন। কারণ, ইহার মধ্যে ইংরেজের অনুকরণ অত্যধিক। দেশের যে সকল মুষ্টিমেয় 'সুশিক্ষিত' ব্যক্তি 'ইউরোপীয়ানাইজড্' হইয়া 'রাইট্' পাইতে চাহেন, তাঁহাদের তিনি তীব্র ধিক্কার দিয়াছেন। তাঁহার বাঙালীয়ানা ও দেশীয় মনোভাবের পরিচয় অনেক স্থলেই সুব্যক্ত—

৫৬ 'প্রজানীতি' (৪)

৫৭ ঐ (১১) 'বাঙ্গালী ভীরু কবে'

'স্বাধীনতার সুবাতাস সেই শুভ প্রভাতে আমাদের প্রাণে প্রবাহিত হইবে যেদিন দেশপ্রীতি আমাদের হৃদয়কে দেশীয় ভাবে প্রবুদ্ধ করিবে।'[৫৮]

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য কি তাহা তিনি ১৩২৯ সালে 'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধেও উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর পরে তিনি তাঁহার সেই অভিমত বুদ্ধিভ্রষ্ট বাঙালীকে আবার শুনাইয়াছেন। 'স্বাধীনতা' ও 'নিরধীনতা' নামক দুইটি অধ্যায়ে তিনি ভারতীয় 'মুক্তি' ও ইউরোপীয় 'স্বাধীনতা'র তুলনা করিয়াছেন। তিনি আমাদের বুঝাইয়াছেন যে ব্যক্তিগত অধীনতা হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে জাতিগত নিরধীনতা সম্ভব নহে। ইংরেজের সহিত সম্পর্ক একেবারে ঘুচাইতে হইলে 'আমাদের মনোরাজ্য হইতে ইংরাজকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত' করিতে হইবে।

ইংরেজের প্রকৃতি ও শাসনবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি এই প্রবন্ধে যে সকল মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা হইতে ইংরেজ-চরিত্রে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই। ইংরেজ এদেশে আসিয়া আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে যে নিদারুণ সর্বনাশের জালবিস্তার করিয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে আমরা যদি অবহিত না হই, তাহা হইলে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিয়াও আমরা তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না, ইহাই ছিল তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত। তাই তিনি 'প্রজানীতি' প্রবন্ধের অনেকগুলি অধ্যায়ে ইংরেজের বাণিজ্যবিস্তারের কৌশল, তাহাদের স্কুল-কলেজ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব, নিজেকে সর্বদা প্রভুজ্ঞান করিয়া সর্বত্র আধিপত্যসৃষ্টির প্রয়াস, আমাদের মনের মধ্যে অভাব ও অসন্তোষ সদাজাগ্রত রাখার প্রচেষ্টা প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইংরেজীভাবের প্রভুত্বও সর্বপ্রথম আমাদেরই মধ্যে বদ্ধমূল হইল। ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে তাহাদের জাতীয় ভাবও আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া গেল সকলের আগে—

'ইংরাজী কাব্য-ইতিহাসাদি পাঠে নবীন বাঙ্গালীর প্রাণে পাশ্চাত্ত্য পেট্রিয়টীজ্‌মের ভাব ফুটিয়া উঠিল, নেশান— তথা জাতীয়তার গৌরব উপলব্ধি করিতে শিখিলেও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারী সূত্রে লব্ধ নিজের জাতির প্রতি মনে মনে একটা অবজ্ঞা দাঁড়াইয়া গেল। এইখানেই ইংরাজের বঙ্গবিজয় সম্পূর্ণ হইল।'[৫৯]

---

৫৮ 'প্রজানীতি' (৫)

৫৯ ঐ (২২): 'ইংরাজী ভাবের প্রভুত্ব'

য়ুরোপীয় সাহিত্যের 'বিজাতীয় জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে রাজ্যস্থাপন' করিয়াছিল। কিন্তু এই বিদেশী জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হইয়া আমরা যখন জীবনযাত্রাপথে অগ্রসর হইয়াছি ইংরেজ আবার তখনই আমাদের বাধা দিয়াছে। ইংরেজের এই বিরুদ্ধধর্মী ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ অমৃতলাল এইরূপ ব্যঙ্গভরে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—

'সাহেব! বই প্রেসক্রাইব করবার বিদ্যে তো বেশ আছে; কেন পড়তে দিয়েছিলে আমাদের গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনির জীবনচরিত? ফরাসী বিপ্লবের শোণিতসিক্ত ইতিহাস আমাদের কলেজের লাইব্রেরীতে কোত্থেকে এসেছিল? আমেরিকায় স্বাধীনতার বিবরণ কি আমার ঠাকুরদাদা নিউইয়র্ক থেকে ইনভেন্ট্‌ করে আনিয়েছিলেন? গদ্যে পদ্যে, গীতে বাদ্যে, খেলায় মেলায়, আওয়াজে কাওয়াজে পৌনে দুশো বছর ধরে কানের ভিতর দিয়ে মর্মে মর্মে বসিয়ে দিচ্ছ স্বাধীনতার গৌরব— স্বাধীনতার মহিমা, পরাধীনতার হীনতা, আর আজ তরুণদের মনে সেই স্বাধীনতার পিপাসা জেগেছে, তারা হা-হা করে উঠেছে, আর এখন এসেছ তাদের দাবড়ি দিতে— হাতকড়ি দেখাতে? ভেবেছিলে বুঝি খালি খদ্দের তৈরী করেই তোমাদের বিদ্যে কাজ সেরে নেবে? এ ঠিক একদফা ব্রাণ্ডী বেচে লাভ, আবার মাতালের জরিমানা করে লাভ।'[৬০]

ইংরেজের বলদর্পিতা ও জাতিগর্ব, তাহাদের প্রভুত্বশক্তির ব্যভিচার, তাহাদের 'মনি ম্যানিয়া' প্রভৃতি সম্পর্কেও লেখক যথেষ্ট শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও তিনি সুস্পষ্টভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে ভারতীয় জীবনদর্শনের সহিত ইংরেজের জীবনদর্শনের বিন্দুমাত্র মিল নাই: কলের ধ্যানে মগ্ন ইংরেজের স্ত্রী, ভ্রাতা, বন্ধু, ভগ্নী নাই— আছে সেক্রেটারী, লেডী টাইপিস্ট, শেয়ারের দালাল!

এইরূপে ইংরেজের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া অমৃতলাল স্বদেশপ্রেমী দেশবাসীকে এই অনুরোধ করিয়াছেন—

'মুক্তির জন্য যাঁরা যথার্থই লালায়িত, সত্য সত্যই যাঁরা দেশকে দেশের জন্য ভালবাসেন, তাঁদের এখন অন্তরের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করে চিন্তা করতে হবে, কিরূপে এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের প্রভুত্বের হাত থেকে স্ব-জাতিকে মুক্ত করতে ক্ষমবান্ হন। ভয় তত ইংরাজকে নয়, যত ইংরাজেরই ভাবকে।'[৬১]

৬০ 'প্রজানীতি' (১৭): 'বিজাতীয় ভাব'

৬১ ঐ (২২): 'ইংরাজীভাবের প্রভুত্ব'

ইংরেজের দুর্মতি ও আমাদের দুর্গতির উল্লেখ করিয়াই লেখক ক্ষান্ত হন নাই। নিদারুণ নৈরাশ্য ও বিনষ্টি হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে কায়িক ও মানসিক শক্তির সাধনা করিতে হইবে একথাও তিনি নানাস্থলে বলিয়াছেন। জড়তা পরিহার করিয়া অবিলম্বে কর্মের সাধনায় আমাদের ব্রতী হইবার নির্দেশও দিয়াছেন। শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করিতে গিয়া তিনি কৃষককেই সমাজের সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধের কতকগুলি অধ্যায়েও ('কৃষকের উপর মানুষ কে?' 'কৃষকের কীর্তি', 'স্বাধীনতা— পল্লীগ্রামে', 'যুবক-আবাহন', 'পল্লীকথা') কৃষক-জীবনের মহত্ত্ব সম্পর্কে তিনি আমাদের সচেতন করিয়াছেন। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্ধং কৃষিকর্মণি' এই অতি প্রচলিত প্রবাদবাক্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। লিখিয়াছেন—

"কোন উদ্ভট্ ভট্ট 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্ধং কৃষিকর্মণি' ইত্যাদি শ্লোকে কৃষককে কর্মজগতের দ্বিতীয় স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, এই 'লক্ষ্মী' বাক্যটি গ্রাম্য দোষাশ্রিত হোয়ে মৌলিক অর্থ হারাইয়া ফেলিয়াছে। লক্ষ্মী শব্দের তাৎপর্য কাঞ্চনের প্রাচুর্যে অনুভূত না হইয়া সুখ শান্তি স্বাস্থ্য সন্তোষাদিজনিত 'শ্রী'র ঐশ্বর্য মনে করা উচিত এবং সেই সূত্রে কার্যতঃ বণিকও কৃষকের অবশ্যপোষ্য।"[৬২]

কৃষকের বৃত্তিকেই তিনি সর্বোত্তম বৃত্তি বলিয়া মনে করিতেন—

'জগতে যত রকম বৃত্তি আছে, তার মধ্যে কৃষকের বৃত্তি সর্বাপেক্ষা বনিয়াদী—সর্বাপেক্ষা স্বাধীন, সর্বাপেক্ষা স্বার্থশূন্য। কৃষক একমাত্র প্রকৃতি ভিন্ন আর কারো উপাসনা করেনা। সে যে আপনি প্রভু, এ জ্ঞান তার সর্বদা আছে; জমি তার অধিকারে, বলদ তার ভৃত্য। কৃষক কাহারো ধন লুণ্ঠন করেনা, কাহারো উপার্জনে ভাগ বসায় না, সামান্য প্রাণীহত্যাও তাহার শ্রমের অন্তর্গত নয়।'[৬৩]

কৃষকের শক্তি ও তেজোমণ্ডিত কীর্তির সহিত আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 'বিলাতী স্বাধীনতা-সাধনার' তুলনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

'রাজবলে বলীয়ান্ ইংরাজ নীলকর যখন শক্তির অপব্যবহারে পর্ণকুটীরবাসী

৬২ 'প্রজানীতি' (১৫): 'কৃষকের উপর মানুষ কে?'

৬৩ ঐ ঐ

জীর্ণবাসপরিহিত দরিদ্র প্রজাগণকে উৎপীড়িত করিয়াছিল তখন এই বঙ্গদেশে বিনা সভা-আহ্বানে, বিনা বক্তৃতায় একবার হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে অপূর্ব দৃশ্য দেখাইয়াছিল, রাইচরণের পাশে তোরাব যেভাবে লাঠি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল,— পিছনে দাঁড়াইয়া ভদ্রগৃহস্থ নবীনমাধব— তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের এই বিলাতী স্বাধীনতা-সাধনায় নিযুক্ত মস্তক লজ্জায় অবনত হওয়া উচিত।'[৬৪]

ইংরেজশাসনের সেই প্রখর মধ্যাহ্নে সংঘবদ্ধ কৃষকশক্তি কিভাবে ইংরেজ নীলকরদের নীলচাষ একেবারে বন্ধ করিয়া দিল তাহার মর্মস্পর্শী বাস্তব আলেখ্যও তিনি অঙ্কন করিয়াছেন—

"বেলভেডিয়ারের আসন টলিলে যখন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর গ্রে সাহেব স্বচক্ষে নীললীলাক্ষেত্র দর্শনমানসে ষ্টীমার আরোহণে ওই নদীয়াভিমুখে যাত্রা করেন, তখন দেখিতে থাকেন যে, নর-নারী, হিন্দু-মুসলমান, জলাচরণীয় অস্পৃশ্য, বালক, বৃদ্ধ, যুবা— ভাগীরথীর দুইকূলে অবিরল জনতায় সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সকলে হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে :—'দোহাই লাটসাহেব, সব কথা শুনব; কিন্তু নীল আর বুনম্ না, এ হাতে নীল আর বুনম্ না, হাত কাটিয়ে ফেলাবো, তবু নীল বুনম্ না।' লাট সাহেব অবাক! অবাক তাঁহার সেক্রেটারী আদি পার্ষদবর্গ! অবাক ষ্টীমারের মাঝি মাল্লা কাপ্তেন! আর নীল তারা বুনলে না; সেই ১৮৬২ বা ৬৩ সাল থেকে বাঙ্গালা হইতে নীলের নাম উঠিয়া গেল।"[৬৫]

দেশের রাজনীতি ও স্বরাজ-সাধনা সম্পর্কে তাঁহার মনের মধ্যে যে চিন্তা ও মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই ঘটনাটিতে তাহারই জলন্ত সমর্থন রহিয়াছে দেখিয়া তিনি উদ্দীপ্ত হইয়া আরও লিখিয়াছেন—

'এ কংগ্রেস নয়, কাউনসিল নয়, পার্লামেণ্ট নয়, ডুমা নয়; এ বাঙ্গালার যশোর— বাঙ্গালার নদে, বাস খড়ের কুঁড়েতে, পাথরের খোরায় আধপেটা বাসি ভাতের গ্রাস আহার, পরণে নেংটী, অস্ত্রের মধ্যে কাস্তে— বড় জোর একগাছা লাঠি; অত বড় ইংরাজের নীলের কারবারটা দেশ থেকে তুলে

৬৪ 'প্রজানীতি' (১৩): 'কৃষকের কীর্তি'
৬৫ ঐ ঐ

দিলে। এই বাঙ্গালী ভীরু? এই বাঙ্গালী মানুষ নয়, কে তুমি বলতে চাও? কৃষক-প্রজা মনে করলেই সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারতো, এখনও পারে, এবং জমিদার তাদের ভয় করতো, এখনও করে।'[৬৬]

কৃষকের মহত্ত্বমণ্ডিত জীবনের কথা বলিতে গিয়া পল্লীবাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও অমৃতলাল আমাদের সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, প্রকৃত স্বাধীনতা পল্লীগ্রামেই রহিয়াছে— পল্লীর পাঠশালায় যে সজীব স্বাধীনতা ছিল, ইস্কুলে ঢুকিয়া বিলাতি বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিতে করিতে আমরা তাহা হারাইয়াছি। ইংরেজী শিক্ষা ও শহুরে বাতাস আমাদের ক্রমেই অকর্মণ্য ও পঙ্গু করিয়া দিতেছে। ইহাই তাঁহার অভিমত যে, 'স্বাধীনতা পল্লীগ্রামের মুক্ত বাতাসে, সহরের নর্দামার গুপ্ত লহরে নয়।' আত্মশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারী হওয়ার কথা বহুস্থলেই বলিয়াছেন। এখানেও লিখিয়াছেন—

'আমি যে অবস্থাকে মনুষ্যের সত্য স্বাধীনতা বলিয়া মনে করি, তাহা প্রাপ্তির পথ নিজ শক্তির দ্বারা প্রতিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করা।'[৬৭]

বঙ্গদেশের উপেক্ষিত অবহেলিত পল্লীগুলির সংস্কারকার্যে যদি আমরা ব্রতী হই তাহা হইলেই আমাদের অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তির পুনরুজ্জীবন হইবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন—

'যথার্থ বীরত্ব, যথার্থ ত্যাগ, যথার্থ দেশের মঙ্গলেচ্ছা এই পল্লী-উদ্ধার কার্যে প্রযুক্ত করিতে হইবে।'[৬৮]

. এই জন্যই 'সোদরসদৃশ সমবেদনাভাজন' 'শত সংখ্যক যুবকের হৃদয়ের দ্বারে' তাঁহার 'আদরের আবেদন'। সকল প্রকার ভাববিলাস ও শিক্ষাভিমান পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিতে হইবে 'বীরের বুক, সন্ন্যাসীর সাহস ও মল্লের বেশ পুঁজি করিয়া।'[৬৯]

মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে বাংলার যুবশক্তিকে তিনি এই বলিয়া 'আবাহন' করিয়াছেন—

'এস, তোমাদের মধ্যে অন্ততঃ একশত একনিষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবক, কোন কোন

---

৬৬ 'প্রজানীতি' (১৬): 'কৃষকের কীর্তি'

৬৭ ঐ (২৯) 'স্বাধীনতা—পল্লীগ্রামে'

৬৮ ঐ (২৯) ঐ ঐ

৬৯ ঐ (৩১) 'পল্লীকথা'

নির্দিষ্ট পরিচিত দশখানি গ্রাম স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও আহার্যের আধারে পরিণত করিব বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প কর। একবার দেখাও যে, বিনা গভর্ণমেন্টের সাহায্যে, বিনা ধনগর্বস্ফীত লক্ষপতির পোষকতায়, কেবলমাত্র গ্রামবাসীকে সহকর্মী করিয়া নিজের দক্ষতায় কেমন করিয়া পরিত্যক্ত পল্লী আবার লক্ষ্মীশ্রীফুল্ল জনপদে পরিণত করিতে পার। জগৎ দেখুক যে বাঙ্গালীর ছেলে deserted villageকে populous paradise করিয়া তুলিয়াছে।'[৭০]

পল্লীগ্রামের সেবাই তৎকালীন বঙ্গ-যুবকের প্রধানতম করণীয় বলিয়া অমৃতলালের মনে হইয়াছে। আচারভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট বাঙালীকে ইহাই তাঁহার শেষকথা—

'একবার জন্মভূমিকে সত্য সত্যই জননী মনে করিয়া, মাটীর মাই টেনে দুধ খেয়ে আপনাকে সবল ও স্বাধীন কর, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কেল্লার ভিতর জোরে ঢুকিয়া পড, তখন সিংহাসন-অধিকার অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইবে।'[৭১]

৯

মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বেও অমৃতলাল সমসাময়িক ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া গভীর চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধ প্রধানত 'দৈনিক বসুমতী'তেই প্রকাশিত হয়। অন্যান্য পত্রপত্রিকায়ও কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩৩৪ সালের ১৩ই ফাল্গুন (২৬. ২. ১৯২৮) কলিকাতা সিটি কলেজের রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে সরস্বতী-প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার দাবিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে যে বিবাদ হয় তাহার জের কয়েক মাস ধরিয়া চলে। অমৃতলালের মনে এই ঘটনা গভীর রেখাপাত করে। তিনি ছাত্রদের দাবির সমর্থক ছিলেন। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন নেতাও ছাত্রদের পক্ষ লইয়া আন্দোলন করেন। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের আচরণের প্রতিবাদ করিয়া ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে 'সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজা' নামক প্রবন্ধটি লেখেন। অমৃতলাল মূর্তিপূজার সমর্থনে তাঁহার

৭০ 'প্রজানীতি' (৩০) 'যুবক-আবাহন'

৭১ ঐ (৩২) 'পল্লীকথা'

বক্তব্য প্রকাশ করিলেন 'বাংলার কথা'য় (শ্রাবণ), প্রবন্ধের নাম দিলেন— 'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।'

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে 'মহাসমিতি'[৭২] প্রবন্ধটি রচিত হয়। লেখক এই প্রবন্ধে রাজনৈতিক দিক হইতে কংগ্রেসকে ব্যাখ্যা করেন নাই; সামাজিক চক্ষে কংগ্রেসের অনুষ্ঠান 'জাতীয় মহোৎসব', এই কথাই বলিয়াছেন। হিউম, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ঘটস্থাপনা মহাযজ্ঞে পরিণত হওয়ায় লেখকের সন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙালী যুবকেরা যেভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছে তাহাতেও লেখক বাঙালীর শৃঙ্খলাবোধের জন্য আনন্দিত। পার্ক সার্কাসে 'কংগ্রেস মণ্ডপ' দেখিতে গিয়া লেখকের মনে হইয়াছিল—

> 'এই অতি দীন— অতি হীন উপেক্ষিত প্রাচীন আমি, আমারও মনে হইল যে, এই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন ভিন্ন আচারপন্থী, ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী নরনারী— এরা আমার বাঙ্গালার— আমার কলিকাতার — আজ আমার নিজের ঘরের অতিথি।'

ভলান্টিয়ারদের সৌজন্যহীনতায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্রমেলার স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। নবগোপাল মিত্রের নেতৃত্বে তাঁহারাও একদিন সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের স্বেচ্ছাসেবকদের ন্যায় এরূপ শিষ্টাচার-বিবর্জিত হন নাই। সংবাদ পরিবেশনের বিচিত্রতার জন্য সংবাদপত্রের উপরও উপভোগ্য শ্লেষবর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—

> "পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সঙ্গে সঙ্গে অনেক সংবাদপত্রেই বড় বড় অক্ষরে ৩৪টি ঘোড়া এমনভাবে জোড়া দেওয়া হইয়াছিল যে, আমার নট-মনে কেবল থিয়েটারী বিজ্ঞাপন 'অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল' উঁকি মারিতে লাগিল।"[৭৩]

৭২ দৈনিক বসুমতী : ১৫ই পৌষ ১৩৩৫

৭৩ গোবিন্দলালের ভূমিকাভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এইরূপ বিজ্ঞাপন দিতেন। প্রবাসী পত্রিকাও লিখিয়াছিলেন— 'সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু মহাশয়কে অপূর্ব সমারোহের সহিত ৩৪ ঘোড়ার গাড়ীতে স্টেশন হইতে তাঁহার বাসস্থানে আনা হইয়াছিল।'—বিবিধ প্রসঙ্গ : মাঘ ১৩৩৫

'পৌষপার্বণ'[৭৪] অতীতের বাঙালী গৃহস্থের সুখ ও সন্তোষপূর্ণ সমাজজীবনের একটি আলেখ্য। দুঃখের চরম অবস্থাকে সর্বনাশ ও সুখের পরিপূর্ণতাকে আমরা পৌষমাস কেন বলি তাহার সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন অমৃতলাল। পৌষপার্বণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বাঁউনী বাঁধা, মকর-সংক্রান্তি, সো-দোর ব্রত, পিষ্টকোৎসব প্রভৃতির অর্থ, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বেশ ঘরোয়া ভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে। বাংলার সমাজজীবনের সহিত অমৃতলালের যে কিরূপ আন্তরিক ও নিবিড় পরিচয় ছিল তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন এই প্রবন্ধটি হইতে মিলিতেছে। অতীতের সুখী ও সম্পন্ন বাঙালীর কথা ভাবিয়া এবং বর্তমানের 'শূন্যে স্বাধীনতার রাজনৈতিক মন্দির খাটাইবার আশায়' উন্মাদ, শ্রী ও সমৃদ্ধিহীন বাঙালীর দিকে চাহিয়া লেখক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'[৭৫] প্রবন্ধটি একটি অতিবাস্তব সমস্যার প্রতিক্রিয়ায় সংশয়িত মন লইয়া অমৃতলাল রচনা করিয়াছিলেন। হরবিলাস সরদা 'বাল্য-বিবাহ নিবারক ও বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্ধারক বিলটি' আইনে পরিণত করিবার জন্য ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। কিন্তু একজন 'শাস্ত্রধ্বজী' মাদ্রাজী সভ্যের প্রস্তাব অনুযায়ী 'সম্মতির বয়স কমিটি'র রিপোর্ট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত উহা স্থগিত থাকে।

এই ঘটনা অমৃতলালের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন।[৭৬] সেইজন্য প্রবন্ধের সূত্রপাতে সংশয় ও শ্লেষ দুর্লক্ষ্য নহে—

> 'বাঁচা গেল! হরবিলাসের স্বরবিলাস বিল অবিবাদে পাশ হইয়া যাইবে, উন্নত সমাজের মনে আশার এই বিজলীপ্রভা রক্তপদ্মাভ স্ফটিক গোলকের মধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।
>
> বেশ হইয়াছে। ধর্মের নামে, শাস্ত্রের দোহাইয়ে সাতপুরুষ ধরিয়া সমাজের উপর নানারূপে আমরা যে সব যথেচ্ছাচারী অত্যাচার করিয়া আসিতেছি, তাহার শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে।'

৭৪ দৈনিক বসুমতী : ২৯এ পৌষ ১৩৩৫

৭৫ দৈনিক বসুমতী : ১৯এ মাঘ ১৩৩৫

৭৬ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে দেশে সম্মতি-বিষয়ক আন্দোলনের সূত্রপাত হইলে অমৃতলাল 'সম্মতি-সঙ্কট' প্রহসনটি রচনা করেন। উহা ২১এ মার্চ ১৮৯১ স্টারে অভিনীত হয়। এই প্রহসনে অমৃতলাল সার্বভৌমের মুখ দিয়া বাল্যবিবাহের সমর্থনে অনেক যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই সঙ্গে অমৃতলাল এই কথাও বলিয়াছেন যে, স্বার্থান্ধ বিদ্বেষপরায়ণ মূর্খের হস্তে শাস্ত্র অপমানিত হইয়াছে বলিয়াই শান্ত শাস্ত্রও শস্ত্রধারণে উদ্যত। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ কেন প্রচলিত ছিল তাহার সবিস্তার আলোচনাও এই প্রবন্ধে পাওয়া যাইতেছে। 'অনুস্বার'-পরায়ণ ও দক্ষিণালোভী ব্রাহ্মণদের প্রতিও কটাক্ষ কম নাই। বাল্যবিবাহ-নিরোধক 'নব্যতন্ত্রের উজিরগণের' কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য—

'কলিকাদলনের ফলে সময়ে সময়ে সমাজে যে নানারূপ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না এবং তাহারই গোটাকতক বাছা বাছা নজির দেখাইয়া নব্যতন্ত্রের উজিরগণ সংস্কারের পরিবর্তে সংহারের অস্ত্রলাভের জন্য আজ ইংরাজ শাসকের শরণাপন্ন হইয়াছেন।'

হরবিলাস-বিল আইনে পরিণত হইলেও তাহা কতটা সুফলপ্রসূ হইবে সে সম্পর্কে লেখকের সংশয় প্রকাশ পাইয়াছে।

'স্বাধীনতার পথে'[৭৭] নামক শ্লেষাঢ্য রচনায় লেখক বিশ্ববিদ্যালয় ও মিউনিসিপ্যালিটির স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদির বর্ধিত মূল্য সম্পর্কে লেখকের মতামত এই—

'যে মুকুন্দরাম-চণ্ডী বাজারে বানাইলে দেড় টাকায় বিক্রয় হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাটীতে চোলাই করিয়া ভূমিকার সম্ভ্রমে তাহারই মূল্য দাঁড়ায় ছয় টাকা।'

মিউনিসিপ্যালিটির কার্যাদির সমালোচনাপ্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন যে, 'দেশীয় লোকেরা সম্পূর্ণ ইংরাজী মন লইয়া' 'স্বায়ত্তশাসন-রাজ্যে' স্বাধীনতার আসন দখল করিয়া 'স্বাধীনভাবেই' মিউনিসিপ্যাল কার্য পরিচালনা করিতেছেন।

'কচুরীপানা'[৭৮] প্রবন্ধটি, কচুরীপানা যে ম্যালেরিয়ার আকর ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, কচুরীপানা ধ্বংসের আন্দোলন উপলক্ষে রচিত। কচুরীপানার 'ওয়াটার হেসিন্থ' নামটি লেখক অনুবাদ করিয়াছেন 'জল-হসন্তী'। সাইমন-কমিশনকে কটাক্ষ করিয়া লেখক একটি কচুরী-কমিশনেরও প্রস্তাব দিয়াছেন—

'আপাততঃ গভর্ণমেণ্টের নিতান্ত কর্তব্য যতদূর সম্ভব শীঘ্র বিলাত হইতে

৭৭ দৈনিক বসুমতী : ৮ই ফাল্গুন ১৩৩৫

৭৮ ঐ ১১ই ফাল্গুন ১৩৩৫

একটি কচুরী-কমিশন আনাইয়া বেগুন ভাজিতে আরম্ভ করা ; ইহাতে ইংলণ্ডের সাত আটটি গলগণ্ডের উপকার হইবে, সংবাদপত্রের কাপির যোগাড় হইবে, হরতাল বয়কটাদি হইবে, য়্যাসেমব্লি কাউন্সিলে কাক-চিল পড়িবে, আর জগতের আদর্শস্বরূপ এ দেশীয় পুলিশের কর্মপটুতা উজ্জ্বলতর-ভাবে প্রকাশিত হইবে।'

'ঘুষ ও ঘুষি'[৭৯] প্রবন্ধে মানব-চরিত্রের নিপুণ বিশ্লেষণ মিলিতেছে। এই প্রবন্ধে লেখক ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া বার্ধক্যের শেষদিন পর্যন্ত আমরা যাহা করি তাহা হয় ঘুষের লোভে, না হয় ঘুষির ভয়ে! এই তিক্ত সত্য তিনি জীবনের নানা অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করিয়াছিলেন ; তাই লিখিয়াছেন—'আমি না দেখিয়া না শুনিয়া খামকা প্রায় কোন কথা বলিনা··· ।'

'গ্রামদর্শন'[৮০] নামক বর্ণনামূলক প্রবন্ধটি বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ধানকুড়ে গ্রাম সম্পর্কে 'চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা'-সঞ্জাত রচনা। বাংলা দেশের লক্ষ্মীশ্রীহীন পল্লীগুলির তুলনায় ধানকুড়ের সমৃদ্ধিসম্পন্ন শ্রীমন্ত অবস্থায় লেখকের আন্তরিক সন্তোষ লক্ষ্য করা যায় এই রচনাটিতে।

১০

বঙ্গসাহিত্যের নিষ্ঠাবান সেবক, বঙ্গসংস্কৃতির অকৃত্রিম অনুরাগী এবং বঙ্গদেশের প্রাচীন সামাজিক অমৃতলালকে জীবন-সায়াহ্নে প্রায়ই সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে হইত।* নিম্নলিখিত সাহিত্য-সম্মেলনগুলিতে তিনি মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করেন : বীরভূমে অনুষ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন (১৩৩২), মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত বিহার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন (১৩৩৩), বসিরহাট বাণী সম্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশন (১৩২৭), ধলায় বীণাপাণি সাহিত্য-সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক উৎসব (১৩৩৪) এবং মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের ১৬শ বার্ষিক অধিবেশন (১৩৩৫)। ইহা ব্যতীত ১৩৩০ সালে

৭৯ দৈনিক বসুমতী : ১৪ই ফাল্গুন ১৩৩৫

৮০ ঐ ২৪শে ফাল্গুন ১৩৩৫

* ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল সভাতেই সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার যে সকল ভাষণ মুদ্রিত আকারে পাওয়া গিয়াছে, এখানে কেবলমাত্র তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি সাহিত্য-শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সকল সভার সভাপতিরূপে তিনি তাঁহার অননুকরণীয় বাগ্‌ভঙ্গীতে যে সকল বক্তব্য উপস্থাপিত করিতেন তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীকে শুধু মুগ্ধই করিত না, গভীরভাবে ভাবিতও করিত। সাহিত্য-সম্মেলনে তাঁহার অভিভাষণগুলিতে কেবলমাত্র সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের ইতিহাস বা সাহিত্যিক-প্রশস্তি নাই, গল্প-উপন্যাস, কাব্য-নাটকের অতিরিক্ত স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাদি ও ছাত্রমানসে তাহাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও তিনি তাঁহার সুচিন্তিত মতামত দান করিয়াছেন। তাঁহার নাটক-প্রহসন, নকশা-প্রবন্ধাদিতে তিনি যেমন সমাজের নানা চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, এই সকল অভিভাষণেও সেইরূপ সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার শেষজীবনে তিনি বঙ্গসাহিত্যে যে সংকট ও সমস্যার সূচনা দেখিয়াছেন সে বিষয়েও নানা প্রকার শঙ্কিত ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন।

শিশুমনের উপযুক্ত গ্রন্থ রচিত হইতেছে না বলিয়া তাঁহার উদ্বেগ ও আক্ষেপের সীমা ছিল না। তিনি নিজে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত আমৃত্যু ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেইজন্য ছাত্রদের বিদ্যানুরাগ হ্রাস পাইবার যথার্থ হেতু তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বসিরহাট ও বীরভূমের সাহিত্য-সম্মেলনে দেশের এই মৌলিক সমস্যাটির দিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দেশের শিক্ষাসমস্যা যে ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে তাহার কারণ উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর নীরসতা ও ভাষাবিভ্রাট শিশুদের কোমল মনে পাঠ্যগ্রন্থ সম্পর্কে বিরাগ বর্ধন করিয়াই চলিতেছে। জুলে ভার্ণ ও ডুমার ন্যায় গল্প ও শিক্ষা একসঙ্গে দিবার মত সাহিত্যিক এদেশে বিরল। অথচ ভাল গল্প-উপন্যাস হইতেই কিশোর-কোমল মনে ভূগোল-ইতিহাস-বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ জন্মে। এ বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ—

'ডুমার নভেল পাঠ করিয়াই প্রথমে ফ্রান্সের ইতিহাস, তাহা হইতেই ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করিবার আগ্রহ আমার মনে জন্মিয়াছিল। চন্দ্রশেখর পাঠ করিয়াই আমি যে একদা দুষ্প্রাপ্য সায়ের মুতাক্ষরীণ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে অন্বেষণে পাগল হইয়া উঠি, তাহা নহে, বঙ্কিমবাবু ও রমেশবাবু-প্রণীত উপন্যাস

পাঠ করিয়া তখনকার বহু বাঙ্গালী যুবকের মনে ইতিহাস পড়িবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে।'[৮১]

ছাত্রদের উপযোগী ভাল অনুবাদগ্রন্থ নাই বলিয়াও তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ ছিলেন। বিদ্যাসাগর 'জাতীয় ভাবশূন্য পাঠ্যপুস্তক' রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া—বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশের নীতি ছাত্রদের সম্মুখে না ধরিয়া তিনি Æsop's Fable (কথামালা) অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া, দুঃখিত অমৃতলাল বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়াছেন। নালিশের ভাষাও উল্লেখ করিবার মত—

'বড় দুঃখে ভয়ে ভয়ে আপনার হৃদয় মুচড়াইয়া দিয়া লোকে কখন কখন নিজ পিতার বিরুদ্ধে একটা নালিশ করিয়া ফেলে, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে কৃষক যেমন পেটের জ্বালায় দেবতাকেও গালি দেয় আমি তেমনি চক্ষুঃপথে রক্তাশ্রু টানিয়া আনিয়া বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিয়া মহাত্মা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছি।'[৮২]

ছাত্রদের পাঠ্যগ্রন্থের দুরবস্থার কথা বলিতে বলিতে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে স্মরণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"আজ যদি রামেন্দ্রসুন্দর জীবিত থাকিতেন, আমি তাঁহার পায়ে মাথা লুটাইয়া বলিতাম, 'বাবা, তোমার প্রাণ আছে, শক্তি আছে, ভাব আছে, ভাষা আছে, আমাদের ছেলেদের জন্য একখানা বই দিয়ে যাও— যাহাতে তাহারা রূপকথা শুনিতে শুনিতে বিজ্ঞান শিখিয়া লইতে পারে।"[৮৩]

তিনি প্রসঙ্গক্রমে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এ যুগের L.T. B.T. ডিগ্রীধারী শিক্ষকদের তুলনায় সেকালের 'অসভ্য' গুরুমহাশয়রা শিক্ষণকার্যে অনেক দক্ষ ছিলেন।

বিভিন্ন সম্মেলনে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁহাকে অভিমত ব্যক্ত করিতে হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবি ও লেখকবৃন্দের সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার অকুণ্ঠিত ও অসংশয়িত শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেও, যাহা সমালোচনার যোগ্য মনে করিয়াছেন, দ্বিধাহীন ভাষায় তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। বাংলা গদ্য সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে,

৮১ সভাপতির সূচনা-বচন (বীরভূম): মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩২

৮২ সভাপতির ভাষণ (বসিরহাট): পল্লী-বাণী, চৈত্র ১৩২৭

৮৩ সভাপতির সূচনা-বচন (বীরভূম)

এই গদ্যরূপিনী ভাষার 'জনকস্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয় ; সৌষ্ঠব-সম্পাদনে সপুত্র মহর্ষি ও অক্ষয়কুমার দত্ত ; সালঙ্কারা কন্যা সৎপাত্রে দান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র…।'

বাংলা গদ্যে প্রয়োজন মতো তৎসম শব্দ ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' তৎসম শব্দবর্জিত হইয়া বাংলা ভাষাকে কিরূপ শ্রীহীন করিয়া তুলিয়াছিল তাহা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 'সংস্কৃতের ভূরিভোজনে নবীন গদ্যের ওজন' যখন অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিতেছিল—

'সেই সময়ে এই দুইখানি পুস্তক অতি উচ্চশিক্ষিত হতে বর্ণমালার সহিত পরিচিতমাত্র সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ের আদর অধিকার করে বসে। সংসারের নিত্য ঘটনার বাস্তব চিত্র প্রদর্শনে, লোকালেখ্য-লিখনে ও ব্যঙ্গ শ্লেষের রঙ্গমাধুর্যে পুস্তক দুখানি অতুল ঐশ্বর্যশালী হলেও, ভাষা ঠাকুরাণীর শ্রীঅঙ্গ হতে সংস্কৃত অলংকার দূরীকরণের প্রয়াসে মাকে যে কেবল শাড়ী শাঁখায় সাজান হয়েছিল, তা নয় ; মাঝে যেন তাঁর কোমরে গামছা পর্যন্ত জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারা যায়।'[৮৪]

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের সাধনায় যাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই প্রতি অমৃতলালের শ্রদ্ধা ছিল। এই সাহিত্যসেবকবৃন্দের মধ্যে তিনি সর্বাধিক শ্রদ্ধা করিতেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। তাঁহার প্রতিটি অভিভাষণেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি বেশী উদ্দীপ্ত হইয়াছেন। মহৎ উপন্যাস রচয়িতা বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসম্রাট নহেন ; অমৃতলাল বলিয়াছেন—

'সমগ্র ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনকে আদরের আহ্বানে, আদর্শের আদেশে বাংলা পড়িতে, শিখিতে, লিখিতে, প্রথম আকৃষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আজ বাংলার সাহিত্য-সাম্রাজ্যের সম্রাট।'[৮৫]

তাঁহার—

'বঙ্গদর্শনের দর্পণেই শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার হৃদয়গতভাব ও ভাষার অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানগৌরবোজ্জ্বল প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখিয়া মোহিত হইল।'

৮৪ সভাপতির অভিভাষণ (ধলা) : মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৩৪

৮৫ সভাপতির অভিভাষণ (বসিরহাট)

অমৃতলাল তাঁহার শেষ জীবনে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ধারার প্রতি নব্যবঙ্গের অনুরাগ কমিয়া আসিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাও আর তাঁহাদের মনঃপূত নহে। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছিলেন বীরভূমে ও ধলায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনে। তিনি শ্লেষপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, যদি বঙ্কিমের ভাষা না চলে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পবিত্র জাহ্নবী-জলও এখন অচল !

বঙ্কিমী ভাষাকে অতিক্রম করিতে গিয়া নব্যবঙ্গীয়রা যে ভাষার রাজ্যে একটা ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহাও অমৃতলালের লক্ষ্য বহির্ভূত হয় নাই। ইহার উপর আবার এক-একটা জেলার বৈশিষ্ট্য অনধিকার প্রবেশ করিয়া ভাষার সর্বজনীনতা বিঘ্নিত করিতেছিল। অমৃতলাল ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন—

'প্রত্যেক জেলার লোকের যেন একটা জিদ দাঁড়িয়েছে যে, জোর জবর-দস্তি যা করে পারি নদীয়া-ইক কি যশোর-ইক কি ঢাকা-ইক ক্রিয়া কর্ম কর্তাগুলোকে ধরে নিয়মভঙ্গের পংক্তিভোজে বসিয়ে দি।'[৮৬]

'নিয়মভঙ্গের পংক্তিভোজ'— এইরূপ অত্যুৎকৃষ্ট শ্লিষ্টপ্রয়োগ বাংলা ভাষায় দুর্লভ। ইহার ফলে বাংলা ভাষার যে দুরবস্থা, তাহার করুণ চিত্রও অমৃতলাল অঙ্কন করিয়াছিলেন—

"... ভাষাসুন্দরীকেও কতকটা গয়নাগাঁটী খুলিয়া মোটা শাড়ী পরিয়া এ জেলা ও জেলা ঘুরিতে হয় ; পাঠক-পাঠিকার সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়া তাঁহাকে কোথায় বা বলিতে হয় 'চাহিদা', কোথায় 'করলুম', কোথায় 'বল্‌ল', কোথায় 'চল্‌লাম', কোথায় বা 'ঝাঁটা' কোথায় বা 'পিছে'।"[৮৭]

বলিষ্ঠতাবিহীন কাব্যময় নব্যগদ্যের উদাহরণও তিনি কোথাও কোথাও দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকারকদের সম্পর্কেও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। অমৃতলাল তাঁহার প্রহসনের কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ প্রবণতাকে পরিহাস করিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিরাটত্ব সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। বীরভূমে, নৈহাটিতে এবং মেদিনীপুরে প্রকাশ্য জনসভায় উচ্চকণ্ঠে তিনি রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি করিয়াছেন। নৈহাটিতে

৮৬ সভাপতির অভিভাষণ (মজঃফরপুর) : মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৩৪
৮৭ ঐ (বীরভূম)

বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখক-লেখিকা সম্পর্কে তাঁহার সশ্রদ্ধ মতামত ব্যক্ত করিয়া শেষে বলিয়াছিলেন—

'আর একটি নাম বাকী রাখিয়াছি— তেত্রিশ কোটী দেবতাব নাম উচ্চারণ করিয়া অবশেষে বলিতে হয় ওঁ তৎসৎ। এইবার ওঁ তৎসৎ উচ্চারণমাত্র করিব !··· কবিকুলোজ্জ্বল রবি এক্ষণে বঙ্গগগনের শীর্ষদেশে বিরাজ করিয়া লোককে আলোকিত পুলকিত উদ্দীপিত ও সঞ্জীবিত করিতেছেন।··· আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি কেবল কিরণানুভবে তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে পারে মাত্র।'

বীরভূমে বলিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কাব্যজগতের 'দেবারতার'। কিন্তু তাঁহার রচনায় যে 'জগৎজাগানো জীবনীশক্তি' আছে তাহার অনুকরণের প্রয়াস না করিয়া আমরা কেবল তাঁহার মতো 'ক-য়ে দীর্ঘ ঈ-কার' অভ্যাস করিতেছি! বিশেষ পরিতাপের সহিত অমৃতলাল বলিয়াছিলেন—

'রবিবাবু ক-য়ে দীর্ঘ ঈ-কার দিলেন বলিয়া আমিও যদি তাই দিতে যাই, তাহা হইলে লোকে যে ছ-য়ে দীর্ঘ ঈ-কার দিয়া আমাকে ছী ছী করিবে।'

নৈহাটি সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি বাংলা নাটক ও নাট্যকারদের সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য বিবৃত করিয়াছেন। তিনি নিজে কেন নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন তাহাও আমরা জানিতে পারি।

পরানুকরণকে অমৃতলাল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ মনে করিতেন। তাঁহার নিজের সুদীর্ঘ জীবনের আচার-আচরণ কর্ম ও চিন্তা সম্পূর্ণরূপেই স্বাদেশিকতায় মণ্ডিত ছিল। তাই ইংরেজীভাবের অনুকরণ তাঁহাকে বিশেষ চিন্তিত করিত। ইংরেজী ভাব ও ভাষা আমাদের জীবন ও সাহিত্যে নিদারুণ আধিপত্য করিয়াছে বলিয়া তিনি মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিতেন। এই কথাই তিনি সর্বদা বলিতেন যে, ইংরেজ পলাশীক্ষেত্রে বঙ্গবিজয় করে নাই, করিয়াছে হিন্দুকলেজে তেজোময় সাহিত্য-অসির ঝলকে। ইংরেজী সাহিত্যপাঠের ফলে এক সময়ে আমাদের মস্তিষ্কের তেজ বর্ধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু 'রজতসূয় যজ্ঞকারী' ইংরেজকে নকল করিতে গিয়া দেশীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি বিদ্রোহ করিতে আমাদের বাধে নাই। ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া ইংরেজী ভাব আমাদের মনে এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, আমাদের 'স্বাধীনতা' ও 'স্বরাজে'র জন্য তর্জন-গর্জন শোনা যাইত তাহার সবটাই ছিল ইংরেজের নকল।

মতে—

'এই যে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে আমরা হাহাকার করছি, স্বরাজ স্বরাজ বলে গর্জন আরম্ভ করেছি, এও সেই ইংরেজী স্বাধীনতা— ইংরেজী স্বরাজ।'[৮৮]

আমাদের পরমুখাপেক্ষিতায় বিষণ্ণ অমৃতলাল মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনে তাঁহার আক্ষেপ ব্যক্ত করিয়াছেন। এই অভিভাষণ সম্পর্কে 'মানসী ও মর্মবাণী' যে মন্তব্য করেন তাহা উল্লেখযোগ্য—

'এই সুন্দর অভিভাষণে অল্প কথায় চিন্তাশীল শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় জাতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন।... পরিশেষে তিনি যে সকল সময়োপযোগী যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করা সকলের কর্তব্য।'[৮৯]

বঙ্গসাহিত্যের সর্ববিধ উন্নতি ও বিকাশসাধন করিতে হইলে বঙ্গসাহিত্যের সকল সেবক ও সেবিকাগণকে অর্থাৎ 'বঙ্গের সাহিত্য-পরিবারকে' পরস্পরের নিকট অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই ছিল অমৃতলালের অভিমত। কিন্তু 'আত্মাভিমান' সেই মিলনপথেরও বাধা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।[৯০] অতি দুঃখেই অমৃতলাল একবার বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন—

'আজকাল আমরা অনেক সাহিত্য-সম্রাট, সাহিত্য-যুবরাজ, সাহিত্য-বিশারদ, সাহিত্য-রথী, সাহিত্য-ঘোড়সোয়ার আদি আছি। কিন্তু Robinson Crusoe কি Gulliver's Travelsএর মত একখানা বইও আমাদের সাহিত্যে বেরুল না!'[৯১]

সাহিত্য-সম্মেলনে বা বিশেষ সভায় সাধারণভাবে সাহিত্য-সংক্রান্ত এইরূপ নানাকথা তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বঙ্গদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নাট্যজগতের বহুদর্শী প্রবীণ সাধকরূপে নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কেও তাঁহাকে অনেক স্থলে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। ১৩০৭ সালে বঙ্গনাট্যশালার সাম্বৎসরিক উৎসব-সভায় তিনি বেশ বিস্তৃতভাবে বাংলা নাটক ও নাট্যশালার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে তাঁহার

৮৮ সভাপতির অভিভাষণ (মজঃফরপুর)

৮৯ মানসী ও মর্মবাণী : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬

৯০ সভাপতির অভিভাষণ (নৈহাটি) : ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৩০

৯১ সভাপতির বক্তৃতা (বাঁশবেড়িয়ার সাধারণ পাঠাগার, ১৩৩১)

ব্যক্তিগত নাট্যসাধনার কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন,[৯২] একথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

উত্তম গদ্যের স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় লিখিয়াছেন—

'উত্তম গদ্যরীতিতে ছায়াতপ থাকে, উচ্চাবচতা থাকে, পাঠকের মন জিরিয়ে নিতে পারে মাঝে মাঝে এমন চটি বা সরাই থাকে...।'[৯৩]

অমৃতলাল যে উত্তম গদ্যরীতির সহজ সাধক ছিলেন তাহা তাঁহার যে কোন বিষয় অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিলেই উপলব্ধ হয়।

৯২ ১৩০৭ সালের মাঘ মাসের রঙ্গভূমিতে 'অমৃতবাবুর বক্তৃতা' দ্রষ্টব্য।

৯৩ 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক', পৃ ৯১

ইংরেজী রচনা

অমৃতলালের বাংলা গদ্যরচনাগুলির ন্যায় ইংরেজী রচনাগুলিতেও তাঁহার বহুদর্শী অভিজ্ঞতা, বাস্তবপ্রীতি এবং বক্তব্যবিষয় সম্পর্কে অবিচলিত বিশ্বাস সরস ও আন্তরিক ভঙ্গীতে বর্ণিত। তাঁহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট বাগ্‌বিধির ছাপ ইংরেজী রচনাগুলিতেও পড়িয়াছে। যে অনায়াস লঘু-তরল রীতি তাঁহার বাংলা গদ্যের সর্বত্র সঞ্চারিত, ইংরেজী রচনাতেও তাহার অভাব নাই। রচনাগুলিতে বিষয়ের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সমাজ-সংস্কার, নাট্যসমালোচনা, শৈশবস্মৃতি, স্মৃতিপূজা, চরিত্রচিত্র, অতীত কলিকাতার স্মৃতিচিত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এই সকল প্রবন্ধাদি রচিত।

প্রাপ্ত রচনাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে এইরূপে বিন্যস্ত করা যায়—

'Social Evil in Cornwallis Street' (1903), 'Visarjan—An appreciation' (1923), 'Step Aside' (1925), 'Looking Backward' (1925), 'The Puja in the Retrospective—its social and festive aspects' (1926), 'Christmas under Sunshine' (1926) 'Ksherode Prasad—his contribution to Bengali Drama' (1927), 'A Stroll in the Hogg Market' (1927), 'A Divine Messenger' (1928) এবং 'Calcutta as I knew it once—Tales of a Grandfather' (1928).

১৯০৩ সনে বিডন স্ট্রীট হইতে গ্রে স্ট্রীট পর্যন্ত অঞ্চলে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপরকার বাড়ীগুলিকে পতিতালয়ে পরিণত করিবার যে উদ্যোগ হয় *Social Evil in Cornwallis Street* নামক প্রস্তাবটি[১] তাহার সার্থক প্রতিবাদ। একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—

"When the owners of the house facing our theatre, first thought fit to convert their ancestral home where once their mothers and sisters lived, into a brothel, I

১ The Bengalee · 15.3.1903

tried to persuade them, through their friends, from putting this infliction on their old neighbours and family friends. Respectable tenants were not wanting, but the owner meant to make every brick pay; and money earned with honesty and decency could not cope with their demands. Failing in the above attempt, if I remember rightly, an application signed by a number of respectable residents was sent to the Commissioner of Police. But my growing infirmity prevented me from taking any further active step in the matter.'

এই প্রতিবাদে সুফল ফলিয়াছিল।[২] রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও তিনি যে সমাজের হিতাহিত সম্পর্কে কিরূপ চিন্তা করিতেন উক্ত প্রস্তাবটি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য তাঁহার 'রঙ্গালয়' পত্রে এই ধরনের প্রস্তাবকে 'বুজরুকী' বলিয়া কটাক্ষ করেন।[৩] পরে তিনি একটি ব্যক্তিগত পত্রে অমৃতলালের নিকট অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।[৩ক]

২ ২৮এ মার্চের বেঙ্গলী হইতে জানিতে পারি যে, পুলিশ কমিশনার Bignell 'has resolved upon issuing an order on the landlords of this locality not to let their houses to ill-famed women any more.'

৩ দ্রষ্টব্য রঙ্গালয়, ১লা চৈত্র ১৩০৯

৩ক পত্রটি অপ্রকাশিত:

'শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

195, Cornwallis Street
25th March, 1903.

কল্যাণবরেষু,

বাবাজীউ, এবারকার রঙ্গালয়ে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার একাংশে আপনার প্রতি কটাক্ষ আছে। হারাণ ভায়া [হারাণচন্দ্র রক্ষিত] সেই অংশের কথা লইয়া আমাকে অনুযোগ করিলেন। আপনি যে এই অংশ পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। যুক্তির খাতিরে আমি লিখিয়াছিলাম, বেশ্যার সমর্থন করা আমার অভিপ্রেত নহে, তবে এই সকল হুজুগের মধ্যে কেবল Humbuggism* আছে ইহাই আমি দেখাইতে চাহি। আপনার অগোচর কিছুই নাই, আমার যাহা কিছু বিদ্যা আপনাদের প্রসাদেই, আমি সত্য কথা লিখিতেছি কি মিথ্যা লিখিতেছি তাহা আপনি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারেন।

*'Humbuggery'

অমৃতলালের *Visarjan—An appreciation*[8] নাট্যসমালোচনার সার্থক দৃষ্টান্ত। একটি অভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ বিচার যে ভাষার প্রসাদে কিরূপ রসোজ্জল রূপ লাভ করিতে পারে তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধ হইতে মিলিবে।[৫]

শিল্প ও সৌন্দর্যচর্চার আদর্শ নিকেতন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী সম্পর্কে লেখকের সশ্রদ্ধ অভিমত লক্ষণীয়। নবীন অভিনেতৃকুলের অভিনয় সম্পর্কেও তাঁহার সপ্রশংস উক্তিতে বিনয় ও সত্যভাষণের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে—

'So, when one heard that cast included amateurs, mostly members of that house, one anticipated a real treat. But as the play progressed, I felt that I, an old stage-horse, was receiving object lessons in the art of acting.'

এই দলের অভিনয়ে তিনি যে-আধুনিকতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গে যুগে যুগে অভিনয়রীতিতে কিরূপ পরিবর্তন আসে তাহার আভাসও দিয়াছেন—

"The style of acting changes every twenty years, if not sooner, and Kemble's Hamlet on the Irving stage would be out of date to-day. So, Irving and Matheson Lang likewise would be two perfect yet different Hamlets. So, here also the Tagore 'troupe' were up-to-date."

রঘুপতি ও অপর্ণার অভিনয়ের বিশ্লেষণ যেমন সূক্ষ্ম তেমনই কবিত্বপূর্ণ—

"Few actors know how to make their entrances and exits. Babu Dinendra Nath Tagore, as the high priest of the Holy Mother's Temple, entered and, before he uttered a single word, we knew that the genius of an actor was in him. He looked the haughty Brahmin,

পরন্তু আপনি আমার কথায় নিজে ব্যথিত হইলে আমি বড়ই মর্মপীড়িত হইব। যেমন করিয়া লিখিলে আপনার রাগ পড়ে আমি তেমনি করিয়া লিখিতে প্রস্তুত। আমাকে স্নেহ করেন বলিয়া আমি আপনার জন্ম এত চিন্তিত।... ইতি

শ্রীপাঁচকড়ি দেবশর্মা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

[8] Indian Daily News : 4. 9. 1923

[৫] শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে (৩য় খণ্ড) এই সমালোচনার উল্লেখ আছে (পৃ ১১৪-১১৫)।

proud of his 'paita', conscious of his authority, intriguing, designing, yet never losing his native dignity ; no convention, no mannerism, no stiffness.

Next comes the little lady in the character of Aparna, the beggar-girl. As everything on the stage must be counterfeit, a real *Ranee* was chosen to represent a beggar ; the duckling glides in and out of the stage as if the boards were her play-pond ; native in speech, artless in manners, how sweetly she laid her virgin cheek on the step-stone to caress her pet, her stolen and slain kid, the aching heart murmuring soft words soaked in tears."

রবীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্পর্কে তাঁহার মতামত একাদিকে যেমন উচ্ছ্বসিত অপরদিকে তেমনি যথার্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ। দর্শকদের তিনি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এই বলিয়া যে রবীন্দ্রনাথের আভিনয়িক অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ না করিয়া তাঁহারা যেন কবির অভিনয়ের অন্তর্নিহিত শক্তিটুকু গ্রহণ করেন—

'After the officers have preceded comes the General. *The* Rabindranath. Born Great, he has achieved greatness, and greatness courts him too. The great poet is a great actor, almost a master of the technique of stage-craft. But, young aspirators to histrionic fame, beware of the great master ! As in poetry one must drink at the fountain of Rabindranath's mind and not simply borrow his words, so on the stage, one should imbibe the spirit of his acting and not imitate him in action, attitude, gesture or pose. They are all his own, and the copyright is not to be infringed.'

রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অভিনয় সম্পর্কে অমৃতলাল যে-মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সমালোচনার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রসসাহিত্যের অনির্বচনীয়তায় রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে—

"In enduwing Rabi Babu with a great mind, Providence

seems to have prepared a special mould to cast the golden casket in which that mind was to find its home. There is, in the masculine frame of Rabindranath, such a judicious admixture of the faminine, that the product almost approaches the Divine. He sighs, murmurs, wails, kneels, claps his hands, draws out his long vowels ; and we feel that the woman peeps out without making effeminate the poetry of his presentation.

এই সমালোচনা পাঠ করিয়া শরৎচন্দ্র যে কিরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত অমল হোমকে লেখা তাঁহার একটি ব্যক্তিগত পত্র হইতে জানা যায়।[৬]

Step Aside[৭] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে লিখিত একটি আত্মনিষ্ঠ শোকরচনা। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে অমৃতলালের 'আমার পূজা' নিবন্ধে ব্যক্তিগত শোকের তীব্রতা যেরূপ লিরিক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল এই প্রবন্ধেও সেই সুর পরিলক্ষিত হয়। প্রথম অনুচ্ছেদটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে—

'Step aside ye crowned heads ! Step aside ye proud peers and belted knights ! Stand back all mortal world and for one moment hush ! Let from the frail frame a Great Soul pass away in peace to the abode of Eternal Bliss !'

প্রসঙ্গত অসি-ভল্লধারী ভারতীয়ের শক্তিমত্তা ও ভারতীয় নারীর মাতৃহৃদয়ের কোমলতায় নিহিত শক্তিসঞ্জীবনী প্রেরণার উল্লেখ করিয়া লেখক এই মতে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতীয় বীরধর্ম আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত চিত্তরঞ্জনের যে মহত্ত্ব, লেখকের মতে, তাহা তাঁহার দানশীলতার জন্য নহে দানশীলতা হিন্দুস্থানের 'ধর্ম' নহে, 'অভ্যাস' মাত্র—

---

৬ 'বাজে শিবপুর : হাবড়া

অমল, ১২ই ভাদ্র ১৩৩০

আমাকে বিসর্জনটা দেখাও।... তোমাদের কাগজে ভুনি বোসের প্রশংসাটা পড়ে যেতে না পারার দুঃখটা আরও যেন বেড়ে গেল। আচ্ছা, ও লেখাটা সত্যিকার বল তো কার অমন ইংরেজী কি ও বুড়ো লিখতে পারে ? এ যে রীতিমত মুন্সিয়ানা।... তোমাদের

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'

৭ The Calcutta Review : August 1925

'So in charitable Bengal the rich lawyer of Russa Road was but another charitable man. The thing that made the Bengali to raise his brother of Bikrampur to the throne of worship is his act of renunciation, his act of sacrificing all, his entire annihilation of Self.'

চিত্তরঞ্জনের সর্বস্বত্যাগের মহিমা লেখক তাঁহার একটি মৌলিক উপমার সহায়তায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বর্ণনার গুণে তাহাতে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের স্বাদ মিলিতেছে—

"He is no man who does not exclaim out 'Ahaha' when he sees a person stumble in his walk ; but the sight of one leaping down from a terrace forty-five feet high, stops the beating of the hearts of all those who look at it, and the stunned heart bound up to the mouth when that one stands up instantly erect and taller than what he looked when high above on the terrace. This wondrous feat, in these times of scrambling up the greasy post to catch the winning purse, was performed by Babu Chittaranjan Das. He threw himself down to rise stronger, he stooped to conquer. Ah ! What a conquest it was !"

রচনাটির শেষাংশও বর্ণনার আন্তরিকতায় মর্মস্পর্শী—

'The lamp-lighter has done his task and retired to rest ; an illuminated street is now before us, my countrymen, and if we will, we can walk up to our workshop.

An illuminated street is often before you too, our Rulers ! You also can tread this road both for your and our good if you will see your way by the Bengal light, leaving your Roman candle for service at home.'

Looking Backward[৮] নামক রচনাটিতে জীবনের শেষপ্রান্তে

[৮] The Servant : 7. 3. 1925

উপনীত নাট্যকার পিছন ফিরিয়া তাঁহার নটজীবনে প্রথম পদক্ষেপের বিস্মৃত দিবসটির দিকে চাহিয়াছেন। অমৃতলালের অভিনয়-জীবনের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই রচনার অনেকখানি প্রাসঙ্গিক অংশ পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃ ৩৫-৩৬)। বর্ণনার স্নিগ্ধ প্রসাদগুণে *Looking Backward* একটি অতি উপাদেয় সাহিত্যরসপুষ্ট স্মৃতিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। নটনাথের চরণতলে আত্মনিবেদনের সেই পরমক্ষণটির কথা তাঁহার মনের মধ্যে কিরূপ সুখের স্মৃতিরূপে অক্ষয় হইয়া ছিল তাহা এই রচনাটি হইতে জানা যায়। ১৮৭২ সনের নভেম্বর মাসে (অর্থাৎ ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধনের কয়েকদিন পূর্বে) শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলে ধর্মদাস সুরের সহিত আকস্মিক সাক্ষাৎ ও বাগবাজারে রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরকার সুরম্য হলঘরে মহলারত অর্ধেন্দু-শেখরের সহিত সহসা মিলন তাঁহাকে ডাক্তারি অথবা ব্যবসায়ের সরল পথ হইতে সরাইয়া কিভাবে শিল্পসাধনার দুরূহ পথে টানিয়া আনিল তাহা কোথাও লঘু-তরল কোথাও বা গভীর-গম্ভীর ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার নটজীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ তিনি তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বিশিষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—

> 'If during a career covering over a period of more than half a century I could have given a moment's solace to a wearied mind, have brought a single smile on the lips of one brother or sister with a troubled soul, my life as a player, playwright and actor-manager has been worth living.'

The Puja in the Retrospective—its social and festive aspects[৯] নামক রচনায় অমৃতলালের জীবনের আর এক বিস্মৃত অধ্যায় আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হইয়াছে। বাষট্টি বৎসর পূর্বে তাঁহার বালক বয়সে মহাপঞ্চমীর প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে প্রমত্ত ঝড়ের তাণ্ডব চলিয়াছিল তাহার ভয়াবহ স্মৃতি অনেকবারই তাঁহার মনে পড়িয়াছে।[১০] এখানেও সেই ঝড়ের জীবন্ত চিত্র দেখিতে পাই—

> "The crashing of uprooted trees, the rattling of tiles, the swishing of bamboo roof swept swiftly over towering

৯ Forward : Puja Number 1926

১০ 'ঘরের কথা'র বা 'বিসর্জন' প্রবন্ধে এই ঝড়ের উল্লেখ আছে।

waves in the ocean of air, the thundering sound of falling masonry mingled with terrified cries, wails, growls and howls of man and beast voiced a vicious concert, the burden of which was 'Horror' !"

শুধু ঝড়ের বর্ণনাই নহে, ঝড়ের সময়ে কলিকাতাবাসীদের অবস্থা, স্থলে ও গঙ্গাবক্ষে ঝড়ের পরের দৃশ্য, ষষ্ঠীর উজ্জ্বল প্রভাতে আবার পূজার আনন্দের সঞ্চার প্রভৃতি লেখকের বর্ণনার গুণে মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করিয়াছে। তৎকালীন পূজার বৈশিষ্ট্য, দেশে দ্রব্যাদির মূল্য, বাঙালীর মনোভাব, এমন কি ঢাক-ঢোল-কাঁসির আওয়াজ পর্যন্ত আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্যবর্ণনার প্রসঙ্গটিতে একাধারে সামাজিক ও ঐতিহাসিক চিত্র ফুটিয়াছে—

"Even the aristocratic Zames Rose of Lal Bazar would not charge more than five rupees for the fashionable foot-wear of a Sil, Mallick, Tagore or a rich Banian, Brahmin or Kayastha. Rupees three spent for his 'Santi-puri' dhuti and chaddar would please the most fastidious boy and a piece of Dacca Gulbahar bought at Rupees eight then brought a smile on the lips of a proud bride."

সেকালের কলিকাতার উল্লেখযোগ্য পূজার কথা বলিতে গিয়া তিনি জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁয়ের দালানের প্রতিমা, কুমারটুলী-ভবনের অভয়চরণ মিত্রের বাড়ীর পর্বতপ্রমাণ মিঠাই এবং শোভাবাজারের রাজাদের দুই বাড়ীর জাঁকজমক ও আনন্দোৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন।

সেকালের সেই সর্বব্যাপী আনন্দযজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়া এবং নিরানন্দ বর্তমান কালের দিকে চাহিয়া তাঁহার দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে। বাঙালী জাতিকে তিনি পুনরায় আনন্দোচ্ছল হইতে উপদেশ দিয়াছেন। সেই সঙ্গে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি লেখকের অবিচলিত ও সহজাত অনুরাগ পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে—

"My ever beloved Bengal, revive your ancient feasts and holidays ; let not your great 'Durga Puja' pass away in

the obscurity of testamentary old 'dalans' and the cottage of priests ; make again of it a season of Love, Peace and Charity."

Christmas Under Sunshine প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সনের ডিসেম্বরের 'Forward' পত্রে।[১০ক] রচনাটির দুইটি অংশ— *A Scene From European Calcutta* ও *The Doctor's Adventure*।

অমৃতলালের অনেক গল্পেই যেমন মূল কথাবস্তুর সহিত নানা প্রসঙ্গ জড়িত হইয়া গল্প ও নক্শার মিশ্রণে এক বিচিত্র মজলিসী রসের আমেজ পাঠকহৃদয়কে আবিষ্ট করে, এই ইংরেজী রচনাটিতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মনোধর্মের যে বিশিষ্টতা তাঁহার বাংলা গদ্যের রীতিকে অনন্যতা দিয়াছে, ইংরেজী রচনার ক্ষেত্রেও তাহার অনায়াস ও অকুণ্ঠিত প্রকাশ দেখা যায়। স্বভাবসিদ্ধ অনুপ্রাস তিনি ইংরেজী শব্দেও যথেষ্ট সৃষ্টি করিয়াছেন।

ডাক্তার মারে ও তাঁহার অনুপমা পত্নীর জীবনকথা বিবৃত করিতে গিয়া যখন যে-প্রসঙ্গ তাঁহাব মনে আসিয়াছে তাহা তৎক্ষণাৎ বর্ণনা করিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু সে বর্ণনাও এমন আন্তরিক ও অকৃত্রিম রসরূপ লাভ করিয়াছে যে কোথাও অবান্তর বা অসঙ্গত মনে হয় না। আবার ডাক্তার মারের জীবনের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা করিবার সময় তাঁহার লেখনীতে দক্ষ গল্পলেখকের পরিমিত লিপিকৌশলও লক্ষিত হয়।

রচনাটি আরম্ভ হইয়াছে গুণবতী মিসেস মারের বর্ণনায়—

'She was always tidy ; tidy always was Mrs. Murray. Summer, Winter or Rains, morning, noon or night, none had ever seen her in careless toilet... She always wore her own auburn hair, naturally wavy, parted in the middle and tied behind in a round fluffy knot which hung on her swanlike neck.'

রচনাটির *The Skilled Wife* ও *The Loving Wife* অংশে মিসেস মারের উদ্যানরচনায় নৈপুণ্য, গৃহলক্ষ্মীরূপে তাঁহার বিভিন্নমুখী কর্তব্য এবং প্রেমময়ী পত্নীরূপে ডাক্তার মারের জীবন সুখে ও সন্তোষে পরিপূর্ণ করিয়া

১০ক Forward : Congress and Winter Number, 1926

তোলার বিবরণ আছে। বাহান্ন বৎসর বয়স্ক ডাক্তারের 'grey and golden head' চিন্তাভাবহীন এবং জীবন তাঁহার পালকের মত লঘু—

'...but most happy he was in the loving partnership of an ever youthful wife who made him forget that he never was a father and only occasionally allowed a secret sigh to escape on thinking that such a woman was not leaving a copy behind.'

ইহার পর ডাক্তার মারের পূর্বজীবনের বর্ণনা আছে *Disappointment in I.M.S.* অংশে। দুইবার I.M.S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তিনি চাকরি পান নাই। তাঁহার ডাক্তার-জীবনের সূচনা, সংগ্রাম, সাধনা ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। পরবর্তী অংশ *Domestic Life*-এ মিসেস মারের যত্নে কিভাবে একবালপুরের ছোট বাড়িটি 'a tiny fairy bird's nest' হইয়া উঠিল, তাহার বর্ণনা।

ইহার পাশে ডাক্তার মারের এক সম্পর্কিত ভাইয়ের জাঁকজমকপূর্ণ অসার জীবন রঙ্গব্যঙ্গে চিত্রিত। শেরিডানের শিষ্য অমৃতলাল এই ভাইটির নাম দিয়াছেন Mr. Sparkle। ইনি গোড়ায় ছিলেন 'a young baron in the peerage list of Clive Street'; পরে হন 'a member of the Jute Earldom of Clive Street aristocracy'। ডাক্তার মারের মধুর দাম্পত্য জীবনের বিপরীতে মিঃ স্পার্ক্‌লের অবিবাহিত জীবন সম্পর্কে অমৃতলাল মন্তব্য করিয়াছেন—

'Liberty being a relative term, Heaven knows how Mr. Sparkle conceived an idea from his first youth that a wife was a taskmaster to be dreaded of most. Bold enough to order his meal, work double shift at a time when many others thought it a dull season, proud of spending his money in entertainments and display, never feeling at ease when not in society, he kept himself a lockout from the factory of wedlock.'

এই অবস্থায় মিঃ স্পার্ক্‌লের গৃহস্থালি দেখাশোনা করে 'a maiden sister of a certain or uncertain age'। যেহেতু বড়দিনের সৌত্রোজ্জ্বল

আনন্দময়তার মধ্যে 'jute did not suit well', মিঃ স্পার্ক্‌ল আসিয়া উপস্থিত হইলেন ডাক্তার মারের খিদিরপুরের বাড়িতে। তারপর সকলে মিলিয়া বড়দিনের সওদা করিতে বাহির হইলেন। ইহারই বিবরণ পরবর্তী অংশ *X'mas in Bengal*-এ আছে। মিসেস মারের সহিত বিভিন্ন দোকানে মানসভ্রমণ করিবার সময়ও অমৃতলালের মন চিন্তাশূন্য ছিল না। মিসেস মারের চোখ দিয়া চৌরঙ্গীর সম্ভ্রান্ত দোকানগুলির দ্রব্যসম্ভার দেখিতে দেখিতে বাঙালীর জীবিকা-সমস্যায় উদ্বিগ্ন অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

'The thought of mechanical knowledge and vocational training, the supplementing of the hands and eyes to the culture of the brain is in the air of Bengal; why not Bengali fathers then let their children play with tools and models and grow up into clever amateures or even take to some profession if inclination and opportunity combine.'

এই প্রসঙ্গে বেকার-সমস্যা-জর্জরিত বাংলা দেশের মানুষের নিকট বৃদ্ধ অমৃতলালের উপদেশ—

'Take an old man's advice, my young friends, and present your children with a set of carpenter's tools or fret-work things, buy them clock-work, tin-trains and model locomotives;...and you will not only save the doctor's bill but lead your community a long way on towards solving the dreadful bread question.'

ইহার পর রচনাটির দ্বিতীয় ভাগ *The Doctor's Adventure* আরম্ভ হইয়াছে। বড়দিনের রাত্রে ডাক্তার মারের একটি রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা এই অংশের বর্ণনীয়। ইহাকে একটি স্বতন্ত্র গল্পরূপেও গণ্য করা যায়।

ডাক্তার মারের গৃহে বড়দিনের ডিনার। নিমন্ত্রিতদের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। সহসা 'a tall thin figure of no describable complexion, dressed in dull grey' তাঁহার নিকট আসিয়া স্ত্রীর গুরুতর অসুখের সংবাদ দিল। ডাক্তার মারের মনে হইল, লোকটির কণ্ঠস্বর Ventriloquist-এর মতো এবং—

'The doctor diagnosed the presence of hidden tears in the dry glassy eyes of the visitor and read extreme anguish and despair in his voice; he also saw no fee in expectation from the attire of this apparition of a man.'

মিসেস মারের নিকট বিদায় লইয়া তিনি লোকটিকে অনুসরণ করিলেন। মাথার উপরে ক্ষীয়মাণ চন্দ্র মেঘের আড়ালে লুকাইল। প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যার গাঢ় ধোঁয়ায় রাস্তার গ্যাসবাতিগুলি আচ্ছন্ন। শৈশবের বড়দিনের দিনগুলির কথা ভাবিতে ভাবিতে ডাক্তার চলিলেন। মহম্যাডান বেরিয়াল গ্রাউণ্ড লেনের নির্জন হিমশীতল ধোঁয়াটে পথ আজ আর তাঁহার নিকট মোটেই আকর্ষণীয় বোধ হইল না। হঠাৎ একটি বাড়ির সম্মুখে আসিয়া লোকটি তাঁহাকে ভিতরে ডাকিল। এক নিশ্ছিদ্র আঁধারের মধ্যে ডাক্তার ঢুকিলেন। লোকটি একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিতেই তাহা নিভিয়া গেল। ডাক্তার পকেট হইতে টর্চ বাহির করিলেন এবং জীর্ণ সোপান বাহিয়া উপরে একটি কক্ষে গেলেন। সেখানে কালিপড়া লণ্ঠনের আলোয় অতিশীর্ণা এক নারীকে দেখিয়া ডাক্তারের মনে হইল, 'for the credit of the human race we call it a face; no masterly brush could transfer the colour of it on canvas' এবং তিনি এক অজ্ঞাত আশঙ্কার হিমস্পর্শ অনুভব করিলেন হৃৎপিণ্ডের উপর—

'The dissecting room, the hospital, the morgue were all familiar to Dr. Murray from his first youth; as a kid he had played at hide and peep behind the tombs in the burial ground attached to the village church with his mates; yet he felt the touch of a lump of ice on his heart on looking at the sunken eyes, collapsed cheek, hangdown jaw and drybone teeth.'

রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন রাত্রিটুকুই তাহার পরমায়ু। তবু প্রেস্কৃপ্‌শন লিখিয়া ঔষধ আনিবার নির্দেশ দিলেন লোকটিকে। তারপর—

'...declining to be escorted back, pressing the button of his torchlight he came down to the ground floor, but

knew not why he gave a look up at the tumbled down verandah ; perhaps an unearthly sound, neither scream, screach, groan or laugh or all mixed, made up into a demonic vibration compelled a startling gaze upwards.

There were two figures leaning on the verandah rails ; the male in grey, –what in human expression would be depressed, dejected, painfully suffering and anxiously painful for the suffering of another. The female—her face in the possession of Death—defying doctors and drugs, comforts and consolation, kindness and caresses.'

গৃহে ফিরিয়া যাহা দেখিয়াছেন বা যাহা ভাবিয়াছেন তাহার কিছুই স্ত্রীকে বলিলেন না। অতিথিরা আসিয়া গিয়াছিলেন—ডিনার আনন্দের মধ্যেই শেষ হইল। বাহিরের আচরণে ডাক্তারকে উৎফুল্ল দেখাইলেও, শেরি ও ক্লারেট্ যদি অতিথিদের আবিষ্ট করিয়া না রাখিত, তাঁহারা দেখিতেন—'though a very good doctor, he was indifferent as an actor.'

পরের সপ্তাহে খোঁজ লইতে গিয়া ডাক্তার জানিতে পারিলেন যে, গত এক বছর যাবৎ বাড়িটি খালি এবং তালাবদ্ধ। ইহার পূর্বে কলিকাতা কাস্টম্সের এক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও তাহার রুগ্না স্ত্রী বাড়িটিতে থাকিতেন। গত বৎসর ২৬এ ডিসেম্বর স্ত্রীর মৃত্যু হয় যক্ষ্মায়। নববর্ষের প্রথম সপ্তাহেই স্বামীর জীবনের অবসান ঘটে :

'No wonder the doctor lost his appetite at Christmas dinner.'

১৯২৭ সনের ৪ঠা জুলাই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের মৃত্যু হয়। ঐ মাসেই অমৃতলালের *Ksherode Prasad—his contribution to Bengali Drama* নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।[১১] প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখক নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে তাঁহার কয়েকটি মূল্যবান মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। Dramatist ও Playwright-এর পার্থক্য, বহু বিচিত্র চরিত্রস্রষ্টা চার্লস ডিকেন্সের নিকট পরবর্তীকালের নাট্যকারদের ঋণ, অভিনয়ের প্রয়োজনে

১১ Forward : 24.7.1927

লিখিত নাটকসমূহের ক্ষণস্থায়িত্ব, বাংলাদেশে রঙ্গালয়-স্থাপনের পূর্ববর্তী নাট্যকারদের কৃতিত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

'These preliminary lines are written to show that a popular play-wright is a valuable item in the stocktaking of a civilised country's assets ; so the passing away of Pandit Ksherode Prasad Bidyabinode is a national loss in more senses than one.'

এই প্রবন্ধে অমৃতলাল সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের স্থান, তাঁহার নাটকরচনায় মনোনিবেশ, তাঁহার নাট্যপ্রতিভার মূল্যায়ন, লেখকের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, তাঁহার মৃত্যুভয়াতীত মনোভাব প্রভৃতি সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছেন। মনে হয় ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক অপেক্ষা তাঁহার উপন্যাসেরই প্রতি অমৃতলালের পক্ষপাতিত্ব ছিল বেশী। লিখিয়াছেন—

'I advised him to try his pen in fiction for which I thought him well-fitted ; he has left ample proofs of his power in this branch of light literature.'

ক্ষীরোদপ্রসাদের তিন চারিটি জনপ্রিয় নাটকের কথা বলিয়া 'আলিবাবা' সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন—

"... the piece became the most popular play in Bengal and even outside the province for a number of years. Every private theatre that could get up a Company was playing 'Alibaba'. 'Alibaba' songs, 'Alibaba' dance, Marzina skirt and Abdala antics became by-words in the theatrical vocabulary."

অমৃতলালের এই উচ্ছ্বসিত উক্তি অযথার্থ নয়। পরবর্তীকালের অনেক সমালোচকই 'আলিবাবা'কে ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলিয়াছেন।[১২]

১২ ডঃ সুকুমার সেনের মতে আলিবাবা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সার্থকতম রচনা' ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' : দ্বিতীয় খণ্ড)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—'তিনি যদি আর কিছু না রচনা করিতেন, এই রঙ্গনাট্যটিই তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিত।' ('সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'—৬৯)

A Stroll in the Hogg Market[১৩] নামক রচনায় তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে হগ মার্কেটের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে 'জাস্টিস অব্ পিস্'রা যখন কলিকাতা শহরের ব্যবস্থাপনা করিতেন, আমরা সেই সময়কার চিত্র পাইতেছি। হগ মার্কেট পত্তনের সময় স্টুয়ার্ট হগের সহিত বাজার লইয়া কলুটোলার শীলেদের যে বিরোধ হয় তাহার ইতিবৃত্তও জানিতে পারিতেছি। কলিকাতার শ্বেতাঙ্গরা ('the whole white Calcutta') ধর্মতলায় শীলেদের বাজার হইতেই দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। ব্যাপারীরা কেহই হগ মার্কেটে আসিতে চাহিত না 'even for a marbled stall in a palatial edifice'; হগ সাহেবের ভয়ে তাহারা বাঙালী লাঠিয়ালদের পাহারায় ধর্মতলার বাজারে আসিত।[১৪] হগ সাহেব প্রথমে পুলিশের ভীতি প্রদর্শন করিয়া ব্যর্থ হন, পরে হীরালাল শীলকে পুরাতন বাজারটি বিক্রয় করিয়া দিতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সফল হন না। তখন হীরালাল শীলের সহিত প্রীতিপূর্ণভাবে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করেন—

> 'Thus in a happy calm after storm started the new Municipal enterprise, and, to-day, the Hogg Market can vie in grandeur, extent and conduct with any best bazar in the world.'

মার্কেটের অভ্যন্তরের বিভিন্ন বিভাগের মনোহর বর্ণনায় রচনাটি উজ্জ্বল। রচনাটির আর একটি উদ্দেশ্যমূলক দিক আছে। অমৃতলালের বিভিন্ন রচনায় দেখা যায় যে কেতাবি বিদ্যায় পণ্ডিত অথচ অকর্মণ্য বাঙালী যুবকের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা চিরদিনের। শ্রমশীল এবং স্বাধীনবৃত্তিসম্পন্ন বাঙালী যুবকের জন্য তাঁহার ছিল উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা। মার্কেটে গিয়া জেলেপাড়ার গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাসের পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাসের মধ্যে তিনি তাঁহার কল্পনার মূর্ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। বি. এস-সি পর্যন্ত পড়িয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশে অসমর্থ হওয়ায় জ্যোতিশ্চন্দ্র তাঁহার কেতাবি বিদ্যার অভিমান ত্যাগ করিয়া যেভাবে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, লেখকের মতে তাহা অনুকরণযোগ্য—

১৩ Calcutta Municipal Gazette: 3rd Anniversary Number 19.11.1927

১৪ শিশিরকুমার ঘোষের 'বাজারের লড়াই' প্রহসনটি এই ঘটনাকেই ভিত্তি করিয়া রচিত।

'... so wiser counsel prevailed, and throwing aside his learned dignity, he began to weigh, cut, carve and slice fishes himself. He does so even now every morning at the Hogg Market, drives in his own car every afternoon, and his evenings he spends in literary recreation.'

'Forward' পত্রের পঞ্চম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অমৃতলাল যে-শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন তাহা *A Divine Messenger* নামে প্রকাশিত হয়।[১৫] তাঁহার অকৃত্রিম আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে বাঙালিয়ানার গর্ব সুস্পষ্ট—

"I am a Bengalee, and Bengal-born 'Forward' is my brother, my son, my friend and comrade."

জাতীয়তার মুখপত্র 'Forward'কে আশীর্বাদ করিতে গিয়া অমৃতলাল স্মরণ করিয়াছেন তাঁহার অতীতের সেই দিনগুলিকে যখন তিনি নবগোপাল মিত্রের নিকট জাতীয়তার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন—

'I am an old man, an old one who at the age of fifteen carried under the leadership of Nabagopal Mitra a flag blazened with the then new word National. Every one leaning his head at the sound of that word is my kin.

প্রাচীন কলিকাতার সরস ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ মিলিতেছে *Calcutta as I knew it once—Tales of a Grandfather*[১৬] নামক রমণীয় রচনাটিতে।* কলিকাতা নামের উৎপত্তি, লেখকের শৈশবের উত্তর কলিকাতার পথঘাট, বাড়ী ও পরিবেশ, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য, কলিকাতার প্রধান রাজপথ চিৎপুর রোডের আভিজাত্য, রাস্তাবন্দী সাহেবদের প্রতিপত্তি, পানীয় জলসরবরাহের ব্যবস্থা, প্রথম গ্যাসল্যাম্পের প্রচলন প্রভৃতি অনেক বিস্মৃত

১৫ Forward : 26.10.1928

১৬ The Calcutta Municipal Gazette, 4th Anniversary Number: 17.11.1928

* রচনাটির প্রারম্ভে সম্পাদকীয় মন্তব্য এইরূপ—"Mr. Amritalal Bose is not only a distinguished playwright and actor, but also a 'Calcutta-man'. He loves Calcutta passionately, and has known her for more than seventy years......"

বিষয় লেখকের স্মৃতিকথায় স্নিগ্ধ ও উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। এই স্মৃতিকথা রচনার কারণ—

'I love Calcutta. When I was a child, Calcutta was not a fairy princess she is now. She was then only a chubby child just lisping the language of her civic existence. We grew up together as children grow, and many are the memories of those old, dear, dear days that I lovingly cherish and love to tell.'

প রি শি ষ্ট

১ ১৮৯৪ সনে লিখিত অধ্যক্ষ অমৃতলালের অভিনয়-নির্দেশ-পত্রের একটি নিদর্শন (অপ্রকাশিত)।

২ ১৮৯৫, ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ সনে লিখিত অমৃতলালের অপ্রকাশিত দিনলিপির কয়েকটি ছিন্নপত্র।

৩ ১৯১৫ সনে অমৃতলাল-লিখিত ১৮৮৯ সনের স্টার থিয়েটারের চুক্তি সংক্রান্ত কয়েকটি প্রসঙ্গ।

৪ ১৯১৫ সনের ৪ঠা জুন কাশীধাম হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রভূষণকে লিখিত অমৃতলালের একটি অপ্রকাশিত পত্র।

১

১৮৯৪ সনের মার্চ মাসে স্টার সম্প্রদায় ময়মনসিংহে গিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। ৩১এ মার্চ 'ঋষ্যশৃঙ্গ' ও 'কালাপানি' অভিনীত হয়। এ সম্পর্কে অধ্যক্ষ অমৃতলাল যে-নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাঁহার সেই স্বহস্ত-লিখিত অভিনয়-নির্দেশ পত্রটি পাওয়া গিয়াছে। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"The Star Theatre of Calcutta intends to open to-night's performance under the patronage of the District Judge and Magistrate and other European official and residents of Mymensingh, with two short pieces (*Rhishya-Sringa* an opera from Ramayana and a musical farce *Kalapani*) which the manager ventures to hope will suit the taste of European ladies and gentlemen and it is respectfully solicited that intending visitors will kindly send in their names so that proper accommodation and reserved seats may be kept for them.

The manager therefore respectfully requests the ladies and gentlemen to say 'yes' or 'no' opposite their names.

Doorgabari, Mymensingh
31st March, 1894

A. Bose
Manager"

২

১৮৯৫, ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ সনে লিখিত অমৃতলালের অপ্রকাশিত দিনলিপির (অধিকাংশই ইংরেজীতে লিখিত) কয়েকটি মাত্র জীর্ণ পত্র পাওয়া গিয়াছে। পত্রগুলি সবই গলিতপ্রায়। অনেক স্থল ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। মাত্র কয়েকটি দিনের বিবরণ: এই বিবরণের মধ্য হইতে মানুষ অমৃতলালের একটি পূর্ণচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র তুচ্ছ অনেক প্রসঙ্গও এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত যে ইহা হইতে সর্ব বিষয়ে অমৃতলালের কিরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ মনোযোগ ছিল তাহা উপলব্ধ হয়। দিনলিপিগুলির

The Star Theatre of Calcutta
intends to give two nights' performance
under the patronage of the District Judge &
Magistrate and other European [illegible]
residents of Mymensingh [illegible]
[illegible] (Rhishyasringa [illegible] opera from
Ramayana & a musical farce "Kalapani"
which the manager ventures to hope will
suit the taste of European Ladies & Gentlemen
It is respectfully solicited that intending
visitors will kindly send in [illegible]
that proper accommodation
may be kept for them.

The manager therefore respectfully
asks the Ladies & Gentlemen to say
"yes" or "no" opposite their names

Mymensingh
1st March 1894

[illegible]
Manager

অধ্যক্ষ অমৃতলালের স্বহস্তলিখিত একটি অভিনয়-নির্দেশপত্র

কোথাও অমৃতলালের 'অহং' প্রকট হয় নাই। ময়মনসিংহে জমিদারবাড়িতে, স্টার থিয়েটারে সমাগত অতি সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়দের মধ্যে, মুমূর্ষু অনাত্মীয় রোগীর শয্যাপার্শ্বে, স্টার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় বা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে— সর্বত্রই তাঁহার প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের দ্যুতি বিকীর্ণ হইয়াছে। নাট্যজগৎ ও সংসারজীবন— দুই-ই তাঁহাকে যে সমানভাবে আকর্ষণ করিত, তাহার নিদর্শনও দিনলিপিগুলিতে আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'মনে এল' গ্রন্থে অমৃতলালের যে 'প্রকাণ্ড লাইব্রেরীর' উল্লেখ করিয়াছিলেন, ১৮৯৭ এর ৩০এ সেপ্টেম্বরের দিনলিপি হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

নাট্যজগতেরও অনেক ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। উনবিংশ শতকের শেষে স্টার থিয়েটার যে কতভাবে জনচিত্তের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিত তাহার তথ্যপূর্ণ কয়েকটি বিবরণও মিলিতেছে। তৎকালে স্টার থিয়েটারে শুধু অভিজাত ইংরেজরাই আসিতেন না, ইউরোপীয় কূটনীতিকগণও আসিতেন। সমাজের ধনীব্যক্তিবর্গ কিভাবে রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন তাহার ইঙ্গিতও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার স্বকীয় ভঙ্গীতে মতামত দিয়াছেন। কাহারও প্রতি অভিযোগ প্রকাশ পায় নাই। গিরিশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহাও নানাস্থলে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার ২৮ বৎসর বয়স্ক দানীবাবু যে আভিনয়িক বিদ্যায় অমৃতলাল মিত্রকে নকল করিতেছিলেন, তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। কোন্ নাটক অভিনয় হইতেছে, কোন্ নাটকের মহড়া চলিতেছে, কোন্ নাটকে কিরূপ দর্শক সমাগম হইতেছে— সব কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দিনলিপিগুলিতে শুষ্ক তথ্যবিবৃতি নাই। একপ্রকার সাহিত্য-রসও মিশ্রিত রহিয়াছে। দিনলিপির বাকি পৃষ্ঠাসমূহ লুপ্ত হইয়া না গেলে বাংলা নাট্যশালা ও অমৃতলাল সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা যাইত। এই কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠা হইতে যে সকল তথ্য মিলিতেছে, ঐতিহাসিকের নিকট তাহার মূল্য কম নয়। নিম্নে দিনলিপিগুলি যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইল। যে স্থলে জড়িত হস্তলিপির পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই, অথবা সংশয় আছে, সেখানে প্রশ্নচিহ্ন, যেখানে কীটদষ্ট বা জীর্ণ হইয়া অক্ষরগুলি লুপ্ত হইয়াছে সেখানে বিন্দুচিহ্ন এবং যেখানে আংশিক পাঠোদ্ধার করিয়া কোন শব্দযোজনা করিয়াছি সেখানে তৃতীয় বন্ধনী প্রযুক্ত হইয়াছে।

দিনপঞ্জী

(১১ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫—৪ঠা নভেম্বর, ১৮৯৭)

Wednesday the 11tb December, 1895

Took tea (our own brewing) at the station. Babu... Choudhury, Pleader and Preo Babu a Deputy Magistrate met me at the station, They were pressing us to give a few performances at the town. Ticca carriages brought us to Muktagacha[১] at about 11 a. m. This is our 2nd visit here. Housed at Babu Jogendra Kishore Acharyya Chowdhury's (ছোটকর্তা) place as on the 1st visit. ছোটকর্তা is the type of a perfect gentleman of the old school in whom all that is best of the modern ideas of comfort is...

It is always very difficult to settle the programme of a moffusil engagement. They spend quite a large sum of money in bringing up a Company like ours, then they have whetted their appetite with the several reports of different sensation plays of Calcutta, some are for farces and comic sketches, some will have nothing but operas, others again like dramas. After a long (?) protracted discussion the bill was drawn up. I conceded for general satisfaction to play *Nala-Damayanti* and *Babu* in one night. As they seemed to be greatly disappointed if *Ekakar* be not performed here...sent urgent telegram home to Dasu for dresses, wigs, programmes etc. of *Nashiram* and *Ekakar.*

Thursday the 12th December, 1895

Observed the fast of Ekadashi. Wired to Dasoo to send prompt...of *Nashiram* and *Ekakar*...the day and ½ of the

১ ময়মনসিংহে

night in reading...and Panchoo Babu[২] played card ১০|২৫ with Amrita[৩]...is very pleasant to see them making fun...to wife yesterday was posted...the mail-closing hou

Friday the 13th December, 1895

The first thing in the morning received telegraph from Dasoo intimating despatch of dresses, books etc., Haridhone,[৪] Panchu Babu and Amrita went out on an elephant ride this morning. There was much fun in seeing Haridhone ride with his tall stout frame, he is 6 ft. 2 inches and weighs 24 stones. He broke a strong wooden ladder in climbing on the huge beast's back. Natoo is disappearing (?) With all my almost solicitous suggestions, he keeps himself idle, both as to preparing parts and attending to the management of the lodging. He is in the most straitened circumstances and as an old friend and neighbour I wanted to push him to life again—but I cannot control anybody's destiny. The day's meal was ready very late this day, the meat under-done ; the want of a sircar to do the steward's duty is the cause of these late meals in our mofussil trips. Kasinath is the only person who works so hard in the management of the kitchen. *Tarubala* and *Tazzub-Byapar* were performed to-night and our hosts expressed their entire satisfaction. Jogendra Nath Acharya Chowdhury had a fit this evening.

Saturday the 14th December, 1895

Amrita and Panchoo Babu went out on an elephant ride to the jungles in the plains of the Garo Hills and returned

২ পাঁচকড়ি মিত্র : অমৃতলালের প্রীতিভাজন সুহৃদ (দ্রঃ 'অমৃত-মদিরা' `

৩ স্টারের প্রখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র

৪ হরিধন দত্ত : অমৃতলালের নাট্যানুরাগী সুহৃদ

about evening, They were much impressed with...sight of the abode of tigers and bears. Haridhone...Kasinath managed our day's meal...*Nala-Damayanti* and *Babu* were performed ..programme we conceded to an...request of a large number of...service and the bar were the...their dinner the performance began...I played বিদূষক in the 1st piece after...even extra-ordinarily well-performed ..were very troublesome. The bar and...in the mofussil (with honourable exception) ..and decency and the Beng. barristers (with...) almost shamelessly so ; they...are above observing ...our country-men. Our hosts...of some of their guests.

Sunday the 15th December, 1895

Received Rajani Babu's letter inviting me and friends to stay at his Dacca house. Introduced to and had a conversation with Babu Baroda Prosanno Shome and Dr. Baroda K. Bose Sub-Judge and Physician respectively of Nashirabad (Mymansingh). Society, politics, religion were all talked out in an hour.

Owing to last night's late hours the performance of *Nashiram* was commenced at 7 p. m. this evening. The crowd and noise outside and even in the back seats were very great. The performance did not inspire that enthusiasm in the auditorium which its revival has done at Calcutta but was received with approval. Jagat Babu of Muktagacha and a Gobardanga Babu were present with some of the Deputy Magistrates and Munsiffs ; trouble-some...was not present ; strict discipline...were observed. We finished by about...splitting headache I had this evening...uneasiness, lassitude—sometimes...as if I'll drop down. I was ..with both the hands.

17 Tuesday [351-14]

অমৃতলালের দিনলিপিব একাংশ

Monday the 16th December, 1895

Observed the fast of অমাবস্যা. I, Haridhone and Panchoo Babu are to leave here this day for Dacca and sojourning there for a day and half ; will join the company in its down journey. Went to bid farewell to Sudhen Babu. He presented me with a few pieces of antelope deer and leopard skins. Left Muktagacha at about 3 p. m., our 2 personal servants also accompanying us. When nearing the town of Mymansingh (Nashirabad), found a young gentleman, son-in-law of Bangshi Babu, a local D. M., in great distress from a fall off his pony ; he was badly injured. Took him up in one of our carriages and as we were set down in the gate of Rajah Suryakanta's Palace, sent the carriage to reach the youngman to his f-in-l's place. It was growing dark, and Mr. Peter (?) the officer-in-charge of the Palace being absent, we gave up the idea of looking over the place and drove up to the lodgings of Babu Krishna (?) K...Bysack ; he was very sorry as our company not being able to give performance in his Theatre (Hardinge Hall) at Nashirabad; spoke to him about mine and Haribabu's পাটি(?) drove to the station. Babu Kedar Nath Banerjee, station master, said that he has received a letter from the Traffic Manager's office, Dacca, which did not say anything about granting concession to our company on its down journey. We showed him the 3 months' (?) time mentioned in the concession order and he said he will allow us concession on his own responsibility and get orders for the company from Dacca. The concession papers I left with the S. M.

Tuesday the 17th December, 1895

Reached Dacca at about 4 a. m. and waited till daylight in the Waiting Room. At 7-30 a. m. warm reception. My

old rooms being occupied, the Baitakhana suite was placed at our disposal. My darlıng...came to meet me with her smiles, presented her wıth a few apples...sumptuous tiffin and went out first to Babu Chandra K. Ganguly (?)...place the old big house of Nicky Pogoce (?) is presented to his...the Nawab ; the property is worth about eighty thousand...

Saturday the 21st March, 1896

আমাদের আনীত…এ কন্যা সমভিব্যাহারে…Mr. Thomas Barlington…প্রণালী দেখিয়া সকল ইংরাজই বিশেষ…অতি আনন্দিত, আমাকে তিনি বলেন যে,…তাঁহার মেম অতি সহৃদয়, তিনি…প্রশংসা করেন ও অনেককে ডাকিয়া…দেখান। লাইব্রেরি দেখিয়া‥ যেন প্রথমে চমকিত হন। ভূতপূর্ব…পুত্রও প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার…Garth থিয়েটার সম্বন্ধে আমায় …কথা কন। তিনি আমার কথায়…পরামর্শ দেন। কিন্তু বলেন ষ্টেজ সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষযে অনেক অভিজ্ঞতা ও তথ্যলাভ হইবে। কিন্তু আমাদের অভিনয় প্রণালী যেরূপ দেখিতেছেন তাহাতে সেখানে গিয়া শিখিবার বিশেষ কিছুই নাই। দেখিলাম তিনি Sir Henry Irvıngকে খুব ক্ষমতাবান Stage Manager বলিয়া সুখ্যাতি করেন, কিন্তু তাঁহার অভিনয়েব বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। আমাদের অভিনয়ে অনেক conventionalityবিহীন স্বাভাবিকতা আছে, এ কথা তিনি বলেন। আমি ইতিপূর্বে অন্যান্য ইংরাজেরও এই মত শুনিয়াছি। নরীর[৪ক] গীত শুনিয়া Sır Charles Paul[৫] বলেন যে, এরূপ মধুর গলা তিনি পূর্বে কখনও শুনেন নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর 'একাকার' অভিনয় শেষ ও transformation scenes দেখান হইবার পর জজেরা ও অধিকাংশ সাহেব-বিবি বিদায় হইলেন। যাইবার সময় চিফ জষ্টিশ, বড়লাটের প্রাঃ সেক্রেটারী প্রভৃতি সকলেই আবার বিশেষ আনন্দ প্রকাশ ও আমাদের ধন্যবাদ দিয়া গেলেন। বিভার্লি[৬] সাহেব ও তাঁহার মেম দর্শক সমাগমের আধিক্য হেতু বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। মালা ও

৪ক নরীসুন্দরী : ষ্টারের অভিনেত্রী ও সুকণ্ঠী গায়িকা

৫ তৎকালীন অ্যাডভোকেট জেনারেল

৬ একজন বিচারপতি

তোড়া সকল মেম ও সাহেব ও বাঙ্গালীদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। ২।৩টি বড় মানুষ বাবুকে আজ থিয়েটারে Dress Circleএ আসিতে দেখিয়াছিলাম। ইঁহারা আর কখন বড় আসেন না। Mrs. Beverley ও একজন কি Countessকে ১।১টি...তোড়া প্রদান করিলাম। সমস্ত ইংরাজ দর্শকই বিশেষ অমায়িকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একমাত্র পুলিশ কমিশনার Sir John Lambert মুখ বুজিয়া ছিলেন। তিনি যদিও আমাদের নিমন্ত্রিতস্বরূপ আসিয়াছিলেন,...ইংরাজি কায়দা মত একটা শুষ্ক thank you বলেন নাই। পুলিশের অভিধানে আত্মমর্যাদা রক্ষা অর্থে ইতরতা। ল্যাম্বার্ট সাহেব আপনাকে চিফ জষ্টিশ অপেক্ষাও বড়লোক মনে করেন অথবা বাঙ্গালীর কাছে তাহা জানাইতে চেষ্টা করেন। রায় বাহাদুর ইনস্পেক্টর যোগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার প্রভুর থিয়েটারে আসার কথা হওয়া অবধি বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, পাছে তাঁহার বড় সাহেবের নিকট কোন বাঙ্গালী দর্শক আসন অধিকার করেন। আমাদের দেশে পুলিশের conceitএর সীমা নাই। 'ঋষ্যশৃঙ্গে'র অভিনয়ও আজ সুন্দর হইয়াছিল।

Sunday the 22nd March, 1896

অদ্য অন্নপূর্ণা পূজা। অপরাহ্নে হরিবাবুর[৬ক] বাটীতে লুচি উদরস্থ করা গেল। চিপিটক, ক্ষীর, ছানার বার্ষিক আয়োজনের পরিবর্তন করিয়া হরিবাবু ভাল করেন নাই। পূর্ব কথামত মতামত লিখাইবার জন্য আজ বিভার্লি সাহেবের ৪২ নং চৌরঙ্গি ভবনে Visitor Book পাঠান গেল, তিনি পুস্তকখানি রাখিয়া দিয়াছেন। আজ ৪২ টাকায় ১ জোড়া বুলবুলবস্তা পাখী (Nightingale) ও ১২ টাকায় ১টা নূতন রকম শ্যামা কিনিলাম। পাখীর সখ ক্রমে আমার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে দেখি। অদ্য সন্ধ্যার পর 'রাজসিংহে'র অভিনয় হইয়াছিল।

Wednesday the 25th March, 1896

...অতি প্রিয় বন্ধু...অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া ইহার সহিত...প্রাণ চমকাইয়া উঠিল। দৌড়িলাম। গিয়া...উহার দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক মাতৃহীন...বিকার হইতে রক্ষা পাইয়া প্রাতে উলাউঠা...বড় মধুর প্রকৃতি, তীক্ষবুদ্ধি বালক, আমায় জ্যাঠা মহাশয় বলিত, আমিও অতিশয়...উহার ছবিখানি আমার বিছানায় সুমুখে খাটান আছে। যতীন আসিয়া কি...বৈকালের সংবাদ। মিনার্ভার

৬ক স্টার থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিপ্রসাদ বসু

প্রোপ্রাইটারদ্বয় গিরিশবাবুকে ত্যাগ করিয়া নীলমাধব চক্রবর্তীর দল (City) আনিয়াছে ও গিরিশবাবুর নামে চোর প্রভৃতি অপবাদ দিতেছে। গিরিশবাবু মর্মে পীড়া পাইয়াছেন শুনিয়া আমাদের বড় কষ্ট হইল। রাত্রি দশটার পর অমৃত ও হরিবাবুর সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে যাইলাম। অমৃত একেবারে গিরিশবাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন, আসুন আমাদের কাছে! তিনি হৃদয়ে আমাদের স্নেহভক্তি উপলব্ধি করিয়া সঙ্গে আসিলেন। থিয়েটারে পূর্বে কেহ কিছু জানিত না, সকলে আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে প্রণামাদি অভ্যর্থনা করিল। 'ঋষ্যশৃঙ্গ' ও 'রাজা বাহাদুর' অভিনয় হইতেছিল, অনেকগুলি সাহেব-বিবি আসিয়াছিলেন। 'জজেদের রাত্রির' (Judges' Night on 21st) সুখ্যাতির ফল। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর আসিয়াছিলেন। আমাকে ডাকিয়া তাঁহার Managerএর উপর আমার নামে একখানি ৫০০ পাঁচশত টাকার অর্ডার দিলেন। পাঁচ দিন অভিনয় দেখিয়াছিলেন, শরীর অসুস্থ হইতেছে, কলিকাতা ত্যাগ করিবার মনস্থ করিয়াছেন, নচেৎ আরও কয়দিন অভিনয় দেখিতেন।

Saturday the 28th March, 1896

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে টাকার জন্য গিয়াছিলাম, ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। আমি অসময়ে গিয়াছিলাম। Mallick Bros. এখনও আমার কামিজ প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারে নাই। রাত্রে 'রাজসিংহ' অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত হরিধন দত্তের সহিত কয়েকটি ইংরাজ অদ্য অভিনয় দেখিতে আসেন। গিরিশবাবু আমাদের এখানে আসায় হরিধন বিশেষ সন্তুষ্ট নয় বোধ হইল। মিনার্ভার প্রোপ্রাইটার নাগেন্দ্র মুখো মহাশয়ের পূর্ব দুর্ব্যবহার ভুলিয়া হরিধন এক্ষণে আবার তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকে বলে, গিরিশ ঘোষ নাগেন্দ্রের সর্বনাশ করিল; তাহারা নাগেন্দ্রের ঋণজালজড়িত থিয়েটার-পূর্বাবস্থা ও থিয়েটারকালীন নিজ বিলাসব্যয়ের কথা ভুলিয়া যায়। নাগেন্দ্র কিছু বুঝে না! [কিন্তু] জিজ্ঞাসা করি মিনার্ভা স্থাপন করিবার সময় এটা কি বুঝিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হন নাই যে, গিরিশবিহনে ষ্টার ধ্বংস হইয়া তাঁহার লাভ হইবে? আমরা কয়েকটি গৃহস্থ লোক অন্ন করিয়া খাইতেছি, তাঁহার তো মাতামহের[৭] 'আট্‌কে' বাঁধা ছিল, আমাদের সর্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন কেন? গিরিশবাবুর যতই দোষ থাকুক থিয়েটার সম্বন্ধে তিনি অতি উপযুক্ত তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার সমক্ষে 'মুরুব্বীদের'

৭ নাগেন্দ্রভূষণ ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র।

মধ্যস্থগিরি চলে না বলিয়া অনেকে তাঁহার শত্রু ; সামাজিকতা গুণও গিরিশ-বাবুর বড় নাই। হরিধনের সহিত তর্ক করিয়া আমার nervousness অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল।

Sunday the 19th July, 1896

...I have made a very large...many of the books are rare and very...it will cost a great deal to make a decent collection of old histories and kindred works.

Yesterday the new Consul General for France, successor to my old friend Mons. Jubs. Jaslier, came to see our performance. We conversed through his Babu interpreter. He is a much younger man than Mons. Jaslier.

Sarala was performed to-night.

Monday the 20th July, 1896

...Ekadashi and anticipated to work in my home...but Bhoobon Mohan Neogy[৮] came......who has never received honestly or dishonestly a pice from him, while working with body and soul, day and night. We have granted him a stipend of Rs. 10/- per month and he is not satisfied. Theatrical or non-theatrical, no one else will do this for him, not even his nearest relations—those who are enjoying the benefits of his paternal estate...Jeeban has brought the books from the Exchange, the whole lot has cost Rs. 130/-/6 besides Buxis to clerks, cooly, carriage etc. This Jeeban wants to be over-clever and makes himself a fool on all occasions. He has not examined the lots ; a lot of rotten, worthless, small books, which will be dear at 12 as. the lot, he has paid Rs. 6/12/- for. He is again clever and says [that he will] demand refund. Deposited a currency note of

৮ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণে'র রিহার্স্যাল ইঁহার বাড়ীতেই হইত।

Rs. 500/- with Gurudas Babu, drawn Rs. 200/-. Received Rs. 42/- from cash for mother's expenses for the current month.

Tuesday the 21st July, 1896

Felt no inclination for it, so stopped bathing. Jeeban has returned the lot of worthless books purchased at Rs. 6/12/. He says the Exchange will return the money on Monday next.

Permission granted to the Metropolitan students to hold their Vidyasagar Anniversary meeting at our Theatre on Monday next. Kiron Bannerjee's[৯] application to be taken as an actor is granted in consideration of his pecuniary difficulties, [he] being one of the originators of the old National. *Bibaha-Bivrat* and *Kalapahar* were rehearsed. House-servant Shibram is growing very...over him sound reprimand.

Wednesday the 22nd July, 1896

When preparing for bath, received information that son-in-law Nagen[১০] is very ill from...at once to Mirzapore—found the case not very virulent, brought about probably by...food in দ্বাদশমেলা ; his poor father was...distress... Akhoy Coomar Dutt, L.M.S. Homeo. physician was in attendance. The patient...eyes very red—very restless... China and Acid Phos. were...administered. This Nabin Ch. Sircar my বৈবাহিক is a typical কেরাণী। There were tears in his eyes, but punctually he went to office (E.I.R.Agent's). But his office master and mates forced

৯ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণে' বিন্দুমাধবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 'ভারতমাতা', 'ভারতে যবন' প্রভৃতি নাট্যরচয়িতা।

[illegible] ল মাগাজিনের স্বত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন দের ভ্রাতুষ্পুত্র।

him to return home. I left Mirzapore at about 12-30 p.m. My mother, wife and daughter were all painfully anxious. Again went to Mirzapore in the afternoon. The same nature of stool—no change—at about 10 p.m. a slight tendency towards the Tympanitis ; medicine stopped ; there was aggravation. Returned to the Theatre at about 12 p.m. just in time to get ready for *Bibaha-Bivrat.* Improved acting than last week. Mrs. Monmohan Ghosh and daughter were present, both ladies expressed sympathy with me for my son-in-law's illness.

Thursday the 23rd July, 1896

Went up to Mirzapore—found Nagen better ; formed the acquaintance of Abinash Kaviraj ; on way back took from him a few doses of চ্যবনপ্রাশ and a few cough pills and powder for wife.

No end of troubles for want of servant both at home and at the Theatre. Shibram must be sent away. Kiron Bannerjee is attending rehearsal. Worked at my novel till 2-30 p.m. at home. In the evening again went to enquire after Nagen accompanied by Gurudas Babu. Received 2 glass cases from Bhogoban Ch. Dey, Bowbazar, billed at Rs. 27/- the pair.

Friday the 24th July, 1896

......of Magoor fish to son-in-law.. ...his grand-daughter -in-law having......the B.A. Examination...has served him with an attorney's letter threatening to sue him and also threatened to assault him with shoes elsewhere. My poor uncle, who ought to have come in this world 100 years before, is distracted. I went to ask the lawyer whether his client ought to be helped in further...that education

the result of which leads him to insult and affront his elders.

Upendra Mitra's[১১] 2nd daughter was married this day (11 Sravan). Poor fellow was in much trouble. My partner A.L.M's heart won't soften and he would not allow him any pecuniary help from the Theatre ; we three must debit the loan of Rs. 100/-already...in our private account.

Saturday the 25th, July, 1896

Babu G. C. Ghosh has received Rs. 1800/- the balance of the Minerva Theatre's dues for performing at Puthia Rajbaree in March last. The payment was made in our presence and through Ramtaran's influence.

Made sundry purchases worth Rs. 8/-from the old Book-walah. In the evening went to see Nagen ; his bowels are not yet in their correct tone. Went over to Dr. Nabin Ch. Sen ; talked poetry, politics, society, education and everything ; left at 11-30 p.m. *Benzeer* opera was performed this night.

Sunday the 26th July, 1896

...amidst confusion of gasping and sobbing that my young pet Asi[১২] had a fall and was dying. Running upstairs I found the child stretched on my wife's lap, eyes fearfully dilated, all colour gone, jaw locked, difficult short breathing, cold all over ; wife almost maddened ; my Gurudev, who came this day, was there ; daughter and other children crying—servants busy with punkha and water. I was almost stunned while my cranium seemed as if it would burst up. The jaw was forced open, I administered

১১ স্টার থিয়েটারের একজন জনপ্রিয় অভিনেতা

১২ অমৃতলালের কনিষ্ঠ পুত্র অসিভূষণ বসু

a dose of Tirt. Arnica-6. It was a clear case of concussion of the brain. The child vomited and had a...; couldn't make him take any milk. At 7 p.m. a few spoons of milk were given and the child began to speak and complain of shooting pain in the head. Another dose of Arnica. He didn't allow me to leave home ; vomited again. More than an hour later gave a dose of Bell-6 and sent for Dr. A. K. Bose. He was not at home. But the child gradually sank into sleep from which he was awake after midnight and having had a few spoons of soojee and milk slept again. Hari Babu and Panchoo Babu came and remained with me at different times for an hour or so each. Chandi Babu, Lalit and Akhoy Babus from কাঁকুড়গাছি also came to enquire.

Ashi is suffering from a bad liver and repeated attacks of fever. He is very much reduced. Won't take any substantial food, but too much of sweets and other undigestive and unwholesome stuff and will accompany me to the theatre and remain waking till a late hour. There is no coaxing or forcing him. If I leave him at home, he will visibly pine away. He is so intelligent, yet so obstinate

This day God's mercy was shown towards...me in bountiful profusion.

Sarala was performed at the theatre this night.

Monday the 27th July, 1896

......Mr. W.C. Bannerjee took the chair and opened the proceedings with a most anglically pronounced English speech in which he said that the life of the illustrious Pundit was worth every man's serious study. Mr. N.N. Ghosh [১৩]

১৩ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ : মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ, ইণ্ডিয়ান নেশান পত্রের সম্পাদক, ব্যারিস্টার।

then read in English chiefly about the unpleasant state of the affairs of the Metropolitan. Mr. Jatindra Bannerjee (Suren Bannerjee's brother) also stammered and hammered in English. Then the Editor of the *Hitabadi* Babu Kali Prosonno Kavya-Bisharad, a fighting orator, bawled in Bengali. After that came my turn; voice from the stall jeered at my modesty. I said, 'After the Pujah has been performed with Daisy, Heliotrope and Begonia, as also with the indigenous flaming স্থলপদ্ম I'll attempt to offer a few fallen leaves of Toolsy at the feet of the sainted Pundit...We need not go to Carlyle to learn hero-worship. Our sages have set many such examples and the mode of worship...beneficial as the devotees are required to develop in themselves the divine qualities of the objects of worship; suggested institute a ব্রত in Vidyasagar's name and by observing the in.. seasoning (?) year develop charity and love of our mother tongue.'

Tuesday the 28th July, 1896

I am in despair. I have lost a valuable pamphlet (...Memory Part I) lent me by my friend Babu B.C. Sen on last Saturday night. It must have slipped from my hands on my way home and disposed of with the sweepings; for no one, I believe, would care to pick up a seemingly worthless little pamphlet. I and the whole family searched for it at home, but it was not to be found. I sent a note of regret informing of the loss to its owner, but he, ever so generous, reproached me in [his] turn for taking the loss so much at heart. The next morning he and his friend and partner Kadu Babu were waiting for me at the bathing ghat to enquire after Ashi's health after the accident of the fall. Owing to stomachic disorder, had a scanty light meal at a

late hour. The meal was followed by a painful headache owing to which couldn't join the rehearsal; but feeling slightly better by about 11-30 p m., worked on my novel[১৪] till after 2 a.m., Ghuneshyam acting as my amanuensis.

Sunday the 9th August, 1896

I went to bathe this morning rather...Dr. Bose came and saw the children; he...bandaging the abdomen for my wife. Observed total fast on account of অমাবস্যা. Sent Khetter[১৫] to see mother. She is a trifle better. *Rajsingha* was performed this evening.

Monday the 10th August, 1896

......was rehearsed this evening...*Baie Mahasaya* of Mirzapore for a......wrote to Babu Cally Krishna Tagore's... Atul Babu to enquire if it will suit his Governor to witness a performance of *Chandrasekhar* on Sunday next.

Tuesday the 11th August, 1896

Received delivery of a cart of coke from Foolchand Agarwalla sent by Suren. Paid...As-/8/-and Behary Paul 2/4/-for flower pots including cooly hire.

Kalapahar was rehearsed in the evening. Owing to slight indisposition Girish Babu did not attend this evening.

Wednesday the 12th August, 1896

After bathing went to Babu Cally Krishna Tagore, he wanted to see me before......Simla this evening. He is getting a gold [medal] . ready for Asi, whose play of......

১৪ 'ঘরের কথা' নামক দীর্ঘ নক্‌শা। ১৯এ আগস্ট এই নক্‌শার প্রসঙ্গে 'রায়গিন্নী'র কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই অসমাপ্ত রচনাটি ১৩১২ সালের ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৫ অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র (ইনি ভেটারিনরি সার্জন ছিলেন) ক্ষেত্রভূষণ বসু।

pleased him much. He also ordered his manager (?) to supply me with a quantity of স্বর্ণসিন্দুর মকরধ্বজ and a few grafts of good mangoes. On parting, he made me a present of a grand specimen of Aristolasia Gigantia, a beautiful flower resembling a bonnet shaped like a duck.

Billamangal was played this evening. There was a good house, but Amrita did not act...indolence is fast taking possession of him, He talks of retiring. An actor can never delegate his work ; he must die in harness.[১৬] Lyceum Theatre would be nothing without Irving. People come to see particular artistes in a particular Theatre. Girish Babu's son Dani played *Billamangal* to the entire dissatisfaction of all the audience and the artistes. It was a mere stiff imitation of Amrita's personal peculiarities. Can Girish Babu's paternal affection make him blind to artistic inefficiency ?[১৭]

Thursday the 13th August, 1896

This morning went across to Salkia to see mother. She is very ill ; a pain in the abdomen, prostration and loss of taste and appetite. Oh ! my ever-poor mother, I don't know how it will end with you ! Your most unworthy son could never make you happy. I asked her to come over at Calcutta, but she wants to wait and see. Gave her Nux.

The annual চেলাফেলা festival took place at my house this day and the family feasted...on চিঁড়া দই দুধ etc...while the kitchen had a holiday. *Kalapahar* was rehearsed in the evening. Received a portable paddle harmonium from

১৬ অভিনেতার এই কর্তব্য তিনি নিজ জীবনে যথাযথ পালন করিয়াছেন। মৃত্যুর চারিদিন পূর্বেও ম্যাডান কোম্পানীর 'বিবাহ বিভ্রাট' চিত্রে গোপীনাথের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৭ তখন দানীবাবুর বয়স ২৮ বৎসর (জন্ম, ১৮৬৮)

Messrs. Harold & Co. for my boy Asi. Catalogue price is Rs. 155/-, but they will charge me only Rs. 125/-.

Friday the 14th August, 1896

...went to see Babu Gopal Lal Mitter ১৭ক...Vice-Chairman of our municipality...strangulated hernia is operated on...are not allowed to enter the sick chamber...my lips moved in whispering the name of শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ; he drew me gently nearer and placing his hand on mine made me signs to proceed. I uttered the names of শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব and হরিবোল and মা for some time and his face, bright, calm and cheerful, in the midst of all his sufferings of utter prostration, wore a beaming smile. May merciful God spare him to us ! In more than sixty years he has not created one enemy. His childlike simplicity used to win the heart of all .. . .

Kalapahar was rehearsed in the evening. Asi, my boy, has again got fever.

At the request of...a set of my plays is sent to Mourbhanj as present to H. H. the Maharani.

Saturday the 15th August, 1896

In the morning after bathing went to enquire after Babu Gopal Lal Mitter. A troublesome hiccup is now his predominant symptom. In the afternoon Babus Bissumbhur Behary and Amrita, sons of Babu Gopal Lal, called at my house to request that it is their sick father's special request

১৭ক ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন (৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ হইতে ২১এ জানুয়ারী ১৮৯৬)। কিছুকাল চেয়ারম্যানও ছিলেন (৬ই জুলাই ১৮৮০ হইতে ৫ই অক্টোবর ১৮৮৫ পর্যন্ত)। ১৮৬৩ হইতে ১৯২১ সনের মধ্যে চেয়ারম্যানের পদ কেবলমাত্র ইংরেজরাই অলংকৃত করিয়াছেন ; গোপাললালই একমাত্র ব্যতিক্রম।

that I'll visit him every morning. He feels, he says, much relieved in my company and the very slight religious ministration I could humbly afford him was very welcome. His further request was that I should take Ramtaran[১৭খ] to console him with some Divine Songs.

Annadamangal and *Raja Bahadur* were performed. Owing to Bhattacharya suffering from an abscess in the ear, Ashoo played the part of Narada in the first piece, but B. came and played his Bhattacharya part in the latter piece, though Natoo Babu was made ready as his double. In the Bhattacharya part no one will be able to replace Haridas Bhattacharya.[১৮]

Sunday the 16th August, 1896

At 9 A.M. went to Gopal Babu's...Ramtaran there. On entering the......we found the venerable patient lying...*Nashiram* in his hand. He was marking with a pencil; there was a smile resting (?) and a tear in each corner of his eyes. I felt proud seeing one of our own dramatic works occupy the place [of the] Scripture in a sick chamber, the patient being a man of superior erudition and extra-ordinary strength of mind. He called us two over (?) his bed and took dust from Ramtaran's feet and bowed to me. Then he requested me to read to him a speech of মাধুরী when she consoles her lady বিরজা with asking her to place her faith on শ্রীহরি. He then explained the divine spirit of the beautiful work to Babu Baidyanath Biswas of Beadon Street, his friend,

১৭খ ইনি স্টার থিয়েটারের সঙ্গীতাচার্য ছিলেন।

১৮ অমৃতলালের কালাপানি প্রহসনে হরিদাস ভট্টাচার্য ভায়রত্নের ভূমিকায় অভিনয় করিতেন।

and himself read with emotion......of the Rajah beginning with 'গগন তপন......'[১৯] etc. After that Ramtaran sang a few songs from the book, which Gopal Babu had himself marked. Ramtaran also sang a few other songs amongst which one Hindi song describing the visit of মহাদেব at Yosoda's house to see শ্রীকৃষ্ণ; was pronounced by Bissumbhur Babu to be a very favourite song of his father's first youth.

If it be the last hours of Gopal Babu, I envy it more than all his possessions and gifts; no bridal chamber ever seemed to me so cheerfully holy as this sick-room on this morning. It is a compliment to the stage that its members are in request (?) at the probably (?) last hour of such a man; it is more than volumes of .....in the best newspaper.

Rajsingha was played to-night. A nephew of the late Bankim Chunder, his brother Purna's son, himself a munsiff was at the play, and in my rooms this morning.

Mother is a trifle better. Nux has done her good.

Monday the 17th August, 1896

...Babu in the morning. He is rather...attention is still devoted to the.. soul. In addition to the flowers I take... in the morning, this evening I sent...house a bunch of fresh-cut roses, jesmine, tube-rose and sweet-scented *Toolsy* leaves.

Received another and a more expensive harmonium from Messrs Horold & Co. in exchange of the one. sent

১৯ 'নসীরাম' নাটকের ৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্যে রাজার হরিনামের মহিমাসূচক দীর্ঘ উক্তি—

'গগন তপন সলিল পবন
তরু মেরু বিহঙ্গম
হরিগুণ গায় সবে…'

previously, the price of this one is Rs. 180/- in catalogue for me Rs. 160/-.

Girish Babu didn't come this evening at the Theatre. We rehearsed the 3rd Act of *Kalapahar.*

Tuesday the 18th August, 1896

Owing to a lot of correspondence falling in arrears couldn't go to see Gopal Babu this morning. Saw J. K. Dev Bahadur on my way from Ganges side. Presented 3 copies of the following books to a poor Brahmin student of the Sanscrit College from Gurudas Babu's Library: Buckle's *History of England, Standard Geography* and Sans. *Naisadh-charita.*

Kalapahar was rehearsed in the evening. Girish Babu came late. It is rumoured that he is helping in the organization of the new Minerva Company.

Received from Sudhendu Babu of Muktagacha 2 gold watches by Rotherham—one for myself and the other for Hari Babu—as presents for performing at his house on the occasion of his brother's marriage. I cannot fully enjoy the pleasure of receiving the gift, as my other two deserving partners have been left out.

Wednesday the 19th August, 1896

Making enquiry of Gopal Babu, who ..on my back from bathing came...with Ashoo[২০]; the 4th Chapter of my novèl...which gives me much anxiety. It has...very long one and without intending to do.. made the portrait of *Roy Ginni* very elaborate. Now, I don't know what to do with her in future. Leave her for good or connect

২০ ইনি ছিলেন অমৃতলালের লিপিকর।

her inseparably with the story? It has been raining in intermittent showers this whole day. Lent at Paltoo Babu's request a lot of dresses to the Combuliatolah amateur Jatra party. *Billamangal* was performed this night. We have decided to ask Girish Babu to take Tincowry.

Thursday the 20th August, 1896

Weather continues wet, a heavy pour at 10 a. m. Had a bath at the Theatre; yesterday morning presented Gopal Babu with 2 pictures—one of শ্রীরাধাকৃষ্ণ another of শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব.

In the evening *Kalapahar* was rehearsed. If Girish Babu has not given any adequate education to his son—general and histrionic—he has stuffed his stupid brain with conceit enough for a dozen amateures; all his gestures and articulations are further stamped with precocity that makes him look like sixty in his beardless chin.

Friday the 21st August, 1896

...in the morning···stopped bathing. Gave introduction for a service in the...Municipality to Roy Bahadur Nursing Dutt...and father-in law. Mother—same state, slow improvement.

Ashoo not coming, could not work on my novel nor the new sketch I intend beginning—so lost the morning. *Kalapahar* was rehearsed in the evening. Girish Babu intends playing the part of *Chintamony* (my part); it is feared I'll be confounded with *Nashiram*, the latter being the model of the first.

Saturday the 22nd August, 1896

I shall probably never forget the lifeless look...I saw in the face of a dying young Brahmin whom I saw in the state of

অন্তর্জলি at the Bathing Ghat this morning ; then it struck me forcibly that an All Powerful God of Mercy is necessary for a man's existence, who alone in the closing of his life can take the flying soul in His Loving Arms. However, I don't like this process of অন্তর্জলি especially in the case of one who had lost all faculty of perception and, from his age, was not prepared to die.

Babu Kartik Ch. Dey the Muktear of Debigunj in Jalpaiguri—at his lodgings my গুরুদেব[২০ক] is now putting up—came down to Calcutta on business and put up at my house. I gave him an introduction to Babu Pramatha Kar, attorney. He and his companions were entertained with a sight of our performance this night, He left next morning for his village Goipur, though I pressed him to dine and pass the day with me,

At the request of the Patna College Football Team the performance of রাজসিংহ was given this night. House fairly good.

Monday the 17th May, 1897

It was arranged that in order to settle the বিদায় of *Thacoormohashoy* I shall see my uncle in the afternoon ; but *Thacoormohashoy* on returning from uncle's informed me that uncle said, "It cannot be done this day." Gave *Thacoormohashoy* our Theatre-বিদায় of *Shivaratri.* There was no rehearsal ; a lecture was delivered in the evening by a Madras gentleman named Professor Rungacharya on the "Priest and the Prophet", Babu Nilmony Mukherjee, Principal, Sanscrit College, presided. The gathering was

২০ক গোবরডাঙ্গা গৈপুর নিবাসী কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য

not large. Mr. Willard, the painter, came to ask for... ; he has made up with his wife.

Tuesday the 18th May, 1897

Went to see Amrita at his garden in company of Dr. Bose ; Ashi and Bina[২১] were with me, 'A' had not much fever ; but was very uneasy—biliousness. On my way back went to have a look at the garden-house of Babu Sreenath Das[২২]—put up for sale—the price is high and the locality is out of the way. Had my bath at the Theatre, I was escorted by the proprietors of the Calcutta Press to their office and home in Nimtolla Street, Girish Babu was with us. These people want to start a Bengali weekly with our literary help. The paper is to be called রাজরাজেশ্বরী after their household goddess. Felt no appetite, took no meals. In the evening there was a heavy shower, Babu Thacoordas Kar[২৩] came in the evening to inform that a lot of good books are coming out for me from England. Had loose stool ; went to bed without any food ; had involuntary loose stools during night and felt very uneasy.

Wednesday the 19th May, 1897

......felt very ill—had barley and water and vegetable soup (গাঁদাল). Couldn't go to the Theatre in the evening. *Chaitanya Lila* was performed.

Uncle Jadunath Biswas and his son Hari came in the evening and stayed long to ask me to speak to the local municipal and police Inspectors about a dispute of passage in the back of his house No. 2, Shambazar Street with one

২১ অমৃতলালের কনিষ্ঠা কন্যা বীণাভূষণা

২২ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর ও নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাসের পিতা

২৩ প্রখ্যাত গ্রন্থ ব্যবসায়ী : ক্যামব্রে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা

Bama Churn Bhur, who purchased a parcel of land belonging to the Sovabazar Rajas. Had barley and fish (মাগুর) soup at night.

Thursday the 20th May, 1897

No bath— took light rice and fish (মাগুর) soup and vegetable (গাঁদাল) soup. Went to the Theatre in the evening. Received the 2nd number of the Illustrated Indian News. There is a portrait of Girish Babu and short sketch of his life in the same manner as mine was dealt in the first number. There is a short history of the constitution of the old National. the first public theatre in Bengal. The writer is Mr.G. In the first number he made some mistakes in jumbling together the names of the present proprietors of the Star with the founders (he called them proprietors too) of the National and the Great National and now in the present issue he has quietly shifted the blame of the inaccuracies on my shoulder, though it was I who soon after the issue of the first number drew Mr. G's[২৪] attention to the error and asked him to correct it in his next, mentioning my name as the corrector. The present information is supplied him by one Khagendra Nath Chatterjee. Who is this man ? I, of course, don't know, but there are so many mushroom growths in the theatrical world and such big names—so many critics, managers, directors, tragic-giants and comic-comets—that it is not easy for one to know them all, though he may be a principal promoter of the Bengali stage and a veteran. This Khagendra advises the theatrical historian to search the old files of local papers for

২৪ প্রবন্ধরচয়িতার নামের আদ্যক্ষর : পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই।

accurate information...It will be an evil day for the history of the Bengali stage in such a case.

Friday the 21st May, 1897

Had my Ganges bath; bowels not yet regular; same diet as yesterday, at night—light bread (dinner roll), fish-soup, milk and sago.

Saturday the 22nd May, 1897

While returning from bathing found at uncle's* house his Durwan Singh was dead. The poor man had a fit day before yesterday. Yesterday I found his pulse very low and he had a pain in the chest, but didn't think he was going to die so soon and sudden. Even this morning he went up to the stable-house to wash himself. His remains were carried for cremation by his relations at about 10 a.m. Nephew Upen, the best fellow of them, came along with me to take his rice meal at mine.

Rishya-sringa and *Kalapani* were performed this night, I taking part (Tincowry) in the latter piece. House very bad. Hari Babu was complaining about the want of nice plays, but he thinks this complaining is quite...his responsibility stops there. Following my advice, they will never sit together with me or Girish Babu to talk about literary matters and subjects of plays.

Sunday the 23rd May, 1897

Owing to the illness of the servant, the bath in the Ganges this morning was stopped; had a bath at the theatre; then accompanied Jagumama to see Bhupendra Nath Bose on some municipal business. After 5 p.m.,

---

* হরিশ্চন্দ্র বসু

went to Rajah Benoy Krishna's house to attend a special meeting of the Bangiya Sahitya Parishad. On my way, was met by Babu Haran Ch. Rakhit, who was coming to...at the meeting. This was my first attendance. Babu Dwijendra Nath Tagore was in the chair to whom I was introduced after the close of the meeting. Amongst others Justice Gurudas Bannerjee, Babu Chandra Nath Bose Rajendra Shastri, Hirendra Dutt, Motilal Ghosh, Dakhineswar Malia, Jatindra Chowdhury (Moonshy) were present. An address in Bengali to the Queen on the Diamond Jubilee occasion (60th year of H. M. 's reign) and an application to the Calcutta University recommending certain changes in the Entrance, F. A., and M. A. text books were considered. I didn't at all like the language of the address to H. M. ; it is not elegant, though at mine and others' suggestions certain changes were made. Babu Gopal Ch. Mukherjee was asked to consult me about typing the address and the design of the casket. I supported Babu Rajendra Shastri's[২৫] motion in as far as it pointed to the desirability of retaining some easy books on Physical Geography. *Haranidhi* was performed at the theatre. Mr. Halder, Coomar Monmatho Mitter, Paltoo Babu and others spoke highly of the performance. There was some rain this night.

Monday the 24th May, 1897

After bath went to Benode, son of Babu Nanda Lal Bose of Baghbazar, to introduce Babu T. D. Kar (Cambray) to him. There was an appointment made with Benode to meet at the theatre this afternoon to settle our genealogi-

২৫ ইনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন।

-cal table, but going at the request of my maternal uncle to his house to meet the bridegroom-elect of his grand-daughter, was obliged to send an apology. There was no rehearsal in the evening. Holiday to honour Her Majesty's Birthday. Gangagobind Babu and Gocool Babu were with me in the evening.

Thursday the 30th September, 1897

......is in my hands but I had to pay Rs. 60/- for it. This is the late Dr. Sambhoo Ch. Mukherjee's set and I have got it brought through Eraz. This set looks to be an older and a different edition than the one...obtained as loan some 3 years ago from the Asiatic Society's library, but I learn [that] through the indiscretion of a Bengali member that set [was] destroyed. Cambray (T.D.) told me so. Like a miser who buries his wealth and gloats......thought and the sight. This book-collecting has become a mania with me. But now it is 3 rooms full, I have no more place to keep them and what I have, I am afraid, may be destroyed by the damp and worms. This is the great Panchami day—day after to-morrow is the first Pujah. I have spent more money, but not have a hundredth part of the happiness and......I had 15 years back with 1/10th of the money. Rather there sits a melancholy...the heart !.

Friday the 1st October, 1897

Received from Jeeban Rs. 15/-. Returned him his Garad and Cheli ; he still owes me about . or Rs. 30/-. Paid Rs. 2/- to one young man named Rajendra Narayan Banerjee of Rajah Raj Ballav Street, who was in distress being unable to buy Pujah cloth for his children—(Oh ! if) I were a rich

man how would I like to see smile [in the Pujah] season on the lips of the poor. Received from Hari Babu Rs. 310/- in all including the monthly Rs. 100/- paid to wife for her portion of the monthly house-keeping expenses as well as mother's monthly allowance. From the balance of Rs. 2000/- borrowed to pay my book debts, there was Rs 144/- only; instructed *master*[২৬] to make payments of small sums to Cambray and the hawkers and Ramzan. Zonab and Eraz each has drawn Rs. 10/- in excess making misrepresentation to *master* in my name. This obliged me to borrow Rs. 40/- from Panchoo Babu. Sent Rs. 50/- to R. Cambray Rs. 50/-, Ramjan—40/- Zonab—50/- Eraz—30/-...

Saturday the 2nd October, 1897

To-day is the Saptami Pujah. Have many sweet and sublime...what memories (?)...joy rise in the mind with the first...of this day's dawn. Oh, what...for enjoyment now that the power of enjoying is past!

The bathing of নবপত্রিকা was timed this morning after 7-30 a.m. Went after bathing in the Ganges to Dasoo's[২৭] house. This is the 3rd year he is celebrating this Moha Pujah in his picturesque new house at Bosepara. Of all our partners Dasoo ought to be most happy. From a poor and dependent orphan childhood he has at once stepped in to an independent and prospering manhood. He had his youth; careless, buoyant, indisciplined youth, that was the only blame in his life. He is well-settled as a respectable

---

২৬ মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী: ইনি ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত ঘাটেশ্বরের জমিদার বংশের সন্তান। অমৃতলালের বহুযত্নসংকলিত দুর্লভ গ্রন্থাবলীর তত্ত্বাবধানভার ইঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। নাট্যশালায় ইঁহার নাম ছিল মাষ্টার মহাশয়। ইনি ষ্টারের অভিনেতাও ছিলেন।

২৭ ধর্মদাস সুরের ভাগিনেয় ষ্টারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী দাশুচরণ নিয়োগী

land-holder helping with an asylum his maternal uncle Dharmodas Soor[২৮] and his family, who supported him in his childhood, and above all has reached the goal of a Bengali Hindu's ambition in performing the Durga Pujah. To complete the mortification of the Bengalees this year of misfortunes, it began to rain this day from 10 a.m. and rainy cloudy muddy day it continued all day and night. The waterworks supplied the customary supply of water at night. I have paid mother, wife—and others their Pujah presents.

Sunday the 3rd October, 1897

Astami morning—rain continued—went to bath and attended Dasoo's house. Sent wife to Dasoo's house; accompanied by her, 2 daughters and Sashee* [also went]. They came home in the evening and wife reported a most affectionate and loving reception from the family. Presented Rs. 2/- to Mejo-Bou (cousin Nepal's wife), who lives at my uncle's house and very poor, though she did her best to contribute in...her open-quarrels and back-bitings to cause our separation with uncle and aunt. From last night up to 3 p.m. this day the water supply was almost nil and in many houses there was absolutely nothing to be had from the pumps. This and the continued shower put the *Pujah Barees* to great trouble. The whole people especially the children and the men and women of poorer class...all their enjoyments and sight-seeing, dressed in their new clothes, marred by this rain. Cyclonic weather is reported from the Bay. Dasoo did not accept the Pranami at his house.

২৮ ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের অন্যতম উদ্যোগী

* তৃতীয় পুত্র

Monday the 1st November, 1897

...তপোবনের ন্যায় শান্তিপূর্ণ কানন, মধ্যে সুন্দর মন্দির। পাণ্ডা ভিখারীর গোলমাল, উৎপাত নাই। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার পাষাণ মূর্তি ...চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির, মধ্যে প্রস্তরের সুন্দর সুন্দর লক্ষ্মী, গোপাল... প্রভৃতির ছোট ছোট মূর্তি। এই মন্দিরের পশ্চাতে এক প্রশস্ত সুন্দর মন্দির—তথায় এক...মূর্তি। ভাস্করকার্যের চমৎকার দৃশ্য! এক সুবৃহৎ চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডের উপর উচ্চভাবে খোদিত প্রকাণ্ড নৃসিংহদেব—২ হস্তে শঙ্খ চক্র, ১ হস্ত মুক্ত, অপর হস্ত শিশু প্রহ্লাদের মস্তকোপরি স্থাপিত। বড়ই শান্তিপূর্ণ স্থান। কাশীযাত্রী মাত্রেরই এই মন্দিরদর্শন কর্তব্য। জগন্নাথ ও নৃসিংহদেবসম্মুখে আট আনা করিয়া প্রণামী দিয়া ক্ষুদ্র মন্দির সকলে যৎকিঞ্চিৎ করিয়া দিলাম। তথা হইতে আর একটি বাগানে—ডুমরাওয়ের রাজার স্থাপিত প্রস্তরের সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের মূর্তি। তথায় ৷৹ আনা প্রণামী। পরে কেদারেশ্বরের লোহিতপ্রস্তর নির্মিত, গঙ্গার উপর স্থাপিত মন্দিরে যাইলাম। কেদারেশ্বরটি মূর্তিও নহে, ঠিক লিঙ্গও নহে। ক্ষুদ্র স্তূপের ন্যায় দ্বিখণ্ডিত ও হরগৌরী আখ্যাত। পূজা করিয়া ১ টাকা প্রণামী দিলাম। গঙ্গার ধারে নীলকণ্ঠ— বৃহৎ লিঙ্গ। তথায় ।৹ আনা প্রণামী, পাণ্ডা, ভিখারী প্রভৃতিতে প্রায় ১ টাকা। পরে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরে যাইলাম। জালার ন্যায় বৃহৎ মূর্তি— চারি আনা প্রণামী। উহার পূর্বে পথে রামজীর মন্দিরে গিয়াছিলাম। কাশীতে জলের কল স্থাপনের [সময়] এই মন্দির লইয়া মহা দাঙ্গা হয়। পুলিশ ও হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীগণের যুদ্ধে [গভর্ণমেণ্টকে] সেনা আনাইতে হয়। হত্যা আঘাত অনেক হয় এবং বিচারে অনেকে বন্দী হয়। সঙ্কীর্ণ অপরিষ্কার গলির মধ্য দিয়া পথ—জলকলের পাশ [অবধি] সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া মন্দির প্রবেশ করিতে হয়। কথিত আছে, ভক্ত কবি তুলসীদাসের স্থাপিত এই মূর্তি। ।৴৹ প্রণামী, কিছু ভিক্ষা। বেলা ১টার পর বাসায় ফিরিয়া স্নানাহার করিলাম।

In the evening I was invited to a party at Babu (?) Dakhina Mohan's at Bhadawari (?); he is a Zemindar of Rungpore, blind of both eyes...and a hypocrite. Satish was my companion. There was a gathering of most of the Bengalee officials and swell fellows. Babu Nilmadhab

Roy, the sub-Judge and Babu Girish Chandra Bose, the Munsiff, were the prominent guests. The latter was born and reared (?) in Punjab and is a scholar and linguist. They both treated me very...old Sitanath Ghosh was also there. A very late supper was served and there was enough brandy and brawl; but the 1st part of the evening was really pleasant. Saraswati was here again and sang some excellent songs. Then for the 1st time [I] heard the songs of the celebrated Haasina Baie. She is neither young nor a beauty and can't sing in any higher note; but, in the lower keys— she is exquisite; her modulations are marvellous and she is really accomplished. Both the ladies invited me to [their] homes. I [had] wanted to make some present to Saraswati on our boat-party and now gave her ½ a guinea and also gave a ten-rupee note to Haasina. There was [a] fair young one named Shajadi, but her singing was ordinary.

Wednesday the 3rd November, 1897

......here is nothing of any importance to be recorded... from the 1st to this day except that I am idling away aimless days. Purchased a copy of Mathura (?) Prosada's Trilingual Dictionary. Rs. 6/-.........Rs.5/-. Inspected some .. The trip is an absolute loss both [as] regards profit and pleasure...to be at liberty from home...I am forced by courtesy to undergo stricter routine and solitude even in a companionship that is not quite congenial. Our friends often with their best intentions make us unhappy, The displeasure of my wife at parting is bearing its fruits, yet I long to see her again. The news of Ashi's illnes also troubles me.

Thursday the 4th November, 1897

In the morning dressed to go to Secrole, but not finding the Ghareewallah, who has become known to me, went to the carriage-stand and there disgusted with the insolence of a rogue of a John (?) came back. After bathing in the Ganges went to the temples of Bisseswar and Annapurna and performing the Pujah there came back home at Issaar's and had my meal. In the afternoon went to sit on the platform at Ahalyaghat; met one Bengalee Dandee (দণ্ডী) there; Coomar Upendra Krishna was there too. To sit on an afternoon on a moonlit evening at the banks of the Ganges, especially at Ahalyaghat in Benares is really a treat— temporal and spirituul. Bengal Pujahs travel with the Bengalees and this being the Visarjan Day of the Jagatdhatry Pujah, we saw several images of the Devi carried on the river on boats and......with music and light.

১৯২৫ সনে অমৃতলাল একবার পিছন ফিরিয়া ১৮৮৯ সনের স্টার থিয়েটার সংক্রান্ত চুক্তির কথা স্মরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই স্বহস্ত-লিখিত খসড়াটি পাওয়া গিয়াছে। ইহারও ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

STAR THEATRE

2. 12. 1925.

1. Partnership 5 years from October, 1889. In the last clause the word "afterwards" is mentioned ; to what articles it may extend? The Deed was executed where G. C. Ghosh was the salaried Manager and playwright.

2. Rendering of personal services by each is a condition of Partnership and A. L. B's services include that of "attempting to write plays and farces to be played at the said Theatre",

3. The monthly allowance to be received by each partner is called "salary" in one clause.

4. G.C.G. went away and A.L.B. was Manager and though the partners saved G.C's salary both as Manager and playwright, A.L.B. did not receive any extra allowance except later on for a very few years Rs. 40/-a month as house rent—he as Manager was required to pay rent and live in Calcutta near the Theatre while he had his house to live in at Salkia.

5. I wrote plays all along— heaps of money came in— G.C's salary saved, I received nothing.

৪

'শ্রীশ্রীশিবদুর্গা ৺কাশীধাম
সহায় 4.6.15

বাবা ক্ষেত্র,

আমরা গত বুধবার সন্ধ্যার সময় পূর্বস্থান ত্যাগ করিয়া কাকার বাটীতে আসিয়াছি। তোমার ১লা জুনের টেলিগ্রাম গতকল্য ৩রা সে বাসায় পৌঁছিয়াছিল, আমি এই প্রাতে ৯টায় পাইয়া reply দিলাম। লিলির[১] পত্র যথাসময়ে পাইয়া বুঝিয়াছিলাম তুমি tele করিয়াছ। আমি গ্রীষ্মাতিশয্য-বশতঃ কাহাকেও পত্র লিখিতে পারি নাই। এখন বেলা ৩।৽ টা, এখানে তবু বসিয়া লিখিতেছি, সেখানে একেবারে অসাধ্য ছিল। হরিবাবুর পুত্র উপেন লিখিয়াছে কলিকাতায় অসহ্য গরম। সেটা কেমন জান, যেমন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন বলিতেন, আমি গরীব ব্রাহ্মণ। কলিকাতায় electric fan, ice, অজস্র জল, তবু গরম। যদি গরম কাহাকে বলে কেহ বুঝিতে চায় তবে সে এই সময় এখানে আসিয়া ১ দিন কাটাইয়া যাক— আমি তাহাকে ২৪ ঘণ্টায় ২৪ রকমের বিচিত্র বৈভব দেখাইয়া দিব। আল্না হইতে জামা লইয়া গায়ে দাও fomentation এর flannel এর আস্বাদ অনুভব করিবে। Easy chair বা বেনচে ঠেসান দাও পীঠে রজকের গরম ইস্ত্রি বসিবে। জল কবিরাজী চিকিৎসার উপযোগী। এই গরম আমি বিনা পাখায় বিনা বরফে বিনা খসে কাটাইতেছি। খসের পর্দা কয়খানি করাইয়াছি এখনও খাটান হয় নাই, পাখার ও পাখার লোকের চেষ্টা করিতেছি, বরফ তো খাইনা। গৃহিণী ইহার উপর রন্ধন করিতেছেন, লোকও রাখিবেন না, আর রাগে গরমে ছট্‌ফট্ করিবেন। সত্য ছট্‌ফট্, বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সত্য ছট্‌ফট্ ও বাপ্‌রে! মারে! আমাকেও করিতে হয়। কিন্তু বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় কোন অসুখ নাই। তোমরা সকলে ভাল থাক বিশ্বনাথের চরণে এই প্রার্থনা। আমি ক্লান্তিবশতঃ কম চিঠি লিখিলেও তোমরা ঠিক লিখিও। শালিখার বাটীর ভাড়ার ও নারিকেলের খবর কি ?

আঃ —
অ

Babu Hurish Ch. Bose's House
74 Ramapura
Benares city'

১ পৌত্রী : ক্ষেত্রভূষণের কন্যা

পুনশ্চ

পৃ ১৮৭ 'বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত': সপত্নীপুত্র ও বিমাতার প্রণয়প্রসঙ্গে সেলিউকাসের পুত্র ও তাহার বিমাতার উল্লেখ করিয়াছি। Will Durant সেলিউকাসের পুত্রের নাম বলিয়াছেন, Demetrius (দ্রঃ *The Story of Civilization*—Part II: *The Life of Greece*, P. 572)। অন্যান্য গ্রন্থে সেলিউকাসের উক্ত পুত্র Antiochus I বলিয়া উল্লিখিত (দ্রঃ *The House of Seleucus* by E. R. Bevan, P. 64)। *The Cambridge Ancient History* গ্রন্থেও (Vol VI P. 395) Antiochus I-এর নাম পাই। এনসাইক্লোপিডিয়াগুলিও Antiochus I-কেই সেলিউকাসের পুত্র বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন।

পৃ ২৯১ ১৯৬৩ সনে 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র নবমুদ্রণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রীতিভূষণ বসু-লিখিত একটি 'নিবেদন' আছে। ইহাতে 'ব্যাপিকা-বিদায়' প্রথম মঞ্চস্থ হইবার সময়ে এবং তাহার পরে এই প্রহসনের পেশাদারী ও শৌখীন অভিনয়ের বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য বিবৃত হইয়াছে।

পৃ ৩৫৩ জেলেপাড়ার সঙ: ১৩৭৫ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে 'পাঁচালী ভারতী'র উদ্যোগে জেলেপাড়ার সঙের 'স্মরণ-উৎসব' হয়। এই উৎসবে বিশিষ্ট অতিথি জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙের যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

> "প্রাচীনকাল হইতে এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পোষাক পরিয়া অঙ্গভঙ্গী সহযোগে গান ছড়া-কাটা প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের একটি পরিহাসোজ্জ্বল অনুকৃতিকে 'সমাঙ্গ, অর্থাৎ 'অনুরূপ অঙ্গ' বলা হইত। এই সংস্কৃত শব্দ হইতে উত্তর ভারতের হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় 'সওআঙ্গ' এবং বাঙ্গলায় 'সঙ্' বা 'সং'। ছদ্মবেশ অর্থে 'সঙ্'

শব্দ বাঙ্গলাদেশে খ্রীষ্টীয় আঠারোর শতকের শেষ দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে 'জাত' বা 'যাত্রা' অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানমূলক শোভাযাত্রায় এইভাবে সঙ সাজিয়া যাওয়ার রীতি বিশেষভাবে পালিত হইত। পরে উনিশের শতকের প্রারম্ভ হইতে আমাদের চড়ক গাজন প্রভৃতিতে জন-সাধারণের জীবনযাত্রার প্রকাশক নানা প্রকারের 'সঙ' এই সকল জনপ্রিয় পূজানুষ্ঠানের একটি মুখ্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।"

কাঁসারীপাড়ার সঙ্ বন্ধ হইবার পর 'জেলেপাড়ার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কতকগুলি সংস্কৃতিপূত চিত্তের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চেষ্টায় আবার এই সঙ্-এর পুনঃপ্রবর্তন ঘটে—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে।'

নির্ঘণ্ট

* চিহ্নিতগুলি অমৃতলালের রচনা